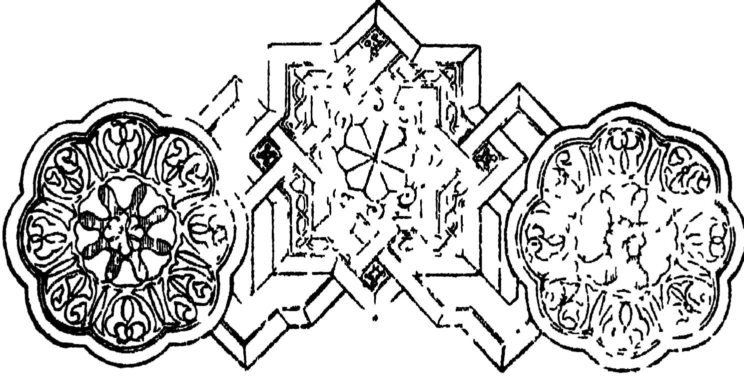


অমরকাহিনী আরব্যরজনী

সম্পাদনা ও ভাষান্তর / সৌরেন দত্ত

প্রচ্ছদ / কুমারঅজিত   অলংকরণ / শ্রীবিদ্যা অশোক



প্রকাশক : অশোক রায়
১৬৬ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মুদ্রক : গোপাল চন্দ্র দাস
এ পি পি প্রেস, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : সান প্রিন্টিং হাউস
৪৮/৫ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

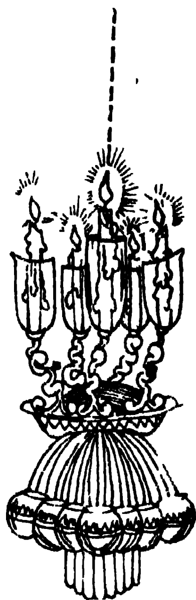
ব্লক মেকার : বেঙ্গল আর্ট প্রসেস,
২০৬/১বি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রকাশকাল : বইমেলা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ৯ ৫

১৮৩৯ সালের ই, ডব্লু, ল্যানের সংস্করণ থেকে গৃহীত মূল ইলাস্ট্রেশন এবং স্যার রিচার্ড বার্টনের 'প্রাইভেটলি প্রিন্টেড' অ্যারাবিয়ান নাইটস থেকে অনূদিত।'

চল্লিশ টাকা


অমরকাহিনী
আরব্য
রজনী
রিচার্ড বার্টন

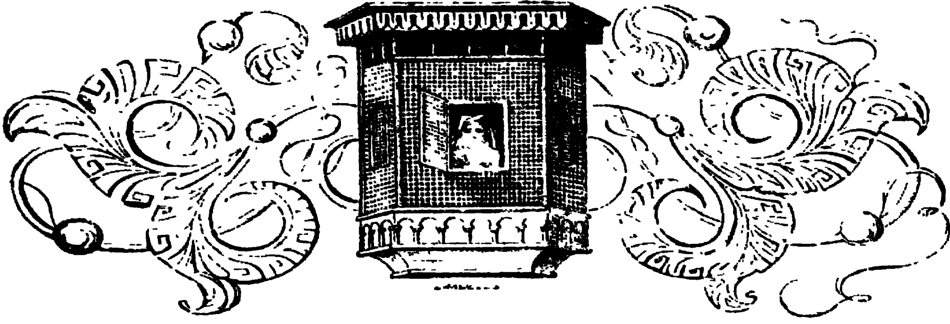


Amar Kahini Arabya Rajani

By Souren Dutta

[Based on Arabian Night by Richard Burton]

Rupees Forty Only



গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

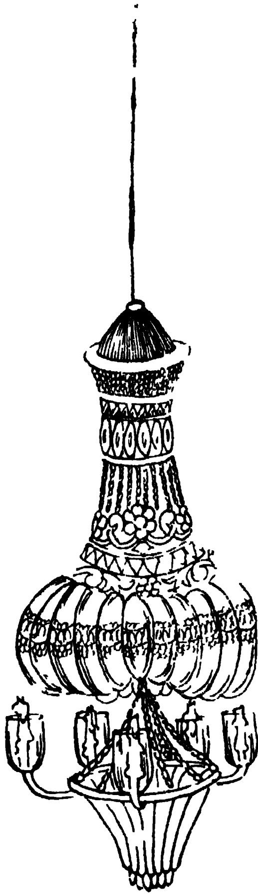




আরব্য রজনী ও কিছু কথা

আজ থেকে প্রায় ২৮০ বছর আগে 'সহস্র এক রজনী' গ্রন্থটি প্রথম ইউরোপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আরব্য রজনীর সেই বিরাট দেওয়টিকে প্রথম যে পরিচয় করিয়ে দেন, তিনি একজন ফরাসী স্কলার, এ্যান্টনি গ্যালা, যার আরবি ভাষায় লেখা থেকে ফরাসী ভাষার ভাষান্তর (১৭০৪—১৭) পাশ্চাত্য জগতে এক কাল্পনিক কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। শুরুতে গ্যালার উদ্দেশ্য ছিলো 'আরব্য রজনীর প্রমোদকাহিনী' পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় করে তোলা। বলাবাহুল্য আরব্য রজনীর মূল চরিত্রগুলি উপেক্ষা করে তিনি অতিরঞ্জিত এবং অলৌকিকতার উপর বেশি প্রাধান্য দিয়ে কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি তাঁর অনুবাদে যৌন ও বিকৃত-যৌন সম্বন্ধে নিষ্ঠুর ও ভ্রষ্টাচারের আদিম কাহিনীর আধিক্যই বেশী করে চোখে পড়ে, প্রকৃত ঐতিহাসিকদের বিচারে যা আধা-সত্য কাহিনী বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

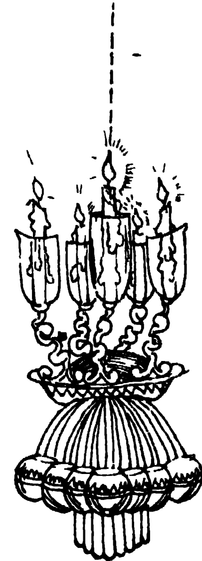
তবে সৌভাগ্যের কথা হলো, আরব্য রজনীর এক সম্পূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য অনুবাদ প্রথম সচেষ্ট হন হেনরী টোরেন্স (১৮৩৮ সালে)। কিন্তু তার পরিকল্পিত ন'টি কিংবা দশটি খণ্ডের মধ্যে মাত্র একটি খণ্ড সম্পূর্ণ করে অসময়ে মারা যান তিনি। পরবর্তীকালে অনুবাদক ই, ডব্লু, ল্যানস্'র (১৮৩৯—৪১) অনুবাদের আসল মূল্যের সন্ধান পাওয়া যায় ফুট-নোটে, যেখানে তার জানা কায়রো সমাজকে অতি বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ বলে লিপিবদ্ধ করে গেছেন তিনি; তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্য ছিলো 'ড্রইং-রুম টেবিলে' গল্প বলার কাহিনী অনুবাদ করা। এ যেন মূল কাহিনী খোজা নির্বাচন মাত্র। তারপর সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ অনুবাদ করার কাজ হাতে নেন জন পেইন (১৮৮১—৮৪) এবং ভিলন সোসাইটি ৫০০ কপির এক সংরক্ষিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। স্যার রিচার্ড বারটন ব্যক্তিগত ভাবে ষোলটি খণ্ডে (বিকৃত, অতিরঞ্জিত ও ভ্রমাত্মক অংশগুলি বাদ দিয়ে) (৮০৫—৮৮) আরব্য রজনীর এই অমর কাহিনী প্রকাশ করার সময় উপরোক্ত তিন অনুবাদকের কাছে অকপটে তাঁর ঋণ ব্যক্ত করে গেছেন। বারটনের ইংরেজী ভাষায় আরব্য রজনীর অনুবাদ স্বীকৃত এই কারণে যে, অনুবাদ করতে গিয়ে প্রতিটি মূল কাহিনীর অসাধারণ সঠিকতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন তিনি। তাছাড়া তাঁর অনুবাদে আমরা দেখতে পাই পুরুষোচিত



জীবনের বিকাশ এবং সাহিত্যের নিরীখে অনবদ্য এক সম্পদ, যা চিরন্তন ও শাশ্বত এবং এখনো এর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী অসহ্য, অপাঠ্য ও অপাক্তেয় বলেই মনে হয়।

আরব্য রজনীর অনুবাদক হিসেবে বার্টনের যোগ্যতা অসাধারণ, কেবল তাঁর আরবি ভাষায় প্রভূত জ্ঞান থাকার জন্যই নয় (প্রাচ্যের প্রধান দুই ভাষা পার্শি এবং হিন্দুস্তানি ভাষাতেও সমান দখল ছিলো), তাঁর বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বও এর অন্যতম একটা কারণ বলা যেতে পারে। ১৮৫৩ সালে তিনি আফগানিস্তানের এক মুসলমান ফকিরের ছদ্মবেশে তীর্থ ভ্রমণে বার হন কায়রো, সুয়েজ এবং মেডিনায়, তারপর মুসলমানদের পবিত্র শহর মক্কায়, সেখানকার মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ কাবার প্রাচীন কাহিনী সংগ্রহ করে আনেন, সেই সঙ্গে তার স্কেচও এঁকে আনতে ভোলেন নি। কেবল ইংরিজী ভ্রমণ সাহিত্যেই তাঁর সেই তীর্থযাত্রা শ্রেষ্ঠ রচনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, সেই সঙ্গে মুসলমান সমাজ ও তাদের সমাজ ব্যবস্থার এক অসাধারণ বর্ণনা তিনি লিপিবদ্ধ করেন গেছেন, সেদিক থেকে আরব্য রজনীর প্রকৃত অনুবাদক হিসেবে তার যোগ্যতা সন্দেহাতীত অবশ্যই! সেই সময় মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ব আফ্রিকাব শহর হারেরে মুসলমান ছাড়া অন্য কোন জাতের লোকদেব প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ ছিলো। সেই নিষেধ কেউ অমান্য করলে তার গর্দান যাওয়া অনিবায ছিলো অথচ সেই নিষেধ লঙ্ঘন করে বার্টনই প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে অক্ষত অবস্থায় সেই নিষিদ্ধ শহরে (১৮৫৪—৫৫) ভ্রমণ করে আসেন। আশ্চর্য! শুধু তাই নয়, প্রাচ্যের মুসলিম সমাজের রীতি-নীতি, বিশ্বাস সম্বন্ধে যে সব নির্ভরযোগ্য তথ্য তিনি সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন, তা অতুলনীয়, মনে হয় না আগে কিংবা পরবর্তীকালে অন্য কোন ভ্রমণার্থীর পক্ষে সেটা সম্ভব হয়েছিল। বার্টনই প্রথম ইংরাজ ভ্রমণার্থী হিসেবে লেক টাঙ্গানাইকা আবিস্কার করেন, এটা তাঁর কম কৃতিত্ব নয়!

আরব্য রজনীর কাহিনীর সূত্রপাত হলো এক কাল্পনিক উপাখ্যানের মধ্যে দিয়ে, আর সেই উপাখ্যানের বিষয়বস্তু হ'লো ঠিক এই রকম: ভারতবর্ষের বাদশাহ শাহরিয়ার তাব বেগমকে হঠাৎ একদিন ব্যাভি-চারিণীর ভূমিকায় দেখতে পেয়ে রাগে উত্তেজনায় জ্বলে ওঠেন। তারপর তাকে কোতল করে সিদ্ধান্ত নেন তিনি, প্রতিটি নারীর বিরুদ্ধে তাঁর ব্যাভিচারিণী বেগমের প্রতিশোধ নেবেন। সেই থেকে প্রতি রাত্রে একটি করে কুমারী মেয়েকে সম্ভোগ করার পর ভোর হতেই তার গর্দান নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন তিনি। কিন্তু তাঁর শেষ সাক্ষাত ঘটে শাহরাজাদের (শেহেরজাদী) সঙ্গে, তাঁর উজিরের পরমাসুন্দরী ও বুদ্ধিমতী



কন্যা। শাহরিয়ার গল্প শুনতে খুব ভালোবাসতেন, খববটা তাব জানা ছিলো। শাহারাজাদ সেই সুযোগটা পুরোপুরি গ্রহণ করলো তাদের শাদীর রাত্রে। একটার পর একটা গল্প বলতে শুরু করলো সে, বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিলো। গল্পের শেষ পর্যায়ে এসে শেষটা না বলেই নতুন আব একটা গল্প ফেঁদে বসতো সে তাবপব থেকে প্রতি রাত্রে। বাদশাহেব গল্প শোনাব কৌতূহল ছিলো দারুণ, শেষটা শোনার আগ্রহ নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন পরবর্তী রাতেব জন্য। শাহবাজাদেব মুখ থেকে নতুন করে আর একটা গল্প শোনাব অপেক্ষায়। আব এই ভাবে প্রতিদিন ভোবে শাহবাজাদেব গর্দান নেওয়ার ফুরসত আর পেলেন না তিনি। তাবপব সহস্র রজনীব শেষে দেখা গেলো বাদশাহ শাহবিয়াব সেই নৃশংস বাতিকটা সেরে গেছে।

শাহবাজাদের অকপটে বলা সেই সব কাহিনীব মূল উৎস হলো পাবস্য। এই সব কাহিনীর কথা মাসুদি বর্ণনা দিয়েছে ৯৪৪ সালে এবং 'ফিহবিস্ট'-এ (৯৮৭) তাব উল্লেখ আছে, 'হাজাব আফসানে'য় (হাজাব কাহিনী) যে সব কাহিনীব আবির্ভাব ঘটে, প্রথম আবটেক্সারেক্সেব কন্যা রাজকুমাবী হোমাইকে দারুণ ভাবে প্রলুব্ধ করে সেই সব কাহিনী। যাইহোক, কাহিনীগুলি শুনলে মনে হয়, পার্শী ভাষার থেকে আববি ভাষাব স্বাদ অনেক বেশী। তবে এও হতে পাবে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোন পেশাদার কাহিনীকার কাযবো থেকে এই সব কাহিনী সংগ্রহ কবে থাকবে। সহস্র এক আববা রজনীর এই সব জটিল কাহিনীগুলি বিশ্বসাহিত্যের এক একটি অমূল্য সম্পদ এবং বহু প্রশংসিত বিস্ময়কব ঘটনাবলির অভূতপূর্ব সমন্বযেব সৃষ্টি। বোকাচিওযেব 'ডেকামেবন' চসাবেব 'ক্যান্টারবেরি টেলস' এবং ফেবলস্ অফ বিডপাই', প্রতিটি গ্রন্থেব গঠন প্রায একই ধবণেব, কিন্তু আববোর কাহিনী নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে, অনেক, অনেক বেশী জটিল ও রহস্যময়।

বার্টনেব বসোত্তীর্ণ মূল কাহিনীগুলি অখণ্ডতা বক্ষা কবাব জন্য প্রথম বাত্রির কাহিনী থেকে শুরু কবে ধারাবাহিকতা বজায বাখা হয়েছে এখানে প্রথম অধ্যায়ে, দশটি অধ্যায়ে 'সহস্র এক রজনীর' গ্রন্থ থেকে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে নির্বাচন কবা হয়েছে ছ'টি অধ্যাযেব 'বিস্ময় বা অতিবিক্ত রজনী' থেকে নেওয়া 'আলাদিন কিংবা আশ্চর্য প্রদীপ' এবং 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোব' এর কাহিনী, যা এখন আমাদের উত্তবাধিকাব সূত্রে পাওয়া সম্পদ হয়ে দাড়িয়েছে। এই গ্রন্থে প্রতিটি কাহিনী বার্টন ক্লাবের ইংরিজী সংস্কবণ থেকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে বাংলা ভাষায অনূদিত হয়েছে। ছবি বা স্কচ নির্বাচন কবা হয়েছে ১৮৫৯ সালে সম্পাদিত ই, ডাব্লু, ল্যানেব অনুবাদ সংস্কবণ থেকে। বাংলা ভাষায আববা রজনীব কাহিনী যতো অনূদিত হয়েছে, মনে হয না মুল কাহিনীব সঙ্গে তাব ঠিক ঠিক মিল আছে, ভাবার দৈন্যতা না হয় বাদই দিলাম। সেদিক থেকে এই 'অমব কাহিনী আববা বজনী' আশা কবি প্রকৃত পাঠক-পাঠিকাদের খুশি কবতে পাববে, এবং এই প্রথম তারা আববা বজনীব একটি প্রামাণ্য দলিল তাদের মূল্যবান গ্রন্থেব সংগ্রহের তালিকায নিঃসংকোচে অন্তর্ভুক্ত কবতে পাববেন। এই বিশ্বাস নিয়েই মূল গ্রন্থকার রিচার্ড বার্টনের 'টেলস ফ্রম দ্য আরেবিয়ান নাইটস' গ্রন্থেব অনুবাদেব কাজ হাতে নেওয়া। সমজদাব পাঠকদের প্রকৃত সমালোচনাই এব সাফল্য এবং পাথেয হয়ে থাকবে বলে আমাব বিশ্বাস, আমাব অনুমান।

সৌরেন দত্ত



খোদা আল্লাহ্

আপনার দয়া অপরিসীম, আপনি মেহেরবান !

প্রথমেই আল্লাকে প্রশংসা জানাতে হয়। দয়ার সাগর আল্লা। ত্রিভুবনের সৃষ্টিকর্তা তিনি। যিনি আমাদের মাথার উপরে বিনা স্তম্ভে মহাকাশ রচনা করেছিলেন, যিনি আমাদের জন্য এই পৃথিবীর জমিনের উপরে শয্যা দিয়েছিলেন বিছিয়ে, আমাদের সেই খোদা মহম্মদের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাই, প্রার্থনা জানাই তাঁর অনুগামী প্রচারকদের এবং তার পরিবারবর্গ ও সঙ্গীদের। তার আদর্শ, তাঁর দোয়া আমাদের জীবনে পাথেয় হয়ে থাকুক চিরদিন। তথাস্তু! আপনি আমাদের ত্রিভুবনের একচ্ছত্র অধিপতি, আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন, আপনার অপার মহিমা প্রচারে আমরা যেন সক্ষম হই !

তারপর! আজকের আধুনিক যুগে সেইসব ঐতিহাসিক কীর্তি-কাহিনী আমাদের সামনে এক একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে গেঁথে গেছে আমাদের ঘরে, আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে, চোখ খুলে দিয়েছে সোচ্চার হওয়ার জন্য অসতের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ব্যভিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাতে কি আমরা সৎ জীবন-যাপন করতে পেরেছি ? জুলুম-অত্যাচার-ব্যভিচারের মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পেরেছি ? না বোধহয়। অতীত ইতিহাসের পাতা ওল্টালে মনে হয় তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আমরা আমাদের চোখের সামনে পেয়ে যেতে পারি। তাই সুক্রিয়া জানাই সেই ঐতিহাসিককে, যিনি অতীতের ইতিহাস রচনা করে বর্তমানকে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। সেই সব ঘটনাবলী নিয়ে 'সহস্র এক আরব্য রজনী', বিশ্বের এক সেই সাহিত্য সম্পদ এবং বিস্ময়কর সেই সব রূপকথাগুলি।

সেই সব রূপকথার কাহিনীতে আমরা জানতে পারি (খোদা-আল্লা সর্বজ্ঞেয়, তিনি সর্বময় কর্তা, সর্বকালের করুণাময়, সর্বকালের দয়াময়, তাঁর কাছে সে সব কাহিনী অজানা থাকার কথা নয়) ভারত এবং চীনের দ্বীপপুঞ্জে বাসু সসন বংশের এক রাজার বাজ্য রাজত্ব করতেন। শত্রুপক্ষের আক্রমণের জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী, ফাই-ফরমাস খাটার জন্য অসংখ্য ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী, বক্সিবাহিনী এবং অনুগত প্রজাবৃন্দ, সবাই তার সুখ-সমৃদ্ধির সমান



অংশীদার ছিলো। দুই পুত্র রেখে একদিন তিনি বেহেস্তে চলে যান। বড় ছেলে টগবগে যৌবনে ভরপুর, আর ছোট ছেলে তখন কৈশোর আর যৌবনের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুজনেই ছিলেন সাহসী যোদ্ধা এবং সাহসী অশ্বারোহী। তবে তুলনায় বড় ছেলের থেকে ছোট ছেলে ছিলেন ঘোড়া চড়ায় বেশি ওস্তাদ, বেশি দক্ষ।

তাই এই সব বাড়তি গুণ থাকার জন্য বড় ছেলে তার পিতার রাজ্য শাসনের ভার পান। তবে তিনি ছিলেন খুব দরদী রাজা। প্রজাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের ব্যাথার ব্যাথী হয়ে দরদীর ভূমিকা নিয়ে

এক উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করেন তিনি। তাঁর প্রজারা অকৃতজ্ঞ ছিলো না, তারা বিপদে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে কিংবা শ্রদ্ধা জানাতে কুণ্ঠাবোধ করতো না কখনো। বাদশাহ শাহরিয়ার তাঁর নাম। আর তাঁর ছোট ভাই শাহ জামান ছিলো পরদেশী সমরখন্দের বাদশাহ। দুই ভাই যে যার রাজ্য শাসনে ব্যস্ত ছিলেন, এক ভাই অন্য ভাই-এর রাজ্যে যাওয়ার ফুরসতই পেতেন না না বড় একটা। যে যার নিজের রাজ্যের প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের চিন্তা করতে করতে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু বছর কুড়ি পরে হঠাৎ একদিন বড় ভাই-এর মন খুব উদগ্রীব হয়ে উঠলো ছোট ভাইকে দেখার জন্য। তিনি তাঁর উজিরকে ডেকে তাঁর মনের কথা জানালেন, ছোট ভাই-এর রাজ্য সমরখন্দে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু উজির তার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে উপদেশ দেন, প্রথমে চিঠি কাউকে দিয়ে পাঠানো হোক ছোট ভায়ের কাছে বড় ভায়ের সঙ্গে দেখা করার আহ্বান জানিয়ে। বাদশাহ শাহরিয়ার তার পরামর্শ মেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছোটভাইকে লোভনীয় উপহার দেওয়ার কাজে নেমে পড়লেন। উপহারের তালিকা হলো, দামী দামী ঘোড়া, শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস, বাছাই করা উদ্ভিন্ন যৌবনা সুন্দরী কুমারী পরিচারিকাবৃন্দ, দামী ও সৌখীন উপহার সামগ্রী। তারপর শাহ জামানকে নিজের হাতে চিঠি লিখলেন তিনি, 'ভ্রাতৃ-বৎসল প্রাণ আমাদের, তোমাকে দেখার জন্য মন আমার সদাই উতলা। আমাদের উজিরকে পাঠালাম। সে তোমার এখানে আসার সব ব্যবস্থা করবে। আশাকরি তুমি আমার ইচ্ছা পূরণ করবে, খোদা তোমার মঙ্গল করুন। তুমি আমার রাজ্যে আসতে বিলম্ব করলে কিংবা আমাকে নিরাশ করলে সে ব্যথা বোধহয় পূরণ হওয়ার নয়, বেহেস্তে গিয়েও আমি হয়তো শান্তি পাবো না। খোদা তোমার সুবুদ্ধি দিন, আমাদের শান্তি দিন!'

তারপর চিঠি সমেত খামের মুখ সীল করে উজিরের হাতে তুলে দিয়ে বাদশাহ শাহরিয়ারের তার উজিরকে বলেন, 'লোক-লস্কর, পাইক-পেয়াদা সঙ্গে নিয়ে সমরখন্দে যাওয়ার ব্যবস্থা করো।'

'আপনার হুকুম তামিল করতে এক পায়ে আমি খাড়া জাঁহাপনা।' মাথা নিচু করে উজির বলে, 'আমি প্রস্তুত। যত শীগ্গীর সম্ভব আপনার ছোট ভায়ের দরবারে হাজির হবে এই বান্দা।'

সমরখন্দে যাওয়ার আয়োজন করতে তিনদিন সময় লাগলো উজিরের। তারপর চতুর্থদিনের উষা-লগ্নে বাদশাহের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রওনা হলো সে দুর্গম পাহাড়ী পথ, নির্জন মরুভূমির প্রান্তর বেয়ে সমরখন্দে যাওয়ার জন্য। পথে প্রতিটি রাজ্যের বাদশাহেরা তাকে খুব খাতির-যত্ন করলো, সোনা রূপো উপহার দিয়ে তাকে সম্মানিত করতে কসুর করলো না।

শাহ জামানের রাজ্য সমরখন্দের কাছাকাছি এসে উজির তার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠালো তার উপস্থিতির কথা তাকে জানানোর জন্য। উজিরের আগমনের খবর পাওয়ামাত্র শাহ জামান তাকে সসম্মানে তাঁর রাজপ্রাসাদে আনার জন্য লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত পাঠালেন।

শহরে পৌঁছেই উজির সোজা চলে এলো রাজ-প্রাসাদে। শাহ জামানের কাছে সে নিজেকে রাজদূত হিসেবে পরিচয় দিলো জমিনের ওপর চুম্বন করার পর রাজার সুখ-শান্তি, দীর্ঘায়ু এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে অবশেষে সে তাঁকে তার আগমনের কারণ জানালো; বললো তাঁর ভাই তাকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন এবং যাওয়ার জন্য সে শাহ জামানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালো। উজিরের হাত থেকে বাদশাহ শাহরিয়ার চিঠিটা নিয়ে গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তে থাকেন তিনি। তারপর পড়া শেষে প্রত্যুত্তরে বললেন তিনি, 'বড় ভাই বাবাজানের মতো, তাঁর

আদেশ আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। তবে তিন দিনের আগে এখান থেকে যেতে পারছি না। এই তিন দিন তুমি আমার সম্মানীয় অতিথি হয়ে থাকবে।'

তারপর উজিরের থাকার জন্য ভালো আস্তানা এবং তার সৈন্য-সামন্তদের জন্য খুব ভালো আহার এবং আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করলেন শাহ জামান। চতুর্থ দিনের দিন তিনি তাঁর উজিরকে তাঁর অনুপস্থিতে রাজ্য শাসনের ভার দিয়ে পরদিন সকালে বাদশাহ শাহরিয়ারের রাজধানীতে পৌঁছানোর উদ্দেশে রওনা হলেন. সঙ্গে নিলেন বিরাট সৈন্য-বাহিনী, তাঁবু, ঘোড়া, খচ্চর প্রভৃতি, আর নিলেন বড়ভাইকে ভেট দেওয়ার জন্য প্রচুর উপহার সামগ্রী।

কিন্তু অনেকটা পথ অতিক্রমের পর, রাত্রির দ্বিতীয় যামে হঠাৎ শাহ জামানের খেয়াল হলো, একটা বিশেষ জিনিষ, তিনি তার প্রাসাদে ফেলে এসেছেন, যেটা তার সঙ্গে আনা উচিত ছিলো। কথাটা মনে হতেই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চললেন তিনি এবং প্রাসাদে ফিরে সোজা তিনি চলে এলেন তার শয়নকক্ষে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। তার দু'চোখের সামনে একরাশ আঁধার বুঝি ঘনিয়ে এলো। সেই মুহূর্তে অন্ধ হয়ে যেতে ইচ্ছে হলো তার। কি জঘন্য সেই দৃশ্যটা! তার সখের মখমলের বিছানায় তার প্রিয়তমা বেগম কিনা এক কালো নিগ্রো পাচক, সারা গায়ে যার রান্নার তেল-কালি মাখা, তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। দুজনের সারা দেহে কোথাও কোন আব্রু নেই, বেশরম। বেগমের ভরাট দুরন্ত দেহের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে দৈত্যের মতো চেহারার নিগ্রোর ভারী দেহটা। ঘুমের মধ্যেও বেগমের পাতলা ঠোঁটের কোণে আধফোটা হাসির ঝিলিক লেগেছিল। শাহ জামানের মনে হলো, ও যা চায় পুরুষদের দিয়ে তা করিয়ে নেওয়ার মেয়েদের এই চিরন্তন ভাবনাটা হয়তো ঢেউ খেলে গিয়েছিল। ওর মনের মধ্যে মিলন-সুখের চরম লগ্নে, বিপুল শিহরণে কাঁপা কাঁপা দেহটা এক সময় নিবিড় সুখের স্পর্শে শিথিল হয়ে আসার আগে ব্যভিচারিণী বেগমের ঠোঁটে তখন বিজয়িনীর হাসি ফুটে উঠেছিল। নিজের বেগমের ঠোঁটে পর-পুরুষ জয়ের হাসি তাঁকে নিজের চোখে দেখতে হলো শেষ পর্যন্ত? রাগে, ঘৃণায়, অপমানে উত্তেজিত হয়ে তিনি নিজের মনে বিড়বিড় করে প্রলাপ বকতে থাকেন, 'শহরের সীমানা এখনো পেরিয়ে যাইনি, তার আগেই যদি এমন জঘন্য দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে বড় ভাইজানের প্রাসাদে আমার দীর্ঘদিন থাকার সময় নষ্ট বুদ্ধি বেশ্যাটা তখন কি করবে, কি করতে পারে?'

রাগে উত্তেজনায় সে তখন দিশেহারা। তবু তা সত্ত্বেও নিপুণ হাতে খাপ থেকে চকচকে ধারালো তলোয়ারটা খুলে এক কোপে দুজনের জড়ানো দেহটা বিচ্ছিন্ন করে দিলেন চার খণ্ডে শাহ জামান। কার্পেটের ওপর তাদের সেই অবস্থায় ফেলে রেখে দ্রুত পায়ে চলে এলেন সেখান থেকে তার দলের লোকেদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য, তার সুখের রাজপ্রসাদে কি ঘটলো কেউ জানতেও পারলো না। নিঃশব্দে পরাজিত সৈনিকের মতো ফিরে এসে তিনি হুকুম দেন তাঁর সৈন্য-সামন্ত ও পাইক-পেয়াদাদের, জলদি যাত্রা আবার শুরু করার জন্য। নিজেও তিনি ঘোড়া ছোটাতে শুরু করে দিলেন অতঃপর।

কিন্তু তার ভালোবাসার প্রতি বেগমের, অমন নিষ্ঠুর ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করার যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পান না তিনি। সারা দেহমন তাঁর অপমানে অনুশোচনায় ও গ্লানিতে ভরে ওঠে। নিজের ভালোবাসার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি বলে ওঠেন, 'ওর কি এই মনে ছিলো, আমার হাতে খুন হওয়ার? কি করে সে এভাবে নিজের কবর

রচনা করলো?' গভীর দুঃখ-বেদনায় তাঁর মুখের রঙ গেলো বদলে, হলুদ মুখে জবা ফুলের মতো লাল রক্ত চক্ষু। এক সময় মনে হলো বুঝি তাঁর দেহটা মাটির ওপর পড়ে যাবে, এমনি অসম্ভব কাঁপছিলেন তিনি যেন মৃত্যু তার আসন্ন। একটা অশুভ কিছু চিন্তা করে উজির তাঁকে সান্ত্বনা দিতে কসুর করলো না।

তারপর এক সময় বাদশাহ শাহরিয়ারের রাজ্যে প্রবেশ করে তিনি তাঁর এক দাম্ভিক অনুচরের মারফত বড় ভাই-এর কাছে খবর পাঠালেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর রাজপ্রাসাদে গিয়ে পৌঁছচ্ছেন। খবর পেয়ে বাদশাহ শাহরিয়ার তার বিশ্বস্ত সৈন্য, উজির ও আমলাদের সঙ্গে নিয়ে ছোট-ভাইকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে গেলেন। এবং ছোট ভাইকে অনেকদিন পর সামনা-সামনি দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে সারা শহর নব সাজে সাজিয়ে দিলেন। কিন্তু বড় ভাই খুব কাছ থেকে ছোট ভাইকে লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখলেন, তিনি যেন যেমন অসময়ে বুড়িয়ে গেছেন, যেন তাঁর মনের ওপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। প্রশ্ন করলে শাহ জামান উত্তর দেন, 'না, না ও কিছু নয়, পথের পরিশ্রম, তার ওপর জায়গার পরিবর্তনে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাতে আমার কোন দুঃখ নেই অবশ্য। তাছাড়া বড় কথা হলো, আল্লার দোয়ায় তোমার মতো এমন প্রিয় ভাইজানের সান্নিধ্য লাভ কম সৌভাগ্যের কথা তো নয়! কি বলো?'

অতঃপর শাহরিয়ার আর কথা না বাড়িয়ে ছোট ভায়ের আদর-যত্নের ব্যবস্থা করলেন নিজের প্রাসাদে। কিন্তু পরদিন, সারারাত বিশ্রাম নেওয়ার পরেও শাহ জামানের চোখের কালি মুছলো না, গেলো না তার মুখের হলদে ভাবটা। বড় ভাই দারুণ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ভাইকে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই তোমার কি হয়েছে বলো তো সত্যি করে। তুমি যেন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছো, তোমার সারা দেহ কেমন হলদেটে হয়ে যাচ্ছে।'

'দাদা, তোমাকে কি আর বলবো বলো।' শাহ জামান এবার মুখ খুললো, পুরোপুরি না হলেও তাঁর দুঃখের সামান্য একটু আভাষ দিতে গিয়ে বললেন,



'ও তুমি বুঝবে না দাদা, এ আমার মনের গোপন ব্যথা!' তবু তিনি বেশি বলতে পারলেন না, এখানে আসার সময় তিনি তার বেগমকে কি রকম নোংরা ও জঘন্য অবস্থায় দেখে এসেছিলেন।

এবার বাদশাহ শহরিয়ার তাঁর কোন যুক্তিই মানতে চাইলো না। চিকিৎসক এবং সার্জেনদের তলব করলেন। তারা আসতে তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন, শাহ জামানের চিকিৎসার কোন ত্রুটি যেন না হয়, তাদের চিকিৎসা চললো সারা মাস ধরে। কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, মনের অসুখ যেখানে, চিকিৎসায় কি সারবে!

একদিন শাহ জামানের দাদা এসে তাঁকে শুধোলেন, 'শোনো ভাই, আমি শিকারে যাচ্ছি, তা তুমিও আমার সঙ্গে চলো। দেখবে শিকারের আনন্দে তোমার মনের সব অসুখ সেরে গেছে।'

কিন্তু শাহ জামান দাদার প্রস্তাবে রাজী হতে পারলেন না, বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'না দাদা, শিকারে যাওয়ার মতো আমার মনের অবস্থা নয়। আমার এই অসুস্থ মন নিয়ে গেলে হয়তো আমি তোমার শিকারের সব আনন্দ মাটি করে দেবো। তাই আমাকে আমার দুঃখ নিয়ে এখানে একটু একা থাকতে দাও।'

শাহরিয়ার বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না ছোট ভায়ের ব্যক্তিগত ব্যাপারে। একাই শিকারে বেরিয়ে পড়লেন লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে।

পরদিন সকালে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে শাহ জামান এসে বসলেন জাফরি দেওয়া বারান্দায়। জাফরির ফাঁক দিয়ে শাহ জামান তার দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন বাইরে বাগিচায়। যেন ফুলের মেলা বসেছে সেখানে। প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে সৌন্দর্য বিলিয়ে দিয়েছে। বেগমের কথা মনে পড়লো তাঁর। বেগমের ব্যাভিচার, বিশ্বাসঘাতকতা মনে পড়লে তাঁর বুকটা কেমন হাহাকার করে ওঠে। তাঁর দৃষ্টি জাফরির ওপর পড়ে থাকে, তাঁর চোখের সামনে রাজ-প্রাসাদের খিড়কির দরজা খুলে যায় ধীরে ধীরে। সেই চোরা দরজা পথ দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে কুড়িজন ক্রীতদাসী তার বড় ভায়ের সুন্দরী বেগমকে সঙ্গে নিয়ে বাগিচায় এসে প্রবেশ করলো। বেগমের রূপ-যৌবন যেন ফেটে পড়ছিল তার সারা অঙ্গ দিয়ে একই অঙ্গে এতো রূপ নিজের চোখে না দেখলে বোধহয় বিশ্বাস হতো না। সামনেই স্নানের বিরাট জলাধার। মাঝখানে জলের ফোয়ারা, ফেনিল জলরাশি পেঁজা তুলোর মতো ছড়িয়ে পড়ছিল জলাধারের চারপাশে। সেই জলাধারের চারধারে তারা কলকলিয়ে উঠলো। জাফরির উপর শাহ জামানের দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ। তারা সবাই এক এক করে তাদের দেহ থেকে বসন খুলে ফেলে বিবসনা হয়ে এসে দাঁড়ালো। বাগিচার প্রাকৃতিক শোভার সঙ্গে তাদের নগ্নদেহের রূপ-লাবণ্য মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেলো জায়গাটা। তাদের মধ্যে দশজন ক্রীতদাসী বাদশাহ শাহরিয়ার উপপত্নী এবং অপর দশজন শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসী। তাদের সঙ্গে কুড়িজন ক্রীতদাস এসে মিলিত হলো। তারা জোড়ায় জোড়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো বাগিচার চারপাশে। এ ওর কণ্ঠলগ্ন হয়ে, দেহে দেহে বিলীন হয়ে গিয়ে। একটু পরে তাদের যৌবনের উচ্ছ্বাস, শীৎকার ভেসে এলো বাতাসে, চরম সুখ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় মেতে উঠলো তারা।

কিন্তু বেগম তখন একা, নিঃসঙ্গ। তার নগ্ন দেহ থর্ থর্ করে কেঁপে উঠছিল পুরুষ সঙ্গীর পরশ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। হঠাৎ সে কামার্তকণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'আমি এখানে, আমার প্রিয়তম সৈয়দ, তুমি কোথায়?'

অদূরে একটা গাছের উপর থেকে বেগমের প্রেমিক সৈয়দ এতোক্ষণ তার প্রেমিকার নগ্ন দেহের সৌন্দর্য উপভোগ করছিল। বেগমের কাছ থেকে তলব পাওয়া মাত্র গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লো। কালো আবলুস কাঠের মতো গায়ের রঙ নিগ্রো

লোকটার, দৈত্যের মতো চেহারা, মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছিল, লালসাদীপ্ত চাহনি চোখের। সব মিলিয়ে ভয়ঙ্কর, বীভৎস সেই দৃশ্য, চাল চলনে বলিষ্ঠতার ছাপ। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায় সে বেগমের কাছে এবং দু'হাত বাড়িয়ে বেগমের গলা জড়িয়ে ধরে। ওদিকে বেগম তাকে আবেগে উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলো, চোখে মদির চাহনি, ঠোঁটে মিলন পিয়াসীর হাসি। মৃদুভাষে বেগম শুধোয় 'প্রিয়তম, নাও, আমাকে সম্পূর্ণ করে নাও। আমি যে আর ধৈর্য ধরতে পারছি না সৈয়দ!'

অধৈর্য নিগ্রো লোকটাও। বাগিচার উপর শুইয়ে দেয় বেগমকে। তারপর নিজে পোষাকমুক্ত হয়ে বেগমের সুডৌল পা-দু'টোর সঙ্গে নিজের লোমশ বিরাট পা দু'টো যুক্ত করে দেয়। একটু পরে বেগমের ফুলের মতো সুন্দর নরম দেহের উপর নিজের ভারী দেহটা বিছিয়ে দিতেই দুটি দেহ মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। আবেশে বেগমের চোখ বুঁজে আসে। মিলন-সুখে তার দেহটা থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠতে থাকে। নিগ্রোটা তাকে সুখের চরম মুহূর্তে পৌঁছে দেয় এক সময়। তার মতো অন্য ক্রীতদাসরাও তাদের সঙ্গিনা ক্রীত-দাসীদের দেহ মিলনের সুখে তৃপ্ত করলো, দিনের আলো নিভে না আসা পর্যন্ত কেউ কারোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলো না। দিন ভর তাদের পেয়ার চললো এই ভাবে।

তারপর ক্রীতদাসরা আগের মতো যে যার ছদ্মবেশ ধারণ করে বাগিচা থেকে চলে যায়, যায় না কেবল নিগ্রো সৈয়দ। ফোটা পদ্মের মতো বেগমের শরীরের ওপর থেকে নেমে সে আবার গাছের উপরে চড়ে বসে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে একেবারে রাজ-প্রাসাদে। যাওয়ার আগে খিড়কির দরজাটা বন্ধ করতে ভুললো না সে।

বড় ভায়ের বেগমের অমন অবৈধ কাযকলাপ স্বচক্ষে দেখে শাহ জামান স্বগোক্তি করলেন, আল্লার দোয়ায় আমার দুঃখ-দুর্দশা তো এর থেকে অনেক কম তাহলে। আমার বড় ভাই তো বাজার বাজা, তার তুলনায় আমি নগণ্য মাত্র। অথচ তাঁরই প্রাসাদে এমন জঘন্য ঘৃণ্যজনক কাজ হচ্ছে, আর তাঁর খাস বেগম কিনা এক নোংরা অসভ্য ক্রীত-দাসের কাছে কেমন বেহায়ার মতো গা ভাসিয়ে দিচ্ছে তার অনুপস্থিতিতে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, নারী জাতটাই ছলনাময়ী ও বিশ্বাসঘাতিনী, প্রত্যেক পুরুষই অসতীর স্বামীতে পরিণত হয়ে থাকে। আল্লার অভিশাপে সব পুরুষই বোধহয় তাদের সমর্থনে ঝুঁকে পড়ে, কিংবা অসতী বেগমকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নিজের হাতে বিচারের ভার তুলে নিয়ে থাকে। তাই তিনি নিজের সব জ্বালা-যন্ত্রণা দূরে সরিয়ে দেন। তারপর তিনি নিজের দুঃখ ভুলতে আপন মনে আওড়ান, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কিংবা এটা আমার প্রত্যয়ও বলা যেতে পারে, এই দুনিয়ার কোন মরদ তাদের অশুভ কামনা থেকে রেহাই পেতে পারে না আর আমিও তো মানুষ, ইনসান্।'

অনেক দিন পর কব্জি ডুবিয়ে নৈশভোজ সারলেন শাহ জামান। খাওয়ায় যে তৃপ্তি আছে, অনেকদিন পর সেই সত্যটা অনুভব করলেন তিনি। খোদা আল্লাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন তিনি। তার প্রশংসায় মুখর হলেন তিনি এবং নিজের প্রাসাদ থেকে চলে আসার পর একটা নিটোল ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলেন। স্বচক্ষে নিজের বেগমের ব্যাভিচার দৃশ্য দেখে ভাঙ্গা মনটা তার চাঙ্গা হয়ে উঠলো আবার। তার মুখের রঙ বদলালো, তার মুখের সেই হলুদ ভাবটা এখন উধাও! তার বদলে তার চোখে-মুখে এখন অদ্ভুত এক রোশনাই দেখা দিলো। এই মুহূর্তে তাঁকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। পরদিন তাঁর মুখ দেখে বোঝাই যায় না যে, তাঁর মনে অতো দুঃখ ছিলো। তাঁর স্বাস্থ্য ফিরতে শুরু করলো আবার।

দশদিন পরে তার দাদা বাদশাহ শাহরিয়ার শিকার—ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে শাহ জামানের স্বাস্থ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হতে দেখে বিস্মিত হলেন। 'ভাই, তুমি তো আমাকে খুব ভাবনায় ফেলে দিয়েছিলে। শিকারে যেতে পারবে না শুনে ভাবলাম, বুঝি আমার রাজ্যে এসে তোমার অবসরকালীন সময়টাও ভালো কাটবে না। কিন্তু এখন তোমার খুস মেজাজ দেখে আমার মেজাজও শরাফ হয়ে উঠেছে।' তারপর সরাবের গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে বাদশাহ শাহরিয়ারকে বললেন '.খোদা আল্লা তোমার মঙ্গল করুন। শিকারে যাবার সময় তোমার অমন বিষণ্ণ মুখ দেখে ভাবলাম, হয়ত তোমার রাজ্য, পরিবার আর বন্ধুবর্গ ছেড়ে এসে মুসড়ে পড়েছো। তাই তোমাকে বাড়তি প্রশ্ন করে তখন বিরক্ত করতে চাইনি। কিন্তু এখন জিজ্ঞেস করতে ভরসা হচ্ছে, তোমার মুখে চেকনাই অবস্থা ফিরে আসতে দেখে। এখন বলো ভাই, আগে তোমার দুঃখের কারণ কি ছিলো, আর এখন কি কারণেই বা তোমার দিলের এমন পরিবর্তন ঘটলো! খোদা কসম, আমার কাছে কোন কিছু গোপন করো না '

এতক্ষণ নীরবে মাথা নিচু করে দাদার কথাগুলো শুনছিলেন শাহ জামান। তারপর মাথা তুলে বললেন তিনি, 'শোনা ভাইজান, আমি তোমাকে আমার মানসিক অসুস্থতার কারণটাই শুধু বলবো, কিন্তু কি করে সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো, তার কারণ জানার জন্য তুমি যেন আমাকে চাপ দিও না।'

এমন অদ্ভুত কথা শুনে প্রথমে একটু বিস্মিত হলেন শাহরিয়ার পরে সামলে নিয়ে বললেন, 'বেশ তো বলোই না আগে তোমার সেই মানসিক অবনতির জন্য দায়ী কে?'

'সত্যি তুমি আমার দুঃখের কারণ জানতে চাও? তাহলে আমার দুঃখের কথা বলি শোনো, 'তুমি যখন তোমার উজিরকে দিয়ে আমাকে আমন্ত্রণ জানালে তোমার প্রাসাদে, তখন আমার মন খুব খুস হলো। বহুৎদিন পর তোমার সঙ্গে আবার আমার মোলাকাত হবে, কম আনন্দের কথা! নির্দিষ্ট দিনে তোমার রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হলাম। কিন্তু মাঝপথে হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, একটা দরকারি জিনিষ আমি সঙ্গে নিয়ে আসতে ভুলে গেছি। আবার ফিরে গেলাম। প্রিয়তমা বেগমকে দেখার লোভটা আমি কিছুতেই সামলাতে পারলাম না, এখন ভাবছি সামলালেই বোধহয় ভালো ছিলো। হারেমে ঢুকে কি দৃশ্য দেখলাম জানো? আমার চির-সাধের কার্পেটের বিছানায় আমারি খাস বেগম সম্পূর্ণ বেশরম হয়ে আমারি এক ক্রীতদাসের কণ্ঠলগ্না হয়ে আরামে ঘুমচ্ছে! বুঝতে অসুবিধা হলো না, আমার অভাববোধটা সে সেই ক্রীতদাসকে দিয়ে মিটাচ্ছে। রাগে ঘৃণায় আমার ভেতরের মানুষটা গর্জে উঠলো, বিশ্বাসহন্ত্রী, ব্যাভিচারিণী বেগমের বেঁচে থাকার অধিকার এরপর আর থাকতে পারে না। সেই সিদ্ধান্তটা নেওয়া মাত্র খাপ থেকে তলোয়ার বার করে তাদের দু'জনের দেহ চার খণ্ডে ভাগ করে দিলাম সেই মুহূর্তে। কাক-পক্ষী কেউ জানতেও পারলো না সে কথা। যেমন নিঃশব্দে হারেমে ঢুকেছিলাম, তেমনি নিঃশব্দে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আবার মিলিত হলাম তোমার উজির ও আমার লোক লস্করদের সঙ্গে। কিন্তু মন থেকে সেই জঘন্য দৃশ্যের কথাটা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিলাম না তখন। মানসিক চিন্তায় তোমার প্রাসাদে এসে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ি। তারপর কি করে সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে আবার আমি চাঙ্গা হয়ে উঠলাম, সে কথা তুমি জানতে চেও না দাদা, আমি বলতে পারবো না' সে কথা তোমায় বলা যায় না।'

'মেয়েদের অশুভ চিন্তাটা চিরন্তন', শাহরিয়ার আবো বললেন,'তোমার মতো অবস্থায় পড়লে, একটা বেগম কেন, হাজার নারী কোতল হতো, হয়তো এ আমার পাগলামো। সে যাইহোক, আল্লার

দোহাই, এবার বলো, তোমার বিষণ্ণ ভাবটা কাটলো কি করে?'

'বললাম তো কারণটা জানতে চেও না', একটু থেমে শাহ জামান নরম গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি একান্তই সে কথা জানতে চাও?'

শাহরিয়ার মাথা নেড়ে সায় দেয়, 'তুমি আমাকে পুরো কাহিনী বলো। আল্লার কৃপায় সব রকম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আছে, তুমি নির্ভয়ে বলতে পারো।'

অতঃপর শাহ জামান সবিস্তারে বললেন, যা তিনি দেখেছেন সেদিন, একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। পরিশেষে তিনি বলেন, 'এতোদিন আমার বেগমের বিশ্বাসঘাতকতায় আমার সারা মন বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু আমার তুলনায় তুমি তো রাজার রাজা। সেই তোমার হারেমে তোমার খাস বেগমকে ব্যাভিচারে লিপ্ত হতে দেখে আমার দুঃখ অনেকটা লাঘব হয়ে যায়। আগের মতো আবার আমি পেট ভরে খেতে শুরু করি, সরাব পান করি, আরামে ঘুমতে পারি। আর তাতেই আমার দ্রুত স্বাস্থ্য ফিরে আসে।'

বাদশাহ শাহরিয়ার সব শুনে অবিশ্বাসের চোখ নিয়ে তাকালেন, 'তোমার কাহিনী একেবারে মিথ্যে বলে আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না। তবে নিজের চোখে না দেখে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'বেশ তো, তুমি চাইলে আমি তোমাকে সেই জঘন্য দৃশ্য দেখাতে পারি।' শাহ জামান জোর দিয়ে বলেন, 'আমি তোমাকে হাতে নাতে প্রমাণ দিতে পারি। তবে তার আগে তোমাকে একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে। তোমার রাজ্যে প্রচার করে দিতে হবে, আবার তুমি শিকারে যাচ্ছো, আসলে তুমি কিন্তু যাবে না, থাকবে এই প্রাসাদেই। তবে তোমার কক্ষে নয়, আমার কক্ষে লুকিয়ে থাকবে, কেউ না জানতে পারে। তারপর যথা সময়ে আমি তোমাকে দেখাবো সেই জঘন্য দৃশ্যের



ছবি। তখন বিশ্বাস করা না করা তোমার ওপর নির্ভর করবে।'

'ঠিক আছে, তাই হবে!' আর কাল বিলম্ব না করে বাদশাহ শাহরিয়ার ঢ্যাডা পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তিনি আবার শিকারে যাচ্ছেন। সাথের লোক-লস্কর, তাঁবু, শিকারের সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে শাহরিয়ার রওনা হলেন শিকারের উদ্দেশে। যাওয়ার আগে উজিরকে তাঁর তিন দিনের অনুপস্থিতিতে রাজ্য শাসনের ভার দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

শিকারের জায়গায় সারি সারি তাবু ফেলা হলো। বাদশাহ শাহরিয়ার তার তাবুর প্রহরীদের জানিয়ে দিলেন, কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তাবুর ভেতরে যেন ঢুকতে দেওয়া না হয় তাকে। তারপর রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশ ধারণ করে

দুইভাই খিড়কি দিয়ে রাজ-প্রাসাদে ঢুকে সোজা চলে এলেন শাহ জামানের কক্ষে।

শাহ জামানের কক্ষের সামনে জাফরি দেওয়া বারান্দা। দুই ভাই সেখানে বসে প্রতিক্ষা করতে থাকলো সেই অশুভ মুহূর্তের জন্য। রাত্রির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যাম কেটে যাওয়ার পর অবশেষে ভোর হয়ে আসে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে রাজ-প্রাসাদের খিড়কির দরজা খুলে যেতে দেখা যায়। খিড়কি পেরোলেই সেই বাগিচা, জলের আধার, ফোয়ারা। ব্যস্ত হয়ে দশজন ক্রীতদাসী খিড়কির দরজা পথে বাগিচায় এসে জড়ো হলো। সবার শেষে এলো শাহরিয়ার খাস বেগম। আগের দিনের মতো বেগম তার দাস দাসীদের হুকুম করলো বিবস্ত্র হতে এবং অনুমতি দিলো জোড়ায় জোড়ায় বাগিচার আনাচে কানাচে গিয়ে সেই মিলন সুখ অনুভব করতে। খানিক পরে বাগিচার ঝরা পাতার খস্‌খস্‌ শব্দে ও দাস-দাসীদের শীৎকার ধ্বনিতে রিমঝিম করতে থাকে জায়গাটা। সমস্ত পরিবেশটা তখন যেন এক অবৈধ প্রেম কুঞ্জবনে পরিণত হয়ে গেছে। ক্রীতদাসরা এখন তাদের শেষ পেয়ার নিঃস্ব করে দিতে মেতে ওঠে তাদের সঙ্গিনীদের সুখের সাথে বেজন্মাদের জন্ম দিতে।

ওদিকে আগের দিনের মতো বেগম একে একে তার দেহ থেকে সব পোষাক খুলে ফেলে দিয়ে এক সময় চিৎকার করে ওঠে, 'আমার প্রিয়তম সৈয়দ, তুমি কোথায়? আমি যে তোমার অপেক্ষায়।'

গাছ থেকে লাফ দিয়ে নেমে ছুটে আসে সৈয়দ বেগমের কাছে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ঘন ঘন চুমু খায়। দৈত্যের মতো চেহারার লোকটার মুখ দিয়ে লালা ঝরে, ভয়ঙ্কর বীভৎস সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখেন বাদশাহ শাহরিয়ার নিজের চোখে। তার চোখের সামনে তাঁরই ক্রীতদাস তাঁর খাস বেগমকে বাগিচার ওপর ফেলে সঙ্গমে লিপ্ত, সেই অপ্রীতিকর দৃশ্যও তাঁকে নিজের চোখে দেখতে হলো, দেখতে হলো নিগ্রোর ভারী দেহটা তাঁর বেগমের বুকের ওপর কেমন করে বার বার আছড়ে পড়েছে, এবং বেগম হাসি মুখে তার সব অত্যাচার সহ্য করছেন, মাঝে মাঝে সুখের আতিশয্যে কোমর দোলাচ্ছে।

একসময় তারা সবাই যে যার সঙ্গীদের সঙ্গিনীকে কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শান বাঁধানো জলের চৌবাচ্চায় নগ্ন দেহ ভাসিয়ে দেহের কালিমা ধুয়ে ফেলে। তারপর দল বেঁধে উঠে এসে যে যার পোষাক পড়ে খিড়কি দিয়ে আবার হারেমে ঢুকে পড়ে চুপিসারে।

ব্যভিচারিণী বেগমের ইত্যাকার দৃশ্য দেখে, শাহরিয়ারের চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল হয়ে ওঠে। রাগে উত্তেজনায় তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'এই জঘন্য দুনিয়ায় নিঃসঙ্গতাই বাঁচার একমাত্র পথ। খোদা আল্লা জানেন, তাঁর জীবন কেন এমন ব্যর্থ হলো? এ জীবন আঁকড়ে পড়ে থাকার কোন অর্থ হয় না।'

'না, আমি তা মনে করি না,' সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'জীবনকে আমি আরো নিবিড় করে দেখতে চাই, ব্যর্থতার শেষ পরিণতি দেখতে চাই। আমি বাঁচতে চাই।'

'তাহলে চলো, অনাচার, পাপাচারে ভরা এই দেশ থেকে পালিয়ে অন্য কোন দেশে যাই, যেখানে কোন অন্যায় নেই, নেই কোন বিশ্বাসঘাতিনী নারী। খোদা আল্লার সেই দেশে গিয়ে খুঁজে দেখবো আমাদের মতো হতভাগ্য, প্রতারিত কোন মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। আর সে রকম কোন মানুষের সন্ধান পেলে তখন বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে খুব একটা কষ্ট হবে না বোধহয়।'

তারপর দুই ভাই রাজ-প্রাসাদের অন্য একটা খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সেই অজানা দেশের উদ্দেশে। রাত দিন তাঁদের কাছে তখন সমান।

কোথাও বিশ্রাম নেওয়া নেই, দুর্গম পথে অবিরাম পা ফেলা কেবল। অবশেষে এক সমুদ্র তীরে এসে থামলেন তাঁরা। মাথার উপর বিরাট একটা গাছের ছায়া, পায়ের নিচে দুর্বাঘাস। পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। সমুদ্রের পানি খেয়ে তাঁরা সেই গাছের ছায়াতলে বসলেন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। তখন প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে, হঠাৎ তাঁরা লক্ষ্য করলেন, সমুদ্রের মাঝ-দরিয়া থেকে গোলাবারুদের বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এলো, সেই সঙ্গে একটা চাপা হৈ-চৈ-এর আওয়াজ। তারপরেই সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে একটা বিরাট কালো স্তম্ভের মতো দৈত্য বেরিয়ে এলো। বীভৎস চেহারা তার। সমুদ্রের সৈকতের দিকেই এগিয়ে আসছে দৈত্যটা। সেই দৃশ্যটা দেখে ভীষণ ভয় পেলো দুই ভাই। নিরুপায় হয়ে সেই গাছের উপর চড়ে বসলেন তাঁরা দৈত্যের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য। আরে, দৈত্যটা যে তাদের গাছের দিকেই এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই তাঁরা লক্ষ্য করলেন দৈত্যটার মাথায় একটা বিরাট বাক্স। বাক্সটা সে গাছের নিচে নামিয়ে রাখলো। তারপর সে আয়াস করে বসে বাক্সটা খুলে ধনরত্ন রাখার লোহার একটা পেটিকা বার করলো। পেটিকাটা খুলতেই এক পরমা সুন্দরী যুবতী বেরিয়ে এলো, এ যেন বেহেস্তের পরী হঠাৎ খোদা আল্লার পৃথিবীতে নেমে এলো। তার রূপের আলোয় সমুদ্র-সৈকত আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো। এ যেন অমাবস্যায় হঠাৎ পূর্ণিমার আলো। কবি উতাইয়া এখন সেখানে থাকলে সুললিত কাব্যের ঢঙে তার সেই অপরূপ রূপের বর্ণনা দিতেন :

আমি দেখেছি তার রূপ ভোরের আলোর মতো,
আঁধার রাতে সে যেন পূর্ণিমার চাঁদ,
তার রূপের আলোয় কুঞ্জবন আলোকিত,
তার রূপের ঔজ্জ্বল্যে সূর্যের আলো বাড়ে,
এও এক সংবাদ।
আমরা সবাই তার রূপের পিয়াসী,
ধরা দিই তার বাহুপাশে,
নিরন্তন অশ্রুর বন্যা বাহিয়া সে আমি,
তার চোখে আলেয়ার আলো ভাসে ।।

গাছতলায় বেহেস্তের সেই পরীকে দৈত্যটা তার পাশে বসিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে মৃদুভাবে বলে, 'তুমি আমার যৌবনের সাথী, তুমি আমার বুকের কলিজা। আমার নসিব অনেক ভালো, খোদা আল্লা আমার ওপর দয়া না করলে তোমার শাদীর দিনে তোমাকে ভাগিয়ে আনতে পারি? কেউ তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনতাই করতে পারেনি। কিন্তু আমার কলিজা, আমি যে এখন ভীষণ ক্লান্ত, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, আমি এখন ঘুমাতে চাই।' ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে যুবতীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো সে পা দুটো সমুদ্রের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে। খানিক পরে বাজ পড়ার শব্দের মতো নাক ডাকতে শুরু করে দিলো সে।

যুবতীটি জেগে রইলো। চোখ মেলে চারিদিক তাকাতে গিয়ে হঠাৎ তার দৃষ্টি আসমান-মুখী হতেই গাছের ডালে সে বাদশাহ শাহরিয়ার ও তাঁর ভাই শাহ জামানকে দেখতে পেলো। তার স্বপ্নের চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কোল থেকে দৈত্যের মাথাটা নামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ইশারায় বললো, 'এই দৈত্যটাকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, ওর ঘুম এখন ভাঙবে না, তোমরা নিচে নেমে এসো।'

উত্তরে তাঁরাও ইশারায় জানিয়ে দিলেন, 'খুবসুরৎ পরী, খোদা তোমার মঙ্গল করুন! কিন্তু আমাদের তুমি মাফ করো, আমরা নিচে নামতে পারবো না।'

যুবতী ছাড়বার পাত্রী নয়। খোদা আল্লাহর কসম খেয়ে তাদের ভরসা দিলো, 'তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। আর তোমরা যদি আমার কথা না শোনো, তাহলে ঐ দৈত্যকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে

তোমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবো। হয়তো সে তোমাদের টুঁটি টিপে খতম করে ফেলতে পারে।' তারপর সে তাঁদের গাছ থেকে নেমে আসার জন্য ক্রমাগত ইঙ্গিত করতে থাকলো।

শেষে ঐ দৈত্যের হাতে বেঘোরে প্রাণ হারানোর ভয়ে গাছ থেকে নেমে এলেন ওঁরা যুবতীর হুকুম তামিল করতে। এবার সে কি হুকুম করে, কে জানে। দুই ভাই পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন।

এবার যুবতী ওদের পায়ে ঢলে পড়ে অর্ধ-নিমিলিত চোখে ওদের দিকে তাকায়, তার কালো চোখের তারায় কামনার আগুন ঝিকি ঝিকি জ্বলতে থাকে। চকিতে পোষাকের খোলস থেকে সে তার দেহটা মুক্ত করে তাদের আহ্বান জানায়, 'আমার সারা দেহ এখন দাউ দাউ করে জ্বলছে, এই আগুন নেভানোর ভার তোমাদের। নাও, জলদি এখন কামনার আগুনে স্নান করো।'

চমকে ওঠেন দুই ভাই। বলে কি সে? অবাক বিস্ময়ে ওঁরা তার নগ্নদেহের সৌন্দর্য-সুধা পান করতে থাকেন। সাক্ষাৎ বেহেস্তের পরীই বটে সে। আঙুরের মতো অপরূপ স্তনবৃন্ত। স্তনজোড়ার মাঝে ঢলনামা উষ্ণ উপত্যকা। গভীর নিচে নাভি গভীর দিঘি, খাদের দু'পাশে সুন্দর সুডৌল দুটি পায়ের মসৃণ থাম। খাদ নয়, যেন সিংহের বিবর এবং ভয়ংকর। সেই বিবরে প্রবেশ করার আহ্বান, না হুকুমই বলা যেতে পারে। আবার প্রত্যাখ্যান মানেই ঐ দৈত্যের হাতে প্রাণ হারানো। দুই ভাই সেই ঘুমন্ত দৈত্যের দিকে তাকিয়ে আবার পরস্পর চোখে চোখ রাখলো। ইশারায় বড় ভাই ছোট ভাইকে অনুরোধ জানালেন, 'তুমিই প্রথমে ঐ বিবরে প্রবেশ করো, তারপর আমি।'

'না, তা হয় না, তুমি বড়, তোমারই তো আগে পথ দেখানোর কথা...' শাহ্ জামান মাথা নেড়ে আপত্তি জানান।

যুবতী রেগে যায়। এরা কি ধরণের মরদ! তার নগ্ন দেহ এতো কাছে পেয়েও উপভোগে এমন দ্বিধা! অথচ অন্য কোন পুরুষ হলে এতক্ষণ

ওদিকে তার দেহ থেকে আগুনের হলকা ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। এ দেহের জ্বালা অসহ্য। ঝাঁঝিয়ে ওঠে মেয়েটি, 'তোমরা কি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি করে আমার দেহের ক্ষুধা আরো বাড়িয়ে দিতে চাও? নাও, চটপট কাজে লেগে যাও আমাকে ঠাণ্ডা করার জন্য। তা না হলে এখুনি আমি আমার দৈত্য স্বামীকে ডাকছি। মনে রেখো, একবার তার ঘুম ভাঙ্গলে তোমাদের বাঁচার পথ বন্ধ—'

না আর দেরী নয়। দৈত্যের ভয় দেখিয়ে দুই ভাইকে পাগল করে মেয়েটি তার সম্ভোগের কাজ সারলো। নিজের খুশি মতো সে তাঁদের ব্যবহার করলো। তপ্ত দেহ এখন তার শীতল। ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি। ওরা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ঠোঁটে রহস্যের হাসি ফুটিয়ে সে বলে, তোমরা বেশ ভালোই আনন্দ দিতে জানো মেয়েদের। আমার মেজাজ এখন খুব শরীফ।' তারপর সে তার সেমিজের পকেট থেকে একটা বটুয়া বার করে। বটুয়ার ভেতর থেকে একগাছা আংটির ছড়া বার করে বললো, 'এই ছড়ায় পাঁচশো সত্তরটি আংটি আছে। সন্দেহবাতিক স্বামীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে পাঁচশো সত্তরজন পুরুষকে আমি আমার দেহ উপভোগ করতে দিয়েছি, তাদের দিয়ে আমি আমার দেহের জ্বালা নিবৃত্ত করেছি। সেই সর্বনাশা খেলার শেষে প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা আংটি চেয়ে নিয়ে এই আংটির মালা গেঁথেছি। এগুলো আমার বার্ধক্যে স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে। তোমাদের দুই ভাইকেও দু'টি আংটি দিতে হবে এবার।' এই বলে সে হাত বাড়ায় ওদের দিকে, 'কই দাও! এই মালার সঙ্গে তোমাদের আংটি দু'টিও গেঁথে রাখবো।'

মেয়েটির মুখ থেকে অদ্ভুত কথা শুনে কোন

বকমে তারা তাদের বিস্ময ভাবটা গোপন করেন, যে যার হাত থেকে একটি করে আংটি খুলে তার হাতে তুলে দিলে সে বললো, 'আমার জীবনের করুণ কাহিনী শুনবে তোমরা? ঐ শয়তান দৈত্য। আমার শাদীর রাতে আমাকে আমার বাড়ি থেকে ফুসলিয়ে এনেছে। আমাকে তার বিশ্বাস নেই, তাই সে আমাকে লোহার সিন্দুকে বন্দী করে, সেই সিন্দুকটা আবার ঐ বাক্সের মধ্যে পুরে লোহার শিকল দিয়ে বাক্সটা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সাতটা তালা লাগিয়েও তার সন্দেহ ঘুচে যায়নি, শেষে ঐ গভীর সমুদ্রের নিচে ফেলে দিয়েছে, আবার সে সদা সতর্ক প্রহরা দিয়ে যাচ্ছে, যাতে কোন আ[illegible], আমার সতীত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারে সে [illegible] [illegible] পুরুষ আমার [illegible] কাছে পৌঁছতে না [illegible]

কিন্তু ঐ সন্দেহবাতিক লোকটা জানে না, আমাদের, মানে মেয়েদের ইচ্ছেটা কখনো ঘুমিয়ে থাকে না, কোন কিছু ইচ্ছে করলেই তারা সেটা পূরণ করে নিতে পারে তার সঙ্গী পুরুষের চোখে ধুলো দিয়ে। কোন কিছুতেই তাদের ইচ্ছা পূরণে বাধা হয়নি, হতেও পারে না কখনো। তাই কাব্য করে বলতে গেলে বলতে হয়:—

কখনো বিশ্বাস করো না নারীকে,
ছলনাময়ী, জন্ম অভিনেত্রী সে,
যদি তার আহ্বানে সব বাঁধন ছিন্ন করে বাহির
হয়ে আসে, সে।

কে কখনো তাকে
[illegible] অনেক কাহানা,
আজও কেউ [illegible]নি।



ভোলেনি আদমের বঞ্চনার কথা,
এবং তার প্রতি ইবলিসের বিশ্বাসঘাতকতা।
এরপর আর এক কাব্যের উপাখ্যান শোনো ঃ—
তোমরা পুরুষরা, মনে করো বুঝি তোমারই
কেবল ইনসান্,
তোমরা নারীকে তোমাদের ভোগ্যপণ্য
হিসেবে ব্যবহার করো,
একবারও মনে হয় না, সেটা কি দারুণ
গুণাহ্,
অথচ খোদা বিচারে নারী-পুরুষ সবই
সমান।
আর ম্যায় ভি এক ইনসান,
চেয়েছিলাম ঐ দৈত্যটার প্রেমিকা হতে,
এবং তার বেগমের সম্মান,
অথচ সে আমাকে ভাসিয়ে দিলো সমুদ্রের
স্রোতে।

মেয়েটির মুখ থেকে অমন বিস্ময়কর সব কথা শুনে তাঁরা দারুণ বিস্মিত। ইতিমধ্যে মেয়েটি দৈত্যটার কাছে ফিরে গিয়ে আগের মতো মাথা সে নিজের কোলে তুলে নিয়ে নরম গলায় বললো, 'এখন তোমরা তোমাদের পথ দেখো।'

দুই ভাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন, 'হায় আল্লা, নারীর ছলনা ও কৌশলের কাছে আমরা কতো অসহায়। দৈত্যের অমন কঠোর প্রহরাকে কলা দেখিয়ে সে কেমন দিব্যি তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে চলেছে, খুশি মতো যে কোন পুরুষকে দিয়ে তাকে সম্ভোগ করাচ্ছে। দৈত্যের তুলনায় আমাদের বেগমদের পাহারা তো অনেক বেশী শিথিল, দৈত্যের তুলনায় আমাদের মানসিক যন্ত্রণা অনেক কম সেদিক থেকে। চলো, আমরা যে যার দেশে ফিরে যাই। আল্লার কসম খেয়ে আমরা শপথ নিচ্ছি, আর কোন মেয়েকে শাদী করে আমাদের হারেমে বেগমের মর্যাদা দেবো না, এখন থেকে আমরা তাদের আসল রূপটা কি তা দেখিয়ে দেবো।

তারপর বাদশাহ শাহরিয়ার নিজের রাজ্যের রাজধানীতে ফিরে এসে আমির, উজির ও তার মন্ত্রী পরিষদের সমস্ত সভ্যদের ডেকে পাঠালেন, তাঁর তলব পেলেন প্রধান মন্ত্রীও। তাদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে প্রধান মন্ত্রীকে হুকুম করলেন শাহ-রিয়ার, 'আমার খাস বেগমকে যেন এখুনি কোতল করা হয়, তার অপরাধ সে তার বিশ্বাস হারিয়েছে, হারিয়েছে তার সতীত্ব।' প্রধান মন্ত্রী বেগমকে বদ্ধভূমিতে নিয়ে যায় তাকে কোতল করার জন্য তারপর বাদশাহ শাহরিয়ার নিজের হাতে তলোয়ার তুলে নিয়ে হারেমের সমস্ত ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের গর্দান নিলেন। সেই সঙ্গে তিনি শপথ নিলেন, এখন থেকে প্রতি রাত্রে যে মেয়ে তাঁর হারেমে বেগম হয়ে আসবে, তাকে তিনি সারা রাত ধরে উপভোগ করবেন, তারপর ভোর না হতেই তাকে নিজের হাতে কোতল করবেন, তাঁর নিজের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। 'এই পৃথিবীতে একটা সতী নারীকেও আমি অসতী হতে দেবো না, এখন থেকে।' ওদিকে শাহ জামান তার দাদার অনুমতি নিয়ে নিজের দেশে ফিরে যান। তারপর শাহরিয়ার তাঁর উজিরের দিকে ফিরে ফরমান দিলেন, আজ থেকে প্রতি রাত্রে তাঁর বেগম হওয়ার জন্য একটি করে কুমারী মেয়ে হারেমে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। বাদশাহের হুকুম মতো প্রতি রাত্রে আমির এক একটা সুন্দরী কুমারী কন্যা উপহার দিতে থাকে শাহরিয়ারের বিছানার সঙ্গিনী হওয়ার জন্য। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই, কুমারী মেয়ের দেহ সম্ভোগের রেশ মিটতে না মিটতেই বাদশাহ তাঁর উজিরকে তলব করে ফরমান দেন, সদ্য কুমারীত্ব হারানো নিষ্পাপ সুন্দরী তনয়ার গর্দান নেওয়ার জন্য। বাদশাহের ভয়ে সেই নৃশংস কাজটা উজিরকে নিজের হাতে করতে হয়।

এই ভাবে তিনটি বছর প্রতি রাত্রে একটি করে কুমারী কন্যার সর্বনাশ করে পরদিন ভোরে তাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করার রেওয়াজ চলে বাদশাহ শাহরিয়ার। ওদিকে তাঁর এই অমানুষিক অত্যাচারে দেশবাসী সোচ্চার হয়ে ওঠে, অভিশাপ দিতে থাকে তাঁকে। খোদা আল্লার কাছে তারা তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানায়, প্রার্থনা জানায় তার কুশাসনের পরিসমাপ্তি এবং তাকে খতম করার জন্য। কুমারী মেয়েরা প্রাণ ভয়ে প্রহর গোণে, কখন কার ডাক পড়ে কে জানে। মেয়েরা তাদের কন্যা হারানোর ব্যথায় ডুকরে কেঁদে ওঠে, পিতা তার স্নেহের কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাদশাহের রাজধানী ছেড়ে গোপন জায়গায় পালিয়ে যায় সাময়িক ভাবে।

কিন্তু পালিয়ে তারা যাবে কোথায়? বাদশাহের সজাগ দৃষ্টি তাদের সেই সব গোপন স্থানেও গিয়ে পড়ে, তাঁর হুকুমে উজির গিয়ে তাদের পিতা-মাতার কোল থেকে তাদের আদরের কন্যাদের ছিনিয়ে আনে শাহরিয়ারের হুকুম তামিল করার জন্য। প্রতিরাত্রে একটি করে কুমারী মেয়ে তাঁর চাই, চাই-ই! কলসির জল গড়াতে গড়াতে এক সময় নিঃশেষ তো হবেই, এই ভাবে তামাম দুনিয়ার কুমারী কন্যা প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায় বুঝি এক সময়।

অথচ বাদশাহের হুকুম, তাঁর রাতের নতুন অতিথি আসা যেন বন্ধ না হয়, তার মখমলের বিছানা যেন একটি রাতের জন্যও সঙ্গিনী বিহীন না হয়। কিন্তু তখন তামাম দুনিয়ার কুমারী যুবতী মেয়ের ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। সারাদিনের পথের ক্লান্তিতে উজির ফিরে এলো তার ডেরায়। অবসন্ন দেহ, বিষণ্ণ মন। বাদশাহের রুদ্র-রোষের আক্রোশে তার আসন্ন প্রাণ বিনাশের চিন্তায় মগ্ন সে, আজ রাতে একটি কুমারী বাদশাহের জন্য জোগাড় করতে না পারলে তার গর্দান নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু এখন উপায়! কুমারী মেয়ে সে পায় কোথায়?

উজিরের ছিলো দুই কন্যা। দুই কন্যাই অপরূপ সুন্দরী। একই অঙ্গে অতো রূপ, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না বুঝি। সেই সঙ্গে বিদ্যা ও বুদ্ধির জাহাজ যেন এক একটি। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম শাহারাজাদ, আর কনিষ্ঠা কন্যার নাম দুনিয়াজাদ। তাদের দুই বোনের মধ্যে বড়টি আবার ইতিহাস যেন গুলে খেয়েছে। প্রচুর পড়া-শোনা আছে। প্রাচীন ইতিহাস, সেকালের নবাব-বাদশাহের বিচিত্র জীবন-কাহিনী, নানান দেশের বিচিত্র কিংবদন্তী তার মুখস্থ। হাজার হাজার বাদশাহের ইতিহাস বই আছে তার পড়ার ঘরে। শুধু কি ইতিহাস। কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যেও কম জ্ঞান তার ছিলো না। তার আন্তরিকতা ও নম্র ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়।

সেই শাহরাজাদ তার আব্বাজানকে অমন বিষণ্ণ ও চিন্তিত হয়ে বসে থাকতে দেখে শুধোয়, 'আব্বাজান, তোমার মুখটা আজ কেন এমন চিন্তায় অন্ধকারের মতো দেখাচ্ছে বলো তো?' আব্বাজানকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কবির এক অমর কাব্যগাঁথা থেকে আবৃত্তি করে শোনায় সে :—

দুঃখ-শোকে কাতর হয়ো না কখনো,
কঠিন ডোরে বাঁধো তোমার কলিজা,
রাত্রির পর দিন যেমন আসে,
দুঃখ ঘুচে তোমায় বিষণ্ণ মন যেন সুখের
সাগরে ভাসে।

কন্যার মুখ থেকে অমন ভালো ভালো কথা শুনে শান্তি ফিরে আসে উজিরের মনে, বুকে বল পায়। তারপর যে শাহারজাদকে বাদশাহের অমানুষিক আগুন নিয়ে খেলার কাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণনা দিয়ে গেলো, কিছুই গোপন করলো না সে তার কন্যার কাছে।

সব শুনে শাহারাজাদ আক্ষেপ করে বলে ওঠে, 'হায় আল্লা, মেয়েদের খুনী এই জল্লাদ বাদশাহের অত্যাচার আর কতদিন সহ্য করা যায়? তার

রক্তাক্ত খুনে হাত কি ভাবে রেহাই পাওয়া যায়, আমি বলবো আব্বাজান ?'

'বলো বেটী, তোমার মনে কি আছে ?'

রাত বাড়ে, আর দেরী না করে শাহারাজাদ তার মনের কথাটি এবার খুলে বলে, 'খোদা আল্লা বেহেস্ত থেকে নিশ্চয়ই আমাকে আশীর্বাদ করবেন। আব্বাজান, তুমি এক কাজ করো, আজ রাতেই তুমি ঐ জল্লাদ বাদশাহের সঙ্গে আমাকে শাদী করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করো। আমি যদি সাচ্চা মুসলমানের মেয়ে হয়ে থাকি তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর হারেম থেকে বেঁচে ফিরে আসবো। আর যদি একান্তই তাঁর নৃশংস অত্যাচারের শিকার হই তাহলে তাঁর হাতে কোতল হওয়ার আগে তাঁকে এমন উচিত শিক্ষা দিয়ে যাবে যে, অন্য কোন কুমারী মেয়েকে আর প্রাণ দিতে না হয়, অন্য কোন মেয়ে যেন তার মায়ের কোল ছাড়া না হয়।'

'না, না বেটী এ হয় না, 'এমন সর্বনাশা কথা মেয়ের মুখ থেকে শোনা যে কোন বাপের ভীষণ পাপ বেটী। কতো মেয়ের তো সর্বনাশ আমি করেছি। তারপর নিজের মেয়েকে বাদশাহের হাতে কোতল হওয়ার জন্য তুলে দিয়ে আমার পাপের বোঝা তুমি আর বাড়িও না বেটী। না বেটী, এ হয় না। এ অন্যায়, এ পাপ। খোদা আল্লা আমাকে কখনো ক্ষমা করবেন না।'

'প্রয়োজনে একটু নিষ্ঠুর হতে হয় বৈকি আব্বাজান, এ কাজ আমাকে নিজের হাতে করতে হবে বৈকি !' শাহারাজাদ রুখে ওঠে, 'তাছাড়া এ তো একটা সৎ কাজ আব্বাজান। দশের জন্য ভালো কাজে আমাকে বাধা দিও না তুমি। তাড়াতাড়ি বাদশাহের সঙ্গে আমার শাদীর জোগাড় করো।'

অগত্যা নিরুপায় হয়ে উজির তার কন্যাকে স্মরণ করিয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলে। 'সেই গাধা, বলদ আর গৃহস্বামীর গল্প তুমি শুনেছো ?'

'কি বললে ?' শাহারাজাদ অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে, 'না, শুনিনি তো ! বলো সেই গল্প আব্বাজান, আমি শুনতে চাই।

উজির সেই উপাখ্যান বলতে শুরু করলো অতঃপর।

গাধা ও বলদের উপাখ্যান

'জানো বেটী, এক সময় এক ধনী পশুপালক বাস করত। তার ছিলো প্রচুর অর্থবল ও লোকবল। গৃহপালিত পশু এবং উটের ব্যবসা। খোদা আল্লা তাকে পশুদের মুখের ভাষা বোঝার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই ক্ষমতা দানের কথা প্রকাশ করলে মৃত্যু তার অনিবার্য। তাই সে তার প্রাণের ভয়ে খোদার সেই অকৃপণ দানের কথাটা গোপন রেখেছিল সে। তার বাড়ির সংলগ্ন একটা গোয়ালঘর ছিলো। সেই গোয়ালে থাকতো একটি বলদ এবং একটি গাধা। একদিন হলো কি সে তার ভৃত্যদের সঙ্গে নিয়ে সেই গোয়ালঘরের কাছাকাছি একটা জায়গায় বসেছিল, তার ছেলে-মেয়েরা তাকে ঘিরে খেলায় মত্ত ছিলো, সেই সময় গাধার উদ্দেশে বলদকে বলতে শুনলো সে, 'ওহে ভ্রমণবিলাসী. তুমি তো বেশ সুখে আছো ভাই, ভালো ভালো খাবার খেয়ে, আরাম করে শুয়ে থাকো, দিব্যি নাক ডেকে ঘুমোও। আর আমি ? (অভাগা জানোয়ার !)' বলদ বলতে থাকে, 'গাই-গরুর উচ্ছিষ্ট খড়-বিচালি মাঝে-মধ্যে খেতে পাই, তাও পেট ভরে না। বিছানা ? গরুর গোবরের ওপর। আর খাটুনি ? হাড়-ভাঙ্গা। সেই

কোন কাক-ভোরে মনিবের ভৃত্য এসে আমার ঘাড়ে জোয়াল চাপায়, তারপর চলে সারাদিন খেত-খামারে অমানুষিক পরিশ্রম, কাজে একটু গাফিলাতি হলে আর রক্ষা নেই, সাঁই-সাঁই চাবুক পড়ে পিঠের ওপর, সারা পিঠে চাবুকের দাগ, দ্যাখোই না ভালো করে একবার। খেটে খেটে আমার শরীরের কি হাল হয়েছে। কাঁধে জোয়াল বয়ে বয়ে কাঁধে কি রকম ঘা হয়ে গেছে, দ্যাখো না। অথচ দ্যাখো, তোমার কাজ বলতে তেমন কিছুই নয়। মাঝে-মধ্যে মনিবের ইচ্ছে হলে তোমার পিঠে চড়ে কাছা-কাছি কোথাও ঘুরে আসে। তুমি তখন তার ভ্রমণের সাথী, বেশ লাগে দেখতে তোমাকে তখন। তারপর ফিরে এসে সারাদিন বিশ্রাম। আর আমার ছুটি সন্ধ্যার আগে তো কোনদিনই নয়।' আক্ষেপ করে বলদ আরো বলে, 'তাহলে বুঝতেই পারছো, আমার যখন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি চলে তখন তোমার পূর্ণ বিশ্রাম, আমি যখন খিদের জ্বালায় ছটফট করি তখন তুমি এখানে ফিরে এসে ভালো ভালো সুস্বাদু খাবার খেয়ে পেটটা ডাঁই করে বিচালি পাতা গদির ওপর শুয়ে পড়ো; আর অনিদ্রায় আমার স্বাস্থ্য যখন ভেঙ্গে পড়ছে তখন তুমি নাক ডেকে অকাতরে ঘুমোও। আশ্চর্য, এক যাত্রায় কি রকম পৃথক ফল দেখেছো?'

এই পর্যন্ত বলে বলদ থামলে গাধা তার দিকে ফিরে বলে, 'এ ভাবে তুমি ভেঙ্গে পড়ছো! তুমি না ষাঁড়? কত বড় তোমার মাথা। অত বড় মাথা নিয়ে সামান্য একটু বুদ্ধিও কি তুমি খাটাতে পারো না। তোমার তুলনায় আমার বুদ্ধি তো যতসামান্য! লোকে কথায় বলে আমি নাকি গাধা, তা গাধার আবার বুদ্ধি কি আছে যে অন্যকে সে উপদেশ দিতে জানে। তবু না বলে পারছি না, তুমি কি কখনো জ্ঞানীজনদের সেই অমর বাণী শোনোনি।'

অন্যেরে লাগি সে দিবারাত্র খাটে,
তাদের মুখে হাসি ফোটায় তার চোখের
অশ্রু দিয়ে।
কাটফাটা রোদে ধোবির কপাল ফাটে,
অন্যের কুর্তা সফেদ করতে গিয়ে॥

'কিন্তু তুমি কি বোকা বলদ, মুখ বুজে তুমি তোমার মনিবের এতো অত্যাচার সহ্য করো? জানো, তোমার সুখ নিজের হাতের মুঠোয় রয়েছে। একটু বুদ্ধি খাটালে আমার থেকে অনেক বেশী সুখে তুমি থাকতে পারো।' গাধা এখানে একটু থেমে একটু সময় কি ভেবে আবার বলতে শুরু করলো, 'শোনো বলদ, লোকে আমাকে যতোই গাধা বলুক, বোকা বলুক না কেন, তবু তোমাকে আমি একটা পরামর্শ না দিয়ে আর থাকতে পারছি না। তোমার দুঃখে আমি মর্মাহত। তাই শোনো, তোমাকে একটা মতলব শিখিয়ে দিচ্ছি, আমার এই মতলবটা তুমি মনিবের ভৃত্যের ওপর খাটাবে ঠিক ঠিক ভাবে যেমন আমি বলবো। কাল ভোরে ভৃত্যটা তোমাকে



আবার হালে নিয়ে যেতে এলে তুমি কিছুতেই তোমার গোবরের বিছানা থেকে উঠবে না। সে তোমাকে যত জোরে চাবুক মারুক না কেন, খুব অসহ্য না হলে এক পাও নড়বে না। তারপরেও সে যদি তোমাকে একান্তই মাঠে নিয়ে যায়, তখন তুমি জোয়াল কাঁধে নেবে না কিছুতেই। ভৃত্য মনিবের মতোই নিষ্ঠুর। আমি জানি হয়তো জোর জবরদস্তি করে শেষ পর্যন্ত সে তোমার কাঁধে জোয়াল ঠিক চাপাবেই। ঠিক আছে, তবুও আচ্ছা। মাঠে হাল দিতে গেলে দু'এক পা চলেই তুমি তোমার ভারী দেহটা মাটিতে ফেলে দেবে। সে তোমার পিঠে চাবুক কষাবে, হয়তো একটু বেশী লাগবে, তবু আর মাটি থেকে উঠবে না, মরার মতো পড়ে থাকবে। তখন সে তার মনিবকে ডাকবে, শলা-পরামর্শ

করবে। শেষে ওরা ভাববে, তোমার অসুখ করেছে। এই ভাবে তুমি রেহাই পেয়ে যাবে ওদের কাছ থেকে। তারপর থেকে আমার মতো আরামে দিন কাটবে তোমার। একদিন হোক দু'দিন হোক, কিছু সময় তো রেহাই পাবে! কি বলদ মহাশয়, আমার মতলবটা ভালো নয় কি?'

বলদ মাথা নেড়ে তোফা তোফা জানায়, খুশিতে ডগমগ্ হয়ে ওঠে। সে ভাবে গাধাই এখন তার একমাত্র উপকারি বন্ধু। 'ও আমার জ্ঞানদাতা, সত্যি তুমি আজ আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছো, কি বলে যে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেবো!' ('শোনো বেটী', উজির তার কন্যা শাহারাজাদকে শুধোয়, 'সেই পশুপালক তাদের সব কথার অর্থ স্পষ্ট বুঝতে পারলো।')

পরদিন ভোরে পশুপালকের ভৃত্য কৃষক যথারীতি গোয়ালে এসে বলদের গলায় জোয়াল লাগাতে গেলো, কিন্তু পারলো না, বলদ মাটিতে শুয়ে লুটোপুটি খেতে লাগালো, মাঠে তাকে সেদিন আর লাঙ্গল দেওয়ার কাজে লাগানো গেলো না! গাধার পরামর্শটা পুরোপুরি কাজে লাগালো বটে, দক্ষ অভিনেতার মতো অভিনয় করে গেলো সে ভৃত্য-কৃষকের সামনে। অবশেষে বিরক্ত হয়ে বলদকে সে গোয়ালে ফিরিয়ে দিয়ে যায় সন্ধ্যার সময়। সারারাত বলদ উপোষ করো রইলো, এক কণা দানাপানিও মুখে দিলো না। পরদিন ভোরে কৃষক আবার এলো বলদকে হালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু বলদের এক অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালো সে। বলদ তখন পেট ফুলিয়ে শুয়ে আছে, তার সারা গায়ে গোবরের ছড়াছড়ি। কৃষকের তখন খেয়াল হলো, নিজের মনে বললো, 'খোদা আল্লা, বেচারা জ নোয়াটার ওপর গতকাল আমি অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছি, কিন্তু এখন বুঝছি, সত্যি তার শরীরটা কাল খুব খারাপ ছিলো।'

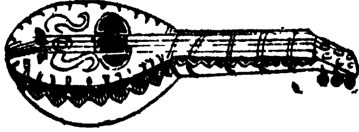
নৌকর তখন ছুটলো তার মনিব সওদাগরের কাছে পরামর্শ করার জন্য। সব শুনে সওদাগর মনে মনে মনে হাসলো, তারপর গম্ভীর হয়ে বললো, 'ঠিক আছে, ঐ বেত্তমিজ গাধাটার ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে মাঠে নিয়ে যা, বলদের কাজটা তাকে দিয়ে চালিয়ে নে।' তারপর সে তার মনিবের হুকুম মতো গাধাটাকে মাঠে এনে হালে জুড়ে সারাদিন সেই কাটফাটা রোদে বলদের কাজটা তাকে দিয়ে সেরে নিলো। মাঝে মাঝে গাধাটা ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে শুধু খড়ের টুকরো খেতে দিলো। দিনের শেষে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ নিয়ে গাধা ফিরে আসে গোয়ালে, ঘাড়ে-গর্দানে ও পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা নিয়ে। তার থাকার আস্তানা হলো বলদের সেই গোবর-গাদায়। ওদিকে বলদ সারাদিন যবের ভুষি মাখানো জাবনা খেয়ে বিচালি পাতা গদির ওপর শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে খোস মেজাজে ছিলো। গাধাকে বিষণ্ণ মনে গোয়ালে ঢুকতে দেখে বলদ তার আরামের বিছানায় উঠে বসে দু'হাত তুলে তাকে দোয়া জানালো।

'আমার জ্ঞানদাতা! খোদা তোমার মঙ্গল করুন। তোমার মতলব খাটিয়ে আজ আমি সারাদিন খুব বিশ্রাম নিতে পেরেছি, পেট ভরে ভালো ভালো খাবার খেতে পেরেছি। কি বলে যে তোমাকে দোয়া জানাবো—'

কিন্তু গাধা কোন উত্তর দিলো না, সে তখন জ্বালায় জ্বলে-পুরে মরছিল। নিজের বোকামির জন্য সে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে থাকে: 'বলদকে ভালো উপদেশ দিয়ে আমি নিজেই নিজের কবর খুঁড়েছি। আমি আমার নিজের সুখ নিজেই কেড়ে নিয়েছি। তবে তার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। আমি আমার মহানুবতা দেখিয়েছি। জ্ঞানীদের এই তো পরিচয়! এই জন্যই তো কবি বলে গেছেন:

বেসিলের (তুলসি পাতা) উপর পড়লে
পদচিহ্ন,
তার মনোহর রূপ হারাবার নয়।

রাজ সভাকক্ষে আগন্তুক মাকড়ষার চিন্ন
জালে কি বা এসে যায় ?
চোখ ধাঁধানো সামুদ্রিক পাথর
কি হারাতে পারে মুক্তার কদর ?



এখন আমাকে বলদের সঙ্গে চালাকী করে তাকে আবার তার কাজে ফিরিয়ে দিতে হবে', আপন মনে গাধা ভাবে, 'তা না হলে মৃত্যু আমার অনিবার্য।' তারপর সে তার জাবনা পাত্রের দিকে এগিয়ে গেলো চিন্তিত মনে, ওদিকে বলদ তাকে বহুত সুক্রিয়া জানালো, আশীর্বাদ করলো……

'তাই বলছি বেটী', উজির তার মেয়ের উদ্দেশে বলে, 'ও রকম বোকামো করতে যেও না', তাতে শুধু তোমাকে কোতলই হতে হবে, কাজের কাজ কিছু হবে না। খোদা আল্লা তোমার সুবুদ্ধি দিন, ও ভাবে সব জেনে শুনে নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিও না।'

'তবু আমাকে তাই করতে হবে আব্বাজান।' বাদশাহের হারেমে আমাকে যেতেই হবে, আর শাদী তাকে আমি করবোই!' শাহরজাদা দৃঢ়স্বরে বলে, 'আমি যদি সাচ্চা মুসলমান হই, কেউ আমার ইচ্ছে থেকে এক চুলও নড়াতে পারবে না।'

'তাহলে আমাকেও পথ দেখতে হবে', উজির এবার একটু উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, 'সওদাগর তার বিবির জিদ ভাঙ্গতে ঠিক যেমনটি করেছিল, দেখছি আমাকেও সেরকম একটা কিছু মতলব আঁটতে হবে।'

'কিরকম ? সওদাগর কি করেছিল আব্বাজান ?

'জানো, সওদাগর কি করেছিল ?' উজির বলতে থাকে, 'গোয়ালঘরে গাধা ফিরে আসতেই সওদাগর এসে বসলো অলিন্দে বিবি ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে, জ্যোৎস্নার আলো লুটোপুটি খাচ্ছিল অলিন্দের চারপাশে। জ্যোৎস্নার আলোয়ে অলিন্দ থেকে গোয়ালঘরের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। গাধার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো সওদাগরের কানে, 'তা তুমি আগামীকাল কি করছো ?'

'কি আবার করবো, তোমার পরামর্শ মতো চলবো', প্রত্যুত্তরে বলদ বলে, 'আর কিছু না হোক, এভাবে বেশ কিছুদিন আরাম তো করে নেওয়া যাবে। এগিয়ে গিয়ে এখন আবার পিছিয়ে আসা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। ওরা আমার জন্য খাবার আনলে, আমি ফিরিয়ে দেবো, পেট ফুলিয়ে পড়ে থাকবো। ওরা ভাববে, আমি এখনো অসুস্থ।'

গাধা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়, 'না না, ও কাজ তুমি আর কখনো করো না দোস্ত।'

'কেন, কেন আজ তুমি একথা বলছো বলো তো ?' গাধা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'এই কথাটাই তো তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম দোস্ত, এক সঙ্গে দুজনে এতোদিন ছিলাম, কি সুখেই না ছিলাম। কিন্তু দোস্ত, এখানে আসার সময় একটা যে অশুভ খবর আমি শুনে এলাম, যদি সেটা সত্য হয়, তুমি তো আর আমার সঙ্গে থাকবে না।



তোমার সঙ্গে জীবনে আর কোনদিনও দেখা হবে না আমার। জানো বলদ', গাধা নিচু গলায় বলে, 'ঘরে ফেরার সময় আমাদের মনিবকে সেই সর্বনাশা কথাটা বলতে শুনলুম। মনিব তার নোকরকে

বলছিল, কাল সকালে তুমি যদি হালে যেতে না চাও, কিংবা খেতে দিলে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তোমাকে কষাইয়ের হাতে তুলে দেবে ওরা। তোমার মাংস গরীবদের বিলিয়ে দেওয়া হবে। আর তোমার দেহের চামড়ায় মনিবের পরিবারের সবার পায়ের জুতো তৈরী হবে। তোমার সর্বনাশা খবরটা শোনার পর থেকে দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তাই তোমাকে আমি ফিরে আবার একটা উপদেশ দিচ্ছি, কাল সকালে মনিবের নোকর গোয়ালঘরে ঢোকার আগেই তুমি ঘুম থেকে উঠে ফিটফাট হয়ে বসে থাকবে। ওরা তোমার ঘাড়ে জোয়াল চাপাতে এলে আর ফিরিয়ে দিও না। ওরা তোমায় খেতে দিলে দু'মুঠো খেয়ে নিও তুমি। তাহলে মনিব তখন বুঝবে, তোমার দেহের শক্তি ফিরে এসেছে, তুমি এখনই অকেজো হয়ে পড়নি। অতএব মনিব তোমাকে কষাই-এর হাতে তুলে দেওয়ার চিন্তাটা মন থেকে বাতিল করে দেবেন।'

'আমাকে তুমি খবরটা জানিয়ে আমার খুব উপকার করলে'. বলদ কৃতজ্ঞ হয়ে বললো, 'কি বলে যে তোমাকে সুক্রিয়া জানাবো! কাল আমি ওদের সঙ্গে মাঠে হ'ল দিতে যাবো।' এই বলে বলদটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে জাবনা-পাত্রে মুখ দিয়ে দানাপানি খেতে শুরু করলো টগবগে হয়ে পরদিন সকালে জোয়াল কাঁধে নেওয়ার জন্য। (অলক্ষ্যে অলিন্দ থেকে তাদের মনিব সব দেখলো, তাদের আলোচনার কথা সব শুনলো)।

পরদিন সওদাগর তার বিবিকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে গেলেন বলদের হাল দেওয়ার কাজ স্বচক্ষে দেখার জন্য। মনিবকে দেখে বলদ চনমন করে উঠলো, ল্যাজ নেড়ে তাকে সম্মান জানালো এবং ঝড়ের গতিতে জোয়াল কাঁধে হাল দিতে থাকে মাঠে, তা দেখে সওদাগর তো হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতে থাকে।

তার বিবি তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার তুমি অমন জোরে জোরে হাসছো কেন বলো তো?'

'এমন কতকগুলো কথা আমি শুনেছি এবং মজার দৃশ্য দেখেছি, যা আমি বলতে পারবো না, বললে মৃত্যু অনিবার্য।'

'সে আমি জানি না, তোমার মৃত্যু হলেও আমি তোমার হাসির কারণটা জানতে চাই।' সওদাগরের বিবি নাছোড়বান্দা।

'না পশু-পক্ষীদের ভাষা আমি প্রকাশ করতে পারবো না, মৃত্যুকে আমি যে ভীষণ ভয় করি।'

'আল্লা জানেন, কেন তুমি সত্যি কথা প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছো। আমি জানি তোমার হাসির কারণ খুলে না বললে তোমার ঘর আমি করতে পারবো না, এখান থেকে আমি চলে যাবো। আমি তোমাকে তালাক দেবো।' দুঃখে অভিমানে সব বেদনা তার অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে।

'আরে বাবা, এতে কাঁদবার কি আছে, আমি তো তোমাকে বললাম বিবিজান, এক বিশেষ ক্ষমতা বলে পশু-পক্ষীদের মুখের ভাষা আমি শিখেছি এখন সেটা প্রকাশ করলে খোদা-আল্লা কখনোই আমাকে মাফ করবেন না। তাঁর বিচারে মৃত্যু আমার অবধারিত। তুমি কি তাই চাও বিবিজান?'

'হ্যাঁ, তাতে আমার কোন ক্ষোভ নেই, তুমি এখন বলো, বলদ এবং গাধার মধ্যে কি এমন মজার কথা বিনিময় হয়েছিল গোপনে তা শুনে তোমার বুক-ফাটা হাসি শুনতে হলো আমাকে।'

অবশেষে সওদাগর বললো, 'বিবিজান তুমি যখন একান্তই শুনতে চাও সে কথা, আমার বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, মেহমান, পাড়া-পড়শী সবাইকে এখুনি খবর দাও। আর খবর দাও কাজীকে, মরার আগে তাকে দিয়ে আমার উইল করিয়ে নিতে চাই। কবরে যাওয়ার আগে আমার শেষ ইচ্ছার কথা লিখে যাবো আমার উইলে।' সে তার বিবিকে বোঝালো, 'তুমি আমার কলিজাও শুধু বিবিজানই নও, তুমি আমার চাচার বেটী, আমার ছেলেমেয়েদের মা,

তোমার সঙ্গে আমি একনাগাড়ে কুড়ি বছর হলো ঘর করছি, তোমার বাকী জীবনের একটা সু-বন্দোবস্ত করে না গেলে বেহস্তে গিয়ে সুখ পাবো না, তাড়াতাড়ি কাজীকে ডাকো।'

সওদাগরের কথা মতো তার বিবি আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শি, সবাইকে ডেকে জড়ো করলো চট্‌পট্‌। তাদের উদ্দেশে সওদাগর বললেন, 'আমি এক রোমাঞ্চকর কাহিনীর কথা জানি, কিন্তু সেটা প্রকাশ করলে মৃত্যু আমার শিয়রে এসে দাঁড়াবেই, কেউ সেটা ঠেকাতে পারবে না।'

সওদাগরের বক্তব্য মন দিয়ে শুনলো সবাই এবং তারা তার বিবিকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, তার সেই একগুঁয়েমি মনোভাব ত্যাগ করার জন্য। আল্লার রুদ্র-রোষে এই বৃদ্ধ বয়সে তার স্বামীর যদি কোন অঘটন ঘটে যায়, তখন সে স্বামী হারা হয়ে ছেলে-মেয়েদের রক্ষা করবে কোন উপায়ে! কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। তার সেই এক কথা, 'আমি আমার সংকল্প থেকে এক চুলও নড়বো না যতক্ষণ না আমার স্বামীর হাসির প্রকৃত কারণ কি জানতে পারছি। তার জন্য যদি স্বামীর মৃত্যুও হয় সে-ও ভালো।'

সওদাগর তার বাঁচার শেষ আশা নিশ্চিন্ন হতে দেখে অবশেষে নিরুপায় হয়ে বাড়ির বাইরে নিজের কবর খোঁড়ালো। তারপর ফিরে এসে তার হাসার সেই রহস্যময় কাহিনী প্রকাশ করে মৃত্যুবরণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলো।...

'জানো বেটী শাহারাজাদ, সেই সওদাগরের বাড়ির বাইরে একটা পোলট্রি ছিলো, সেখানে থাকতো পঞ্চাশটা মুরগী আর একটিমাত্র মোরগ। আত্মীয় ও প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তার পোষা মুরগী মাদী ও মোরগের কথাবার্তা তার কানে ভেসে এলো। মোরগটা তখন ডানা উড়িয়ে একে তার সঙ্গিনী মুরগীদের দৈহিক সঙ্গ দিয়ে কামলিপ্সা



চরিতার্থ করছিল তাদের। সেই দৃশ্য দেখে কুকুরটা তখন মোরগটাকে বলছিল—'

'কি বলছিল আব্বাজান?'

'ওদের মুখ থেকেই শোনো,' উজির বললো।

'ওরে মোরগ! আজকাল মানুষের চরিত্র কি নির্লজ্জ, কি জঘন্য না হয়ে গেছে, তার খবর রাখো তুমি?'

'কি রকম?' মোরগ শুধোয়, 'নতুন কোন ঘটনা আজ ঘটেছে নাকি?'

'সে কি, তুমি জানো না, আজ আমাদের প্রভু মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন? তাঁর বিবির জেদ, খোদা

আল্লার শেখানো কি এক রহস্যকাহিনী তাঁকে খুলে বলতেই হবে, আর বলা মানেই তাঁর নিশ্চিত মৃত্যু, আল্লার সর্ত নাকি সেরকম। খবরটা শোনা অবধি আমরা কুকুরকূল শোকে মুহ্যমান। অথচ তুমি দেখছি একটার পর এক মুরগীকে সঙ্গম-সুখে তুঙ্গে তুলেছো। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এটা কি স্ফূর্তির করার সময়? তুমি কি একটুও লজ্জাবোধ করছো না?'

'খোদা দেখছেন নিশ্চয়ই', মোরগ বলে, আমাদের প্রভু তাঁর একমাত্র বিবিকে বাগে আনতে পারছেন না? ছিঃ ছিঃ এরকম প্রভুর দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে কি লাভ হলো? অথচ দ্যাখো, আমি কেমন সুখে ঘর-সংসার করছি একটা নয়, দুটো নয় গুণে গুণে পঞ্চাশটি মুরগীকে নিয়ে। সবাইকে আমি সমান সুখ দিয়ে কেমন একটা খাঁচায় বন্দী করে রেখেছি, কারো কোন অভিযোগ নেই, কারোর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ নেই। আর আমাদের প্রভু তাঁর একমাত্র বিবিকে পোষ মানাতে পারছেন না। আসলে কি জানো, বেশী লাই দিয়ে দিয়ে তিনি তার বিবিকে মাথায় তুলে দিয়েছেন।'

'কিন্তু মোরগ ভায়া, এখন একটা উপায় তো বাতলাও কিভাবে আমাদের প্রভুর দান রক্ষা হতে পারে।' কুকুর জিজ্ঞেস করলো।

'কি ভাবে আবার? এর একটা খুব সহজ দাওয়াই আমি বাদলাতে পারি। তুঁত গাছের একটা ডাল দিয়ে তিনি যদি তার বিবিকে বেধড়ক পেটান চোখে জল না আসা পর্যন্ত দেখবে তখন আপসে সব ঠিক হয়ে গেছে। যেমন অসুখ তেমনি ওষুধ। প্রতিদিন এভাবে দু'এক ডোজ তার বিবিকে দিতে পারলে অনায়াসে তিনি সুখ নিদ্রায় আরো কিছুদিন হেসে খেলে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু আমাদের প্রভুর না আছে সেরকম বুদ্ধি-সুদ্ধি, না আছে তেমন বিচার ক্ষমতা।'...

'শোন বেটী শাহরাজাদ', 'উজির বলতে থাকে, 'সওদাগর তার বিবিকে যে ভাবে শায়েস্তা করেছিল, এবার আমিও ঠিক সেই রকম ব্যবহার করবো তোমার সঙ্গে, বুঝলে?'

'তা সেই সওদাগর কি করেছিল আব্বাজান?' শাহরাজাদ জিজ্ঞেস করলো।

'কুকুর ও মোরগের উপদেশ শুনে সেই সওদাগরের চেতনার উন্মেষ হয়। সে তখন তুঁত গাছের ডাল কতকগুলো কেটে নিয়ে গিয়ে তার বিবির শয়নকক্ষে গিয়ে হাজির হলো। ডালগুলো আড়ালে রেখে সে তার বিবিকে আহ্বান করলো, উদ্দেশ্য যেন সে তার বিবিকে সেই রহস্য কাহিনী শোনাবে, তারপর স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবে খোদার মর্জি মতো। সওদাগরের বিবি ঘরে ঢুকতেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দেয় সে। তারপর সেই তুঁত গাছের ডাল দিয়ে সে তার বিবির পিঠে, কাঁধে, বুকে, হাতে-পায়ে যেভাবে পারলো উত্তম মধ্যম প্রহার করলো আর বজ্র-কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়তে থাকলো, 'যে কথা তোমার জানার প্রয়োজন নেই, আর শুনতে চাইবে?'

বিবিটা ককিয়ে কেঁদে উঠলো। তাতে সওদাগরের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সে তখন নির্দয়ের মতো তাকে পিটিয়ে চলে ক্রমাগত। বিবি এবার কান্না-জড়ানো স্বরে বলে ওঠে, 'গোস্তাফি মাপ করো, আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি আমার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। আমি আর তোমাকে কোন প্রশ্ন করবো না। দয়া করে আমাকে রেহাই দাও। আর আমাকে মেরো না তুমি।' তারপর সে তার স্বামীর হাতে চুমু খেয়ে তার পা দুটি জড়িয়ে ধরে কাতর মিনতি জানাতে থাকে তাকে আর না মারার জন্য। এবার সওদাগর বুঝতে পারে, তার বিবির উচিত শিক্ষা হয়েছে, মোরগের উপদেশ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে সে গলা ধাক্কা দিয়ে সে তার বিবিকে ঘর থেকে বার করে দেয়।

সেই ঘটনার পর তাদের আত্মীয় স্বজন ও পাড়া-পড়শীদের মুখের ওপর থেকে দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গিয়ে হাসি আর আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। আর

এই ভাবে মোরগের কাছ থেকে সওদাগর তার পরিবারের নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপার শিক্ষালাভ করে সে তার বিবির সঙ্গে মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত সুখে-স্বাচ্ছন্দে দিন কাটিয়ে দেয়। আর আমিও ঠিক সেই ভাবে', বলদ ও গাধার কাহিনী শেষ করে উজির মন্তব্য করে, 'বেটী শাহারজাদ, তুমিও যদি তোমার অন্যায় জেদ ত্যাগ না করো, সেই সওদা-গরের মতো আমাকেও তাহলে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

কিন্তু শাহারজাদের মুখ দেখে মনে হলো না যে, উজিরের হুমকির কোন প্রভাব পড়েছে। ঠাণ্ডা মাথায় সে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়, 'আমি তো আগেই বলেছি আব্বাজান, আমি আমার সংকল্প থেকে ফিরে আসবো না। এমন কি এই উপাখ্যানও আমার মত বদলাতে পারবে না। এসব আলোচনা এখন বন্ধ থাক। আমি স্পষ্ট তোমাকে বলে দিতে চাই, আমি তোমার কোন কথা শুনবো না। তুমি যদি আমাকে অস্বীকারও করো, তা সত্ত্বেও আমি তোমার নাকের ডগা দিয়ে বাদশাহকে শাদী করবো। আমি একাই তাঁর কাছে গিয়ে বলবো, আমি আমার আব্বাজানকে আমার ইচ্ছার কথা জানানো সত্ত্বেও তিনি আমার কথায় কোন পাত্তা দিতে চাইলেন না, তাই আমি নিজেই চলে এলাম আপনার হারেমে আমি আজ বেগম হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

কন্যার আসন্ন সর্বনাশা বিপর্যয়ে দারুণ মর্মাহত হলেও উজির বুঝলো কোন ভাবেই শাহারজাদকে বুঝিয়ে তার সংকল্পকে বিরত করা যাবে না। ওদিকে রাত বেড়ে যায়। এরপর দেরী করলে হয়তো বাদশাহের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। তাই সে আর কাল বিলম্ব না করে বাদশাহ শাহরিয়ারের প্রাসাদে গিয়ে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তাঁকে আদাব জানিয়ে তাঁর সামনে মাটিতে চুম্বন এঁকে দিয়ে অতঃপর কন্যার সঙ্গে তার বচসার পুর্ণ বিবরণদিলো একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। এবং একথাও সে জানালো, আজ রাত্রে সে তার কন্যাকে বাদশাহের হাতে উপহারস্বরূপ তুলে দিতে চায়।

তার কথা শুনে বাদশাহ গভীর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন, মনে মনে উজিরের কন্যার প্রতি তাঁর দারুণ লোভ ছিলো, কিন্তু মুখ ফুটে তিনি তার মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করতে পারেননি লজ্জা সরমের জন্য। অথচ সেই উজির তার সুন্দরী কন্যার রূপের ডালি সাজিয়ে তাঁকে নিবেদন করতে চাইছে, এটা কি কম বিস্ময়ের কথা!

খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে বাদশাহ বললেন, 'আমার মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে একমাত্র তুমিই খুব বিশ্বস্ত ও অনুগত। তবে আর দ্বিধা কেন? কই তোমার কন্যাকে নিয়ে এসো! আমি বেহস্তের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আজ রাতে তাকে উপভোগ করে কাল সকালে তাকে বেহস্তে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে দাও আমাকে। এবার নিঃসঙ্কোচে তাকে আমার হারেমে নিয়ে এসো, তাকে বধ হতে দাও। তাকে যদি তুমি বধ হতে না দাও, তাহলে তার পরিবর্তে আমি তোমার গর্দান নেবো বিনা দ্বিধায়।'

'খোদা আল্লা আপনার দীর্ঘায়ু করুন!' উজির প্রত্যুত্তরে বলে, 'জাঁহাপনা, আমার কন্যা নিজেই চায় আজ রাতটা আপনার সঙ্গে কাটানোর জন্য।'

শাহরিয়ার দারুণ খুশি হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, এখুনি তোমার ডেরায় ফিরে গিয়ে তোমার কন্যাকে আজ আসার রাতে বেগম হওয়ার জন্য এখুনি নিয়ে এসো।'

উজির তার কন্যার কাছে ফিরে গিয়ে বাদশাহের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে বললো, 'আল্লা যেন তোমার আব্বাজানকে নিঃসঙ্গ করে না তোলেন।'

কিন্তু শাহারজাদের মুখে তার আব্বাজানের দুঃখের কোন ছাপ পড়তে দেখা গেলো না। বরং খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে সে তার ছোট সহোদরা দুনিয়াজাদকে কাছে ডেকে বললো, 'আমি যা বলি খুব মন দিয়ে শুনে রাখো। বাদশাহের হারেমে

গিয়ে আমি তোমাকে ডেকে পাঠাবো, সেখানে তুমি নিজের চোখে তাঁকে আমার দেহ সম্ভোগের দৃশ্য দেখবে। তারপর তাঁর রুচি-তৃপ্তি মিটে যাওয়ার পর তিনি যখন ঘুমনোর তোড়জোড় করতে যাবেন, ঠিক সেই সময় তুমি আমাকে বলবে, ও দিদি, আমার যে ঘুম আসছে না, তোমার গল্পের ঝুলি থেকে নতুন একটা গল্প বার করে আমাকে শোনাও। আমি জানি, তুমি চমৎকার গল্প শোনাতে পারো। তোমার গল্প শুনে আমার ঘুম এলে কাল সকালে আমি তোমাকে বহুত শুক্রিয় জানাবো। তারপর আমি তোমাকে গল্প বলতে শুরু করবো। খোদা



আল্লা আমাদের প্রতি সহায় থাকলে সেই গল্পটা বলার ছলে আমি রাতটা কাবার করে দেবো, সেই ভাবেই কিস্তিমাত করবো। বাদশাহের রক্তের নেশা ঘুচিয়ে দিয়ে গল্পের জের টেনে আমার গর্দান নেওয়ার সময় কাটিয়ে দেব। আর যদি সেই চালে সফল হতে না পারি তো—', শাহারজাদ এখানে একটু থামলো, তার দুর্বলতা গোপন করতে চাইলো ছোট বোনের কাছে।

'তোমার যাত্রা শুভ হোক দিদি', হাসি মুখে দুনিয়াজাদ বিদায় দিলো তার দিদিকে।

'রাত নামার পর শাহারজাদকে সঙ্গে নিয়ে উজির হাজির হলো বাদশাহের খাস কামরায়। শাহারজাদকে শাদীর পোষাকে সুন্দর মানিয়েছিল, তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে উজিরের উদ্দেশে বাদশাহ শাহরিয়ার বললেন, 'তাহলে তুমি আজ আমার রাতের প্রয়োজনটা মেটানোর ব্যবস্থা করলে শেষ পর্যন্ত ?'

'হ্যাঁ, জাঁহাপনা !' উজির তার মানসিক যন্ত্রণা কোন রকমে গোপন করে বললো, 'আপনি হুকুম করলে আমি এখন যেতে পারি।'

'হ্যাঁ, তুমি এখন যেতে পারো', বলে বাদশাহ এবার শাহারজাদকে দু'বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে তাকে তাঁর শয়নকক্ষে নিয়ে গেলেন। তারপর তাকে বিছানায় শুইয়ে উপভোগ করার জন্য তাকে বিবস্ত্র করতে গেলে ডুকরে কেঁদে উঠলো শাহার-জাদা। বাদশাহ তার কান্না দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার অমন সুন্দর হরিণ চোখে জল কেন সুন্দরী ?'

'জাঁহাপনা, আমার একটা ছোট্ট প্রিয় বোন আছে, আজ রাতটা শেষ হওয়ার আগে আমি তাকে একবার চোখে দেখতে চাই। আপনার যদি আজ্ঞা হয় তো—'

'ও, এই কথা ' বাদশাহ শাহরিয়ার সঙ্গে

সঙ্গে তাঁর অনুচরদের হুকুম দিলেন দুনিয়াজাদকে তাঁর শয়নকক্ষে হাজির করাবার জন্য।

একটু পরে দুনিয়াজাদ বাদশাহের শয়নকক্ষে তাঁর দুই বাহু ঝুকিয়ে ভূমিতে চুম্বন এঁকে দেয়। বাদশাহ তাকে কৌচের নিচে বসতে বলেন। তারপর শাহরিয়ার শাহরাজাদকে তাঁর বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নরম কার্পেটের ওপব তার নিষ্পাপ কুমাবী দেহের উপরে পশুর শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন! শাহবাজাদের এই প্রথম পুরুষ সঙ্গ লাভ তাই বাদশাহের কঠিন স্পর্শে যন্ত্রণায় কাতবে উঠলো সে। তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বাদল নামলো। শাহরিয়ারের তাতে এতটুকুও ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি তখন তাঁর কুমারী মৃত্তিকায় তাঁর বিজয় পতাকা উত্তোলনের আদিম আকাঙ্ক্ষায় মেতে উঠেছিলেন, ঠোঁটে ক্রুর হাসি, চোখে বীভৎস চাউনি। শাহরাজাদ চোখ বুঁজে তাঁব সেই পাশবিক অত্যাচাব সহ্য করতে থাকে নীববে। এক সময় বাদশাহের দেহটা শিথিল হয়ে আসে। শাহরাজাদাব দলিত-মথিত নগ্ন বুকের উপর থেকে নেমে দুবাহু দিয়ে তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে শুয়ে পড়ে। খানিক পবে তারা তিনজন ঘুমেব কোলে ঢলে পডলো। তবে মাঝ বাতে শাহাবজাদ ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলো, তাবপর পবিকল্পনা মতো ছোটবোন দুনিয়াজাদকে ইঙ্গিত করতেই সে-ও ঘুম-চোখে চোখ বগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে আব্দার করে বসলো, 'ও দিদি, আল্লা তোমাব মঙ্গল করুন, তুমি তো খব সুন্দব সুন্দর গল্প শোনাতে পারো। একটা নতুন গল্প বলো, যাতে করে আজ বাকী রাতটুকু কেটে যায়।'

'খুশি মনে আমি তো তোমাকে গল্প শোনাতে প্রস্তুত বোন', প্রত্যুত্তরে মৃদুভাষে শাহারজাদ বলে, 'অবশ্য যদি জাঁহাপনা অনুমতি দেন তবেই আমি আমার গল্প বলা শুরু করতে পারি।'

তাদের কথাবার্তা শুনে বাদশাহের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল আগেই। ভালো গল্প শুনতে কে না চায়, তার ওপর তিনি ছিলেন দারুণ গল্পপ্রিয়। শাহারা-জাদার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'বেশ তো, তোমার গল্প শুরু করো।'

বাদশাহের অনুমতি পেয়ে শাহারজাদ তো মহাখুশি। অতঃপর সহস্র এক রজনীর প্রথম বজনীতে শাহারজাদ বলতে শুরু করলো 'সওদাগর ও আফ্রিদি দৈত্যেব' গল্প দিয়ে।

জানেন জাঁহাপনা, কথিত আছে পুরাকালে এক বিত্তবান সওদাগব বাস করতো, তখনকার সময়ে সে ছিলো সমস্ত সওদাগরের মধ্যে বিত্তশালী সওদাগর, নানান দেশে তার ব্যবসা ছিলো ছড়িয়ে। একদিন হলো কি, কয়েকটি শহব থেকে সে তার পাওনা অর্থ আদায় করার জন্য ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো। মাঝ পথে প্রখর সূর্যতাপে পরিশ্রান্ত হয়ে একটি গাছেব নিচে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আশ্রয় নিলো। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজ সাবতে সে তার ঝোলা থেকে খাবারের কৌটো বার করলো। মধ্যাহ্নভোজ সারলো সে কিছু ভাঙ্গারুটি ও শুকনো খেজুর দিয়ে। খাওয়া শেষে খেজুরের বীচিগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে। খানিক পরে এক বিরাটকায় আফিদি দৈত্য হঠাৎ তাব সামনে এসে দাঁড়ালো, তার হাতে শানিত খোলা তলোয়ার।

'উঠে দাঁড়াও, তোমাকে আমি বধ করবো', দৈত্যটা হুঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, 'তুমি আমার শিশু পুত্রকে হত্যা করেছে।'

'সে কি?' অবাক চোখে তাকায় সওদাগর তাব দিকে, 'আমি তোমার ছেলেকে হত্যা করলামই বা কি করে?'

'আমার ছেলে এক পা এক পা করে হাঁটছিল, খেজুব খেয়ে বীচিগুলো ছুঁড়ে ফেলছিলো তখন। একটা বীচি তার বুকে লাগে, আর তাতেই সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে।

'আল্লার কসম, জেনে-শুনে আমার কোন গুণাহ

হয়নি। তাই আমি তোমার কাছ থেকে মাফি চাইছি।'

'মাফ!' দৈত্যর ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি, 'না, কোন মাফি নয়, আমি তোমাকে হত্যা করবই!' কথাটা শেষ করেই দৈত্যটা তার তলোয়ার উঁচিয়ে সওদাগরকে আঘাত করতে উদ্যত হলে সে কেঁদে ওঠে, 'আমার যদি সত্যি কোন গুণাহ্ হয়ে থাকে আল্লা আমার বিচাব করবেন।' তারপর নিজের মনে সওদাগর কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে :—

যার কেউ নেই খোদা আল্লা তার সহায়,
আজ আমি বড় একা অসহায়।
হে জঙ্গলের দৈত্য সম্রাট,
মনে মনে তুমি নিজেকে যত প্রবল
পরাক্রান্ত ভাবো না কেন,
প্রকৃতির কাছে তুমি শিশু,
তোমার মৃত শিশুর থেকেও ছোটো,
প্রকৃতি তোমায় মাফ করবে না,
রুষ্ট হবে সমুদ্র,
তুষার ঝড়ে মনে হবে তোমার সব বিক্রম যেন
এক খড়কুটো।



সওদাগর তার পুনরাবৃত্তি করতে গেলে দৈত্যটা তাকে বাধা দিয়ে বললো, 'আল্লার দোহাই, রাখো তোমার ও সব ছেদো কথা। আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। মোদ্দা কথা, আমি এখন তোমাকে বধ করতে চাই।'

কিন্তু সওদাগর কাতর মিনতি জানিয়ে তাকে বললো, 'জানো আফ্রিদি, আমার কিছু দেনা আছে, মরার আগে সেটা আমি মিটিয়ে দিয়ে যেতে চাই। তাছাড়া আমার অগাধ সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি আমার ছেলে-মেয়ে আর বিবিদের মধ্যে একটা বিলি-ব্যবস্থা তো করে যেতে হবে মরার আগে। অতএব আমাকে অনুমতি দাও একবার দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি নতুন বছরে আমি ফিরে আসবো তোমার কাছে ঠিক এই জায়গাটিতে। আল্লার কাছে হলফ করে আমি বলছি, আমি আমার কথার খেলাফ করবো না, আমি ঠিক ফিরে আসবোই, তখন তুমি আমাকে নিয়ে তোমার যা খুশি করতে পারো, তখন আমি কোন আপত্তি করবো না। খোদা আল্লা আমার সাক্ষী রইলেন।'

কি ভেবে দৈত্য তার কথায় বিশ্বাস করে সওদাগরকে ছেড়ে দিলো তখনকার মতো। দেশে ফিরে সওদাগর তার বকেয়া কাজ সেরে নিলো চটপট। পাওনাদারদের দেনা মেটালো প্রথমে, তারপর সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিলো ছেলে-মেয়ে ও বিবিদের মধ্যে। তারপর একদিন সে দুর্ভাগ্যের কাহিনী শোনালো তাদের। তারা দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়লো। কিন্তু সওদাগরের প্রতিশ্রুতি রাখার সময় হয়ে যায়। সেই দৈত্যের কাছে ফিরে যেতে হবে তাকে, সেই গাছের নিচে, সেই বদ্ধভূমিতে। তারপর সে তার শেষ করণীয় কতকগুলো কাজ সেরে নিলো। মরার আগে দেহটাকে পবিত্র করে তোলার জন্য স্নান করলো। তারপব মৃতদেহ ঢাকার জন্য কালো পোষাক সঙ্গে নিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াপড়শীদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে তাদের চোখের জলে ভাসিয়ে রওনা দিলো দৈত্যকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে সওদাগব নিজেও তার চোখের জল সম্বরণ করতে পারে না।

নির্জন পথ, নিঃসঙ্গ, একা পথ চলতে গিয়ে তার

কান্না গেলো আরো বেড়ে। তবু মনটাকে শক্ত করে খোঁজে সে বাগান, সেই গাছতলাটা। অবশেষে সেই গাছতলায় পৌঁছনোর দিনেই আবার নতুন একটা বছর শুরু হলো, গতবছর ঠিক এই দিনটিতে সে এখানে এসে বসেছিল একটু আশ্রয় নেওয়ার জন্য, জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, ব্যবসার হিসেব-নিকেষ করার জন্য, সেদিন সে ভিনদেশে বাণিজ্য সেরে ফিরছিল। আর আজ? আজ সে এখানে এসেছে প্রাণ বিসর্জন দিতে, দৈত্যের কাছে দেওয়া কথা রাখতে। কথাগুলো ভাবতে গিয়ে তার দু'চোখের কোল বেয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়লো, কান্না যেন থামতে চায় না। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তবু সেই ঝাপসা চোখ নিয়ে সামনের দিকে তাকাতে গিয়ে সে দেখে, এক বৃদ্ধ শেখ শিকল বাঁধা একটা গজলা-হরিণ সঙ্গে নিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে সেই গাছতলায়।

কাছে এসে বৃদ্ধ শেখ তাকে সেলাম জানিয়ে তার দীর্ঘায়ু কামনা করে জিজ্ঞেস করলো, 'একা একা এই দৈত্য-দানবের জায়গায় কি কারণে আপনি বসে আছেন, জানতে পারি?'

আফ্রিদির দৈত্যের কাছে আসার কারণ সবিস্তারে বলে গেলো সওদাগর। বৃদ্ধ শেখ তার কথা শুনে তো থ। অবাক চোখে তাকিয়ে সে বলে, 'হায় আল্লা, এ আপনি কি বলছেন সওদাগর সাহেব? আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য একটা দৈত্যের কাছে ছুটে এসেছেন, নিশ্চিত প্রাণ যাওয়ার কথা জেনেও? এ যে কেউ বিশ্বাসও করবে না।' তারপর সওদাগরের পাশে বসে সে বলে, 'খোদা আপনাকে রক্ষা করুন। আপনি আমার ভায়ের মতো, আফ্রিদি দৈত্যটা আপনাকে নিয়ে কি করে, তা না দেখা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না।'

বৃদ্ধ শেখ সান্ত্বনার ছলে যতো ভরসাই দিল না কেন, সওদাগরের ভয় কিন্তু তবু যায় না। মৃত্যুর সময় যতো ঘনিয়ে আসে, ততোই সে ভয়ে কুঁকড়ে যেতে থাকে। সেই সময় সেখানে দ্বিতীয় আর এক বৃদ্ধ শেখের আবির্ভাব ঘটলো, তার সাথী কালো রঙের বেশ বড়-সড়ো দুটি গ্রেহাউণ্ড কুকুর। দ্বিতীয় শেখ তাদের সেলাম জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এই দৈত্যপুরীতে আপনাদের আগমনের হেতুটা কি জানতে পারি?'

তারপর তারা একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কাহিনী বললো দ্বিতীয় শেখকে। এবং সওদাগরের দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনে দ্বিতীয় শেখের অবাক হওয়ার রেশটা মিলতে না মিলতেই তৃতীয় শেখ হাজির হলো সেখানে এসে, সঙ্গে তার ছিলো একটি মাদী খচ্চর। সেলাম জানিয়ে সে তাদের সেখানে অবস্থানের কারণ জানতে চাইলে তারা তাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেই কাহিনী বলে গেলো। যথারীতি প্রথম ও দ্বিতীয় শেখের মতো তৃতীয় শেখও তাজ্জব বনে গেলো এবং সওদাগরের জীবনের শেষ অধ্যায়ের দৃশ্য দেখার জন্য থেকে গেলো তাদের সঙ্গে।

ঠিক সেই মূহূর্তে সেই জায়গার অনতি দূরে ঘূর্ণী-ঝড় উঠলো, চারিদিক ধুলো-বালিতে জায়গাটা কৃত্রিম এক অন্ধকারে ঢেকে গেলো। একটু পরে সেই ধুলো-বালির বিরাটকায় কুণ্ডলী সরে যেতেই সেই আফ্রিদি দৈত্যের চেহারাটা তাদের সবার সামনে ভেসে উঠতে দেখা গেলো। তার চোখ দুটো দিয়ে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছিল যেন মুখে হিস্ হিস্ শব্দ, তার হাতে আজও সেই শানিত তলোয়ারটা দেখা গেলো। তিনজন শেখের দৃষ্টি এড়িয়ে সওদাগরের সামনে গিয়ে হাজির হলো দৈত্যটা, তারপর চীৎকার করে বলে উঠলো, 'উঠে দাঁড়াও সওদাগর!' তার হাতের শানিত তলোয়ারের আস্ফালন প্রত্যক্ষ করলো শেখ তিনজন। ভয়ে তাদের বুক কেঁপে উঠলো। আফ্রিদি দৈত্য তার কথার জের টেনে বলতে থাকে, আমি তোমার গর্দান নিতে

চাই। তুমি আমার জানের কলজে প্রিয় পুত্রকে হত্যা করেছো, আজ তার প্রতিশোধ নিতে চাই আমি।'

সওদাগর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার শানিত তলোয়ারের নিচে গিয়ে দাঁড়ায়, চোখ ভর্তি জল। তার নবাগত দোস্ত তিন শেখ তখন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখে ডুকরে কেঁদে উঠে এ ওর দিকে তাকালো। চোখের ইশারায় তারা তাদের ইতি-কর্তব্য স্থির করে নিলো। আপাততঃ প্রথম শেখ, যার হাতে শিকল লাগানো গজলা-হরিণ, দৈত্যটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাতের উপর চুম্বন এঁকে দিয়ে আবেগ জড়ানো স্বরে বললো, 'হে দৈত্য-সম্রাট আমি তোমাকে আমার আর এই গজলা-হরিণের কাহিনী শোনাবো, শুনে যদি তোমার দিল খুশ হয়, তাহলে এই হতভাগ্য সওদাগরের গুস্তাকীর তিন ভাগের এক ভাগ মাফ করে দিও, এই আমার গল্প বলার শর্ত। সেই গল্পটা শুনতে তুমি রাজী আছো?'

শেখের কথায় মন ভরলো বোধহয় দৈত্যটার। সে তার উদ্যত শানিত তলোয়ারটা মাটিতে নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো, 'ঠিক আছে, তোমার গল্প শুনে আমার মন যদি ভরে তাহলে আমি এই সওদা-গরের তিন-ভাগ প্রাণের এক ভাগ আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেবো। তুমি তোমার গল্প শোনাতে পারো, তবে জলদি বলবে।' অতঃপর প্রথম শেখ তার গল্প শুরু করলো:

প্রথম শেখের কাহিনী



জানো দৈত্য সম্রাট, আমার সঙ্গে এই যে গজলা-হরিণটা দেখতে পাচ্ছো, এ কে জানো? এ আমার চাচার মেয়ে, আমি ওকে শাদী করি ভালোবেসে। তিরিশটা বছর ওর সঙ্গে ঘর করি আমি, ও আমার দেহের ক্ষুধা মেটালেও একটিও পুত্র-সন্তান উপহার দিতে পারেনি তিরিশ বছরের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে। তাই আমি আমার বংশ রক্ষার জন্য এক সুন্দরী কুমারী ক্রীতদাসীকে আমার উপপত্নী হিসাবে গ্রহণ করি, আমাদের কোরাণে এর স্বীকৃতি আছে। যথা সময়ে সে আমাকে সুন্দর ফুটফুটে একটি শিশুপুত্র উপহার দেয়, আমার কলেজে, আমার প্রাণের বাছা, চাঁদের মতো যার মুখ, যার চোখ দুটি ছিলো আকাশের তারার মতো উজ্জ্বল, ভাস্কর। দিনে দিনে বাড়তে থাকে আমার কলজে, তারপর সে যখন পনেরো বছরের কিশোর, আমাকে তখন বাণিজ্যের প্রয়োজনে দেশ-ভ্রমণে বেরোতে হয়। কিন্তু ওদিকে আমার চাচার মেয়ে (এই গজলা-হরিণটি) ছোটবেলা থেকে যাদুবিদ্যায় দারুণ ক্ষমতা ছিলো। আমার গর-হাজিরে ও করলো কি জানো, ও ওর সেই যাদুবিদ্যা দিয়ে আমার একমাত্র কলজেকে একটা বাছুরে পরিণত করলো, আর আমার উপপত্নী ক্রীতদাসীকে (তার মা) বখনা-বাছুরে পরিণত করে পশুপালকের হাতে তুলে দেয় তাদের দেখা-শোনা করার জন্য। তারপর বিদেশ ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরে এলে পর আমি তাকে আমার ছেলে ও তার মায়ের খোঁজ করলে ও বলে, সেই ক্রীতদাসী মারা গেছে, আর তোমার ছেলে

পালিয়ে গেছে, জানি না সে এখন বেঁচে আছে কিনা।'

তারপর ওদের হারানোর দুঃখ নিয়ে আমাকে প্রায় একটা বছর কাটাতে হলো, তারপর একদিন সেই খোদা আল্লার উৎসবের পবিত্র দিনটি এলো, বক্রীঈদ, কুরবানের উৎসব। আমি আমার পশু-পালককে হুকুম করলাম কোরবানির জন্য একটা মোটাসোটা বখনা-বাছুর সংগ্রহ করে আনার জন্য। তারপর যে বখনা-বাছুরটিকে ধরে নিয়ে এলো, সে আর কেউ নয়, আমার সেই উপপত্নী সুন্দরী ক্রীতদাসী, আমার একমাত্র পুত্রের মা, তবে সেকথা তখনো আমার জানা হয়নি এই গজলা-হরিণ ওর যাদুবিদ্যায় তাকে এভাবে বশ করেছিল আমার অনুপস্থিতিতে। যাইহোক, হাতের আস্তিন গুটিয়ে ধারালো ছুরি হাতে সেই বখনা-বাছুরটাকে কোরবানি করার জন্য তার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, বাছুরটা আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লো, তার চোখ ভর্তি জল, যেন সে মিনতি জানাতে চায়, তাকে যেন আমি রেহাই দিই, বাঁচতে চায় সে। তার অমন করুণ অবস্থা দেখে আমার তখন খুব মায়া হলো। পশুপালককে কাছে গিয়ে বললাম, 'অন্য আর একটা বাছুর নিয়ে এসো।' আমার সেই কথা শুনে আমার চাচার মেয়ে চীৎকার করে বলে উঠলো, 'না, না ঐ বাছুরটাকেই জবাই করো ঐ রকম না মোটা, না রোগা বাছুরই আমার পছন্দ। ওকেই তুমি জবাব করো।' তাকে জবাই করার জন্য আবার আমি সেই বাছুরটার দিকে এগিয়ে যাই ছুরি হাতে। কিন্তু আগের মতো আবার বুক ফাটা চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। তখন আমি ছুরিটা আমার পশুপালকদের হাতে তুলে দিলাম তাকে জবাই করার জন্য।

পশুপালক তাকে জবাই করে তার ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে ফেলতেই দেখা গেলো তার দেহে না আছে চর্বি, না আছে মাংস। জীর্ণ-শীর্ণ চেহারায় কয়েকখানি হাড় ছাড়া কিছুই মিললো না। তখন আমি আমার পশুপালককে ডেকে বললাম, 'অন্য আর একটা হৃষ্টপুষ্ট বাছুর ধরে নিয়ে এসো।' এবার সে আমার নাদুস-নুদুস বাছুর-বেশী ছেলেকে ধরে নিয়ে এলো, চাচার মেয়ে তাকে যাদুবিদ্যায় বশ করে বাছুর বানিয়ে দিয়েছিল। আমাকে দেখে বাছুরটা আমার পায়ের ওপর আছড়ে লুটোপুটি খেতে থাকে আর



তার দুচোখের কোল বেয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে যায়। বেশ বুঝতে পারি, সে আমার করুণা চায় প্রাণ ভিক্ষা চায় আমার কাছ থেকে। তাই আমি পশুপালককে ডেকে বললাম, 'আমার জন্য অন্য আর একটা বখনা-বাছুর জোগাড় করে নিয়ে এসো, আর এই বাছুরটাকে যেখান থেকে নিয়ে এসেছিলে রেখে এসো সেখানে।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার চাচার মেয়ে (এই গজলা-হরিণটা) চীৎকার করে আমাকে বলে উঠলো, 'এই বাছুরটাকেই জবাই করতে হবে তোমাকে, আজ এই পবিত্র দিনে একে ফিরিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না, খোদা মেহেরবান আমাদের ওপর রুষ্ট হতে পারেন। তাছাড়া আমার মনে হয় না, এখন অন্য কোন বখনা-বাছুর হাতের কাছে পাওয়া যাবে।'

কিন্তু তোমার কথায় আগের ঐ অনিচ্ছুক বখনা-বাছুরটাকে জবাই করে যে ভুল করেছি তার ঐ হাড়-সর্বস্ব দেহটা দেখেই তো বুঝতে পারছো। তাই এবার আর তোমার কথা আমি শুনছি না।

'আজ এই পবিত্র দিনে খোদা মেহেরবানকে তুমি সন্তুষ্ট করবে না তাহলে? ঐ বাছুরটাকে কোরবানি না করলে আমি আর তোমার বিবি থাকছি না, এ আমি সাফ জানিয়ে দিলাম।'

চাচার মেয়ের মুখ থেকে সেই কঠিন কথা শুনে আমি আমার মত বদলালাম, তখন তার মনের আসলি মতলবের কথা না জেনেই আমি ছুরি হাতে আমি সেই বাছুটার দিকে এগিয়ে যাই—

এই পর্যন্ত বলে শাহারাজাদ থামলো ভোরের আলো ফুটে উঠতে দেখে। এদিকে দুনিয়াজাদ তার দিদির মুখ থেকে গল্প শুনে দারুণ মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে বলে, 'কি সুন্দর তোমার গল্প দিদি, কি মিষ্টি, কি রোমাঞ্চকর গল্প তুমি শোনাতে পারো। তারপর, তারপর কি হলো সেই বাছুরটার, বলো দিদি!'

'এর থেকেও আরো আকর্ষণীয় গল্প তো বলাই হয়নি এখনো, সেটা শুনতে হলে তোমাকে আগামী রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বোন', শাহারাজাদ ম্লান হেসে বলে, 'অবশ্য আমি যদি বেঁচে থাকি, আর জাঁহাপনা যদি অনুমতি দেন তবেই!'

দুই বোনের কথাবার্তা কানে আসে বাদশাহের, নিজের মনে তিনি বলেন, 'খোদা আল্লা, আমি ওকে কোতল করবো না, গল্পের শেষটুকু না শোনা পর্যন্ত ওকে আমি বাঁচিয়ে রাখবো।' তারপর তারা বাকী রাতটুকু গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লো একেবারে সকাল না হওয়া পর্যন্ত।

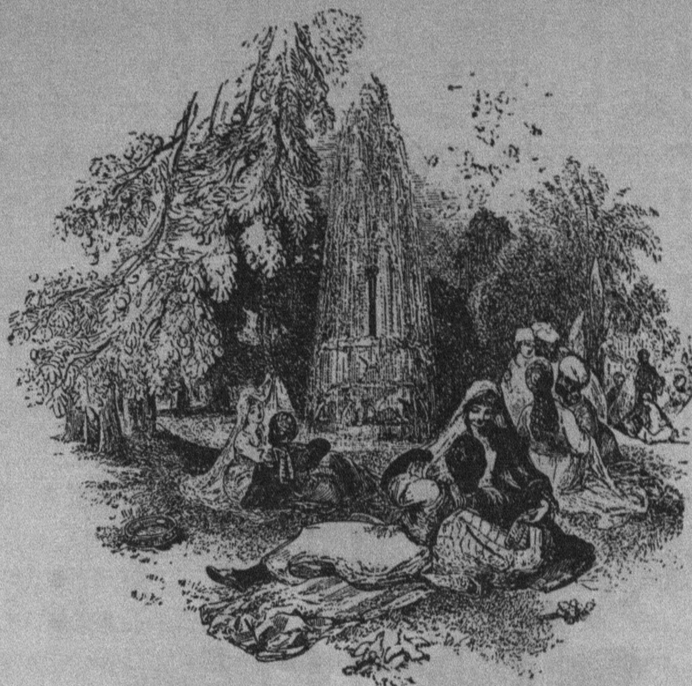
তারপর প্রভাতের আলোয় আমির ওমরাহদের সঙ্গে নিয়ে বাদশাহ শাহরিয়ার এসে উপস্থিত হলেন তাঁর রাজদরবারে। উজিরও এলো, হাতে তার কন্যার মৃতদেহ ঢাকবার জন্য কালো পোষাক। মনে মনে তৈরী হয়ে এসেছিল, তার আদরের কন্যার মরা মুখ দেখবে বলে। রোজকার রুটিন মাফিক বাদশাহ নানান ঘোষণাপত্রে সই করলেন, কিন্তু উজিরের কন্যার মৃত্যুর কথা একবারও ঘোষণা করলেন না। উজিরকে তিনি জানালেন, এতোদিন যা ঘটে এসেছে তার এক কণাও কিছু ঘটেনি। গভীর বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে উজির। তাহলে, তার কন্যা এখনো বেঁচে আছে? কি আশ্চর্য। কোন্ যাদুবলে তার মেয়ে বেঁচে রইলো? এক সময় রাজ-দরবারের কাজ কর্ম শেষ করে বাদশাহ শাহরিয়ার ফিরে গেলেন তাঁর প্রাসাদে।

দুনিয়াজাদ তার দিদি শাহরাজাদকে শুধোয়, 'কই দিদি, সওদাগর ও দৈত্যের গল্পের বাকীটুকু এবার শেষ করো!'

'বলার জন্য আমি তো তৈরী বোন, অবশ্য জাঁহাপনা যদি অনুমতি দেন তো আবার শুরু করতে পারি।'

ওদিকে বাদশাহেরও গল্পের বাকী অংশটুকু শোনার জন্য মনে মনে খুব ইচ্ছে, তাই কাল বিলম্ব না করে তিনি ফরমাস করলেন, 'হ্যাঁ তোমার গল্প শুরু করতে পারো তুমি।'

বাদশাহের অনুমতি পেয়ে শাহারাজাদ বলতে শুরু করলো এই ভাবে: 'জাঁহাপনা, আপনি আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এবং বেহস্তের শাসক. আজ এই দ্বিতীয় রজনীতেও আমি যে আপনাকে গল্প শোনাতে পারছি, এ আমাদের খোদা আল্লার কৃপা বই আর কিছু নয়। আমি শুনেছি, হ্যাঁ যা বল-




F. WILLIAMS





ছিলাম, সওদাগর তার পুত্ররূপী বাছুরটাকে কোরবানী করতে গেলে সে দেখলো বাছুরটা কাঁদছে, টপটপ করে তার দু'চোখের কোল বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। তার সেই কান্না দেখে সওদাগরের বুকটা কেমন হাহাকার করে উঠলো, যেন সত্যি সত্যি নিজের পুত্রকে কোরবানী করতে গিয়ে বুকে ব্যথা পাওয়া, কিন্তু তখনো তিনি জানেন না, ঐ বাছুরটা সত্যি তার একমাত্র পুত্র, তার উপপত্নী ক্রীতদাসীর পুত্র, যে পুত্রের মাকে সে একটু আগে কোরবানী করিয়েছে। তবে কি ভেবে এবার বাছুরটাকে কোরবানী করার কথা শিকেয় তুলে দিয়ে তার পশুপালককে বললো, 'এক কাজ করো, বাছুরটাকে আমার গোয়ালঘরে রেখে এসো।'

প্রথম শেখের মুখ থেকে এমন রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে শুনতে আফ্রিদি দৈত্য তো দারুণ মুগ্ধ, তার মুখে রা নেই, কান খাড়া করে শুনতে থাকে প্রথম শেখের মুখের দিকে তাকিয়ে। তারপর সেই গজলা-হরিণীর মালিক আবার বলতে শুরু করে তার কাহিনী, 'হে দৈত্য সম্রাট, আমার চাচার মেয়ে এই গজলা-হরিণী আমার ইচ্ছের কথা শুনে আব্দার করে বসলো, 'তা হবে না, এই বাছুরটাকেই আজকের এই পবিত্র দিনে কোরবানী করতে হবে, দেখছো না ওটা কেমন নাদুস-নুদুস, ওর সারা দেহে মাংসের ছড়াছড়ি, খোদা আল্লা খুব খুশি হবেন।'

কিন্তু এবার আমি আমার চাচার মেয়েকে খুশি করতে পারলাম না, পশুপালককে হুকুম করলাম, বাছুরটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, এবং সে আমার হুকুম তামিল করলো সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরমুখী হয়ে।

পরদিন আমি আমার বাড়িতে বসে আছি, এমন সময় পশুপালক আমার সামনে হাজির হয়ে আমাকে আদাব জানিয়ে বললো, হুজুর, আমি আপনাকে এমন একটা মজাদার খবর দেবো, যা আপনার দিলখুশ হয়ে যাবে, আপনি আমাকে পুরস্কৃত না করে থাকতে পারবেন না।'

'তাই নাকি?'

প্রত্যুত্তরে সে বলে, 'জানেন হুজুর, এক সময় আমাদের বাড়িতে একটা বুড়ী থাকতো, তাকে আপনি ডাইনীও মনে করতে পারেন, যাদুবিদ্যায় ভয়ঙ্করী ছিলো সে। তার কাছ থেকেই ছেলেবেলায় আমার লেড়কী যাদুবিদ্যা শেখে। গতকাল আপনি তো আমাকে বাছুরটাকে আপনার গোয়ালঘরে রেখে আসতে বললেন, আমি তা না করে বাছুরটাকে সোজা আমার বাসায় নিয়ে গেলাম। তা সেই বাছুরটাকে দেখা মাত্র আমার লেড়কী বোরখা টেনে দেয় নিজের মুখের উপরে, তারপর সে কাঁদলো ও হাসলো, এবং অবশেষে মুখ খুললো, 'বাপজান, তুমি কি তোমার মেয়ের লজ্জা-শরমের কোন দাম দিতে চাও না?'

'কেন বেটী এ কথা বলছ কেন বল তো? বাছুরটাকে তোর সামনে এনেছি বলে কি আমার গুণাহ হয়েছে?' আমি আমার লেড়কীকে জিজ্ঞেস করলাম সঙ্গে সঙ্গে।

আমার লেড়কী তখন বাছুরটার দিকে তাকিয়ে কখনো হাসছে, আবার কখনো যা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে। 'তোমার ঘরে একজন সমর্থ মেয়ে রয়েছে, আর তার সামনে তুমি একজন জোয়ান পুরুষকে ঘরে এনে তুললে বাপজান? এটাই তো তোমার মস্ত বড় গুণাহ!'

'সেকি?' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমায়, কোথায় সেই জোয়ান পুরুষ? আর তুমি অমন করে একবার হাসলে, আবার কাঁদলেই বা কেন বেটী?'

'ঐ যে তুমি বাছুরটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছো, আসলে ও আমাদের মালিক সওদাগরের লেড়কা বাপজান। ওর সৎমা যাদুবিদ্যায় ওকে বাছুর করে দিয়েছে দেখে আমি আমার হাসি চাপতে পারিনি প্রথমে। ওর সৎমা একজন ডাইনী, ওর নিজের মাকেও সৎমা যাদুবিদ্যায় গাই গরু করে দেয়, যাকে

ঐ ছেলেটির বাপজান কোরবানী করিয়েছে, ওর মায়ের দুঃখে আমি আমার চোখের জল ঠেকিয়ে রাখতে পারিনি তাই আমি কেঁদেছি।'

'জানো দৈত্য সম্রাট' প্রথম শেখ আফ্রিদির দৈত্যকে সম্বোধন করে বলতে থাকে, 'পশুপালকের মুখে সেই শুভ খবরটা শোনার পর সত্যি আমার দিল খুব খুশ হয়ে যায়। কেন বুঝতে পারি, আমার জীবনের অন্ধকার রাত্রি শেষ হয়ে গিয়ে ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। তখনি আমি আমার পশুপালককে সঙ্গে নিয়ে তার ডেরায় ছুটলাম কাঁপা কাঁপা পায়ে। শরাব না পিয়েও আমার পা দুটো তখন অসম্ভব টলছিল আশা আর আনন্দের ভয়ঙ্কর উত্তেজনায় তার ডেরায় না পৌঁছনো পর্যন্ত আমার পায়ের সেই কাঁপুনি থামেনি।'

সেখানে পশুপালকের লেড়কী আমার হাতে চুম্বন দিয়ে আমাকে খুব খাতির যত্ন করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বাছুরটা ছুটে এসে আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লো আগের দিনের মতো।

পশুপালকের লেড়কীকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এই বাছুরটার সম্বন্ধে তুমি যা বলছো সত্যি?'

'জি হুজুর, ও আপনারই লেড়কা আছে, আপনার কলজে।'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে বললাম, 'তুমি যদি তোমার যাদুবিদ্যার বলে ঐ বাছুরটাকে আবার আমার ছেলেতে পরিণত করে দাও, তাহলে পুরস্কার স্বরূপ আমি আমার গোয়াল-ঘরের সমস্ত গৃহপালিত পশু তোমার বাবার হাতে তুলে দেবো।'

মেয়েটি হাসলো, রহস্যময় সেই হাসি। হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে সে বললো, 'হুজুর, টাকাকড়ি কিংবা কোন মূল্যবান জিনিষপত্রের ওপর আমার লোভ নেই, তবে দুটি শর্তে আমি আপনার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারি মানুষরূপে আবার।' মেয়েটি বলে, 'আমার প্রথম শর্ত হলো, আমার সঙ্গে আপনার ছেলের শাদী দিতে হবে, আর আমার দ্বিতীয় শর্ত হলো, আপনার ঐ ডাইনী বিবি আপনার ছেলের সৎমাকে আমার যাদুবিদ্যা দিয়ে জানোয়ারে পরিণত করার অনুমতি আমাকে দিতে হবে, কিংবা তাকে কোথাও বন্দিনী করে রাখতে হবে, কারণ তা না করলে তার অশুভ কামনার হাত থেকে আমরা রেহাই পেতে পারবো না।'

'জানো দৈত্য সম্রাট', প্রথম শেখ বলতে থাকে, 'পশুপালকের মেয়ের কথা শুনে আমি তো তখন দিশেহারা আনন্দের অতিশয্যে। সঙ্গে সঙ্গে আমি তার শর্তে রাজী হয়ে গিয়ে বললাম, 'তুমি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও বেটী, আমার ছেলের সঙ্গে তোমার শাদীর পর তুমি আমার চাচার মেয়েকে যা খুশি বানাতে পারো, আমি তোমাকে কথা দিলাম, এবার তুমি তোমার কাজে নেমে পড়ো।'

আমার কাছ থেকে সাড়া পেয়ে মেয়েটি করলো কি জানো দৈত্য সম্রাট, এক পেয়ালা পানির ওপর বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে সেই মন্ত্রপুতঃ পানি বাছুরটার গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে সে বলতে থাকে, 'খোদা আল্লা যদি তোমাকে বাছুর বানিয়ে থাকে তাহলে তুমি বাছুর হয়ে থাকবে, আর কোন ডাইনী যদি তার হিংসের বশে তোমাকে বাছুর বানিয়ে থাকে, তাহলে তুমি মানুষের রূপ ধারণ করো আবার খোদার দোয়ায়।' মেয়েটির মন্ত্র পড়া শেষ হতে না হতেই বাছুরটা কাঁপতে কাঁপতে একটা জলজ্যান্ত মানুষে পরিণত হয়ে গেলো চোখের নিমেষে। আমার তখন মনের অবস্থা যে কি রকম, তা দৈত্য সম্রাট, তোমার নিশ্চয়ই মালুম হচ্ছে। কতদিন, কতদিন আমি আমার কলজের মুখ দেখিনি। দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, 'খোদা আল্লা আবার তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন, এখন বলো কি ভাবে আমার চাচার মেয়ে তোমাকে আর তোমার মার অমন দশা করেছিল বলো।'

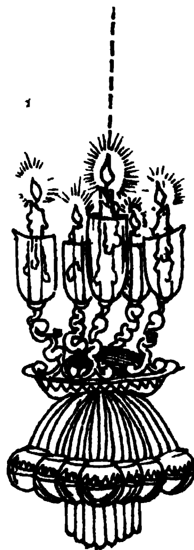
আমার অনুপস্থিতিতে সৎমা ও তার মাকে যাদু-বিত্তায় কিভাবে বাছুর এবং গাই গরুতে পরিণত করেছিল তার বর্ণনা দিলো আমার ছেলে সবিস্তারে।

'খোদা মেহেরবানের দোয়ায় তুমি আবার মানুষ হয়ে ফিরে এসেছো আমার কাছে, আর সেটা সম্ভব হয়েছে ঐ বেটীর জন্য', বলে আমি তাকালাম পশুপালকের মেয়ের দিকে। সে তখন আমার ছেলের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসছিল। 'জানো দৈত্য সম্রাট, পশুপালকের বেটীকে আমি ওয়াদা করেছিলাম আমার ছেলের সঙ্গে তার শাদী দেবো! সেই মতো সেদিনই আমার ছেলের সঙ্গে তার শাদী দিয়ে আমার বাড়িতে নিয়ে গেলাম। আর সে আমার বিবিকে তার যাদুমন্ত্রে এই গজলা-হরিণী বানিয়ে দিয়ে বলে, 'তার এই রূপ চিরদিনের জন্য, কেউ তাকে তার আগের মানবী রূপে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তারপর থেকে রাত দিন এই গজলা-হরিণী আমার সাথী হয়ে আছে, এই ভাবেই সে থাকবে যতক্ষণ না খোদা মেহেরবান তাকে ডেকে নেন। তারপর থেকে আমার ছেলে-বৌ মনের সুখে ঘর সংসার করছে, দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আমি আমার চাচার মেয়ে এই গজলা-হরিণীকে সাকী করে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে তোমাদের রাজ্যে এসে দেখি, এই গাছতলায় বসে এই সওদাগর চোখের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এই হলো আমার কাহিনী। এখন বলো দৈত্য সম্রাট আমার এই কাহিনী কেমন লাগলো তোমার?'

'চমৎকার! সত্যি চমৎকার তোমার কাহিনী, আরো চমৎকার তোমার বলার ভঙ্গী। আমি মুগ্ধ। অতএব ঐ সওদাগরের গুনাহের তিন ভাগের এক ভাগ মাফ করে দিলাম।'

তারপর দ্বিতীয় শেখ সঙ্গে দুটি গ্রেহাউণ্ড কুকুর নিয়ে সেই দৈত্যটার সামনে এগিয়ে এলো। 'শোনো দৈত্য সম্রাট, আমার দুই ভাই, এই দুটি গ্রেহাউণ্ডের কাহিনী যদি শোনো, তাহলে বুঝবে, আমার কাহিনী আরো বেশী মজাদার, আরো বেশী বিস্ময়কর। এ কাহিনী তোমার শোনা আছে বলে আমার মনে হয় না। তুমি একজন সমজদার আদমী, ভালো লাগলে বেচারী সওদাগরের তিন ভাগ গুনাহের এক এক ভাগ তোমাকে মাফ করে দিতে হবে, এই আমার শরত্।'

উত্তরে দৈত্য বলল, 'বহুত আচ্ছা, আমি ওয়াদা করছি, তোমার কাহিনী যদি সত্যি আমার ভালো লাগে, তোমার শরত্ মানতে আমি রাজী।' অতঃপর—



দ্বিতীয় শেখের কাহিনী



শোনো দৈত্য সম্রাট-দের শ্রেষ্ঠ, আমার সঙ্গে এই যে দুটি গ্রেহাউণ্ড দেখছো, এরা জানোয়ার নয়, আসলে এরা আমার বড় দুই ভাই, আমি সবার ছোট। আমাদের বাপ-জান মারা যাওয়ার সময় তিন হাজার স্বর্ণ মুদ্রা রেখে যান, আমি আমার অংশের এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে একটা দোকান খুলি, কেনা বেচার কারবার। আমার মতো দাদার ও যে যার দোকান খুলে বসলো। কিন্তু আমার বড় ভাই হঠাৎ এক দিন সে তার দোকানের সব মালপত্র মাত্র এক হাজার দিনারে বিক্রী বাটা সেরে পরপর নতুন মালপত্র কিনে বেরিয়ে পড়লে বানিজ্য করতে বিদেশে দল বেঁধে। পুরো একটা বছর সে দেশের বাইরে রইলো। কিন্তু একদিন আমি আমার দোকানে বসে আছি, একজন ভিখারী আমার সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইলো। আমি তাকে বললাম, 'আল্লা তোমার জন্যে অন্য দরজা খুলে রেখেছেন, আমাকে মাফ করো।'

আমি তাকে ঠিক চিনতে পারিনি। কাঁদতে কাঁদতে সে বললো আমি কি এতই বদলে গেছি যে, তুমি আমাকে চিনতেই পারলে না।'

এবার আমি তার দিকে ভালো করে তাকাতে গিয়ে তাকে চিনতে পারলাম, সে আমার বড় ভাই। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর আমার দোকানে তাকে বসিয়ে তার সেই দুরাবস্থার কারণ জানতে চাইলাম।

'আর বলো কেন ভাই', উত্তরে সে বলে, 'ব্যবসায় সর্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখারী হয়ে দেশে ফিরে এসেছি।'

হ্যাঁ, ভিখারীর মতোই অবস্থা তার তখন, পরনের পোষাক শত-ছিন্ন, হয়তো অনেকদিন গায়ে পানি পরেনি বলে রুক্ষ চেহারা, উস্কো-খুসকো চুল। বাথরুমে নিয়ে গিয়ে তাকে গোসল করালাম। তারপর তাকে আমার পোষাক পড়িয়ে আমার বাড়িতে থাকার জন্য নিয়ে গেলাম।

আমার ব্যবসা তখন বেশ ভালোই চলছিল। হিসেব করে দেখলাম, এক হাজার দিনার লাভ হয়েছে, আমার মূলধন তখন প্রায় দ্বিগুণ। আমার সব অর্থ ভাগাভাগি করে তাকে বললাম, 'তোমার এখন আর বিদেশে গিয়ে বানিজ্য করতে হবে না, দেশেই থাকো আপাততঃ, আর নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য অনুতাপ করো না এখন।' দারুণ খুশি হয়ে সে আমার সঞ্চিত অর্থের অর্ধেক ভাগ নিলো। এবং সেই অর্থে সে তার নিজস্ব একটা দোকান দিলো এবং কয়েক রাত ও কয়েকদিন বেশ শান্তিতে কাটলো। কিন্তু আমার আর এক দাদা আমাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে অন্য আরো সওদাগরদের দলে পড়ে দেশান্তরে বেরিয়ে পড়লো বানিজ্য করতে স্বদেশের দোকান পাট তুলে দিয়ে। তারপর বছর খানেক পরে বড় ভায়ের মতোই সর্বস্ব খুইয়ে ভিখারীর বেশে ফিরলো দেশে। তার অমন দুরাবস্থা দেখে আমি তাকে ধিক্কার দিয়ে বললাম,

'কেন, বিদেশে যাওয়ার আগে আমি তোমাকে মানা করিনি ?'

চোখ ভর্তি জল নিয়ে উত্তর দিলো সে, 'এ আমার অদৃষ্টের পরিহাস ভাই,সবই ললাটের লিখন, খণ্ডাবে কে ? এখন আমি ভিখারী ছাড়া আর কিছু নই, একটা আস্ত জামা গায়ে দেওয়ার সঙ্গতিও আমার নেই, কপর্দকশূন্য ভিখারী আমি এখন।'

তার কথা শুনে আমার ভীষণ মায়া হলো, ভালো করে তাকে গোসল করিয়ে আমার পোষাক পরিয়ে আমার দোকানে নিয়ে গেলাম তাকে এবং সেখানে তাকে মাংস ও সরাব খাওয়ালাম। তাছাড়া তাকে বললাম, 'ছাখো দাদা, মেহেরবানের দোয়ায় আমার ব্যবসা এখন রমরমা, বেশ কিছু লাভের বাড়তি অর্থ জমে গেছে, তার ভাগ আমি তোমাকে দিতে চাই। আমি চাই আমার কাছে উদ্বৃত্ত অর্থের কিছু অংশ নিয়ে আবার তুমি আগের মতো দোকান দাও, ব্যবসা শুরু করো।'

জানো, আফ্রিদি, তারপর আমি আমার ব্যবসার হিসেব নিকেষ করে দেখলাম, দু'হাজার লাভ হয়েছে খোদা আল্লার দোয়ায়। লাভের অর্ধেক সেই দাদাকে দিলাম। আমার সেই লাভের অর্থে সে আবার নতুন করে দোকান সাজালো। বেচা-কেনা তার বেশ ভালোই হল কিছুদিন। কিন্তু নিরুদ্বেগ জীবন-যাপন বোধহয় তাদের না-পসন্দ। অল্পে সন্তুষ্ট নয় তারা। তারা খোয়াব দেখতে চায় আবার। একদিন দুই ভাই আমার কাছে এসে আব্দার করলো সেই পুরানা বাহানা, বিদেশে বানিজ্যে যেতে চায়। কিন্তু আমি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বললাম, 'বিদেশে ব্যবসা করতে গিয়ে তোমাদের হালও তো আমি নিজের চোখে দেখেছি, তাতেই আমার অনেক লাভ হয়েছে। তাই বিদেশে গিয়ে বেশী লাভ আমি করতে চাই না।'

আমি তাদের কথায় কান না দেওয়াতে তারা যে যার দোকানে ফিরে গিয়ে আবার কেনা-বেচা শুরু করলো আগের মতো। তবে পরদেশী বানিজ্যের হাল তারা একেবারে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলো না। একটা বছর ধরে তারা দুজন আমাকে কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করলো, চলো দেশের বাইরে গিয়ে বানিজ্য করে আসি, তাতে বহুত মুনাফা লোটা যাবে। কিন্তু তখনো আমি তাদের কথায় সায় দিইনি। এইভাবে দু' দুটা বছর আমি তাদের ফিরিয়ে দিয়েছি। তারপর একদিন আমি নিজের থেকেই তাদের বললাম, 'ছাখো ভাই, এখন আমি বিদেশ ভ্রমণে তোমাদের সঙ্গী হতে পারি। কিন্তু পরদেশে ব্যবসা করতে হলে তো অনেক টাকার দরকার। এখন বলো, তোমরা তোমাদের ব্যবসা থেকে কে কতো জমিয়েছো বলো ?'



যাইহোক, দেখা গেলো, তাদের হাতে এক

কানা-কড়িও অবশিষ্ট নেই। সরাব খেয়ে আর নারী সঙ্গ দোষে ব্যবসার মূলধন সমেত লাভের সব টাকা এরই মধ্যে খরচ করে বসে আছে তারা। তবু তাদের ওপর রাগ করলাম না, কিংবা একটা কথাও বললাম না। বরং আমি আমার দোকানের হিসাবপত্র দেখলাম, দোকানের সমস্ত মালপত্র বিক্রী করে দেখলাম আমার হাতে এসেছে ছ'হাজার স্বর্ণমুদ্রা। খুশি হয়ে বিদেশের যাওয়ার আগে দাদাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম একদিন। ঠিক করলাম তিন-হাজার স্বর্ণমুদ্রা আমাদের তিনজনের ব্যবসার প্রয়োজনে সঙ্গে নিয়ে যাবো, আর বাকী তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা মাটির নিচে কোথাও পুঁতে রেখে যাবো। বলা যায় না, বিদেশে বাণিজ্য করতে গিয়ে যদি লোকসান দিয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়। তখন দেশে ফিরে এই তিনহাজার স্বর্ণমুদ্রা তিন ভাই এক হাজার করে ভাগ করে নিয়ে নতুন করে নিয়ে নতুন করে আবার দোকান সাজাবো।

'তোবা, তোবা', বলে তারা হাততালি দিয়ে আমার আমার প্রস্তাব সমর্থন করলো। তিনহাজার স্বর্ণমুদ্রা তিন ভায়ে এক হাজার করে ভাগ করে নিয়ে যে যার পছন্দমতো বাণিজ্যের মালপত্র কিনতে শুরু করে দিলাম। তারপব একদিন একটা নৌকো ভাড়া করে বিদেশে সওদা কবতে বেরিয়ে পড়লাম আল্লার নাম নিয়ে।

'তারপর একমাস পরে একটা শহরে আমরা নোঙর করলাম। সেখানে বেশ ভালোই সওদা হলো, এক একটা স্বর্ণমুদ্রার জিনিষ সেখানে বিক্রী করলাম দশগুণ দামে। অন্য শহরে যাওয়ার জন্য ফিরে নৌকোয় আবাব পাল তুলতে যাবো, সেই সময় হঠাৎ সেখানে এক সুন্দরী যুবতী এসে হাজির হলো। তার পরনে ছেঁড়া, ময়লা পোষাক, লজ্জা ঢাকার সেকি ব্যর্থ চেষ্টা, তবে তার মধ্যেও যুবতীর রূপ আর যৌবন কিন্তু চাপা থাকে না, চোখ ধাঁধানো রূপ আমার চোখে এক ভয়ঙ্কর বিস্ময় বলেই মনে হলো। এতো যার রূপ, খোদা আল্লা অকৃপণ হাতে যার দেহে যৌবনের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, তার কেন এই ভিখারীর অবস্থা। এ মেয়ে তো যে কোন গেরস্থের ঘরে কেন উজির, আমির, ওমরাহের ঘরের খাস বিবি হওয়ার যোগ্যা। মেয়েটি কাছে এসে আমার হাতে চুমু খেয়ে বলে, 'ছোট মালিক. তুমি আমাকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে সাহায্য করবে?' তার বিনিময়ে আমি তোমার যে কোন কাজ করতে রাজী আছি। আশাকরি আমার কাজ দেখে তুমি খুশি হবে। তোমার দোয়া মার যাবে না। আমি আমার সাধ্য মতো তোমার উপকারে আসবো। আমাকে তোমার নৌকায় আশ্রয় দিয়ে পরখ করে দেখবে ছোটো মালিক? দেখোই না একবার!'

'ও কথা বলছো কেন সুন্দরী?' আমি তাকে বললাম, 'তোমাকে আমি সাহায্য করলেও তার বদলা হিসেবে আমি তোমার কাছ থেকে কোন কাজ আদায় করে নিতে চাই না।' মেয়েটিকে প্রথম দেখা মাত্র কেমন যেন আমার ভালো লেগে গিয়ে-ছিল, আমার বুক ভরে গিয়েছিল বেহস্তের পরীর মতো ওর অমন রূপ আর যৌবন দেখে।

মেয়েটি বোধহয় আমার দিলের খবর আন্দাজ করে থাকবে। মৃদুভাবে ও বলে, 'তা ছোটা মালিক, তোমার যখন অতোই দোয়া, আমাকে শাদী করে তোমার বিবি করে নাও না কেন তাহলে। তারপর তোমার দেশে নিয়ে চলো। আমি তোমার, শুধু তোমারি হয়ে আমার বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবো, আমি তোমার বার্ধক্যের সাথী হয়ে তোমার দেখা-শোনা করবো, তোমার ঘর-গৃহস্থলীর কাজ করবো। এতেও যদি তোমার মন না ভরে, আমাকে যদি তোমার বিবির খেতাব দিতে না চাও, বেশ তো তোমার ক্রীতদাসী করেও তো তোমার দেশে আমাকে নিয়ে যেতে পারো, কেন পারো না ছোটা মালিক!'

মেয়েটির সুন্দর সুন্দর আবেগ ভরা কথা শুনতে শুনতে আমার মনটা কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছিল তখন,

ওর আকর্ষণবোধ, ওর রূপ-যৌবন আমার মনে তখন প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিল। সেই ঝড়ে আমার পদস্খলন হলো। দু'হাত বাড়িয়ে ওকে পাঁজা-কোলো করে আমার নৌকায় তুললাম। ওর চিঁড়িয়ার মতো নরম বুক আমার বলিষ্ঠ বুকের চাপে পড়ে যেন পিষে গেলো। কিন্তু ওর মুখের ভাব-দেখে কোন কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হলো না, বরং ওর দু'ঠোঁটের ফাঁকে একটা নিটোল সুখ-তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম। আশ্চর্য সুন্দর ওর হাসি, মুগ্ধ করা চোখের চাহনি,



ওর চোখের ওপর থেকে আমি আমার চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলাম না অনেক, অনেকক্ষণ। তারপর তাকে ভালো পোষাক উপহার দিয়ে নৌকায় ওর পূর্ণ বিশ্রামের জন্য সুন্দর একটা জায়গা ঠিক করে দিলাম।

ওদিকে আমাদের নৌকো পাল তুলে হাওয়ায় ভেসে চলে নতুন আর এক শহরে নোঙর করার উদ্দেশে। যতো দিন যায় ততোই বেশী করে আমি ওর আকর্ষণবোধ করি যেন। ও তখন আমার সম্মানিত অতিথি। রাত নেই, দিন নেই আমি ওর কাছ ছাড়া হতে পারি না এক মুহূর্তও। ও আমার নয়নের মণি হয়ে গেছে তখন। ও আমার একটু চোখের আড়াল হলেই আমার বুকে ব্যথা জাগে, হাহাকার করে ওঠে বুকটা। ভায়েদের থেকে মেয়েটির ওপরই বেশী নজর দিতে থাকি তারপর থেকে, আমার ভায়েদের কাছ থেকে আমি কেমন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। দিন যতো গড়াতে থাকে, আমাদের অন্তরঙ্গতা, মহব্বতও ততো গভীর হতে থাকে। নীরবে-নিভৃতে, গোপনে-গভীরে আমাদের দুটি হৃদয় এক হয়ে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। এক সময় দুটি দেহ মিশে গিয়ে আবেশে, চরম সুখ-তৃপ্তিতে থরথর করে কেঁপে ওঠে, কথা বলে সময় নষ্ট করতে দিল আমাদের চায় না, আমাদের ভাষা তখন মূক হয়ে যায়। মিলনে এতো সুখ বুঝতে পারি অনু-ভূতিতে, অনুভবে। একটা নিটোল দাম্পত্য জীবনের ছবি আঁকি আমরা দুজনে, আমাদের অবচেতন মনে। চোখে চোখে কথা হয় কেউ কাউকে না হারাবার।

সুখ নামে চিঁড়িয়াটা তখন আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে গিয়ে শান্তির বাণী বর্ষণ করে যায় আমাকে, 'সুখে থাকো, সুখে রেখো তোমার বিবিকে।'

কিন্তু খোদা আল্লা বোধহয় দূর থেকে আমার দিকে তাকিয়ে ব্যাঙ্গ করে হাসলেন, 'এতো সুখ বোধহয় তোর সইবে না। জানিস না সুখের আর এক নাম অসুখ?'

হ্যাঁ, সুখের আমার অসুখ করলো বটে কয়েকদিন পরে। খোদা মেহেরবানের ব্যঙ্গ-হাসিটা বাস্তবে রূপ নিলো ভায়েদের মনে অশান্তি যখন ছড়ালো আমার সুখ, ঐশ্বর্য, সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে। পরবাসে আমার নারী সঙ্গ লাভটা তারা ভালো চোখে দেখতে পারলো না। হিংসেয় তাদের বুক ফেটে যেতে থাকলো। তার ওপর আমার ঐশ্বর্য, আমার সম্পত্তির ওপরে তাদের লোভ তো বরাবরই ছিলো, লক্ষ্য ছিলো কি করে সেগুলো হাপিস করা যায়। নতুন রূপবতী বিবিকে পেয়ে তার মহব্বতে আমাকে বিভোর হয়ে প'ড়ে থাকতে দেখে তার সুযোগটা তারা পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে চাইলো। অতএব তারা পরামর্শ করলো, আমাকে তারা খতম করে দেবে এবং আমার সমস্ত সম্পত্তি তারা লুটে-পুটে নেবে।

গোপনে তারা পরামর্শ সেরে নিজেদের মধ্যে ফতোয়া জারী করলো, 'এসো, আমাদের ছোট ভাইকে খুন করি, তাকে খুন করতে পারলে তার সমস্ত সম্পত্তি আমাদের দুই ভায়ের হয়ে যাবে।' সেই মুহূর্তে এক অশুভ পিশাচ তাদের ওপর ভর করলো যেন। তারা সুযোগ খোঁজে আমাকে সরাবার। একদিন গভীর রাতে তারা আমার শয়ন কক্ষে হানা দিলো। আমি তখন গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে ছিলাম আমার বিবির পাশে। নিঃশব্দ আমার ঘরে ঢুকে তারা আমাদের দুজনকে আমাদের সুখ-শয্যা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মাঝ-দরিয়ায় ফেলে দিলো। পানির কলকল শব্দে আমার বিবির ঘুম যায় ভেঙ্গে। জেগে উঠেই ও দেখতে পায় সেই বীভৎস কাণ্ড-কারখানা। সঙ্গে সঙ্গে ও সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, এ অবস্থায় কি করতে হবে ওকে, কি শুরু করা উচিত! আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পানির জিনির রূপ ধারণ করেছে—ওপর দিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে এবং একটা নির্জন দ্বীপে নিয়ে গিয়ে আমাকে তোলে। তারপর কিছুক্ষণের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ও। তবে ও আবার ফিরে আসে পরদিন সকালে।

'এই যে আমি এসে গেছি, আমি তোমার সেই বিশ্বস্ত ক্রীতদাসী, যে তোমার পুর্নজন্ম ঘটিয়েছে, তোমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তুলেছে। মনে আছে, তুমি একদিন আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে, আমাকে শাদী করে তোমার বিবির মর্যাদা দিয়েছিলে। সেই কৃতজ্ঞতাবশেই আমি তোমায় মাঝ দরিয়ায় ডুবন্ত শরীরটা কাঁধে তুলে নিয়ে পানির ওপর দিয়ে হেঁটে এসে এই নির্জন দ্বীপে রেখে যাই কাল আঁধার রাতে। আমি তোমার জান বাঁচিয়েছি কেন জানো ছোটা মালিক? খোদা মেহেরবানের হুকুমে। জানো, আমি কে? আমি একজন আফ্রিদি জিনিয়াহ্। তোমরা ঠাট্টা করে যাদের বলো, পশু-শক্তিধর, আমি সেই পশু, সেই দৈত্যদের বংশধর। মেহেরবানের দোয়ায় আমি তোমাকে প্রথম দর্শনেই পেয়্যার করে ফেলি। তোমার মহব্বত আমি ভুলতে পারবো না। আল্লা এবং তাঁর বানীর ওপর আমার দারুণ আস্থা আছে। তা না হলে আমার এক কথায় কি ভাবে তুমি রাজী হয়ে গেলে, এবং আমাকে শাদী করলে! আর এখন ত্যাখো, তোমার জলে ডোবার হাত থেকে তোমাকে কি ভাবে বাঁচালাম। কিন্তু আমি তোমার দুটি ভায়ের ওপর আমার প্রচণ্ড গোঁসা হয়েছে, ওদের কোতল আমাকে করতেই হবে।'

ওর গল্প শুনতে শুনতে ভয়ঙ্কর বিস্ময়ে আমি

অভিভূত হয়ে পড়লাম। ও আমার যে উপকার করেছে তার জন্য ওকে শুক্রিয়া জানাতে কসুর করলাম না। সঙ্গে সঙ্গে ভায়েদের অমঙ্গলের কথা চিন্তা করে ওকে বললাম, 'না, না তুমি আমার ভায়েদের কোতল করতে যেও না।' তারপর আমি ওকে আমার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনী শোনালাম, আর সেই কাহিনী শুনে ও আরো জোর দিয়ে বললো, 'আজ রাতে চিঁড়িয়া হয়ে তাদের নৌকোর ওপর গিয়ে বসবো এবং নৌকোডুবি করে তাদের আমি খতম করবোই। তোমার অমন করুণ কাহিনী শোনার পর আর চুপ করে বসে থাকা যায় না।'

'আল্লা তোমার সুবুদ্ধি দিন, ও কাজ তুমি করতে যেও না।' আমি ওকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, 'সেই প্রবাদ কাহিনীর কথা শোনোনি? শয়তানকে তার কৃতকর্মের শাস্তি নিজের থেকে পেতে দাও। তাছাড়া তারা তো এখনো আমার নিজের সহোদর ভাই।'

কিন্তু ও রেগে উঠলো, 'খোদা আল্লার মর্জি মতো তাদের খতম হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। মরতে তাদের হবেই!'

আমি ওর কাছে কাতর মিনতি জানাই, আমার ভাইদের গুণাহ্ মাফ করে দেওয়ার জন্য। ও তখন আমাকে ওর কাঁধে তুলে নিয়ে আকাশে উড়লো, গা ভাসিয়ে দিলো আমার বাসার ছাদে গিয়ে পৌঁছনো না পর্যন্ত থামলো না ও। তারপর মাটি খুঁড়ে সেই লুকনো তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা বার করে দোকান সাজানোর জন্য মালপত্র কিনলাম, পাড়া-পড়শীকে সেলাম জানিয়ে আবার আমি দোকান খুলে বেচা-কেনা শুরু করলাম। রাত্রে বাড়ি ফিরে গিয়ে এই দুটি গ্রেহাউণ্ড কুকুরকে শিকলে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমাকে দেখে তারা তাদের ল্যাজ নেড়ে, ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠে তাদের দুর্ভাগ্যের কথা প্রকাশ করলো আকারে-ইঙ্গিতে। আমি আমার বিবির দিকে প্রশ্ন চোখে তাকাতেই ও জানালো, 'এই দুটি কুকুর তোমার দুই বড় ভাই।'

'কিন্তু তাদের এই করুণ অবস্থা কে করলে?'

হাসতে হাসতে ও বললো, 'আমার ছোট বহিন যাদুবিদ্যা জানে, তাকে খবর পাঠাতেই সে তাদের ওপর ভর করে যাদুমন্ত্রে তাদের কুকুর বানিয়ে দেয়। দশ বছরের আগে তারা তাদের এই রূপ থেকে মুক্তি পাবে না।'

সেই দশ বছরের মেয়াদ এবার ফুরিয়ে এলো। তাই আমি আমার বিবির ছোট বহিনের খোঁজে এখানে এসেছিলাম, কারণ কেবল সেই আমার ভায়েদের এই কুকুরের রূপ থেকে মুক্তি দিয়ে আগের মতো মানুষের বেশে ফিরিয়ে দিতে পারে। এখানে ঘুরতে ঘুরতে এই গাছতলায় বেচারী এই যুবক সওদাগরকে দেখতে পাই। তার মুখ থেকে তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনে আমি ঠিক করলাম, তার এবং তোমার মধ্যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটে সেটা না দেখা পর্যন্ত এখান থেকে নড়বো না। এই হলো আমার জীবনের কাহিনী। বলে থামলো দ্বিতীয় শেখ।

'তোবা, তোবা!' আফ্রিদি দৈত্য বাহবা দিয়ে বলে, 'সত্যি, কি চমৎকার তোমার কিস্‌সা, শুনে আমি খুব খুশি। আমার ওয়াদা আমি রাখছি, সওদাগরের গুনাহের তিন ভাগের এক ভাগ আমি মাফ করে দিচ্ছি।'

তারপর সেই খচ্চরটার মালিক আফ্রিদি দৈত্যকে শুধোয়, 'এর চেয়েও বিস্ময়কর কিস্‌সা আমি তোমাকে শোনাতে পারি। অবশ্য তুমি যদি এই সওদাগরের গুনাহের তিন ভাগের এক ভাগ যদি মুকুব করে দাও তবেই আমি আমার গল্প শুরু করতে পারি।'

আফ্রিদি দৈত্য সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, 'ঠিক আছে, তোমার কিস্‌সাও শুনবো। জলদি শুরু করো।'

সে তখন মুখ খুললো।



শোনো দৈত্য সম্রাট, শুরুতে তোমাকে বলে রাখি, আমার সঙ্গিনী এই মাদী খচ্চরটা আমার বিবি। ব্যবসার প্রয়োজনে আমাকে এক সময় দেশের বাইরে যেতে হয়, এবং সারাটা বছর বাইরে বাইরে কাটাতে হয়। তারপর কাম শেষ করে একদিন রাতে বাড়ি ফিরে এলাম। বিবির সঙ্গে দেখা করার জন্য তার শয়নকক্ষে দেখা করতে গিয়ে একটা বিশ্রী দৃশ্য দেখে আমার মাথা গেলো ঘুরে। আমার বিবি তখন আমার দামী কার্পেটের বিছানার ওপর বসে আছে, তার কোলে আমার এক নিগ্রো ক্রীতদাস মাথা রেখে রসের গল্প করছে, এ ওকে আদর করতে করতে হাসিতে ফেটে পড়ছে, চুমোয় চুমোয় রাঙ্গিয়ে দিচ্ছে এ ওর ঠোঁট। কারোর গায়ে এক চিল্‌তে সলতেও নেই। আমাকে দেখেও আমার বিবি একটুও লজ্জা পেলো না, কিংবা তার লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করলো না। অবশ্য আমি তার স্বামী, তাই আমার সামনে তার লজ্জা ঢাকার প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু একজন ক্রীতদাসের সামনে ও ভাবে···সেই অবস্থায় সে শয্যা থেকে নেমে দ্রুত আমার সামনে ছুটে এলো, তার হাতে জলের পাত্র, সেই পাত্র থেকে জল নিয়ে আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলো সে বিড়বিড় করে বকতে বকতে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'এখন থেকে তুমি আর মানুষ নয়, তুমি কুকুরের রূপ ধারণ করবে।' আর সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা কুকুর বনে গেলাম। আমারি বাড়ি থেকে আমার বিবি তাড়া করে দূর করে দিলো। আমি তখন ছুটতে শুরু করলাম।

একটা কষাই-এর দোকানের সামনে এসে থামলাম। খুব খিদে পেয়েছিল। কষাই-এর দোকানের সামনে মাংসের হাড় পড়েছিল, সেই হাড়ের টুকবোগুলোই তখন আমার খুব প্রিয় খাদ্য হয়ে দাঁড়ালো। কষাই আমাকে দেখতে পেয়ে তার বাড়িতে নিয়ে গেলো।

কিন্তু তার মেয়ে আমাকে দেখামাত্র মুখে নাকাব চাপা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠলো, 'আজকাল তোমার কি হয়েছে বাপজান, আমার সামনে তুমি একজন পরপুরুষকে এনে হাজির করলে?'

তার বাবা বিস্মিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকায়, 'কোথায়, কোথায় তুই আবার পরপুরুষ দেখলি? কই আমি তো দেখতে পাচ্ছি না মা!'

'কোথায় আবার?' মেয়েটি মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে, 'তোমার সঙ্গী ঐ কুকুরটাই আসলে একজন পুরুষ মানুষ। ওর ডাইনী বিবি যাদুমন্ত্রে ওকে কুকুর বানিয়ে দিয়েছে। তবে আমি আবার মানুষের রূপ ওর ফিরিয়ে দিতে পারি।'

মেয়েটির বাপ তার কথা শুনে স্তম্ভিত। বলে কি বেটী? বিস্ময়ের ঘোর না কাটতেই সে তার মেয়েকে অনুরোধ করে, 'আল্লা তোমার মঙ্গল করবেন, তাড়াতাড়ি তুমি ওর মানুষের বেশ ফিরিয়ে দাও বেটী।'

তাই সে জলভর্তি একটা পাত্র হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়লো সেই জলের ওপর। তারপর মন্ত্রপূত সেই জল আমার গায়ের ওপর ছিটিয়ে দিতে গিয়ে সে বললো, 'হে কুকুরের রূপধারী মানুষ তুমি তোমার আগের রূপ ধারণ করো।' সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার মানুষের রূপ ধারণ করলাম। মেয়েটির প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে গেলো আমার মন। তার হাতে চুমু দিয়ে আমি আমার বিবির ওপর ক্রোধ প্রকাশ করে বললাম, 'আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি তোমার মন্ত্রবলে আমার বিবিকে এখুনি একটা জানোয়ার বানিয়ে দাও। আমি সেই শয়তানীটাকে সমঝে দিতে চাই, যাদুবিদ্যায় তুমি তার থেকে অনেক বেশী পারদর্শী, অনেক বেশী ভয়ংকরী।'

সব শুনে কষাই-এর মেয়ে আমাকে কিছু পরিমাণ পানি দিয়ে বললো, 'যখন দেখবে তোমার বিবি ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন তার গায়ে এই পানি ছিটিয়ে দেবে আর মনে মনে তোমার ইচ্ছেটা কল্পনা করবে, দেখবে সে তোমার ইচ্ছার মতো নতুন কোন এক জানোয়ারের রূপ ধারণ করেছে।'

তারপর আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখলাম সে ঘুমচ্ছে অকাতরে। কষাই-এর মেয়ের নির্দেশ মতো তার ঘুমন্ত শরীরের উপর সেই মন্ত্রপুত পানি ছিটিয়ে দিয়ে বললাম, 'এখুনি তুমি একটা মাদী খচ্চরের রূপ ধারণ করো।' সঙ্গে সঙ্গে সে একটা মাদী খচ্চরের রূপ ধারণ করলো। এই যে মাদী খচ্চরটা দেখছো, এ হলো আমার সেই শয়তানী ডাইনী বিবি।

এবার আফ্রিদি দৈত্য খচ্চর-রূপী তৃতীয় শেখের বিবির দিকে ফিরে তাকালো, 'এসব কথা কি সাচ্চা?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় সে এবং ইঙ্গিতে জানায়, 'হ্যাঁ, এর মধ্যে একটা বর্ণও মিথ্যে নয়, সব সাচ্চা।'

'এই হলো আমার কাহিনী', এই পর্যন্ত বলে তৃতীয় শেখ থামলো।

সে থামলে আফ্রিদি দৈত্যের মনে খুশির দোলা লাগে, তার প্রকাশ ঘটে তার ভাবে-ভঙ্গিমায়, কথা-বার্তায়, সওদাগরের বাকী তিনভাগের এক ভাগ গুণাহ ও মাফ করে দিলো সে—আর শাহরাজাদও তার গল্প বলায় বিরতি ঘটালো ভোরের আলো ফুটে উঠতে দেখে।

'ও দিদি, কি চমৎকার, কি মিষ্টি মন মাতানো তোমার গল্প, অনেকদিন মনে থাকবে—'

'এ আর এমন কি ভালো গল্প বোন,' শাহরাজাদ উত্তরে বললো, 'এর থেকেও ভালো ভালো গল্প আমি তোমাকে শোনাতে পারি পরের রাতে, অবশ্য যদি বেঁচে থাকি, যদি জাঁহাপনা আমাকে অনুমতি দেন।'



বাদশাহ শাহরিয়ারের মনে তখন দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল, তিনি ভাবলেন, শাহরাজাদের সমস্ত গল্প বলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে কোতল করবেন না, সত্যি কথা বলতে কি, তার গল্পগুলি অপূর্ব, অপূর্ব তার বলার ভঙ্গিমা। অতএব তারা সকাল না হওয়া পর্যন্ত গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে থাকলো।

তারপর বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ শাহরিয়ার রোজকার অভ্যাস মতো তাঁর রাজদরবারে উপস্থিত ভীড়ে উপচে পড়া প্রজাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনলেন, সব শুনে তিনি তাঁর বিচারের রায় দিলেন, কারোর শাস্তি বরাদ্দ করলেন কারোর বা মুকুব করে দিলেন। তারপর সন্ধ্যা নেমে এলে পর তিনি তাঁর প্রাসাদে ফিরে গেলেন, শাহরাজাদের গল্প শোনার জন্য মন তাঁর তখন ছটফট করছিল।

বাদশাহ শাহরিয়ার তাঁর উজিরের কন্যার কথা রেখেছেন। আজ তৃতীয় রজনী। তুনিয়াজাদ আগের আগের রাতের মতো আজও আব্দার করে বসলো, 'দিদি, এবার তোমার গল্প শেষ করো।'

'হ্যাঁ, করছি বোন', শাহরাজাদ এবার বাদশাহের দিকে ফিরে বললো, 'তাহলে শুনুন জাঁহাপনা, আগের তুই শেখের কাহিনীর থেকেও তৃতীয় শেখের কাহিনী আরো বেশী মদাজার, আরো বেশী চমৎকার হওয়াতে দৈত্য খুশি হয়ে বলে উঠলো, 'সওদাগরের অবশিষ্ট গুণাহও আমি মাফ করে দিলাম, অতএব আমি তাকে মুক্তি দিলাম।'

মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে এসে সেই সওদাগর তিন বৃদ্ধ শেখদের জড়িয়ে ধরলো আবেগে এবং তাদের অজস্র সুক্রিয়া জানাতে কসুর করলো না। আর সেই শেখেরা তার সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে যে যার দেশে ফিরে গেলো। 'তবু আমি বলবো, শাহারজাদ বললো, 'ধীবরের গল্পের চমতকারিত্বের কাছে শেখদের গল্প তো কিছুই নয়।'

'তা ধীবরের কাহিনী কিরকম শুনি ?'

বাদশাহের কৌতুহল দেখে শাহরাজাদ তার উত্তর দিলো গল্প বলার মধ্যে দিয়ে—

ধীবর ও আফ্রিদি দৈত্য

'জাঁহাপন' এক সময় এক ধীবর বাস করতো, বড় গরীব, ছিলো সে কোন রকমে কায়ক্লেশে সংসার চলতো তার। এক বিবি ও তিনটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে তার সংসার। দিনে চারবার জলে জাল ফেলার অভ্যাস ছিলো তার বেশী কদাচ নয়। একদিন সে সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরার জন্য জাল ফেললো, মাথার ওপর প্রখর রৌদ্র, তখন তুপুর। কিছুক্ষণ বাদে জাল গোটাবার সময় সে অনুভব করলো, জালটা বেশ ভারি, আনন্দে তার মনটা তুলে উঠলো, তাহলে বোধহয় একটা ভারি মাছ গুটিয়ে ডাঙ্গায় তুললো সে। কিন্তু হায় আল্লা, মাছ কোথায় ? এ যে একটা মরা গাধা তার জালে বেধেছে, সমুদ্রের লোনা জলে পড়ে থেকে তার দেহটা ফুলে ভারি হয়ে গেছে। তুঃখে কাতর হয়ে নিজের মনে আক্ষেপ করে উঠলো সে, 'বোধহয় খোদা আল্লার মনে আজ এই ইচ্ছেই ছিলো, তা না হলে আজ এভাবে আমাকে এমন নিরাশ হতে হবে কেন ?' মনের তুঃখে অপ্রস্তুত ভাবে কবিতার কয়েকটি ছত্র আবৃত্তি করলো সে :—

রাত নেই, দিন নেই মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে,
তবু পরিশ্রম তোমার যথাসাধ্য নয় রোজকার রুজি-
রোজগারে।
অথচ রাত্রি শেষে কখনো বা খোদা এসে,
বলবে হেসে,
এবার তোমার জালে,
ধরা দেবে বিরাট এক মাছের ছেলে।

একরাশ বিরক্তি নিয়ে মৃত গাধাটাকে জালমুক্ত করে আবার সে জাল ফেলে সমুদ্রের জলে আল্লার নাম নিয়ে। কিছুক্ষণ পরে ধীবর জাল গোটাতে গিয়ে অনুভব করলো আগের থেকে এ যেন আরো বেশী ভারি। যথাসাধ্য পরিশ্রম করে জালটা সে ডাঙ্গায়



তুললো টেনে। কিন্তু কোথায় মাছ? তার বদলে ধরা পড়েছে তার জালে বিশাল এক মাটির জালা, কাদা আর বালিতে ভরা। একটা হতাশা তাকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে যেন। দুঃখে তার মনের অনুভূতি কাব্য হয়ে ঝরে পড়ে :

ও আল্লা, তুমি আমার গোস্তাকী মাফ করে দাও,
দীন-দুনিয়ার মালিক তুমি,
এ-কেমন পরিহাস তোমার,
নীরবে নিভৃতে
তোমার কোন্ ইঙ্গিতে
বন্ধ হলো আজ আমার রুজিরোজগার?

তাই সে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানালো মাছ ধরা জালটা পরিস্কার করতে। তারপর আল্লার নাম নিয়ে আবার সে জাল ফেললো জলে, জাল গেলো তলিয়ে জলের অনেক গভীরে অতলে। এবার আল্লা নিশ্চয়ই তার প্রার্থনার কথা শুনে সদয় হবেন তার ওপর, জাল ভর্তি মাছ উপহার দেবেন তাকে। টানতে গিয়ে জাল বেশ ভারি ভারি ঠেকে। ধীরে ধীরে জাল গুটোয় সে, এক সময় ডাঙ্গায় তুলতেই চমকে উঠলো সে। আল্লা আবার তার ভাগ্যকে নিয়ে পরিহাস করলেন, তার জালে মাছের বদলে উঠল কতকগুলো ভাঙ্গা মাটির বাসন এবং কাঁচের টুকরো।

আকাশ পানে তাকিয়ে ধীবর আল্লার কাছে অভিযোগ জানাতে গিয়ে কলকলিয়ে উঠলো। 'খোদা, তুমি তো জানো দিনে চারবারের বেশী জাল আমি ফেলি না, এরই মধ্যে তিনবার আমার জাল জল ছুঁয়েছে, অথচ এখনো পর্যন্ত একটা মাছের মুখও আমি দেখতে পেলাম না। তাই আল্লা, এবার আপনি আমার দিকে মুখ তুলে তাকান, আমার রোজকারের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে দিন।'

তারপর সে আল্লার নাম নিয়ে জাল ফেললো এবং জালটা জলে সম্পূর্ণ ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো সে। তারপর জাল গোটাতে গিয়ে অনুভব করলো সে, জালটা যেন সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যেতে চায়, এতো ভারি। এবারও কি আল্লা তার দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন? এবারও কি তার জালে মাছ ধরা পড়বে না? তার আজকের রুজি রোজকারে বাধা পড়বে? 'না না আল্লা নিষ্ঠুর, তাঁর দোয়া আমার জন্য নয়, আমার প্রতি আজ

তিনি ভীষণ নিষ্ঠুর, নির্দয় !' তারপর আবৃত্তি করতে শুরু করলো সে—

এই নিষ্ঠুর দুনিয়া আমার জন্য নয়,
থিক্কার দিতে ইচ্ছে হয়।
সামনে আমার বিপন্ন বিস্ময়,
তবু আমি অভিভূত,
এই ভেবে, সুখ তো ইনসানকা তকদারকা খেল
জানি, তবু সুবাহ সূরজ আমার তাকত।
আমার আর্তি নিজের চোখে যখন দেখি,
ভাঙ্গা গুঁড়িয়ার মতো দূরে সরিয়ে রাখি।
তবু এই দুনিয়ার আমি এক ইনসান,
নিজেকে যখন প্রশ্ন করি, নসীবকা লিখন
কার ভালো ? সুখী কে ?
হাজার কণ্ঠ মুখরিত, দিল চায় বলতে, 'তোমাকে।'

তারপর জাল পরিস্কার করে আবার সে বিছিয়ে দিলো জলের ওপর, ধীরে ধীরে জালটা তলিয়ে গেলো অতল জলের আহ্বানে। এই নিয়ে চারবার তার জাল ফেলা, শেষবার, দিনের কোটা তার শেষ। এবার মাছ ওঠে তো আল্লার দোয়া, তা না হলে ভুখা থাকতে হবে। কিছুক্ষণ পরে জাল গোটাতে গিয়ে এবারেও ধীবরের কেমন মনে হলো, তার জালে বেশ একটা ভারি জিনিষ ধরা পড়েছে, মাছটা নিশ্চয়ই খুব বড় হবে। ডাঙ্গায় জাল গুটিয়ে তুলতে গিয়ে সে দেখলো, এবারেও তার জালে মাছ ধরা পড়েনি, তবে শশার আকারে একটা বিরাট তামার জালা তার চোখে পড়লো। ভর্তি জালা। জালার মুখে সিলমোহর, আর সেই সিলমোহরের ওপর দাউদের পুত্র শাহেনশাহ সুলেমনের নাম খোদাই করা রয়েছে (আল্লা বোধহয় এবার তার মুখের দিকে তাকিয়েছেন ; বহুত, বহুত সুক্রিয়া !) তা ধীবর তো মহা খুশি জালাটা দেখে, নিজের মনে বলে উঠলো সে, 'কিছু না হোক তামার জালাটা বাজারে বিক্রী করলে অন্তত দশটা সোনার দিনার তো পাওয়া যাবে। তবে তার আগে জালার মুখটা খুলে দেখতে হবে ভেতরে কি আছে। মূল্যবান সম্পদ কিছু থাকলে থলে ভর্তি করে ডেরায় নিয়ে যাবে, তারপর জালাটা বাজারে বিক্রী করে আসবে সে। শায়েনশাহ সুলেমনের সিলমোহর করা জালা, ভেতরে মহামূল্যবান সম্পদ না থেকে যেতে পারে না. কিন্তু হায় তার পোড়া কপাল, সিলমোহর ভাঙ্গার পর দেখা গেলে, সে সম্ভাবনা আদৌ নেই, তবে জালার মুখ থেকে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে আকাশ-মুখী হয়ে উঠতে থাকলো (এ যেন আর একবার চমকানোর পালা। বিস্ময়, শুধু বিপন্ন-বিস্ময় !) জালার মুখটা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একাকার হয়ে যায় এক সময়। ধীবরের চোখে গভীর বিস্ময়, থমথমে মুখ, এবার কি দেখতে হয়, কে জানে ! হঠাৎ সে দেখে সেই বিরাট ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা একটা ততোধিক বিরাটাকার আফ্রিদি দৈত্যর রূপ নিয়ে তাকিয়ে আছে তার পানে।

আফ্রিদি দৈত্যের মাথাটা তাকাল ছুঁই-ছুঁই, জাহাজের মাস্তুলের মতো বিরাটা পা দুটো তার মাটি স্পর্শ করে আছে। গোলাকার গম্বুজের মতো তার মাথা, হাত দুটো জাহাজের নোঙ্গরের মতো, গুহা সদৃশ মুখের হা, তার দাঁতগুলো যেন এক একটা বিরাট পাথরের চাই, হাতওয়ালা জগের মতো তার নাকের ফুটো, তার চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত দুটি বাতি, আর তার চাহনি অতি ভয়ঙ্কর, বীভৎস, বেশীক্ষণ তার সেই জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকানো যায় না।

সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ধীবর তো থ, দেহ তার কেমন অবশ হয়ে আসে, দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার উপক্রম, ঠোঁট শুকিয়ে যায়, তার চোখের সামনে এক বুক অন্ধকার ; কি যে করবে, কি তার করা উচিত, কিছুই ঠিক করতে পারে না সে।

এই পরিস্থিতিতে আফ্রিদি দৈত্যটা জ্বলন্ত চোখে

তার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলো, 'খোদা আল্লাই আমার সব কিছু, তাঁকে ছাড়া আমি কাউকে মানি না, আর আমার মতে সুলেমান আল্লার প্রচারক, পয়গম্বর মাত্র।'

'তোমাকেও আমি আল্লার পয়গম্বর বলে মানছি, আমাকে তুমি খতম করো না, আমি তোমাকে ওয়াদা' করছি, আমি আর কখনো তোমার কথার অবাধ্য হবো না, কখনো কোন অন্যায় করবো না, কাতর মিনতি জানায় ধীবর, 'তুমি বিরাট শক্তিধর পুরুষ, একটু আগে তুমি বললে, সুলেমন আল্লার পয়গম্বর, কিন্তু সে তো আজ প্রায় আঠারোশো বছর আগে মারা গেছেন, আর আমরা এই দুনিয়ার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে গুজরাচ্ছি। কার কখন খোদার তলব পড়বে কে জানে! তা তোমার কি কাহিনী, কেন তোমার এই দশা, ঐ জালার মধ্যে তোমার বন্দী হয়ে থাকতে হলো কেন, কি তোমার গুস্তাকী বলো?'

তার কথা শুনে আফ্রিদি দৈত্যটার ঠোটে একটু ক্রুর হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো, 'শোনো ধীবর, আল্লা তোমার জন্য একটা খুব ভালো খবর পাঠিয়েছেন।'

'তা সেই সুখবরটা কি শুনি?'

'মৃত্যুর চেয়ে আর কি ভালো খবর হতে পারে?' আফ্রিদি দৈত্যের ঠোটে সেই ভয়ঙ্কর হাসিটা আবার ফুটে উঠতে দেখা যায়, 'এই মুহূর্তে তোমাকে আল্লার নাম নিয়ে মরতে হবে।'

'আশ্চর্য, আমাকে কেন তুমি হত্যা করবে? মরার মতো কি এমন অপরাধ করেছি? তোমাকে সিলমোহর করা ঐ জালার ঢাকনা খুলে মুক্তি দিয়েছি বলে? সমুদ্র নিচ থেকে তুলে তোমাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছি বলে? তোমাকে ডাঙ্গায় তুলে নতুন করে জীবনের আলো দেখেয়েছি বলে? আমার উপকারে এই তোমার পুরস্কারের নমুনা?'

'ওসব ছেঁদো কথা রাখো?' আফ্রিদি দৈত্য হুঁঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'এখন বলো ঠিক কি ধরণের মৃত্যু তোমার পছন্দ? কি ভাবে আমি তোমাকে হত্যা করলে তুমি খুশি হয়ে মরবে!'

ধীবর তার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলে, 'আমার কি গুণাহ তা তো বলবে? কেন তোমার এই প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে জানতে পারি?'



'তাহলে শোনো ধীবর আমার জীবনের সেই করুণ কাহিনী।' আফ্রিদি দৈত্যটা বলতে শুরু করলো অতঃপর:

'সক-হর্‌-অল জিনির নাম নিশ্চয়ই শুনেছো তুমি? সেই আমি। দাউদের পুত্র শাহেনশাহ সুলেমনের এক বেয়াদপ ক্রীতদাস ছিলাম আমি।

তার অবাধ্য হওয়াই ছিলো আমার একমাত্র কাজ। সে যদি ডাইনে যেতে হুকুম করতো, আমি যেতাম বাঁয়ে। সেই সুলেমন একদিন করলো কি, তার এক ভয়ঙ্কর শক্তিধর উজির আশফ-ইবন-বারখ্যাকে পাঠালো আমাকে বন্দী করে তার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি সক্-হর্-অল জিনি, শক্তিতে কেউ আমার ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারে না। কিন্তু সেই আমি সুলেমনের উজিরের কাছে বন্দী হয়ে গেলাম। সে আমাকে শাহেনশাহের কাছে নিয়ে গেলো। সুলেমন আমাকে তার কব্জায় পেয়ে আমাকে তার বশ্যতা স্বীকার করতে বললো, বললো তার অনুগত বান্দা হয়ে থাকতে। কিন্তু আমি তার কথায় কান দিলাম না। আমি তার ফরমান প্রত্যাখ্যান করে দিলাম। সে তখন রেগে গিয়ে তার সেই উজিরকে নতুন করে এক ফরমান দিলো, আমাকে ঐ তাকাবে পুরে ঢাকনা লাগিয়ে তার নামাঙ্কিত সিলমোহর করে সমুদ্রের এই মাঝ-দরিয়ায় ফেলে দেওয়ার জন্য। সমুদ্রের অতল জলের গভীরে তাকিয়ে রইলাম প্রার্থনা জানিয়েছি, কেউ যদি এই সময়ের মধ্যে আমাকে মুক্ত করে, আমি তাকে চিরদিনের জন্য প্রচুর ঐশ্বর্যে ভরিয়ে রাখবো। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সেই একশো বছরের মধ্যে কেউ এলো না আমাকে উদ্ধার করতে। আমি আবার নতুন করে শপথ নিলাম, পরের একশো বছরের মধ্যে কেউ যদি আমার সেই বন্দীদশা ঘোচাতে পারে তাকে আমি সারা দুনিয়ার ধন-দৌলতের দরজা উন্মুক্ত করে দেবো। কিন্তু তাতেও কোন ফল হলো না, কেউ আবার সেই কাতর অনুণয়ে সাড়া দিতো এলো না এগিয়ে। ভাগ্যের কি পরিহাস! এই ভাবে জালার মধ্যে বন্দী থাকতে থাকতে চারশো বছর পার হয়ে গেলো।'

'তারপর?' ধীবর শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'তারপর কি হলো!'

'আবার আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, এই চলতি একশো বছরে যে আমাকে মুক্তি দেবে, তাকে আমি যেন কোন তিনটি বর চাইতে বলবো!' তবু কেউ এলো না আমাকে আমার মুক্তির শের শোনাবার জন্য। তখন আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না। না, আর ভালো কথায় কাজ হবে না। এবার আমি খেপে গেলাম। মনে মনে হলফ করলাম, এবার যে আমাকে ঐ জালা থেকে মুক্তি করবে, তাকে আর আদর-আপ্যায়ন নয়, তাকে আমি নিজের হাতে কোতল করবো। তবে কিভাবে সে মরতে চায়, তার সেই ইচ্ছেটা অবশ্যই আমি জেনে নেবো আগে। আর এখন যেহেতু তুমি আমাকে মুক্ত করেছো, তুমি ঠিক কি ধরণের মৃত্যু চাও! তোমার পছন্দ মতো আমি ব্যবস্থা নেবো।'

আফ্রিদি দৈত্যের কথা শুনে ধীবর এবার বলে, 'হায় আল্লা, আগে জানলে আমি তোমাকে মুক্ত করতাম না। আমার নসীবে এটাই কি লেখা ছিলো?' সে এবার মাথা নিচু করে প্রার্থনা জানায়, 'তুমি দৈত্যদের সম্রাট, তোমার অসীম দয়ার কথা শুনেছি। আমাকে তুমি হত্যা করো না, আমাকে বাঁচতে দাও, আল্লা তোমার ভালো করবেন। আর আমাকে তুমি হত্যা করলে আল্লা তোমার এই অন্যায় গুণাহ্ কখনো মাফ করবেন না। তাঁর শক্তি তোমার থেকে অনেক, অনেক বেশী, আমাকে হত্যা করার প্রতিশোধ ঠিক তোমার ওপর নেবেন তিনি, তাঁর হাত থেকে তুমি কখনোই রেহাই পেতে পারো না।'

'আমি অসহায় ধীবর, আমি হলফ করেছি আমার মুক্তিদাতাকে আমি অবশ্যই হত্যা করবো। আমি আমার সেই হলফ থেকে সরে আসতে পারি না। মরতে তোমাকে হবেই! তবে সে মরণ হবে তোমার পছন্দের ওপর।'

ধীবর তখন মরীয়া হয়ে বাঁচার জন্য শেষ চেষ্টা করে আফ্রিদি দৈত্যটাকে বলে, 'হে দৈত্য সম্রাট, তোমাকে আর একবার ভালো করে ভেবে দেখতে

বলছি, তোমাকে আমি মুক্ত করেছি, অন্তত সেই কৃতজ্ঞতাবশেও আমাকে হত্যা করার হলফের কথা তুমি ভুলে যাও। যাবে না ভুলে?'

'বড় দেরীতে তুমি আমাকে মুক্ত করলে ধীবর, একশো বছর আগে হলে আমি তোমার কথা রাখতে পারতাম। কিন্তু এখন আর তা হয় না', আফ্রিদি দৈত্যটা জোর গলায় বললো, 'এবার আমাকে আমার কথা রাখতে দাও। আর দেরী না করে কি ভাবে মরলে তুমি খুশি হবে, তোমার সেই ইচ্ছের কথাটা চটপট জানিয়ে দাও।'

'তুমি আফ্রিদি দৈত্যদের সম্রাট', 'ধীবর এবার একটু রুক্ষস্বরে বললো, 'আমি তোমার জান বাঁচালাম, আমার উপকারের এই তোমার নমুনা? ছিঃ ছিঃ, তুমি এমন বেইমান! তোমার এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার দেখে আমার সেই প্রবাদটার কথা মনে পড়ে গেলো :—

বাদের বুকের রক্ত জল করা রচিত মিনার,
চাবুকের কষাঘাত তাদের একমাত্র পুরস্কার।
অনিশ্চিত রুজিরোজগার আমার সমস্ত পরিশ্রম
অথচ সামনে মৃত্যুর পরোয়ানা, শুধুই ভ্রম!

ধীবরের সেই সব নীতিকথা আফ্রিদি দৈত্যটার পছন্দ হলনা। খিঁচিয়ে উঠে সে বলে, 'অনেক বাজে বকেছো, আর নয়। তোমাকে আমি হত্যা করবোই!'

ধীবর দেখলো, আফ্রিদি দৈত্যটাকে ভালো কথায় বুঝিয়ে তার মন ভোলানো যাবে না। আর গায়ের জোরে কাজ হাঁসিল করবে সে? অসম্ভব! শক্তিধর দৈত্যদের সম্রাট সে, তার শক্তির কাছে সে তো নস্যি মাত্র। অতএব একমাত্র বুদ্ধির খেলায় তাকে হারাতে হবে। নিজের মনে কথাটা ভাবা মাত্র একটা মতলব তার মাথায় খেলে গেলো হঠাৎ। বুদ্ধি খাটিয়ে সে এবার তার বাঁচার শেষ চাল চাললো, এই চালে হয় সে বেঁচে থাকার পথ দেখবে, তা না হলে মৃত্যুর প্রহর গুণবে।

'আমাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত তুমি কি সত্যি সত্যি নিয়েছো দৈত্য সম্রাট?'

'নিশ্চয়ই! তুমি কি ভেবেছো, তোমার সঙ্গে আমি এতক্ষণ ঠাট্টা করছিলাম?'

'ঠিক আছে, মরতে আমি ভয় পাই না। কিন্তু', ধীবর গম্ভীর স্বরে বললো, 'মরার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর আমি তোমার কাছ থেকে জেনে নিতে চাই, উত্তরটা জেনে না গেলে বেহস্তে গেলেও সুখ আমি পাবো না।'

'বেশ তো', বললো বটে আফ্রিদি দৈত্যটা, কিন্তু তার গলার স্বরটা কেমন যেন কাঁপা কাঁপা বলে মনে হলো 'তবে সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করো।'

'আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি', ধীবর বললো, 'তোমার ঐ বিশাল দেহটা ঐ ছোট্ট জালাটার মধ্যে আটলো কি ভাবে! তোমার সম্পূর্ণ দেহটা দূরে থাক, তোমার অমন লম্বা লম্বা মোটা হাত পায়ের জায়গা ঐ জালাটার মধ্যে হবে কিনা সন্দেহ।'

'কি বললে?' আফ্রিদি দৈত্যটা রাগে উত্তেজনায় গর্জে উঠলো, 'বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি ঐ জালাটার মধ্যে ছিলাম?'

'না, আমি নিজের চোখে একবার না দেখলে কখনই বিশ্বাস করবো না। এ অসম্ভব, এ হতে পারে না—'

ওদিকে ভোর হয়ে আসে। শাহারাজাদ দেখলো, রাতের আঁধার ফিকে হয়ে আসছে দেখে বাদশাহ শাহরিয়ারের কাছ থেকে পরের রাতে বাকী গল্পটুকু বলার অনুমতি নিয়ে মখমলের বিছানায় তার নরম দেহটা এলিয়ে দিলো। শাহরিয়ারের ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি, চোখের চাহনিতে শাহরাজাদের গল্প শোনার নেশা। তাকে হারাবার ভয়ে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সে-ও ঢলে পড়লো বিছানায়। রাত্রি-জাগরণে রাজ্যের ঘুম নামলো তাদের চোখে।

তার বোন দুনিয়াজাদ তাকে অনুরোধ করলো,

'দিদি, এবার তোমার গল্প শেষ করো, আজ আমি তোমাকে ঘুমতে দেবো না।'

বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে শাহারাজাদ তার অসমাপ্ত গল্পের জের টেনে বলে, ধীবর যখন সেই আফ্রিদি দৈত্যটাকে বললো, 'তুমি ফিরে আবার ঐ জালার মধ্যে ঢুকে আমাকে দেখানো না পর্যন্ত আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না, করতে পারি না', সেই দৈত্যটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে আবার ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে পরিণত হয়ে গেলো। তারপর একটু একটু করে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা সেই খালি জালার মধ্যে প্রবেশ করলো সম্পূর্ণ ধোঁয়াটা জালার মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র ধীবর ঢাকনাটা জালার মুখে এঁটে দিয়ে সিলমোহর করে দিলো আগের মতো আবার।

ধীবরের বিকট হাসির শব্দে সমুদ্র-সৈকত কেঁপে উঠলো। এক সময় হাসি থামিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো আফ্রিদি দৈত্যটাকে, 'হে দৈত্য সম্রাট, এবার বলো, কি ভাবে তুমি এখন মরতে চাও? আল্লার কসম, আমি তোমাকে ঐ জালা সমেত এই দরিয়ায় ফেলে দেবো, আর এখানে এই সমুদ্রতীরে একটা বাড়ি বানিয়ে আমি এই জায়গাটা পাহারা দেবো। আর এখানে কোন ধীবর মাছ ধরতে এলে তাকে মাছ ধরতে মানা করে দিয়ে বলবো, এখানে সমুদ্রের এই দরিয়ায় এমন একজন আফ্রিদি দৈত্য জালাবন্দী হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছে, যাকে একজন ধীবর একবার মুক্ত করে এবং পুরস্কার স্বরূপ সেই দৈত্যটা তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়।'

ধীবরের মুখ থেকে নিজের বোকামোর কথা শুনে নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো। তামার জালার মধ্যে থেকে তার আস্ফালন, তার হুঙ্কারের শব্দ সমুদ্রের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো, জালার ভেতর থেকে ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য। কিন্তু সুলেমানের সীসের সিলমোহর ভেঙ্গে তার বাইরে বেরিয়ে আসার সাধ্য ছিলো না তখন। সে তখন বুঝে গেছে, ধীবর তাকে দারুণ কব্জা করে ফেলেছে, তাকে ভালোয় ভালোয় বুঝিয়ে জালার মুখ না খোলাতে পারলে তার বাঁচার আর অন্য কোন পথ নেই। তাই সে এবার কাতর মিনতি জানালো ধীবরের উদ্দেশে, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে, এবারের মতো তুমি আমার গুস্তাকী মাফ করে দাও। জালার মুখটা আর একবার খুলে দাও দোস্ত। দেখবে, এবার আর আমি তোমাকে হত্যা করার কথা বলবো না।'

ধীবর হাসে, 'খানিক আগে তোমাকে আমি দৈত্য সম্রাট বলে ভুল করেছি, আসলে তুমি একটা শয়তান ছাড়া আর কিছু নয়? শয়তানের কথায় ভুলতে নেই! মরতে তোমাকে হবেই!' এই বলে সে জালাটা ঠেলতে ঠেলতে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যায় জলে নিক্ষেপ করার জন্য।

'আরে, এ তুমি কি করছো ধীবর?' জালাটা নড়ে উঠতেই ভেতর থেকে আফ্রিদি দৈত্যটা চীৎকার করে উঠলো, 'তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?' তার কণ্ঠস্বর জোরে হলেও সংযত এবং নম্র বলেই মনে হলো।

'কোথায় আবার?' ধীবর প্রত্যুত্তরে বললো, 'তোমাকে আবার সমুদ্রের দরিয়ায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছি শয়তান, যেখানে তুমি একহাজার আটশো বছর ধরে পচেছিলে। আর এখন আমি তোমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আল্লার বিচারে তোমার শেষ দিন ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত সেখানে তোমাকে থাকতে হবে। মনে আছে শয়তান, তোমাকে আমি তখন বলেছিলাম না, আমাকে হত্যা করলে আল্লা তোমাকে কিছুতেই রেহাই দেবেন না। এবার বুঝছো তো, আমার কথা কেমন অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেলো? এখন আল্লার দোয়ায় হয়তো তোমার পরমায়ু একটু বাড়তে পারে। কিন্তু মরতে তোমাকে হবেই! বাঁচার সব পথ তুমি নিজের হাতেই বন্ধ করে দিয়েছো। আল্লা এখন তোমার মরণ-বাঁচনের সমস্যাটা আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন: তুমি

মরো, ঐ জালার মধ্যে থেকে পচে পচে মরো, যেমন আমার কথা শোনোনি।'

'বিশ্বাস করো ধীবর, এবার তুমি আমাকে মুক্ত করলে, তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে দেবো। দেখো—'

'কি বললে, তোমাকে আবার আমি বিশ্বাস করবো? তোমাকে বিশ্বাস করা মানেই তো নিজের কবর খোঁড়ার ব্যবস্থা করা।' ধীবর মাথা নেড়ে বলে, 'আমার দৃষ্টান্ত সেই বাদশাহ য়ুনানের উজির আর হেকিম রুয়ানের (ভুল করে কেউ কেউ তাকে 'দুবান' বলে সম্বোধন করে থাকে) কিস্‌সার মতো।'

'কি রকম কিস্‌সা শুনি?' জালার ভেতর থেকে আফ্রিদি দৈত্যটা বলে, 'বাদশাহ য়ুনানের উজির কে, আর হেকিম রুয়ানই বা কে? আর তাদের কিস্‌সাই বা কি, বলো না শুনি।'

সেই কাহিনী বলতে শুরু করলো ধীবর অতঃপর :

উজির এবং হেকিম রুয়ানের কাহিনী



তাহলে বলি শোনো আফ্রিদি দৈত্য, অনেক, অনেক বছর আগে প্রাচীন যুগে রুস দেশের ফারস শহরে বাদশাহ য়ুনান রাজত্ব করতেন। শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন দারুণ প্রতাপশালী, প্রচুর ধন-দৌলতের অধিকারী। তার ছিলো অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত, প্রহরী, গুণমুগ্ধ উজির, আমীর-ওমরাহ এবং অনুগত প্রজাবৃন্দ, সারা দুনিয়ার মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করতো। কিন্তু তাঁর মনে সুখ ছিলো না। সুখ থাকবেই বা কি করে? তিনি যে ভয়ঙ্কর অসুখে ভুগছিলেন, সে আবার যে সে অসুখ নাকি? সারা অঙ্গে দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি। তামাম দুনিয়ার সব রথী-মহারথী হেকেম কোবরেজ তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে আহোরণ করা দামী দামী ওষুধ তাঁকে মুড়ি-মুড়কীর মতো খাইয়েছে, কিন্তু সেই অসুখ সারবার নাম নেই। বিজ্ঞান হার মেনে বসে আছে তাঁর সেই ব্যাধির কাছে। অবশেষে তাঁর শহরে এলো এক বয়স্ক হেকিম রুয়ান। প্রচুর জ্ঞানী-গুণী হেকিম। তার দাওয়াই নাকি কথা বলে থাকে। নানান ভাষায় তার অগাধ। পাণ্ডিত্য ছিলো গ্রীক, পার্শি, রোমান, আরবি এবং সিরীয় ভাষায় লেখা যে কোন কিতাব ছিলো তার কণ্ঠস্থ। জ্যোতিষবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যায় সমান পারদর্শী ছিলো। যে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি সম্বন্ধে তার দারুন অভিজ্ঞতা ছিলো, সেই সঙ্গে কোন্ অসুখে কোন্ গাছ-গাছড়া, জড়িবড়ি কাজে লাগাতে পারে, কিংবা তার গুণাগুণ সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিলো অগাধ।

সেই হেকিম শহরে কিছুদিন কাটাবার পর জানতে পারলো, বাদশাহ য়ুনানের ব্যাধি নাকি দুরারোগ্য, সেই ব্যাধি নাকি আল্লার দেওয়া শাস্তি, তামাম দুনিয়ার তাবড় তাবড় চিকিৎসক, হেকিম, কোবরেজ ব্যর্থ হয়েছে তাঁকে কুষ্ঠব্যাধি থেকে মুক্ত করতে। সারা রাত ধরে সে ভাবলো, বাদশাহকে কি করে সেই রোগ থেকে মুক্ত করা যায়। ভাবতে ভাবতে সেই রাত অবশেষে ভোর হয়, সকালের স্নিগ্ধ

আলোয় বাদশাহের চিকিৎসার কি নির্দেশ সে পেলো খোদা আল্লার কাছ থেকে সেই জানে। তবে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ভালো পোষাক গায়ে চাপিয়ে সে গিয়ে হাজির হলো বাদশাহ যুনানের কাছে। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বাদশাহের পায়ের নিচের ভূমি চুম্বন করলো সে। তারপর তাঁর সামনে কুর্নিশ করে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করে সে তাঁর আবেদন পেশ করতে গিয়ে শুধালো, 'জাঁহাপনা, আমি আপনার দুরারোগ্য ব্যাধির কথা অবগত হয়েছি, আর এও শুনেছি এ পর্যন্ত যতো সব চিকিৎসক আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে, তারা একে একে সবাই ব্যর্থ হয়ে সরে পড়েছে, প্রমাণ করেছে তারা অপদার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আমি প্রমাণ করবো, আপনার ব্যাধি কখনোই দুরারোগ্য নয়, আমি আপনার ব্যাধি সারিয়ে তুলতে পারি। তবে আমি আপনাকে কোন ওষুধ খাওয়াবো না, কিংবা লাগাবার কোন ওষুধও দেবো না, আমি একজন সামান্য হেকিম মাত্র, আপনার মতো একজন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বাদশাহকে আমার ওষুধ খেতে বলা তো পাগলের প্রলাপ বকা। তাই—

বাদশাহ যুনান তার প্রতিটি কথা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন, এবং যতো শুনছিলেন ততই যেন অবাক হচ্ছিলেন। হেকিম থামতে সঙ্গে সঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'খাওয়ার কোন ওষুধ দেবে না, লাগাবার কোন ওষুধ দেবে না, তাহলে আমার এই দুরারোগ্যব্যাধি সারবে কি করে হেকিম? যাইহোক, তোমার কথাবার্তা শুনে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। আল্লার দোয়ায় তুমি যদি আমার এই দুরারোগ্যব্যাধি সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে অঢেল ধন-দৌলতের অধিকারী করে দেবো। সেই অর্থে তুমি একা কেন, তোমার বিবি, পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি বংশানুক্রমে বিনা আয়াসে পায়ের ওপর পা রেখে হেঁসে-খেলে বাস করতে পারবে। আর তুমি হবে আমার একান্ত আপনজন আমার বিশ্বস্ত সঙ্গী ও দোস্ত।' তারপর বাদশাহ তাকে একটি অতি মূল্যবান পোষাক উপহার দিয়ে বলে, 'তুমি ঠিক বলছো হেকিম, বিনা ওষুধে তুমি আমার দেহের এই দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে তুলবে?'

'হ্যাঁ জাঁহাপনা, আপনার শরীরে কোন রকম কষ্ট না দিয়েই আমি আপনাকে সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলবো?' হেকিম তাঁকে আশ্বাস দিয়ে, বলে 'এখন আপনার হুকুম পেলেই আমি আপনার চিকিৎসা শুরু করতে পারি।'

'ও আমার দোস্ত হেকিম, আমার হুকুমের অপেক্ষা কেন, তোমার যখন খুশি, কাল থেকেই তো তুমি আমার চিকিৎসা শুরু করতে পারো, কেন পারো না দোস্ত?'

মাথা নুইয়ে হেকিম তার সম্মতি জানিয়ে বাদশাহের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে তার ভাড়া বাড়িতে ফিরে এলো। ঘর ভর্তি গাছ-গাছড়া, জড়িবড়ি, তৈরী ওষুধ আর চিকিৎসা সংক্রান্ত দামী দামী বই।

তারপর হেকিম নানান বইপত্র ঘেঁটে গাছ-গাছড়া ও জড়িবড়ি মিশিয়ে একটা সঠিক ওষুধ তৈরী করলো। সেই সঙ্গে একটা ফাঁপা ব্যাট ও বল বানিয়ে তৈরী ওষুধ ফাঁপা ব্যাটও বলের মধ্যে ঢেলে দিয়ে ব্যাটের হাতল লাগিয়ে দিলো। পরদিন সকালে ব্যাট ও বল যখন তৈরী হয়ে গেলো, তখন সে চললো বাদশাহ যুনানের প্রাসাদে। যথারীতি মাটিতে চুমু খেয়ে এবং বাদশাহের সামনে কুর্নিশ করে জানালো, 'জাঁহাপনা, এবার যে আপনাকে একবার প্যারেড গ্রাউণ্ডে যেতে হবে!'

বাদশাহ সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ার পোষাক গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লেন প্যারেড গ্রাউণ্ডের উদ্দেশে। তার সঙ্গে এলো, উজির, আমির ওমরাহ, ভক্ত প্রজাবৃন্দ এবং তাঁর নতুন দোস্ত হেকিম। প্যারেড গ্রাউণ্ডে এসে হেকিম তার রুগী বাদশাহ যুনানের হাতে ব্যাটটা তুলে দিয়ে দেখালো, কি ভাবে ঘোড়ার

পিঠে চড়ে নিচে মাটির ওপর ব্যাট চালাতে হবে বলে আঘাত করার জন্য। ভালো করে সে বুঝিয়ে দিলো বাদশাহকে মাটিতে বল ফেলে। আর একটা মূল্যবান উপদেশ দিতে ভুললো না সে, 'জাঁহাপনা, আপনাকে একটু কথা বলে রাখি, হাতের চেটো এবং শরীরটা যতক্ষণ না ঘেমে উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই অভিনব খেলা খেলে যেতে থাকবেন। তারপর এক সময় আপনার হাতের চেটো ঘেমে গেলে দেখবেন ফাঁপা ব্যাটের মধ্যে পুরে রাখা ওষুধটা আপনার ঘর্মাক্ত হাতের চেটোয় মিশে গেছে। এই ভাবেই আপনি আমার ওষুধের সংস্পর্শে আসছেন দেখবেন। ওতেই আমার চিকিৎসার একটা উল্লেখযোগ্য কাজ সমাধা হবে।'

এক সময় বাদশাহ য়ুনান ঘেমে নেয়ে উঠলেন, তাই দেখে হেকিম তাঁর সামনে হাজির হয়ে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলো, 'জাঁহাপনা, আপনার হাতের চেটোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, কেমন ঘেমে গেছে আমার ওষুধ মেশানো ব্যাটের স্পর্শে, ওতেই কাজ হয়েছে। আজ এই পর্যন্ত থাক। এবার আপনি প্রাসাদে ফিরে গিয়ে হামামে ঢুকে ভালো করে গোসল সেরে বিশ্রাম নিন। একটুও দেরী করবেন না। কাল আবার এমন সময়—'

সেই মতো বাদশাহ য়ুনান ঝটিতি প্রাসাদে ফিরে এসে হামামে প্রবেশ করলেন। ভালো করে গোসল করলেন। তারপর খোস মেজাজে তাঁর শয়নকক্ষে এসে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এতো গেলো বাদশাহ য়ুনানের কথা। ওদিকে হেকিম রুয়ান তার বাড়িতে ফিরে গিয়ে রোজকার অভ্যাস মতো বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিলো, খানিক পরে নিদ্রাদেবী তার চোখে ভর করলো।

পরদিন সকাল হতেই সে আবার বাদশাহ য়ুনানের রাজপ্রাসাদে এসে হাজির হলো, রাজপ্রাসাদে তখন প্রচণ্ড ভীড়, তিল ধারণের জায়গা ছিলো না। বাদশাহ তাকে সাদর আহ্বান জানালেন, হেকিম তাঁর দু'হাতের মধ্যবর্তী জায়গায় চুম্বন এঁকে দিয়ে বাদশাহের খুস মেজাজ দেখে একটি কবিতা আওড়ালো :—

শরীরের আর এক নাম মহাশয়,
যতোই তাকে প্রশ্রয় দাও,
সে হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর বেয়াদপ,
তখন তুমি মানুষ নয় যেন এক কচ্ছপ।
গতি শ্লথ, দেহ ক্লান্ত, মন বিষণ্ণ,
সময়ের প্রহর তুমি গোণো,
জেনে গেছো তোমার মৃত্যু আসন্ন,
অথচ ভেবে দেখেছো কি কখনো?'

হেকিমের কবিতার ছন্দের তালে তালে বাদশাহ য়ুনানের ঠোঁটে মৃদু হাসির ঝিলিক দেখা দেয়। দেহ মন তাঁর আগেই প্রসন্ন হয়েছিল, আজ সকালে হামাম থেকে বেরিয়ে আসার সময় আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন অনেকক্ষণ। আশ্চর্য! তাঁর দেহে কুষ্ঠব্যাধির চিহ্নমাত্র নেই। রুপোর মতো চকচকে দেহ, আনন্দে তাঁর বুক ফুলে গিয়েছিল তখন। সুখ নামে পাখীটা তখন তাঁর মনের চারপাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছিল খুশির আবেশ ছড়িয়ে। রাজদরবারে প্রবেশের সময় তার পারিষদবর্গ, উজির, আমির-ওমরাহ সবাই তাঁকে সেই দুরারোগ্য ব্যাধিমুক্ত দেখে অবাক চোখে তাকিয়েছিল, এ ওর মুখ চাওয়া-চায়ি করছিল। তারাই আবার এখন অবাক হয়ে হেকিম রাজদরবারে প্রবেশ করা মাত্র তাকে দেখতে পেয়ে চিরাচরিত প্রথা বিসর্জন দিয়ে তিনি নিজের সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। শুধু কি তাই, তাঁকে তিনি আদর করে কাছে ডেকে নিজের সিংহাসনের পাশের আসনে বসতে দিলেন। বাদশাহের আহারের জন্য দামী দামী ফল মিষ্টি এলো রেকাব সাজিয়ে, হেকিমের সঙ্গে ভাগ করে খেলেন সেই সব ফল-মিষ্টি তিনি। সারাটা

দিন তার সঙ্গ তিনি ত্যাগ করতে চাইলেন না। তাছাড়া রাত্রি নামলে পর বিদায় বেলায় তাকে তিনি দামী পোষাক এবং আকর্ষণীয় উপহার ছাড়াও দুহাজার স্বর্ণমুদ্রা ভেট দিলেন। এবং নিজস্ব ঘোড়ায় চড়িয়ে তাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজপ্রাসাদ ছেড়ে হেকিম চলে যাওয়ার পর বাদশাহ য়ুনান আবার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। আজ তাঁর মনে খুশির বন্যা হয়ে যাচ্ছে যেন। সারা দেহে স্ফূর্তির আমেজ, আর সেটা সম্ভব হয়েছে হেকিম রুয়ানের যাদুকরী চিকিৎসায়। কি আশ্চর্য, বাদশাহ ভাবেন, কোন ওষুধ না খাইয়ে, কিংবা কোন মলম না লাগিয়েই সে তাঁর কুষ্ঠব্যাধি সম্পূর্ণ সাবিয়ে দিলো? আহ, একি তাজ্জব কি বাত্? আল্লার দোয়ায় তার মতো একজন বিচক্ষণ হেকিমকে তিনি একাধারে তার চিকিৎসক ও দোস্ত দুই-ই পেয়ে গেছেন। তাঁর নসিব নিশ্চয়ই ভালো, তাই তো এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটলো। হেকিম ইনসান নয়, সে যেন বেহস্তের দূত হয়ে তাঁর কাছে এসেছে খোদার হুকুম মতো। বাদশাহ নিজের মনে বলেন, 'এমন উপকারী লোককে সম্মান জানানো আমার একান্ত কর্তব্য. তাকে মূল্যবান উপহার দিয়ে খুশি না করলে তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। এই হেকিমকে আমি আমার জীবনের বাকী দিনগুলি আমার একান্ত প্রিয়জন, দোস্ত হিসেবে পেতে চাই।'

সেই রাত্রে বাদশাহ অনেকদিন পরে নির্ভাবনায় মনেরও দেহের জড়তা কাটিয়ে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর ব্যাধিমুক্ত দেহে একটা শান্ত সৌম্য ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি গোসল সেবে খুশ মেজাজে বাদশাহ তাঁব সিংহাসনে এসে বসলেন। তাঁর দুপাশে উজির, আমির-অমাত্যরা বসলো।' তাদের দিকে আজ যেন তাঁর কোন লক্ষ্য নেই, লক্ষ্য নেই রাজকার্য পরিচালনা করা, প্রজাদের ওপর তাঁর হুকুম জারী করা, তাদের বিচার করা। আজ যেন তিনি অন্য মানুষ, অন্য মন নিয়ে সিংহাসনে এসে বসেছেন। আসলে তখন যে তাঁর সারা মন আচ্ছন্ন হয়েছিল হেকিম রুয়ানের চিন্তায়। সে এখনো এলো না কেন? শেষে থাকতে না পেরে হেকিমের খোঁজ কবলেন তিনি। একটু পরেই সে এলো, এবং তাঁর সম্মুখের ভূমির উপর চুমু খেলো। বাদশাহ তাঁকে খুব খাতির করে তাঁর পাশের আসনে বসালেন, তার সঙ্গে আহারাদি সমাধা করলেন, আর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হেকিম তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করলো খোদা আল্লার কাছে। তার হাতে উপহারের সামগ্রী তুলে সারাটা দিন তার সঙ্গে গল্প-গুজন করে কাটিয়ে দিলেন। তারপব তার পারিশ্রমিক হিসেবে পাঁচটি ভালো পোষাক এবং এক হাজার দিনারের একটা থলে হেকিমের হাতে তুলে দিলেন। বাদশাহের প্রতি অজস্র সুক্রিয়া এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হেকিম তার বাসায় ফিরে যায় সেদিনের মতো।

তাবপরের দিন সকালে বাদশাহের রাজদরবারের চিত্রটি আগের দিনেরই অনুরূপ। সেই উজির, আমির-অমাত্য তাঁর চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, বাদশাহ তাদের বসার জন্য হুকুম কবলে তবেই তার দু'পাশে আসন গ্রহণ করলো। অন্য দিনের মতো হেকিম বাদশাহের সামনের মাটিতে চুম্বনের রেখা এঁকে দিলেন।

কদিন ধরেই উজিরদের উজির, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্য করছিল, বাদশাহ য়ুনান যেন একটু বেশী বাড়াবাড়ি করেছেন হেকিমকে অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়ে। সেই হিংসায় মনে মনে জ্বলে-পুড়ে করছিল সে। সেই উজির আজ যখন দেখলো, হেকিমকে বাদশাহ কাছে ডেকে আবাব তাঁর পাশে নির্দিষ্ট আসনে বসালেন, তাকে মূল্যবান জিনিস সব উপহার দিলেন, তখন সে আর স্থির থাকতে পারলো না। হিংসায় উন্মত্ত হয়ে মনে মনে সে স্থির করলো, যে

করেই হোক হেকিমকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না, অবিলম্বে তার ক্ষতি করতে হবে। নিজের মনে সে বললো, 'প্রত্যেক মানুষের মনেই অপরের প্রতি ঈর্ষা ওঁৎ পেতে বসে থাকে। হিংসায় অপরের সর্বনাশ করার প্রবণতা সহজাত। শক্তিধর পুরুষ প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করে থাকে, আর দুর্বল-চিত্তের পুরুষ তার দুর্বলতা গোপন করে রাখে।'

কিন্তু উজিরের উজির সেরকম দুর্বলচিত্তের মানুষ নয়। বাদশাহের সিংহাসনের সামনে এগিয়ে তাঁর দু'হাতের নিচেকার ভূমিতে চুম্বন করে শুধালো, 'জাঁহাপনা, আপনি হলেন গিয়ে সর্বকালের সর্বময় সম্রাট। আপনার দোয়ায় আজ আমি আপনার রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছি। গুস্তাকী মাফ করবেন এই অধম যদি তার অজান্তে আপনাকে কিছু পরামর্শ দিয়ে ধৃষ্টতা দেখায়। এখন আপনি মেহেরবানি করে হুকুম করলেই আমি আমার মুখ খুলতে পারি।'

উজিরের কথায় বাদশাহ কেমন যেন একটু



অস্বস্তিবোধ করতে থাকেন। তবু সেই ভাবটা কোন রকমে গোপন করে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তা তোমার পরামর্শই কি শুনি?'

'জাঁহাপনা, যদিও আমার ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না, তবু আপনাকে না বললেও বড় গুণাহ বলে আমি মনে করি। তাই বলছি, জ্ঞানী-গুণীরা বলে গেছেন, অজ্ঞাত কুলশীলকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই, অজানা-অচেনা লোককে দোস্ত হিসেবে গ্রহণ করলে শেষে ঠকতে হয়, কে বলতে পারে সে পরম শত্রু নয়? অথচ আমি ক'দিন থেকে লক্ষ্য করছি একজন শত্রুকে পরম মিত্র ভেবে জাঁহাপনা তার পাওনার অতিরিক্ত মহামূল্যবান সম্পদ উপহার দিচ্ছেন, তাকে আপনজন হিসেবে অতিরিক্ত খাতির-যত্ন করছেন। এই সুযোগে সে তার আসল পরিচয় গোপন করে আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার চেষ্টা করছে। এ অবস্থায় আমার আশঙ্কা, জাঁহাপনার জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা যেন দেখতে পাচ্ছি।'

উজিরের এমন সব অপ্রাসঙ্গিক কথা শুনে বাদশাহ দারুণ অস্বস্তিবোধ করেন, বিরক্ত হয়ে বলেন, 'ভণিতা রাখো, স্পষ্ট করে বলো, কাকে তোমার সন্দেহ, কার কথা তুমি বলতে চাইছো?'

'জাঁহাপনা, গোস্তাকী মাফ করবেন, ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে। আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি আর অযথা ঘুমিয়ে থাকবেন না, উঠুন, জেগে উঠুন! চোখ চেয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, আপনার দানের অনুপযুক্ত গ্রহীতা আপনার পাশেই উপবিষ্ট আছেন।' হেকিম রুয়ানের দিকে সে এবার সরাসরি আঙুল দেখিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, আমি ঐ হেকিম সাহেবের কথাই বলছি!'

বাদশাহ য়ুনান এবার রেগে গর্জে উঠলেন, 'তুমি বড় ঈর্ষাপরায়ণ উজির! অন্য সবার থেকে এই হেকিম আমার সব থেকে আপনজন, অন্য সব ডাক্তার, কবরেজ, হেকিমরা তো আমাকে জবাব দিয়ে বলেছিল, আমার সেই দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি নাকি সারবার নয়! অথচ এই হেকিমই আমার সেই রোগ নিরাময় করে এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছে। ওর মতো এমন ভালো দোস্ত পাওয়া ভাগ্যের কথা, আমার নসিব ভালো, তাই ঠিক সময়ে ওর সঙ্গে আমার মুলাকাত হয়ে গেছে। আর সেই লোকের নামে তুমি আমার মনে সন্দেহ জাগাবার চেষ্টা করছো? ছিঃ ছিঃ উজির, দিন দিন তোমার মন কেমন হীন হয়ে যাচ্ছে।' বাদশাহ য়ুনান ভ্রূকুঁচকে আবো বললেন, 'শোনো উজির, আজ ও আমার রাজ্যে স্বাধীনভাবে তার পসার জমাবে, মাঝে মাঝে আমার রাজকোষ থেকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা মাসোহারা হিসেবে পাবে। তবে তোমার পরামর্শ শুনলে ওর ভাগ্য অন্য রকম হবে। ওর প্রতি তোমার হিংসের কথা শুনে এই প্রসঙ্গে বাদশাহ সিন্দবাদের গল্প আমার মনে পড়ে গেলো—'

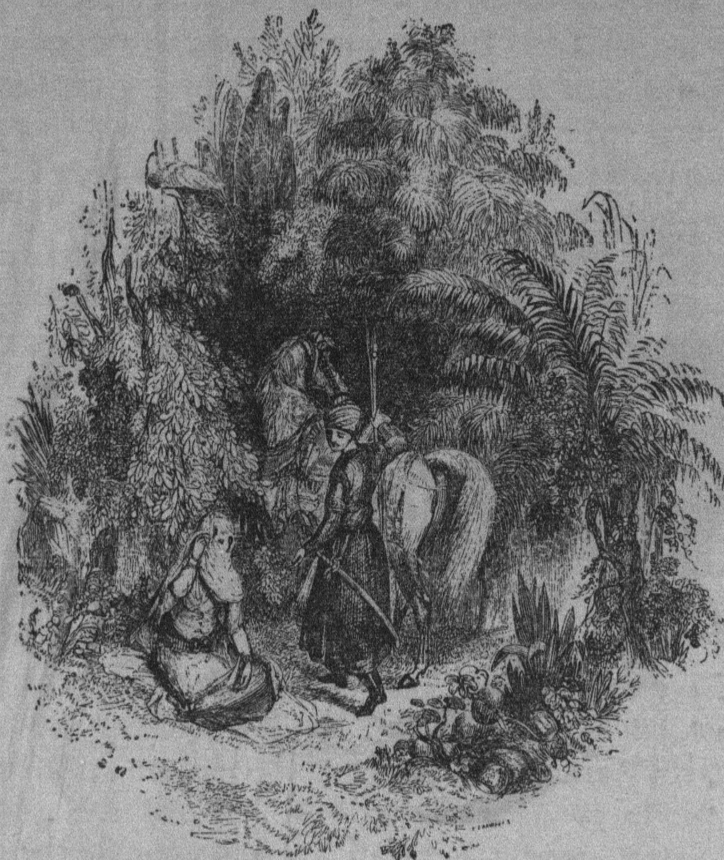
এই পর্যন্ত বলে শাহরাজাদ তার গল্পের সাময়িক ভাবে ইতি টানলো। প্রথম ভোবের আলো এসে পড়েছিলো বাতায়নে তখন, বাদশাহ শাহরিয়ারের সঙ্গে তার চুক্তি মতো কাহিনীর মাঝপথে তাকে থামতে হলো। তবু খুশিতে ডগমগ হয়ে তার সহোদরা দুনিয়াজাদ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো, 'ও দিদি, কি মিষ্টি তোমার গল্প, গায়ে শিহরণ জাগিয়ে দেয়, মনে রেশ রেখে যায়।'

উত্তরে শাহারজাদ মৃদুভাষে বলে, 'তা এ আর এমন কি সুন্দর গল্প বোন, বাদশাহ যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, আগামীকাল রাত্রে এর থেকেও চমকপ্রদ গল্প আমি তোমাকে শোনাবো।'

তার কথা শুনে বাদশাহ শাহরিয়ার আপন মনে বলতে থাকেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, গল্পগুলি দারুণ মজাদার, শাহরাজাদের ঝুলির সব কাহিনীগুলি না শোনা পর্যন্ত তাকে কোতল আমি করছি না।' আজ তিনি তার মুখ থেকে 'হেকিম এবং য়ুনানের কাহিনী' শুনে এতোই মোহিত হয়ে পড়েছিলেন যে, শাহরাজাদকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে একটা গভীর









চুম্বন এঁকে দিলেন তার পাতলা দুটি ঠোঁটের ওপর। তারপর তাকে তিনি তাঁর নরম মখমলের বিছানার ওপর টেনে আনলেন। রুদ্ধ আবেগে বন্ধ হয়ে গেলো তাঁর চোখের পাতা। পোষাকের খসখস শব্দ, তারপরেই তাঁর শক্ত মুঠোয় ধরা পড়লো শাহারাজাদের নিটোল কবোষ্ণ স্তনদ্বয়। সমস্ত শরীর ছেয়ে নামলো বিক্ষুব্ধ একটা আলোড়ন। বিপুল শিহরণে বাদশাহ তার মাথাটা নিবিড় করে চেপে ধরলেন তাঁর বুকের মধ্যে। অস্ফুট গলায় বলে উঠলেন, 'ভেবেছিলাম, তোমার মুখ থেকে এতো ভালো কিস্‌সা শুনে আজ আর তোমার ওপর অত্যাচার করবো না, সুন্দরী, আমি যে আর পারছিনা। নাও, এবার চটপট তৈরী হয়ে নাও, বেহস্তের সুখ পেতে চাই আমি তোমার মধ্যে দিয়ে—'

'এ আপনি কি বলছেন জাঁহাপনা, আমি তো আপনার বাঁদী, আপনার হুকুম মতো কাজ করার জন্যই তো আমাদের জন্ম।' বাদশাহ শাহরিয়ার আধশোয়া অবস্থায় শুয়েছিলেন তার পাশে। শাহারাজাদ তাকে ফিরে আবার বুকের ওপর টেনে নিতে যান। তার উজ্জ্বল একরাশ কালো চুল বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়লো বাদশাহের সারা বুকে। 'আপনি একটু চুপটি করে শোন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

শাহরিয়ারের চোখ দুটো তখন কামনায় আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল। শাহরাজাদ ততক্ষণে ব্লাউজ আর ঘাঘরাটা খুলে ফেলেছিল, অন্তর্বাসের ফিতে দুটো আলগা করে দিতে গিয়ে বাদশাহের দিকে একবার চোখ মেলে তাকাতেই শিউরে উঠলো তো। জানোয়ারটা এবার তার নগ্ন শরীরটাকে ছিঁড়ে খাবে।

আজ একটু বেলাতে ঘুম ভাঙ্গলো শাহরিয়ারের। চোখ মেলে তাকালো ঘুমন্ত শাহরাজাদের দিকে, নগ্ন দেহ, দলিত স্তন; সু-উচ্চ স্তনজোড়ার মাঝে নিচে ঢল নামা উপত্যকা, সে ঢল নেমে গেছে নাভীর অনেক নিচে এক গভীর খাদে, খাদ নয় যেন এক উষ্ণ আগ্নেয়গিরি, যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। এই মুহূর্তে সেই বিস্ফোরণের উত্তাপ পরখ করার লোভটা রাতের অপেক্ষায় রেখে দিয়ে বাদশাহ শাহরিয়ার পালঙ্ক ছেড়ে নেমে এলেন। তারপর গোসল সেরে নিজেকে তৈরী করে নিয়ে চলে গেলেন রাজদরবারে, সেখানে অপেক্ষা করছে আমির-ওমরাহ উজির এবং প্রজাদের দল, তাদের নানা আর্জি ও অভিযোগ নিয়ে।

সারাটা দিন রাজকার্য পরিচালনা করে রাত নামতেই আবার তিনি ফিরে এলেন তাঁর প্রাসাদে, নিজের নিভৃত শয়নকক্ষে।

সেদিন রাত্রে শাহরাজাদের সহোদরা আবার আব্দার করে বসলো, 'দিদি, তোমার যদি ঘুম না পেয়ে থাকে, তোমার সেই সুন্দর মিষ্টি গল্পটা এবার শেষ করবে?'

শাহেনশাহ শাহরিয়ারের দিকে আড় চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে শাহরাজাদ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'তারপর সুলতান য়ুনান কি বললো তাহলে শুনুন শাহজাদা—'

'ছিঃ উজির, তুমি এতো নিচে নেমে গেছো? আমি বেশ বুঝতে পারছি, একজন সাচ্চা মানুষের ওপর অন্যায় ভাবে তুমি হিংসা করছো। আগে তোমার দিল সাচ্চা করো, তারপর আমাকে তোমার মতলবের কথা বলতে এসো। তা না হলে তোমার কথা শুনে হেকিম রুয়ানের গর্দান নিলে আমার অবস্থাও ঠিক সেই সুলতান সিন্দবাদের মতো হবে। তিনিও তাঁর উজবুক উজিরের কথায় বিশ্বাস করে তাঁর প্রাণের দোস্ত বাজপাখির টুঁটি টিপে হত্যা করেছিল।

'আমার গুস্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা', নত মস্তকে উজির শুধোয়, 'কি সেই কাহিনী সুলতান সিন্দবাদের, বলবেন আমাকে?'

অতঃপর শাহেনশাহ সিন্দবাদের কাহিনী বলতে শুরু করলেন :

কথিত আছে (খোদা আল্লা সব জানেন, আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত তাঁর কণ্ঠস্থ) ফার দেশে এক শাহেনশাহ বাস করতেন। সব সময় তিনি আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকতেন, বিশেষ করে শিকারে তাঁর দারুণ আগ্রহ ছিলো। আর তাঁর সব সময়ের সাথী থাকতো একটি বাজপাখি, যেখানেই যান না কেন, সেই বাজপাখিটা তিনি তাঁর হাতের মুঠোয় নিয়ে ভ্রমণ করতেন, এমন কি রাতের শিকারে গেলেও তাকে তিনি হাতছাড়া করতেন না ভুলেও। তার গলায় সোনার একটা পাত্র ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, যাতে করে তৃষ্ণা পেলেই সে সেই পাত্র থেকে জল খেতে পারে নিজের থেকে। এমনি গভীর ভালোবাসা ছিলো তাঁর বাজপাখির সঙ্গে। তা একদিন শাহেনশাহ সিন্দাবাদ তাঁর প্রাসাদে একান্ত নিভৃতে বসে আছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর বাজপাখির প্রধান নোকর এসে শুধালো, 'শাহজাদা, আজকের দিনটা পাখি শিকারের পক্ষে খুব উপযুক্ত, যাবেন নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিলেন শাহেনশাহ, এবং ঠিক হলো, তিনি তাঁর প্রিয় সাথী বাজপাখিটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন শিকারে। নির্দিষ্ট সময়ে শাহেনশাহ চললেন পাখি শিকারে, সঙ্গে লোক-লস্কর, পাইক-পেয়াদা নিয়ে।

পাখি শিকারের জায়গাটা বেছে নেওয়া হলো পাহাড়ী এক উপত্যকায়। উপযুক্ত জায়গাই বটে। মনোরম দৃশ্য, পাখিদের কাকলী, বুনো ফুলের সুবাস ভেসে আসে, গাছের পাতায় পাতায় হাওয়ার শিহরণ, অকৃপণ হাতে প্রকৃতি সেখানে তার সমস্ত সৌন্দর্য যেন ঢেলে দিয়েছে। বেশ কায়দা করে সেখানে ফাঁদ পাতা হলো জাল বিছিয়ে পাখি ধরার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো কোন পাখি নয়, একটা গজলা-হরিণ ফাঁদ পাতা জালে ধরা পড়েছে, তা দেখে শাহেনশাহ চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'যে ঐ গজলা-হরিণীটাকে পালাবার সুযোগ করে দেবে, কিংবা যার মাথার ওপর দিয়ে টপকে পালাবে, তাকে আমি জ্যান্ত রাখবো না, কোতল করবো।' বলেই তিনি জাল গোটানোর ফরমান দিলেন।

অতঃপর জাল গোটানো হলো, গজলা-হরিণী-টাকে জালমুক্ত করে শাহেনশাহের সামনে উপস্থিত করতেই সে তাঁর সামনে এসে পিছনের দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের পা দুটো তার বুকের কাছে ঠেকাতে যায়। সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যটা দেখে মনে হয়, সে বুঝি শাহেনশাহের সামনের মাটিতে চুম্বন করে তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। শাহেনশাহ ভ্রু কুঁচকে তন্ময় হয়ে গজলা-হরিণীর কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন। বোধহয় কোন এক সময়ে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, গজলা-হরিণীটার দিকে লক্ষ্য ছিলো না তাঁর। তাঁর সেই অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে আর এক বিস্ময়কর কাজ সে করে বসলো। শাহেনশাহের মাথা টপকে তড়াক করে লাফ দিয়ে যেন রকেটের গতিতে এক ছুটে পালিয়ে গেলো। তার চালাকী দেখে তো শাহেনশাহ থ! একটা জানোয়ারের এতো বুদ্ধি? তার মতো এক বিচক্ষণ শাহেনশাহের চোখে ধুলো দিয়ে তাঁর হাতের নাগালের বাইরে চলে গেলো! জানোয়ারটার উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করবেন নাকি

জানোয়ারটার বেয়াদপির জন্য তাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। ওদিকে খানিক আগে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যার হেপাজত থেকে গজলা-হরিণীটা হাত ছাড়া হয়ে যাবে, তাকে তিনি কোতল করার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু—

কিন্তু এখন তো তাঁর নিজের অন্যমনস্কতার জন্যই জানোয়ারটা পালিয়ে গেলো। এখন তাহলে কে কার গর্দান নেবে? অতঃপর তিনি তাঁর সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্করদের দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে চমকে উঠলেন, দেখলেন, তারা সবাই তাঁর দিকে আঙুল উঁচিয়ে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। ঘাবড়ে গিয়ে তিনি তাঁর উজিরের উদ্দেশে বলেন, 'উজির, আমার লোকজন সব কি বলাবলি করছে?'

উজির তখন নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে জবাব দেয়, 'জাঁহাপনা, ওরা আপনার হুকুমের কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছে। একটু আগে আপনিই তো বলেছিলেন, যার মাথা টপকে ঐ গজলা-হরিণীটা পালিয়ে যাবে তার গর্দান নেওয়া হবে।'

'তার মানে আমার গর্দান নেবে ওরা?' শাহেনশাহ তাঁর নিজের কথা নিজেই তাকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, 'তাহলে আমি চললাম ঐ জানোয়ারটাকে ধরবার জন্য। তাকে হাতের মুঠোয় না পাওয়া পর্যন্ত আমি থামবো না। আমি তাকে ঠিক ফিরিয়ে আনবোই, দেখো!'

শাহেনশাহ তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছোটালেন সেই গজলা-হরিণীর পিছু ধাওয়া করে, বাজপাখিটা তার হাতেই রইলো। তাঁর উজির, আমির-ওমরাহ, সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কররা সেই মজার দৃশ্যটা দেখে উপভোগ করতে থাকে। আগে ভাগে গজলা-হরিণী ছুটছে, তার পিছু পিছু তাদের রাজ্যের একছত্র অধিপতি নিজের জান বাঁচানোর তাগিদে একা একা ছুটছেন তাকে ধরবার জন্য। অথচ তাঁর হাতের সামান্য একটা অঙুলি হেলেন তাঁর সমস্ত সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর, পাইক পেয়াদারা ছোটে যুদ্ধ করতে, প্রাণ বিসর্জন দিতে। একি খেল তকদিরের? খোদা নিশ্চয়ই আড়াল থেকে তাঁর নসিবের এই হয়রানি দেখে হাসছেন মুচকে মুচকে। শায়েনশাহ অবশ্য নিজের এমন নিষ্ঠুর নসিব দেখেও বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালেন না, বরং বাড়তি উৎসাহ নিয়ে ছুটতে থাকেন সেই গজলা-হরিণীর পিছু পিছু।

এক সময় একটা গভীর খাদের ধারে এসে উপস্থিত



হলেন তিনি, আর এক পা এগোলেই মৃত্যু তাঁর অবধারিত। সে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়ানো। গজলা-হরিণী জাতে জানোয়ার। পাহাড়ের প্রতিটি চড়াই উতরাই, খাদ-খন্দর তার নখদর্পণে, তাই সে সেই ভয়ঙ্কর খাদের নিচে লাফ দিতে যাওয়ার জন্য সামনের পা দুটি বাড়াতে যায়। কিন্তু তার আগেই শায়েনশাহ তাঁর অতি বিশ্বস্ত জিগরী

দোস্ত বাজপাখিটাকে হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিছু একটা সে করবে তাঁর জন্য এই ভেবে হয়তো। হ্যাঁ, এক অসাধ্য কাজই সে করলো তার মনিবের জন্য। বাজপাখিটা তার ডানা মেলে দ্রুত গতিতে উড়ে গিয়ে হাজির হলো গজলা-হরিণীর সামনে, তারপর সে তার ধারালো ঠোঁট দুটো সিঁধিয়ে দিলো গজলা-হরিণীর চোখের মধ্যে। অব্যক্ত একটা যন্ত্রণায় কাঁতরে উঠলো সে, তার ভারী দেহটা খাদের নিচে পড়তে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে আটকে যায়। শাহেনশাহ ছুটে গিয়ে ধাতুর তৈরী দস্তানা পরা তাঁর হাতের মুঠি দিয়ে আঘাত করলেন গজলা-হরিণীর মুখের ওপর। সেই মুহূর্তে তার প্রাণটা বেরিয়ে গেলো, তার নিস্তেজ দেহটা এলিয়ে পড়লো মাটির ওপর। শায়েনশাহের মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায় তখন। তাঁর জান তাহলে বাঁচলে, আবার তিনি তাঁর রাজ্য শাসন করতে পারবেন।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দ্রুত পায়ে সেই নিহত গজলা-হরিণীর কাছে ছুটে গেলেন। খাপ থেকে তলোয়ার বার করে প্রথমেই তিনি এক কোপে তার মুণ্ডুটা দিলেন উড়িয়ে। মুণ্ডুহীন গজলা-হরিণীর দেহটা তাঁর ঘোড়ার জিনের নিচে ঝুলিয়ে ফিরে চললেন।

তখন ভর দুপুর। মাথার ওপর কাট-ফাটা রোদ্দুর। দারুণ তৃষ্ণায় সিন্দবাদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, তাঁর ঘোড়াটাও তৃষ্ণায় ছটফট করতে থাকে, পথ আর চলতে পারে না সে! চারিদিক তাকিয়ে দেখেন সিন্দবাদ, কোথাও পানির চিহ্ন মাত্র নেই, সমস্ত পাহাড়ী নদী-নালা, ঝর্না শুকিয়ে গেছে প্রখর রৌদ্রতাপে। অথচ এদিকে পিপাসায় তাঁদের প্রাণ যায় যায়। সিন্দবাদ পানির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘোরেন, কিন্তু কোথাও পানির হদিশ পেলেন না। অবশেষে একটা বিরাট বৃক্ষের নিচে এসে দাঁড়ালেন খর রৌদ্রতাপ থেকে নিজেকে এবং তাঁর ঘোড়াটাকে বাঁচানোর জন্য। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন গাছের ওপর থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে গলা মাখনের মতো, আর সেই জল নিচে মাটির ওপর ছোট খাটো একটা জলাশয় সৃষ্টি করেছিল। সিন্দবাদের জিভে পানি দেখা দিলো। যাক্ এতক্ষণে পানির সন্ধান পাওয়া গেলো তাহলে। তাড়াতাড়ি বাজপাখির গলা থেকে চেন লাগানো সোনার পাত্রটা খুলে নিয়ে সেই জলাশয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন পানি তুলে আনার জন্য। কিন্তু জলটা কেমন যেন আঠা আঠা মতো। তা হোক, পানি তো! ওতেই চলবে, পিপাসা তো মেটানো যাবে। প্রথমে তিনি সেই পানি পাত্রে ভরে বাজপাখিটাকে খাওয়াতে গেলেন, কিন্তু তার ডানার ঝাপটায় পাত্রটা উলটে দেয়। গাছ থেকে পড়া সেই জল আবার তিনি ভর্তি করলেন সেই সোনার পাত্রে, তার সঙ্গী বাজপাখিটা খুব তৃষ্ণার্থ ভেবে দ্বিতীয়বার তার মুখের সামনে পানি ভর্তি পাত্রটা তুলে ধরলেন। কিন্তু এবার ও সে সেই পানি ভর্তি পাত্রটা তার ডানার ঝাপটায় উল্‌টে দিলো।

বাজপাখির অমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার দেখে সিন্দবাদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তৃতীয়বার তিনি সেই পাত্রে পানি ভরলেন বটে, তবে এবার তিনি তাঁর তৃষ্ণার্ত ঘোড়াটাকে পানি খাওয়াতে গেলেন। কিন্তু এবারও বাজপাখি তার ডানার ঝাপটা দিয়ে পাত্রটা ফেলে দিলো, পানি গড়িয়ে পড়লো মাটির ওপর।

এবার শায়েনশাহ সত্যি সত্যি তার ওপর ক্রুদ্ধ হলেন, আর তার গুণাহ্ মাফ করা যায় না। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে তিনি বললেন, 'আল্লা তোমাকে বিভ্রান্ত করছেন বার বার, হতভাগ্য পাখি তুমি! তুমি আমাকে তৃষ্ণা মেটাতে দিলে না, নিজের তৃষ্ণা মেটালে না, এমন কি আমার ঘোড়াটাকেও তার তৃষ্ণা মেটাতে দিলে না। দাঁড়াও তোমার বেয়াদপির মজা আমি দেখাচ্ছি।' বলে রাগে উত্তেজনায় খাপ থেকে তালোয়ার বার করে বাজপাখির ডানা দুটো কেটে উড়িয়ে দিলেন মুহূর্তে। তার দেহের ক্ষতস্থান

থেকে রক্ত ঝরছিল অঝোর ধারায়, কিন্তু তাতেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই, সে তখন মাথা তুলে গাছের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলো, 'ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখুন প্রভু, গাছে কি ঝুলছে?'

চকিতে চোখ তুলে ওপর দিকে তাকাতেই সিন্দবাদ দেখলেন অসংখ্য বিষধর সর্প গাছের ডালে ডালে ঝুলছে, আর তাদের মুখ থেকে বিষ মেশানো লালা ঝরে পড়ছে নিচে, তা তিনি পানি ভেবে জলাশয় থেকে তুলে তৃষ্ণা মেটাতে যাচ্ছিলেন! বাজপাখির খণ্ডিত ডানা দুটোর দিকে তাকিয়ে তাঁর বুকটা ব্যথায় মথিত হয়ে উঠলো, না জেনে সে বাজপাখিকে সময় বাজপাখিটা তাঁর হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেলো। নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে সিন্দবাদ তার বুকের ওপর হাত রাখলেন, কিন্তু তখন সব শেষ; ধড়ে তার প্রাণ ছিলো না। শাহেনশাহ ডুকরে কেঁদে উঠলেন বাচ্চা ছেলের মতো, বিড়বিড় করে পাগলের মতো প্রলাপ বকতে থাকলেন তিনি, 'ওর মৃত্যুর জন্য আমি, হ্যাঁ আমিই দায়ী। যে আমার জান বাঁচালো, আমি নিজের হাতে তাকে খুন করলাম। ছিঃ ছিঃ এ আমি কি করলাম আল্লা?' অনুতাপের অনলে জ্বলে পুড়ে মরতে থাকলেন শাহেনশাহ সিন্দবাদ।



শাস্তি দেওয়ার জন্য দারুণ অনুতাপ হলো তাব মনে।

মনের দুঃখে শায়েনশাহ ফিরে এলেন তাঁবুতে যেখান থেকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপর বাবুর্চির দিকে মৃত গজলা-হরিণীর দেহটা ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বললেন, ভালো করে এর মাংস পাকাও।'

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে একটা চেয়ারের ওপর গিয়ে বসলেন তিনি। ডানাহীন বাজপাখিটা তখন তার হাতের মধ্যেই ধরা ছিলো, তখনো তার ক্ষতস্থান থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছিল। হঠাৎ এক

'এই হলো শাহেনশাহ সিন্দবাদের নির্বুদ্ধিতার কাহিনী', এই পর্যন্ত বলে বাদশাহ য়ুনান উজিরকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'এর পরেও কি তুমি বলবে, আমার ত্রাণকর্তা, আমার দোস্ত হেকিম রুয়ানকে তাঁর রক্ষক এবং একান্ত আপনজন দোস্ত বাজপাখিকে আমি খতম করবো?'

'কিন্তু জাঁহাপনা, আপনার এই কাহিনীর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক আছে, তা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন—'

শাহেনশাহ তাকে বোঝাবার জন্য আর একটা গল্পের অবতারণা করলেন :

স্বামী এবং একটি তোতাপাখির গল্প

এক সওদাগর পরমা সুন্দরী এক যুবতীকে শাদী করে। সত্যি, মেয়েটি যেন বেহস্তের পরী, যেমন অপূর্ব তার রূপ তেমনি দেহ-সৌষ্ঠব, ভরা যৌবন, কামনা-বাসনায় ভরপুর, আয়ত চোখের চাহনি দিয়ে মেয়েটি তার সওদাগর স্বামীকে যেন বশ করে রেখেছিল, শাদীর পর থেকে দেশের বাইরে কখনো যায়নি সে। সুন্দরী বিবির রূপে একাধারে যেমন সে গর্বিত, আবার ঈর্ষান্বিতও বটে। তার আশঙ্কা, তার অনুপস্থিতে অন্য কোন পুরুষ যদি তার যুবতী বিবির রূপ ও যৌবনের স্বাদ পরখ করে বসে! নারী জাতটাকে বিশ্বাস নেই, বিশেষ করে তো সে যদি সুন্দরী হয়। একটু চোখের আড়াল করেছো কি অমনি সে তোমার মনের আড়াল হয়ে যাবে, তখন সে নিঃসংকোচে অন্য পুরুষের বক্ষতলে আশ্রয় খুঁজবে, তোমার অভাব তাকে দিয়ে পুষিয়ে নেওয়ার জন্য। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় মেয়েদের সম্বন্ধে সওদাগরের মনে এমনি একটা ধারণা জন্মেছিল। সেই সওদাগর একদিন তার সুন্দরী বিবিকে ছেড়ে দেশের বাইরে যেতে বাধ্য হলো। তবে যাওয়ার আগে সে বাজার থেকে একশো স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে একটি স্ত্রী তোতাপাখি কিনে নিয়ে এলো বাড়িতে তার বিবির অভিভাবিকা হিসেবে রাখার জন্য। উদ্দেশ্য বিদেশ থেকে সফর করে বাড়ি ফিরে এলে সে যাতে তার অনুপস্থিতিকে বাড়িতে কি কি ঘটেছিল তার আনুপর্বিক ঘটনার বিবরণ দিতে পারে। কারণ এ ধরনের পাখির আদতই হলো মনিবের অনুপস্থিতে যা সে দেখে কিংবা শোনে ভোলে না কখনো, তার ঠিক ঠিক বর্ণনা দেয় মনিব বাড়ি ফিরে এলে।

তা তখন হলো কি তার সেই সুন্দরী যুবতী বিবি যেন তার হাতে বেহস্ত পেলো। সে তখন এক সুপুরুষ তুর্কী যুবকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। এই সুযোগ, ভাবলো সে। স্বামীর অনুপস্থিতি সেই যুবকটি তার কাছে নিয়মিত আসতে শুরু করলো, দিনের বেলায় আমোদ-আহ্লাদে তার সঙ্গে কাটিয়ে রাতের অন্ধকারে সওদাগরের বিবি তাকে তার শয্যা সঙ্গী করে সারা রাত ধরে স্ফূর্তি করে কাটাতে থাকলো। যুবকটি তার খুশি মতো সওদাগরের বিবির দেহ সম্ভোগ করলো রাতের পর রাত ধরে। মেয়েরা যে স্বেচ্ছায় ধর্ষিতা হতে চায়, সওদাগরের স্ত্রী সেটা প্রমাণ করলো রাতের পর রাত সেই যুবকটির সামনে নিজেকে বসন মুক্ত করে।

তারপর সওদাগর একদিন বাড়ি ফিরে আসে তার বানিজ্য শেষে। বাড়িতে ফিরেই সে সেই তোতাপাখির সামনে গিয়ে হাজির হয় এবং তার কাছ থেকে জানতে চায় তার বিবির স্বভাব চরিত্র কেমন সে দেখলো তার অনুপস্থিতিতে। সঙ্গে সঙ্গে সেই তোতাপাখিটা উত্তর দেয়, 'তোমার বিবির একজন পুরুষ-বন্ধু তোমার অনুপস্থিতিতে এ বাড়িতে আসতো এবং তোমার বিবির সঙ্গে রাত কাটাতো।'

সওদাগর তো সেই দুঃসংবাদটা শুনে রেগে অগ্নিশর্মা। বিবির কাছে ছুটে গিয়ে জানতে চায়, এসব কি শুনছে সে? তার সতীত্বের প্রমাণ দিতে না পারলে সে তার বিবির গর্দান নিতে কসুর করবে না।

সওদাগরের বিবির সন্দেহ হলো, পরিচারিকাদের মধ্যে কেউ একজন নিশ্চয়ই তার

স্বামীকে তার কুকীর্তির কথা হয়তো ফাঁস করে দিয়ে থাকবে তার মনিবের কাছে। সওদাগরের বিবি তখন তার সমস্ত পরিচারিকাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলো গোপনে, তারা কেন এভাবে বিশ্বাসভঙ্গ করলো, নাম জানতে চাইলো। কে তার স্বামীকে তার গোপন অভিসারের কথা বলে দিয়ে তার এমন সর্বনাশ করলো। তখন সবাই আল্লার নাম নিয়ে দিব্যি করলো, তাদের মনিব-পত্নীর নুন খেয়ে অমন নেমকহারামী করার প্রবৃত্তি যেন তাদের না হয়। সবাই তখন সেই তোতাপাখির প্রসঙ্গ তুলল তারা তাদের নিজের কানে শুনেছে, খবরটা ঐ তোতা-পাখিটাই তাদের মনিবকে দিয়েছে।

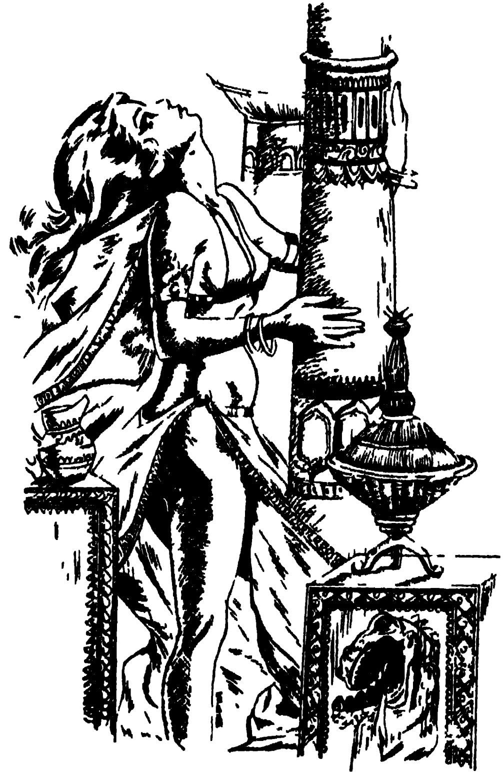
সওদাগরের বিবি তাদের কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনলো। তারপব একজন পরিচারিকাকে ডেকে বললো, 'তোমার কাজ হবে ঐ তোতাপাখির খাঁচার ওপর পাখা চালিয়ে জোরে হাওয়া দেওয়া, এবং দ্বিতীয় পরিচারিকাকে হুকুম করলো খাঁচাব ওপব ক্রমাগত জল ছিটানোর জন্য। সবশেষে তৃতীয় পরিচারিকাকে কাছে ডেকে বললে, 'আর তোমার কাজ হবে সারারাত ধরে আয়না দিয়ে তোতা-পাখির চোখের ওপর আলো ফেলা।'

পরদিন সকালে তার স্বামী বন্ধুর বাড়ি থেকে আমোদ উৎসবে স্ফূর্তি করে বাড়ি ফিবে তার খাস পরিচারকাকে হুকুম করলো, তোতাপাখিটা তার সামনে নিয়ে আসার জন্য। খাঁচার সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, 'পক্ষিরাণী, এখন বলো তো, কাল রাতে তুমি কি দেখলে, আর কিই বা শুনলে?'

'আমাকে ক্ষমা করবেন প্রভু', তোতাপাখি মুখ নিচু করে বললো, 'আমি না পেরেছি কিছু শুনতে, না পেরেছি কিছু দেখতে। তার কারণ হলো, কাল সারা রাত ধরে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে গেছে, সেই সঙ্গে বিদ্যুতের আলোয় আমার চোখ ঝলসে গেছে। তাই আমি কানেও শুনতে পাইনি, আর চোখেও দেখতে পাইনি।'

সে কি? সওদাগর ভাবে, এই এখন মাস, প্রখর গ্রীষ্মের তাপে তামাম দুনিয়া শুকিয়ে খটখটে হয়ে যাচ্ছে। এই অসময়ে পাখিটা ঝড়-বৃষ্টি পেলো কি করে?

তাই সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতিবাদ করে উঠে বলে, 'কিন্তু আমরা এখন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময় কাটাচ্ছি, এখন তুমি ঝড়-বৃষ্টি এবং বিদ্যুতের চমক দেখলে কোথ থেকে?'



'হায় আল্লা!' তোতাপাখিটা নিজের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বললো, 'প্রভু, আপনাকে যা বলেছি, তার এক বিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়, কারণ আমি যে নিজের চোখে দেখেছি—'

তোতাপাখির মুখ থেকে অমন অদ্ভুত কথা শুনে সওদাগরের কেমন সন্দেহ হলো। ভাবলো, পাখিটা

নিশ্চয়ই তার বিবির চরিত্র সম্বন্ধে মিথ্যে কুৎসা রটাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ একটা মিথ্যুক তোতাপাখিকে বিশ্বাস করে অহেতুক সে তার বিবির চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করছে। কথাটা মনে হতেই সে তখন একটা অদ্ভুত কাজ করে বসল, শান-বাঁধানো মেঝের ওপর এমন জোরে আছাড় দিলো যে, সেই মুহূর্তে তার মৃত্যু হলো।

তবে কয়েকদিন পরে তার এক পরিচারিকা তার কাছে অকপটে সমস্ত সত্য ঘটনা ফাঁস করে দিলো! তবু তার সেই স্বীকারোক্তিতে বিশ্বাস হয় না সওদাগরের, তখনো তার পুর্ণ আস্থা বিরাজ করছিল। কিন্তু যখন সে নিজের চোখে তার বিবির খাস কামরা থেকে সেই বিতর্কিত তুর্কী যুবকটিকে বার হয়ে আসতে দেখলো, তখন সে আর স্থির থাকতে পারলো না। রাগে উত্তেজনায় তার শরীর তখন জ্বলছিল, কাটা ছাগলের মতো ছটফট করে উঠলো সে। তেমনি উত্তেজিত অবস্থায় খাপ থেকে ধারালো তলোয়ারটা বার করে পিছন দিক থেকে তার গলার ওপর আঘাত হানলো সজোরে। যুবকটির ধর থেকে তার খণ্ডিত মুণ্ডুটা মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লো, রক্তে ভেসে গেলো জায়গাটা। তলোয়ারটা খাপে পুরে রাখার আগে একই অবস্থা করলো সে তার ব্যাভিচারি বিবির, তাকে কোন রকম আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়ে। তারপর সওদাগর উপলব্ধি করলো, বেচারী তোতাপাখিটা তাকে সত্য কথাই বলেছিল, সে যা দেখেছিল, তার অতিরিক্ত কিছু তো সে বলেনি। নিজের দোষে তাকে হারানোর জন্য দারুণ অনুশোচনা হলো তার, অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকলো সে···

শাহেনশাহ য়ুনানের মুখ থেকে দ্বিতীয় কাহিনীটা শোনার পরেও তার উজিরের মনে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন এলো না, তখনো সে বিশ্বাসে অটল রইলো।

আগের মতোই সে আবার বললো, জাঁহাপনা, আপনার এ কাহিনীর সঙ্গেও আমার কোন মিল তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এক্ষেত্রেও আপনি হয়তো বোঝাতে চাইছেন, সওদাগর তার পরম সুহৃদ উপকারী বন্ধু সেই তোতাপাখিটাকে হত্যা করে পরে অনুতপ্ত হয়েছিল। কিন্তু আমি আবার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ঐ রুয়ান হেকিম কখনোই আপনার সুহৃদ হতে পারে না, আপনার শত্রু, ও আপনার সর্বনাশ করতে চায়, ও আপনাকে আপনার রাজ্য থেকে উচ্ছেদ করতে চায়। এখনো সময় আছে ওকে আপনি শাস্তি দিন। তা না করলে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবেন, আমির-ওমরাহ আপনার প্রভৃত সুহৃদ এবং প্রজাবৃন্দ।' শাহেনশাহ য়ুনানকে উজির তাঁকে শেষ বারের মতো সতর্ক করে দিয়ে বলে, 'সেই উজিরের কাহিনী আপনি শোনেননি? যে উজির তার বাদশাহের পুত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল—'

'সে আবার কি কাহিনী?—'শাহেনশাহ য়ুনান কৌতূহল প্রকাশ করে বলেন, 'বলো সেই কাহিনী আমি শুনতে চাই!'

অতঃপর উজির সেই কাহিনী বলতে শুরু করলো:



এক বাদশাহেব পুত্রের সখ ছিলো শিকারের, শিকার ছাড়া অন্য আর কিছু সে ভাবতেই পারতো না। তিনি তাঁব এক উজিরকে ডেকে হুকুম করলেন, 'পুত্রের দেখাশোনাব ভার বইলো তোমার উপর আজ থেকে যেখানেই সে শিকারে যাক না কেন, এবং শিকারে গিয়ে তার যেন কোন ক্ষতি না হয়, সেদিকেও নজর রাখবে।'

'জো হুজুর।' মাথা নত করে বাদশাহের হুকুম মেনে নিলো সেই উজির।

একদিন বাদশাহ পুত্র শিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো ঘোড়ায় চড়ে, তার সঙ্গী হলো তাব আব্বাজানের সেই উজির। দুটি ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটে চলেছে এক গভীর বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। হঠাৎ ঘোড়া দুটো প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে উজির চিৎকার করে বাদশাহ-পুত্রের উদ্দেশে বলে উঠলো, 'শাহজাদা ঐ আজব জানোয়ারটাকে পালাতে দেবেন না, ওকে ধরুন! ওটাই হবে আজ আপনার মস্ত বড় শিকার।'

উজিরের কথায় শাহজাদা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। সেই আজব জানোয়ারটা আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে না; ততক্ষণে সে বুঝে গেছে, শিকারীর পাল্লায় পড়েছে সে। তাই সে, তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে থাকে যেদিকে দু'চোখ যায়। বাদশাহ পুত্রের ঘোড়াও ছোটে তার উদ্দেশে। এক সময় সেই আজব জানোয়ারটা বাদশাহ পুত্রের নাগালের বাইরে চলে যায়, আড়াল হয়ে যায় তার দৃষ্টির। কিন্তু বাদশাহ পুত্র ততক্ষণে হারিয়ে ফেলেছে তার পথ। সে তখন দিশেহারা, পথভ্রষ্ট এক পথিক। কোন্ পথে গেলে তার আব্বাজানের প্রাসাদে ফেরা যায়, কিছুই খেয়াল নেই তার। তার অবস্থা তখন ঠিক পাগলের মতো, অজানা, অচেনা জায়গায় বেঘোরে প্রাণ হারানোর আশঙ্কায় শঙ্কিত সে তখন। সামনে ধু-ধু মরু প্রান্তর।

সঠিক পথের নিশানা খুঁজে বার করতে সে যখন হাঁকপাঁক করছে, ঠিক সেই সময় সে দেখতে পেলো, এক পরমা সুন্দরী যুবতী অদূরে দাঁড়িয়ে আছে, অশ্রুর বাদল নেমেছে তার দু'চোখের কোল বেয়ে।

তার কাছে গিয়ে শাহজাদা শুধোয়, 'কে হে তুমি সুন্দরী?'

কান্নাজড়ানো স্বরে মেয়েটি তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলে, 'আমি হিন্দের শাহজাদী। মরুযাত্রী-দলের সঙ্গে পথ চলছিলাম। কিন্তু পথের মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যাই। যখন আমার ঘুম ভাঙ্গলো, তখন দেখি মরুযাত্রীদল থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, আমার লোকজনদের ধারে কাছে দেখতে পেলাম না, বুঝতে পারি, আমি পথ হারিয়েছি। এখন আমি বাড়ি ফিরি কি করে?'

বলেই সে ডুকরে কেঁদে উঠলো বাচ্চা মেয়ের মতো।

মেয়েটির দুঃখের কাহিনী শুনে কেমন যেন মায়া হলো তার ওপর বাদশাহ পুত্রের। দু'হাত বাড়িয়ে তাকে সে তার ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে তার পিছনে বসালো। সুন্দরী যুবতীর উষ্ণ উত্তাপ তার গায়ে স্পর্শ করে, একটা মিষ্টি আবেশে তার সারা মন ভরে যায়। পিছন ফিরে মেয়েটিকে সে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমু খায় তার উষ্ণ ঠোঁটে, মেয়েটি চোখ বুজে থাকে, থর থর করে কেঁপে ওঠে তার সারা দেহ। শাহজাদা তার মন তৃষ্ণার তৃষ্ণা মেটায় সুন্দরী মেয়েটির গোলাপের পাঁপড়ির মতো মেলে দেওয়া পাতলা দুটি ঠোঁটের মধ্যে নিজের পুরু ঠোঁট দুটি মিলিয়ে একাকার করে। তৃপ্ত মন নিয়ে আবার সে ঘোড়া ছোটায় টগ্‌বগিয়ে। সামনে একটা জরাজীর্ণ পোড়ো বাড়ি দেখতে পেয়ে মেয়েটি শাহজাদার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, 'তোমাকে বলতে ভীষণ লজ্জা হচ্ছে শাহজাদা, তবু না বলে থাকতেও পারছি না আমার গোসল করতে হবে। তোমার ঘোড়াটাকে একটু থামাবে। তাহলে আমি ঐ পোড়ো বাড়িতে গোসল সেরে এখুনি আবার ফিরে আসতে পারি।'

মেয়েটির কথা শুনে শাহজাদা ঘোড়া থামাল সেই পোড়ো বাড়িটার সামনে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মেয়েটি ধীর পায়ে হেঁটে সেই পোড়ো বাড়িটার ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। কিন্তু ফিরতে তার ভীষণ দেরী হচ্ছে দেখে, শাহজাদা ভাবলো, মিথ্যে সময় নষ্ট হচ্ছে। তাই সে-ও ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মেয়েটির খোঁজে সেই পোড়ো বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলো। মেয়েটি জানতেও পারলো না, সে তাকে অনুসরণ করছে। পোড়ো ঘরের দেওয়ালে কান রাখতে গিয়ে চমকে উঠলো বাদশাহপুত্র, মেয়েটি তখন আর সুন্দরী যুবতী নয় ঘুলাহ ডাকিনী, সে তখন তার আসল রূপ ধারণ করেছে, রাক্ষসী, ভয়ঙ্কর হিংস্র তার চাহনি, দেওয়ালের ফুটো দিয়ে বাদশাহ-পুত্র তার সেই হিংস্ররূপ নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করলো। রাক্ষসীটা তখন তার ছেলেমেয়েদের বলছিল, 'শোনো বাছারা, আজ তোমাদের রাতের খানা-পিনার জন্য একটা বেশ নাদুস-নুদুস চেহারার একটা লেড়কা ধরে নিয়েছি।'

'কি মজা, কি মজা', বাচ্চা রাক্ষস রাক্ষসীরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলো সমবেত কণ্ঠে, 'কই মা তাকে ভেতরে নিয়ে এসো, আজ আমরা পেট ভরে মানুষের মাংস খাবো।'

তাদের কথাবার্তা শুনে বাদশাহপুত্র তো থ! ভয়ে তার হাত-পা পেটের ভেতরে সেঁদিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। ভাবলো সে, সেখানে আর এক মুহূর্তে থাকলে নির্ঘাত তার জান খতম হয়ে যাবে, বেঘোরে তাদের হাতে প্রাণটা সঁপে দিয়ে যেতে হবে। তাই সে ঘুরে দাঁড়িয়ে পালাবার জন্য রাস্তায় পা দিতে যাবে সেই গুলাহ পোড়ো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তার পথ আগলে দাঁড়ালো। বাদশাহ পুত্রকে ভয়ে কাঁপতে দেখে স্বপ্নালু চোখে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার এতো ভয় কিসের শাহজাদা?'

'এমন একজন দুষমনকে আমি আঘাত করেছি, তাকে আমি বহুত ভয় করি।'

'তুমি তাকে ভয় করো?' অবাক হয়ে গুলাহ তাকায় তার দিকে, 'তুমি না বলেছিলে,—তুমি বাদশাহপুত্র?'

'তাতে কি হয়েছে?'

'না কিছু তেমন হয়নি, তোমাকে ভয় পেতে দেখে বললাম কথাটা', গুলাহ এবার বলে, 'তা তুমি তোমার সেই দুষমনকে কিছু অর্থ দিয়ে ভাগিয়ে দিতে পারো।'

'তাহলে তো কথাই ছিলো না।' শাহাজাদা দুঃখ করে বলে, 'আমার অর্থের ওপর তার কোন লোভ নেই, তার নজর আমার জানের

ওপর। তাই তো তাকে আমার এতে ভয়, এতো সংশয়।'

'তোমার যখন এতোই ভয়, আল্লার কাছে প্রার্থনা জানালেই তো পারো। আল্লার দোয়ায় আমরা সবাই বেঁচে আছি। তিনি নিশ্চয়ই তোমার সেই দুষমণের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন।'

তার কথা শুনে শাহজাদা এবার আসমানের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'আল্লা, শুনেছি আপনি দুর্বলের প্রতি দোয়া দেখান, অসহায় ইনসানের পাশে এসে দাঁড়ান। আল্লা, আপনার কাছে আমার একটাই প্রার্থনা, আমি আমার দুষমণকে যেন বশ করতে পারি, তাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিন। আপনি অন্তর্যামী, আপনি সব পারেন। আপনি আমাকে—'

গুলাহ তার প্রার্থনার ভাষা শুনে বুঝতে পারে, শাহাজাদার হাতে ধরা পড়ে গেছে সে, তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাই সে আগে-ভাকে সরে পড়লো সেখান থেকে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাদশাহপুত্র। রাক্ষসীর হাত থেকে জীবন ফিরে পেয়ে অনেকটা পথ পার হয়ে এক সময় সে তার আব্বাজানের কাছে ফিরে আসে। বাদশাহকে সে উজিরের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বললো, বললো উজিরের অদূরদর্শিতার জন্যই আজ তার জান যেতে বসেছিল।

সব শুনে বাদশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সৈন্য-সামন্তদের হুকুম করলেন, উজিরকে যেন এখুনি তাঁর সামনে হাজির করা হয়। তখুনি বাদশাহের সৈন্য-সামন্ত লোক-লস্কর, পাইক-পেয়াদা ছুটালো সেই নেমকহারাম, বিশ্বাসঘাতক উজিরকে ধরে আনার জন্য। বাদশাহের দরবারে উজিরকে হাজির করা মাত্র তার গর্দান নেওয়া হয়।

'তাই বলছি জাঁহাপনা', য়ুনানের উজির তার তার কাহিনী শেষ করে বলে, 'এর পরেও আপনি যদি ঐ হেকিমকে আপনার সাচ্চা দোস্ত মনে করেন তাহলে আপনার সর্বনাশ আপনি নিজেই ডেকে আনবেন। হুজুর, হয়তো আমার ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে, তবু না বলেও বলতে পারছি না, আপনি হয়তো ভাবছেন, হেকিম রুয়ান দোস্তের মতো আপনার মঙ্গল চিন্তায় মগ্ন কিন্তু আসলে সে তলে তলে আপনার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে যাচ্ছে। তা না হলে দেখলেন না জাঁহাপনা, আপনার হাতে লাঠির মতো একটা দণ্ড মাত্র ধরিয়ে দিয়ে আপনার অমন দুরারোগ্য রোগ চট করে নিরাময় করে দিলো? এ কি ম্যাজিক, নাকি ভোজবাজী? কে বলতে পারে, এই হেকিমই আবার তার ভোজবাজীর দ্বারা আপনাকে ধ্বংস করবে না! কে বলতে পারে সে আপনার মনে চমক জাগানোর জন্য প্রথমে আপনার উপকার করে দেখালো, কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য ঠিক তা নয়, আসলে সে আপনার অস্ত্র দিয়েই আপনাকে কোতল করার বদ মতলব নিয়ে আপনার রাজ্যে এসেছে!'

বাদশাহ য়ুনান তাঁর উজিরের কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনলেন। এবার বুঝি বরফ গললো। টললেন বাদশাহ, পরিবর্তন হলো তাঁর মন। 'হ্যাঁ উজির, তুমি ঠিকই বলেছো, হ্যাঁ, তুমিই আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, আমার সাচ্চা পরামর্শদাতা। অথচ এতোদিন আমি তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম। ছিঃ ছিঃ কি ভুলই না করতে যাচ্ছিলাম। যাইহোক, ঠিক সময়ে তুমি আমাকে খেয়াল করে দিয়েছো, সত্যি আসলে লোকটা আমার শত্রু, ভিন্‌দেশের গুপ্তচর হয়ে এসেছে আমার রাজ্যে আমার মরণ ফাঁদ পাতার জন্য। তুমি ঠিকই বলেছো উজির, যে হেকিম আমার হাতে সামান্য একটা লাঠি ধরিয়ে দিয়ে আমার অমন দুরারোগ্য রোগ সারিয়ে দিতে পারে, কে বলতে পারে সেই হেকিমই আবার আমাকে কোন ফুল-টুল শুঁকতে দিয়ে খতম করবে না?' তারপর তিনি তাঁর উজিরের কাছে পরামর্শ চাইলেন, 'বলো, উজির, এখন আমিঐ শয়তানটাকে নিয়ে কি করবো?'

প্রত্যুত্তরে উজির বলে, 'আপনার বিশ্বাসী লোক-লস্করদের পাঠিয়ে তাকে আপনার সামনে হাজির করতে বলুন। তারপর আসা মাত্র তার গর্দান নেওয়ার ব্যবস্থা করুন। এই ভাবেই আপনি তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন, সেই সঙ্গে তার সব দুষমনি তার সব শয়তানি চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে যাবে, আর আপনিও তার কাছ থেকে আপনার জীবনহানির সম্ভাবনা দূর করে আপনাকে খতম করার আগেই তাকে আপনি খুন করে ফেলতে পারবেন। একেই বলে শাহী কায়দা।'

'হ্যাঁ উজির, এবারও তুমি খুব ভালো পরামর্শ আমাকে দিয়েছো। তোমার কথাই আমি মেনে নিলাম।' এই বলে বাদশাহ য়ুনান তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপের কথা জানালেন। বাদশাহ তাঁর এক বিশ্বাসী অনুচরকে পাঠালেন হেকিমকে ধরে আনার জন্য। হেকিম রুয়ান তো সরল মনে হাসতে হাসতে বাদশাহের দরবারে এসে হাজির হলো তৎক্ষণাৎ। কিন্তু তখনো সে জানতো না, তার তকদিরে কি লেখা আছে, তার মৌৎ এতো কাছে। মৌৎ এমনি আসে চুপি সারে, নিঃশব্দে। তার পদধ্বনি কেউ শুনতে পায় না। কোন্ এক কবি যেন এর উপমা, স্বরূপ তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন :

এ তোমার নিয়তি, নিষ্ঠুর নসিবের পরিহাস,
তবু সবুর করো, থাকে যেন তোমার বিশ্বাস
খোদা আল্লার ওপর,
মালিক যিনি তামাম দুনিয়ায়।

হেকিম রুয়ান রাজদরবারে প্রবেশ করেই বাদশাহের উদ্দেশে কাব্য করে বললো :

একদিন, প্রতিদিন ভুলে গেছি আপনাকে শুক্রিয়া জানাতে,
আমি ব্যস্ত ছিলাম আমার এই শের উৎসর্গ করতে,
আপনাকে। হে মহামান্য প্রভু,
আমি ভুলি নাই আপনার মহামূল্যবান দানের কথা,
আমি জানি, আমার একাগ্রতা, আমার সত্তা,
আপনাকে বহাল তবিয়েতে রেখেছে,
আমার এও ভরোসা আছে,
দীন-দুনিয়ার মালিক আপনি, গোঁসা নাহি, নাহি কভু।

হেকিম তার আগের কবিতার জের টেনে আবার আবৃত্তি করে :—

দিল এক মন্দির,
সেথা নাহি দুখ দুখের জন্য,
সব খেল্ তো নসিবের,
আমার কোন নালিশ নেই, আল্লার দোয়ায় আমি ধন্য।
মজাক লুটে নাও যতো পাবো আজ
কালকা বাত নাহি পুছে,
গুজার যাও দুঃখে-সুখে
আল্লা আছেন তোমারি কাছে।

হেকিমের শেষের কবিতায় একটা প্রচ্ছন্ন উদাত্ত ভাবের পরিচয় ফুটে ওটে :—

তকদিরে যা লেখা আছে কহি না বল কর সকৃতা,
আমি জানি দিনের পর আসে রাতের আঁধার,
সুখ নিয়ে কোই মুসিবত নেই আমার,
তাই বলে মনে করো না, এ আমার মনের ভীরুতা।



বাদশাহ য়ুনান তার কবিতার মর্মার্থ বুঝলেন কি বুঝলেন না, তা ঠিক বোঝা গেলো না। তাঁর মুখের আগের সেই সারল্য ভাবটা আজ যেন অনুপস্থিত, তার বদলে দেখা গেলো এক অদ্ভুত রুক্ষতার প্রকাশ ভঙ্গিমা। য়ুনানের কথায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

'তুমি কি জানো য়ুনান, কেন তোমাকে আমি তলব করেছি?'

'না জাঁহাপনা, একমাত্র আল্লাই বোধহয় বলতে পারেন', হেকিম রুয়ানের মনে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলো না।

কথা জানানো হয়। তাই জিজ্ঞেস করছি, আমার কি গুণাহ তা তো বলবেন?'

'আমার অনুগত লোকেরা বলছে, তুমি নাকি একজন গুপ্তচর, তোমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই আমি খুন হওয়ার আগেই তোমাকে আমি সরিয়ে দিতে চাই।' তারপর বাদশাহ য়ুনান সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জল্লাদের দিকে ফিরে হুকুম করলেন, 'এই বিশ্বাসঘাতকের শিরচ্ছেদ করে ওর কাটা মুণ্ডু আমায় পায়ের সামনে রাখার ব্যবস্থা করো, ওর অশুভ কার্য-কলাপ থেকে আমাদের রক্ষা করো।'



বাদশাহ তখন আরো কঠিন কথাটা তাকে শোনাতে কসুর করলেন না, 'তোমার খেল খতম রুয়ান, আমি তোমার গর্দান নেওয়ার জন্য তোমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি।'

তাঁর মুখ থেকে সেই সর্বনাশা আদেশ শুনে দারুণ বিস্মিত। হেকিম এবার মৃদু অনুযোগ করে বললো, 'জাঁহাপনা, আমার যে ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে, কেন আপনি আমাকে খতম করতে চাইছেন? শুনেছি, কাজীর বিচারেও অপরাধীকে তার গুণাহের

'আমাকে রেহাই দিন জাঁহাপনা' হেকিম য়ুনান বারবার কাতর মিনতি জানাতে থাকে সেই অকৃতজ্ঞ বাদশাহের কাছে, যেমন আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম, জানো আফ্রিদি দৈত্য সম্রাট, কিন্তু তা সত্বেও তুমি আমাকে রেহাই দিতে চাওনি, আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছিলে।'

বাদশাহ য়ুনানও সেই ভুলটাই করলেন, সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটলো আবার, নতুন করে আরো একটা ভুলের ইতিহাস লেখার আয়োজন

করতে গিয়ে তিনি বললেন, 'তোমার গর্দান না নেওয়া পর্যন্ত আমার নিরাপত্তা নেই, আমার বাঁচার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। কে জানে যখন তুমি আমাকে নাকে কিছু শুঁকতে দিয়ে হত্যা করে বসো! তাই আমি আমার জীবনের কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। এখুনি আমি তোমাকে কোতল করতে চাই।'

এবার আর কোন মিনতি নয়, এবাব সেই হেকিম অনুযোগ করে বললো, 'হুজুর, আমি আপনার অমন দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে তুললাম, এই কি তার পুরস্কার? আমার ভালো কাজের দাম কি আপনি এভাবেই দিতে চান জাঁহাপনা?'

'এখন আর করার কিছু নেই', বাদশাহের কথায় নির্লিপ্ততা প্রকাশ পায়, 'তোমাকে মরতেই হবে এবং একটুও দেরী না করে এখুনি!'

হেকিম রুয়ান বুঝলো, বাদশাহের হাত থেকে তার বাঁচার কোন পথ আর নেই। তাই সে এবার মনেব দুঃখে কেঁদে ফেললো হাউ হাউ করে। হায় আল্লা, মানুষের ভালো করাব এই কি ইনাম? রুয়ানের সব বেদনা কাব্যের ছন্দে ছন্দায়িত হলো:—

খোদা আপনাকে সুবুদ্ধি দিন
আমি বেগুণাহ,
কার ষড়যন্ত্রে আপনার দিলের এই পরিবর্তন,
জানি না, আমাকে রক্ষা করুন আল্লাহ।

জল্লাদ তখন মূক ও বধিরেব মতো রুয়ানের সামনে এগিয়ে আসে, এবং হেকিমের চোখ দুটো কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর সে তার হাতের তলোয়ার উঁচিয়ে বাদশাহ যুনানের উদ্দেশে বলে, 'জাঁহাপনা, আপনার অনুমতি নিয়ে—'

হেকিম যুনান কান্না জড়ানো স্বরে শেষ বারের মতো মিনতি জানায়, 'জাঁহাপনা, আমাকে আপনি মুক্তি দিন, খোদা আপনাকে রেহাই দেবেন। আর আপনি আমাকে কোতল করলে, আল্লা আপনাকে শাস্তি দেবেন।'

'জাঁহাপনা, আমি প্রস্তুত, আপনি আজ্ঞা করুন—'

'আপনার মনে কি এই ছিলো?' রুয়ান তার কথার জেব টেনে বললো, 'আপনাব এই অদ্ভুত ব্যবহার দেখে আমার সেই কুমীরের ওয়াদার কথা মনে পড়ে গেলো।'

'কুমীরের ওয়াদা?' বাদশাহ থমকে দাঁড়ালেন, 'সে আবাব কি কাহিনী শুনি?'

'আমার মনের যা অবস্থা এখন, বলতে দিল চাইছে না। আপনার জল্লাদ তো আমার জন্যে ইন্‌তেজার করছে। আল্লার দোহা, আপনি আমার জান বাঁচান, খোদা আপনার ভালা করবেন।' কথা বলতে বলতে সে আবাব ডুকরে কেঁদে উঠলো।

তার সেই কান্না দেখে শাহেশাহের এক প্রিয় পাত্র তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো, 'জাঁহাপনা, আমার একটা আর্জি আছে আপনার কাছে। হেকিমের ব্যবহার আর কথাবার্তা শুনে আমাব মনে হয়েছে, লোকটা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারে না; তাছাড়া ও আপনার অমন দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে তুলেছে। অন্ততঃ সেই কথা ভেবে ওকে আপনি বাঁচতে দিন, ওকে কোতল করবেন না।'

'তবু ওকে মৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে আনলে আমার মৌতের ইনতেজার করবে। ওকে জিন্দা রাখলে, আমার আবার কবরের মিট্টি খুঁড়তে খুব বেশী দেরী হবে না তোমাদের। যে লোক আমার হাতে সামান্য একটা লাঠি ধরিয়ে দিয়ে আমার অমন দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে তুলতে পারে, তাকে আমার একদম বিশ্বাস নেই। ও যে আমাকে একটা ফুল কিংবা সে রকম কিছু একটা শুঁকিয়ে আমাকে খতম করে ফেলবে না, তার কি প্রতিশ্রুতি আছে? না, না তুমি জানো না, ও আমার দুষমন আছে, ও পরদেশী গুপ্তচর। অর্থের লোভে ও আমাকে হত্যা

করতে এসেছে। তাই ওকে জিন্দা অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া যায় না। ওকে খতম করলে তবেই আমার জীবন নিশ্চিত হবে।'

হেকিম রুয়ান তখনো করুণ মিনতি জানাতে থাকে কাঁদতে কাঁদতে, 'আমাকে আপনি বাঁচতে দিন, আল্লা আপনাকে রক্ষা করবেন। আর আমার গর্দান নিলে আল্লা আপনার সর্বনাশ করবেন।

কিন্তু তার সব আবেদন, সব মিনতি ব্যর্থ হলো, বাদশাহের মন গললো না। তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত অটল রইলেন। তাঁর দৃষ্টি পড়ে রইলো জল্লাদের ওপর। ওদিকে জল্লাদ তখন তাঁর হুকুমের অপেক্ষায় মুহূর্ত গুণছিল তখন।

শোনো আফ্রিদি দৈত্য সম্রাট, সেই হেকিম রুয়ান যখন জানতে পারলো, বাদশাহ তাকে হত্যা করবেনই তখন সে মরীয়া হয়ে বললো, 'হুজুর আমাকে বাঁচতে দেওয়ার ইচ্ছে যখন আপনার নেই আমাকে মরতেই হবে। তবে মরার আগে আমাকে একবার আমার বাড়ি যাওয়ার হুকুম দিন। আমার শেষ কাজ কতকগুলো সেরে আসতে দিন। আপনি তো জানেন জাঁহাপনা, আমার রিস্তেদার বলতে কেউ নেই। তাই আমার অনুগত পড়শীদের বলে আসতে হবে কোথায় আমার কবরের ব্যবস্থা তারা করবে। তাছাড়া আমার চিকিৎসার বইগুলোর একটা বিলি ব্যবস্থাও তো করতে হবে। আমার ইচ্ছে, মূল্যবান বইগুলো আপনার রাজকোষে রাখার জন্য আপনাকে উপহার দিয়ে যেতে চাই। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির নির্দেশ দেওয়া আছে সেই সব বইগুলোতে। আবার যদি আপনার কোন দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা দেয়, বইগুলো আপনার কাজে লাগাতে পারেন তখন।'



'কিন্তু তোমার সেই সব বইগুলোর নির্দেশ আমি কি করে বুঝবো? আমি তো আর হেকিম নই।'

'সেটা কোন কঠিন ব্যাপার নয় জাঁহাপনা', রুয়ান বলে, 'একটা বইতে কঠিন কঠিন সব ব্যাধির দাওয়াই-এর কথা লেখা আছে। আমাকে হত্যা করার পর আমার কাটা মুণ্ডু আপনি আপনার হাতে রাখবেন, তারপর সেই বইটা খুলে তিনের পাতার প্রথম তিন লাইন পড়ে আমার সেই কাটা মুণ্ডুটাকে প্রশ্ন করলে বলে দেবে কোন্ বিমারির কোন্ দাওয়াই।'

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বাদশাহ বলেন, 'তুমি ঠিক বলছো হেকিম, তোমার কাটা মুণ্ডু কথা বলবে? আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে?'

'হ্যাঁ হুজুর!' রুয়ান বলে, 'যাচাই করে দেখতে পারেন।'

'বাঃ বড় অদ্ভুত ব্যাপার তো!' হেকিমের কথায় কিছুটা প্রভাবিত হয়ে বাদশাহ তাকে কঠোর প্রহরায় তাঁর বাড়িতে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

রুয়ান বাড়ি ফিরেই তার প্রয়োজনীয় কাজগুলো আগে সেরে নিলো। পরদিন সে ফিরে গেলো বাদশাহ য়ুনানের রাজদরবারে। বাদশাহ তখন তাঁর বিরাট বিচারকক্ষে আমির, উজির, অমত্য এবং তাঁর উপদেষ্টা পরিবেষ্টিত হয়ে বসে অপেক্ষা করছিলেন তার জন্য। সুগন্ধ ফুল এবং আতর ও সুর্মার গন্ধে রম রম করছিল সভাকক্ষ। রুয়ান তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। এক হাতে তার সেই পুরনো পুঁথি, যার মধ্যে বিভিন্ন রোগের দাওয়াই-এর নির্দেশ দেওয়া আছে, অন্য হাতে পাউডার ভর্তি ধাতুর বাক্স। বাদশাহের সিংহাসনের সামনে বসে পড়ে সে বললো, 'হুজুর কাউকে বলুন আমাকে একটা ট্রে দেওয়ার জন্য।'

বাদশাহের নির্দেশে তার জন্য একটা ট্রে এলো। অতঃপর রুয়ান সেই ধাতুর বাক্স থেকে কিছু পাউডার ট্রের ওপর ঢেলে সমান করে নিলো। তারপর বাদশাহের দিকে ফিরে বললো, 'জাঁহাপনা, আপনি এই বইটা গ্রহণ করুন, তবে আমার মুণ্ডুটা কাটা না হওয়া পর্যন্ত এই বইয়ের পাতা যেন খুলবেন না। কাটা মুণ্ডুটা এই ট্রের ওপরে রাখবেন, দেখবেন এই পাউডারের সংস্পর্শে এসে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গেছে। আর রক্ত ঝরা বন্ধ হলে তবেই এই বইটার পাতা ওল্টাবেন, তার আগে নয়।

তারপর বাদশাহ য়ুনান তার হাত থেকে বইটা নিয়ে জল্লাদকে নির্দেশ দিলো তার শিরচ্ছেদ করার জল্লাদ সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার দিয়ে হেকিমের দেহ থেকে মুণ্ডুটা কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো, এবং তার সেই কাটা মুণ্ডুটা ট্রের ওপর রাখলো। এক সময় রক্ত ঝরা বন্ধ হতেই হেকিম রুয়ান চোখ মেলে তাকিয়ে বললো, হুজুর, এবার বইটা খুলুন।

সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের মলাটটা খুললেন বাদশাহ। এবং দেখলেন, একটা পাতার সঙ্গে আর একটা পাতা জড়িয়ে রয়েছে। তাই তিনি তাঁর হাতের একটা তর্জনী মুখের লালায় ভিজিয়ে খুব সহজেই প্রথম পাতাটা ওল্টালেন। এবং সেই একই ভাবে দ্বিতীয় পাতাটা ···তারপর তিন নম্বর পাতা, এবার যেন একটু বেগ পেতে হলো। তারপর দুটি পাতা ওল্টানোর পরেও তিনি লক্ষ্য করলেন কিছুই লেখা নেই পাতাগুলোয়। হেকিম রুয়ানের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'কই হে হেকিম, এ যে দেখছি কিছুই লেখা নেই এখানে!'

হেকিম রুয়ান প্রত্যুত্তরে বলে, 'হ্যাঁ, আছে বৈকি আরো কয়েকটা পাতা ওল্টান লেখা ঠিক চোখে পড়বে আপনার।'

সেই একই ভাবে আরো তিনটি পাতা ওল্টালেন বাদশাহ য়ুনান। তখন বইটা বিষময় হয়ে গেছে। বারবার ঠোঁটে তর্জনী ঠেকানোর দরুণ সেই বিষ তাঁর পেটে চলে গেছে তখন। এক সময় তাঁর কথা জড়িয়ে আসে, ঠোঁট আর নড়ে না, চোখ বুঁজে আসে এবং সেই অবস্থায় তিনি ঢলে পড়লেন সিংহাসনের ওপর এবং মৌতের শিয়রে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'আমাকে বিষ খাইয়েছে ঐ শয়তানটা, আমার সারা দেহ জ্বলে যাচ্ছে। আমি শেষ হতে চলেছি।'

এদিকে হেকিমের কাটা মুণ্ডু তখন একটা কাব্য গেঁথে চলেছে :—

এক যে ছিলো দাম্ভিক অত্যাচারী বাদশাহ,
যুক্তি-তর্ক দিয়ে তাকে বোঝান যেতো না,
বড় করে দেখতো সে কেবল নিজের ভাবনা,
বুঝতো না যে অন্যের যাতনা।

রুয়ানের কাটা মুণ্ডু কথা বলা বন্ধ করতেই বাদশাহ য়ুনানের দেহটা নিস্তেজ হয়ে পড়লো। তখন তাঁর দেহে প্রাণ ছিলো না।

ওহে আফ্রিদি দৈত্য, এর থেকে এই শিক্ষা হয়, বাদশাহ য়ুনান যদি হেকিম রুয়ানের গর্দান না নিতেন, খোদা আল্লা নিশ্চয়ই তাঁকে রক্ষা করতেন। কিন্তু তিনি তার কাতর অনুনয় প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে তাকে কোতল করার আদেশ দেন, সুতরাং খোদা আল্লা কেন তাঁর সেই অন্যায় সহ্য করতে যাবেন? তাঁর বিচারে সবার শাস্তি একরকম। বিনা দোষে হেকিমকে হত্যা করে যে তিনি গুনাহ্ করেছিলেন, তাঁর সেই গুণাহের শাস্তি তিনি হাতে হাতে পেয়ে গেলেন। তাই তোমাকে আবার বলছি আফ্রিদি, তুমি যদি আমাকে ছেড়ে না দাও, আল্লা তোমাকে রেহাই দেবেন না—

ওদিকে শাহরাজাদ দেখলো ভোর হয়ে আসছে, আগামী দিন শাহেনশাহ যদি তাকে বেঁচে থাকার অধিকার দেন, তাহলে ও্র অসমাপ্ত কাহিনী শেষ করবে, এই বলে ও থামলো।

সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াজাদ উচ্ছসিত হয়ে বলে উঠলো, 'ও দিদি, তুমি কি চমৎকার গল্প করতে পারো, তোমার বলার ভঙ্গিমা কি সুন্দর, আর তোমার গল্পগুলো কতই না রোমাঞ্চকর, মোহিত না হয়ে পারা যায় না।'

'এ আর এমন কি গল্প', শাহরাজাদ প্রত্যুত্তরে বলে, 'এর থেকেও ভালো গল্প আগামী রাত্রে আমি বলতে পারি, অবশ্য শাহেনশাহ যদি আমাকে বাঁচার অধিকার দেন তবেই।'

বাদশাহ শাহরিয়ার স্বগোক্তি করেন, 'আল্লার কসম, শাহরাজাদের মুখ থেকে ওর শেষ গল্পটা না



শোনা পর্যন্ত আমি ওকে হত্যা করবো না। সত্যি কথা বলতে কি ওর গল্পগুলো বড় অদ্ভুত, বড় বিস্ময়কর।'

সম্মতি জানিয়ে শাহরিয়ার অতঃপর শাহরাজাদকে কাছে টেনে নিয়ে ওকে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লেন সেদিনের মতো, নিবিড় এক সুখ-শয্যা রচনা করার জন্য। আর একটা দিন বেঁচে থাকার অধিকার পেয়ে শাহরাজাদ মনে মনে খুব খুশি হয়ে বাদশাহ শাহরিয়ারকে বাধা দিলো না বরং তাঁর সুখের ব্যবস্থা করতে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে উদ্যত হলো ও. মালার মতো দু'হাতে শাহরিয়ারের গলাটা জড়িয়ে ধরে শাহরাজাদ আলতো করে তাঁর চিবুকে ঠোঁট বোলালো। 'বহুত সুক্রিয়া জাঁহাপনা। আপনি যে ভাবে খুশি উপভোগ করুন। এরাত শুধু আপনার। এ খুশির রাত শুধু আমাদের দুজনার।'

বাদশাহ শাহরিয়ারের চোখে কামনার আগুন জ্বলে ওঠে। শাহরাজাদের ব্লাউজের বাঁধনগুলো আলগা করে দেন ওর কাঁধ দুটো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। সমর্পিতার ভঙ্গিতে শাহারাজাদ ওর সমস্ত দেহভার শিথিল করে দেয় বাদশাহের বুকের ওপর। বাদশাহ ওকে চুমু খায়। ধীরে ধীরে তাঁর লোমশ একটা হাত শাহরাজারের সুউচ্চ বুকের উপত্যকা থেকে নেমে নাভীর নিচে যেখানে ঢল নেমেছে বিলি কাটতে থাকে সেখানে। শাহারাজাদের মুখে একটা তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা যায়, 'আঃ—' তারপর একটু একটু করে শাহরিয়ার তার ভারী দেহটা শাহরাজাদের পশম নরম দেহের ওপর বিছিয়ে দিতে থাকেন চরম সুখ-তৃপ্তি পাওয়ার আশায়।

পরদিন সকালে বাদশাহ শাহারিয়ার খুশি মনে আবার তাঁর রাজদরবারে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর সিংহাসনের চারপাশে আমির, উজির, ও সভ্য ও সৈন্য-সামন্তরা ঘিরে দাঁড়ালো। প্রতিদিনের মতো বাদশাহ রাজকার্য পরিচালনা করে দিনের শেষে তিনি আবার তাঁর রাজপ্রসাদে ফিরে এলেন।

তার বোন দুনিয়াজাদ বললো, 'লক্ষীটি দিদি, তুমি আর দেরী করো না, তোমার সেই অসমাপ্ত গল্পটা এবার শুরু করো।'

অনেক দূরে থেকে বেহাগের সুর ভেসে আসে। শাহরাজাদ মৃদুভাবে বলে, 'শাহেনশাহ অনুমতি দিলেই আমি বলতে শুরু করবো।'

'বেশ তো', বাদশাহ শাহরিয়ার তাকে আদর করতে করতে বলেন, 'শুরু করো এবার, আমিও খুব আগ্রহী।'

অতঃপর শাহরাজাদ আগের দিনের তার সেই অসমাপ্ত কাহিনীর জের টেনে বলতে শুরু করলো, 'শুনুন তাহলে জাঁহাপনা সেই ধীবর কি করলো তারপর। সেই আফ্রিদি দৈত্যটাকে শুনিয়ে সে বললো, 'আমি তোমার কাছে আমার প্রাণ ভিক্ষা করেছিলাম, কিন্তু তুমি তখন আমার কথা না শুনে আমাকে কোতল করতে চেয়েছিল। এখন তোমার জান আমার হাতের মুঠোয়। জালাটা টানতে টানতে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে দরিয়ায় ফেলে দেবো, সেখান থেকে তুমি এ জীবনে আর কোন দিনও উঠে আসতে পারবে না।'

তামার জালার ভেতর থেকে সেই দৈত্যটার কান্না ভেসে আসে, 'আল্লার দোহাই; ধীবর ভাই, ও কাজ তুমি করো না। গুস্তাকী মাফ করো, আমি স্বীকার করছি, আমার ভুল হয়ে গেছে, সে ভুল আর হবে না! আমি অন্যায় করেছি বলে তুমি কেন সেই দোষ করবে? তুমি কতো মহৎ! আমাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি তোমার মহত্ব দেখাও দোস্ত। আমাদের সমাজের রীতি হলো, অতীত ভুলে গিয়ে বর্তমানকে আঁকড়ে ধরা। তাছাড়া আমাদের সমাজের নিয়ম হলো, দোষী তার দোষ স্বীকার করলে তাকে অবশ্যই মাফ করতে হয়। তাই বলছি তুমি যেন আমার

সঙ্গে উমাহ্ এবং আতিকাহর মতো ব্যবহার করো না।'

'উমাহ্-অতিকাহ!' ধীবর একটু যেন অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলো, 'তাদের আবার কি কাহিনী শোনাও!'

'বলার ইচ্ছে তো আছেই', আফ্রিদি দৈত্যটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'কিন্তু কি করে বলবো বলো? জালাবন্দী অবস্থায় যেখানে আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম, তুমি কিরকম দোস্ত ধীবর, ও গল্প শুনতে চাচ্ছো? আমাকে তুমি মুক্তি দাও, দেখবে তখন আমি তোমাকে আমি কতো না গল্প শোনাই!'

এবার ধীবর তার কথায় আর ভুলতে চাইলো না। দৈত্যটার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছে তার ইতিমধ্যে। কেমন নির্লিপ্ত হয়ে সে শুধোয়, 'তোমার অমন মিষ্টি কথায় আমি আর ভুলছি না আফ্রিদি। দৈত্য দৈত্যই, মরলেও তাদের স্বভাব বদলায় না। তুমি এমন অকৃতজ্ঞ তোমার জান আমি বাঁচালাম তোমাকে জালাবন্দী থেকে মুক্তি দিয়ে। আর সেই তুমি কিনা তখন আমাকে কোতল করতে চাইলে? না, দ্বিতীয়বার ভুল আমি. আর করবো না। মরতে তোমাকে হবেই আফ্রিদি দৈত্য। দরিয়ায় তোমাকে আমি নিক্ষেপ করবোই। তারপর এখানে যারা মাছ ধরতে আসবে আমি তাদের নিষেধ করে দেবো, তারা যেন ভুলেও এখানে আর জাল না ফেলে। তোমার জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঐ সমুদ্রের নিচে তোমাকে মৌতের প্রহর গুণতে হবে। সেই হবে তোমার গুণাহের উপযুক্ত শাস্তি।'

আফ্রিদি দৈত্যটা তার কথা শুনে হাঁকপাক করে উঠলো, দাপাদাপি শুরু করে দিলো তামার জালার মধ্যে। তারপর চিৎকার করে বলে উঠলো সে, 'তুমি বিশ্বাস করো ধীবর দোস্ত, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এবার তুমি আমাকে মুক্তি দিলে সত্যি সত্যি আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না। তুমি তখন যা চাইবে তাই আমি করবো। আমাকে তুমি আর একবার সুযোগ দাও বাঁচবার। আমি যে বাঁচতে চাই। আ—আমি—'

ধীবরের কেমন যেন মায়া হলো তার সেই কাতর অনুনয় বিনয়ে। ভাবলো সে, সত্যি সত্যি দৈত্যটা বোধহয় এবার তার স্বভাব বদলাবে, তার কোন ক্ষতি সাধন করবে না। খোদা আল্লার নাম নিয়ে আবার সে সেই তামার জালার ঢাকনা খুলে দিলন। তারপর আলোর মতো আবার ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী আকাশ-মুখী হয়ে উপর দিকে উঠতে থাকলো। এক সময় সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা মিলিয়ে যায় আকাশে, তার বদলে আবির্ভাব ঘটে একটা বিরাট আফ্রিদি দৈত্যের। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই চাহনি। চমকে উঠলো ধীবর। তাহলে? সে কি তার স্বভাব বদলালো না? তবে কি সে আবার তার ফাঁদে পড়লো।

ধীবরের আশঙ্কাই সত্য হলো শেষ পর্যন্ত। মুক্তি পেয়ে দৈত্যটা নিজ মূর্তি ধারণ করে নিজের শক্তি জাহির করতে প্রথমেই সে লাথি মেরে তামার জালাটা ঠেলে সমুদ্রের দরিয়ায় ফেলে দিলো। তার তার অমন স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার দেখে ধীবর তখন মনে মনে ভাবলো, এবার তার মৌত আসন্ন। ভেতর ভেতর প্রচণ্ডভাবে ঘামতে থাকে সে। কোন রকমে আমতা আমতা করে সে বললো, 'ছিঃ ছিঃ, এই কি তোমার প্রতিশ্রুতির নমুনা? আমি আশা করেছিলাম, এবার তুমি ঠিক তোমার প্রতিশ্রুতি রাখবে। কিন্তু এ তুমি কি করলে আফ্রিদি? এতো তাড়াতাড়ি তুমি তোমার কথা ভুলে গেলে? এই খানিক আগে তুমি আল্লার নামে শপথ করে বললে, তুমি আর আমার কোন ক্ষতি করবে না। বাদশাহ যুনানের কাহিনী তো শুনলে, তিনি তাঁর উপকারী দোস্ত হেকিম রুয়ানের গর্দান নিয়েছিলেন বলে আল্লা তাঁকে ক্ষমা করতে পারেননি। তোমার দশাও দেখছি ঠিক সেই বাদশাহ যুনানের অবস্থা হবে।'

ধীবরের শান্ত অনুত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে, শব্দ করে হেসে উঠলো দৈত্যটা। তারপর সে লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে ধীবরের উদ্দেশে বললো, 'আমার সঙ্গে এসো।'

ধীবর তখন করলো কি, তার কাছ থেকে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে তার পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করলো। কে জানে, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। তাই একটু সাবধানে চলাই ভালো। আস্তে আস্তে শহরটাকে পিছনে ফেলে তারা একটা পাহাড়ের ওপর উঠে এলো। দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে একটি উপত্যকা, জনমানব শূন্য জায়গাটা সুন্দর মনোরম দৃশ্য চোখে পড়লো উপত্যকার চারপাশে তাকাতে গিয়ে। আর সেই উপত্যকার মাঝখানে সুন্দর স্বচ্ছ এক নীল সরোবর। আফ্রিদি দৈত্যটা আবার তাড়া দিলো, 'অবাক হয়ে কি দেখছো? এর থেকেও অবাক হওয়ার দৃশ্য আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, আমার সঙ্গে সামনের ঐ উপত্যকার নিচে নেমে এসো। অতঃপর ধীবর তাকে অনুসরণ করে নিচে নেমে এলো সরোবরের সামনে। নীল সরোবরে, রঙীন মাছ। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ধীবর সরোবরের দিকে। তার চোখের সামনে লাল, নীল, হলুদ, সাদা মাছগুলো নীল জলে সাঁতরে বেড়াচ্ছিল। তার খুব লোভ হলো, জাল ফেলে ওগুলো ধরে কথাটা ভাবা মাত্র জাল ফেললো সে সেই সরোবরে। তারপর জালটা ধীরে ধীরে ডাঙ্গায় গুটিয়ে তুলতেই সে দেখলো, চার রঙের চারটে মাছ ধরা পড়েছে জালে। হাতে বেহস্তের চাঁদ পাওয়ার আনন্দে সে যেন উল্লসিত হয়ে উঠলো। তার পাশে এসে আফ্রিদি বললো, 'এই মাছগুলো সুলতানের কাছে নিয়ে যাও, দেখবে তিনি তোমাকে এমন মূল্যবান ইনাম দেবেন যে, তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে, বিরাট ধনী লোক হয়ে যাবে তুমি। রোজ মাত্র একবার করে এখানে জাল ফেলবে, তাতেই দেখবে খুব বড়লোক হয়ে গেছো একদিন।' একটু থেমে সে আবার বলে, 'দ্যাখো ধীবর তখন আমার মাথার ঠিক ছিলোনা, কি বলতে কি বলে ফেলেছি তোমাকে। আসলে আঠারোশো বছর একটা তামার ঘরার মধ্যে বন্দী থেকে এ দুনিয়ার কোন খবরই আমি রাখতে পারিনি। তাই তখন আমার মাথার ঠিক ছিলো না। যাইহোক আমার গুস্তাকী মাফ করো, কথা দিচ্ছি, এরকম ভুল আর কখনো হবেনা। এবার আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লার দোয়ায় আবার যেন আমাদের দেখা হয়।' এই বলে সে এক পায়ে লাফ দিয়ে ওপরে উঠে গেলো। একটু পরে পাখিদের পাখনা মেলে উড়ে যাওয়ার মতো আকাশে ভাসতে ভাসতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো সেই আফ্রিদি দৈত্যটা।

ধীবর দারুণ বিস্মিত হলো আফ্রিদি দৈত্যের অমন অদ্ভুত রকম-সকম দেখে। মাছগুলো নিয়ে সে তার বাড়িতে ফিরে গেলো। মাছগুলো একটা মাটির হাঁড়িতে রাখতেই দলের মধ্যে খুশির আনন্দে নাচন শুরু হয়ে গেলো। তারপর সে মাটির হাঁড়িটা মাথায় নিয়ে আফ্রিদির উপদেশ মতো সুলতানের রাজপ্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলো।

সুলতান তো সেই মাছগুলো দেখামাত্র গভীর বিস্ময়ে অভিভূত। তখন তাঁর প্রাসাদে এক নবাগত পরিচারিকা কাজে বহাল হয়েছিলো, ভালো রাঁধতে জানতো সে। তিন দিন আগে রুমের বাদশাহ তাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিল। তিনি তার উজিরকে হুকুম করলেন, 'মাছগুলো ঐ নতুন রাঁধুনীকে দিয়ে এসো, আজ তার হাতের রান্না পরখ করবো।'

সুলতানের হুকুম উজির তাড়াতাড়ি সেই মাছগুলো নবাগত রাঁধুনীর হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'এই অদ্ভুত রঙের মাছগুলো ভালো করে রান্না করবে। আজ তোমার সামনে কঠিন পরীক্ষা। দেখো, খেতে যেন সুস্বাদু হয়।'

রসুই ঘর থেকে রাজদরবারে ফিরে আসতেই

সুলতান সঙ্গে সঙ্গে তাকে আদেশ করলেন ধীবরকে চারশো দিনার দেওয়ার জন্য। একসঙ্গে অতোগুলো দিনার হাতে পেয়ে ধীবর তো মহাখুশি, মহা আনন্দে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে গেলো।

ওদিকে নতুন রাঁধুনী মাছগুলো কুটে ভালো করে ধুয়ে কড়াইয়ে ভাজতে শুরু করলো। এক পিঠ ভাজার পর মাছগুলো সে উলটিয়ে দিতে গেলে এক অদ্ভুত দৃশ্যের মুখোমুখি হলো। হঠাৎ রসুইঘরের দেওয়াল চিচিং ফাঁক হয়ে যায়, আর সেই ফাঁক দিয়ে রসুই ঘরে ঢুকলো এক অপরূপ সুন্দরী যুবতী, বেহস্তের কন্যার মতো। উজ্জ্বল একরাশ সোনালী চুল তার পিঠে, নিটোল মুখের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। অল্প একটু ফাঁক হয়ে থাকা পাতলা দুঠোঁটের রক্তাক্ত পাপড়ির মাঝে মুক্তোর মতো ঝকঝকে সাদা দাঁত। চোখে সুরমা, টানা-টানা বাঁকানো দুটো ভ্রূ, সুন্দর টিকলো নাক। পাগল করা রূপ, সমস্ত অবয়ব জুড়ে যৌবনদীপ্ত একটা স্নিগ্ধ আমেজ যা পুরুষ কেন মেয়েদের দৃষ্টিও আকর্ষণ না করে পারে না। মাথায় আকাশ-নীল সিল্কের রুমাল বাঁধা। দুকানে বড় বড় দুটো রিং ঝুলছে, দু'হাতের কব্জিতে ব্রেসলেট, হাতের আঙুলগুলোয় দামী পাথরের আংটি শোভা পাচ্ছিল। মেয়েটির হাতে একটা ফাঁপা লাঠি, সেটা সে ফ্রাইং-প্যানের দিকে উঁচিয়ে বলে, 'ও মাছ ভাই! ও মাছ ভাই! আমার কথা শুনতে তোমাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

অমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখে দারুণ ভয় পেয়ে জ্ঞান হারালো রাঁধুনী। সেই সুন্দরী যুবতী আরো দু'বার জিজ্ঞেস করলো মাছগুলোকে, তারা তার কথা শুনতে পাচ্ছে কিনা! অবশেষে মাছগুলো কড়াইয়ের ওপর মাথা তুলে ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ! হ্যাঁ!' তারা এক সুরে আবৃত্তি করে উঠলো :—

তুমি এসেছো, আমরা যাচ্ছি,
আমরা ছিলাম, আমরা আছি।
আমরা থাকবো, যতক্ষণ আমাদের বিশ্বাস থাকবে,
আল্লা আমাদের কান্না শুনতে পাবে।

এরপর সেই যুবতীটি হঠাৎ উনুনের ওপর কড়াইটা উপুড় করে দিতেই আধ-ভাজা মাছগুলো আগুনে পড়ে ঝলসে উঠলো। তারপর সে যে পথে এসেছিল সেই পথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। রসুইঘরের দেওয়ালটা আবার জোড়া লেগে গেলো আগের মতো।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে রাঁধুনীটা ভালো করে চোখ মেলে তাকাতে গিয়ে দেখলো, চারটে মাছ, উনুনের আগুনে পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে গেছে। 'একি সর্বনাশ হলো? সুলতানের জন্য প্রথম মাছের কালিয়া রাঁধতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেললাম মাছগুলো? তিনি নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবেন না!' কথাটা আপন মনে বলতে বলতে সে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। তার চিৎকার শুনে উজির ছুটে এসে দেখলো অমন অবস্থা। যাইহোক রাঁধুনীর জ্ঞান ফিরে আসতেই সে তাকে হুকুম করে, 'যেখান থেকে পারো সুলতানের জন্য মাছগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে এসো।

বেচারী রাঁধুনী—তখন কান্নায় ভাসিয়ে দিলো তার চোখ-জোড়া। তারপর সে তার কান্না থামিয়ে উজিরকে সব খুলে বললো। উজির তো কিছুতেই তার কথা বিশ্বাস করতে চায় না। বলে কি মেয়েটি? সে কি জেগে জেগে দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখে? না, এ সম্ভব নয় এ হতে পারে না, বিশ্বাস করা যায় না। সেই ধীবরকে ডেকে উজির তাকে হুকুম করে, ঠিক সেই রকম আরো চারটি মাছ ধরে আনতে সুলতানের জন্য।

নতুন করে আবার ইনাম পাওয়ার লোভে ধীবর দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে সেই সরোবরে গেলো মাছ ধরতে। আশ্চর্য। সেই চারটি মাছই যেন তার

জালে আবার ধরা পড়লো। আনন্দে নাচতে নাচতে উজিরের কাছে ছুটে এলো সে মাছগুলো সঙ্গে নিয়ে। উজির তার হাত থেকে মাছগুলো নিয়ে সোজা রসুই ঘরে গিয়ে সেই নবাগত বাঁধুনীকে বললো, 'আমার সামনে এই মাছগুলো ভাজো, আমি নিজের চোখে তোমার গাঁজাপুরি গল্পের নায়িকাকে দেখতে চাই।

ভয়ে ভয়ে বাঁধুনী মাছগুলো কুটে কোন রকমে আবার কড়াইয়ের ওপর রাখলো, নিচে উনুনের গনগনে আগুন। যাইহোক, কিছুক্ষণ কোন অস্বাভাবিক কিছু ঘটলো না, তবে বেশ খানিক সময় পরে রসুইঘরের দেওয়ালটার চিচিং-ফাঁক থেকে এক পরমাসুন্দরী যুবতী বেরিয়ে এলো। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই নাক, সেই—আশ্চর্য। কোথাও কি এতোটুকু খুঁত থাকতে নেই? যেন একই ছাঁচে ঢালা দুই রাজকন্যার মুখ দুটি। আগের কায়দায় সেই যুবতীটি কড়াইয়ের দিকে তার হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে শুধোয়, 'কি হো মাছ ভাইরা, তোমার আমার কথা শুনতে পাচ্ছো তো?'

তার কথায় সাড়া দেওয়ার জন্য মাছগুলো কোন রকমে মুখ তুলে উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, তুমি কি বলতে এসেছো আমরা জানি।' বলে তারা সমবেত কণ্ঠে আগের সেই কবিতাটা আবৃত্তি করলো।

ওদিকে শাহরাজাদ দেখলো, রাতের কালো আকাশ আবার ফিরে নীল হয়ে আসছে। অর্থাৎ ভোর হয়ে এলো। আগামীকাল গল্প বলার অনুমতি নিয়ে থামলো সে।

শাহরাজাদ তার ছোট বোন দুনিয়াজাদের অনুরোধে শাহেনশাহ শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে তার আগের দিনের গল্পের জের টেনে আবার বলতে শুরু করলো, 'তাহলে শুনুন জাঁহাপনা, মাছেরা কথা বলতেই সেই রূপবতী যুবতীটি আগের কায়দায় তার হাতের লাঠিটা দিয়ে কড়াইয়ের উলটিয়ে দিয়ে তখুনি আবার রসুইঘরের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। দেওয়ালটা আগের মতো আবার জোড়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে উজির মৃদু চিৎকার করে বলে উঠলো, 'এমন অদ্ভুত চাঞ্চল্যকর খবর সুলতানকে গোপন করা উচিত হবে না।'

তাই সে সুলতানের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনার শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত বলে গেলো। সব শুনে সুলতান গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এসব রূপকথার কাহিনী বিশ্বাস করা যায় না। যাইহোক, আমি নিজের চোখে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে দেখতে চাই।' তারপর সেই ধীবরকে ডেকে তিনি হুকুম করলেন, আগের মতো ঠিক সেই রকম চারটি মাছ সেই সরোবর থেকে তাঁর জন্যে ধরে আনতে হবে।

ধীবর তো সুলতানের কাছ থেকে মাছ ধরার অনুমতি পেয়ে মহানন্দে সরোবরে গিয়ে তার জাল ফেললো। সেই চারটি মাছ আবার ধরা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদে গিয়ে মাছ চারটি তাঁর হাতে তুলে দিলো। সুলতান তার প্রাপ্য চারশো দিনার তার হাতে গুঁজে দিয়ে ছুটলেন রসুইঘরে। মাছ ভাজার ভার পড়লো আবার সেই [illegible] ওপর। এবার সুলতান নিজের [illegible] মাছ ভাজা প্রত্যক্ষ করবেন।

ওদিকে বাঁধুনী তখন ভয়ে ভয়ে মাছগুলো কুটে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে কড়াইয়ের ওপর রাখলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাছগুলোর একটা দিক ভাজা শেষ। তারপর সে যেই মাছগুলো উল্টাতে যাবে, কিন্তু সেই সময় রসুইঘরের দেওয়ালটা সশব্দে ফাঁক হয়ে যায়, আর সেই ফাঁকের মধ্যে দেখা যায়, এবার আর সেই সুন্দরী যুবতী নয়, দৈত্যের মতো কালো পাথরের মতো শক্ত সমর্থ চেহারার এক আদিবাসী আরব পুরুষ। হাতে সদ্য ভাঙ্গা গাছের ডাল। দারুণ জোরে একটা হুঙ্কার ছাড়লো সে, 'হু—হু—হু।'

তারপর মাছগুলোর উদ্দেশে বললো সে, 'ও মাছ ভাই, ও মাছ ভাই, তোমরা জেগে আছো ?'

তার কথার জবাবে মাছগুলো ঘাড় তুলে উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ ভাই জেগে আছি, কিন্তু আমাদের কি দশা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছো তো ? কিন্তু আমরা ভেঙ্গে পড়িনি। আমরা জানতাম তুমি ঠিকই আসবে আমাদের উদ্ধার করতে।' বলে তারা আপন মনে সমবেত কণ্ঠে সুর করে আগের সেই কবিতটা আবৃত্তি করলো :—

তুমি এসেছো, আমরা যাচ্ছি,
আমরা ছিলাম, আমরা আছি।
আমরা থাকবো যতক্ষণ আমাদের বিশ্বাস
থাকবে,
আল্লা আমাদের কান্না শুনতে পাবে।

তাদের সেই দুঃখের কাহিনী শুনে দৈত্যের মতো চেহারার কালো লোকটা কড়াইয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে সেটা উনুনের ওপর উল্‌টিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও উধাও হয়ে যায় এবং রসুই ঘরের দেওয়ালটাও জোড়া লেগে যায়। এবার সুলতান উনুনের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখলেন, মাছগুলো পুড়ে কাঠ কয়লার মতো হয়ে গেছে।

সেই বিচিত্র ঘটনাটা সুলতানের মনে দারুণ গভীরভাবে রেখাপাত করলো এবং তিনি তাঁর উজিরকে কাছে ডেকে বললেন, 'এর পরে তো চুপ-চাপ বসে থাকা যায় না। দৈত্যের মতো কালো ঐ নিগ্রোটাই বা কে, কে ঐ রূপবতী রমণী ? আর ঐ মাছগুলোর পিছনে তো বিরাট একটা রহস্য লুকিয়ে আছে বলে আমার মনে হয়। এই সব রহস্যগুলোর সমাধান আমাকে করতেই হবে, তা না হলে আমার চোখে ঘুম আসবে না।'

তাই তিনি সেই ধীবরকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললেন, 'শোনো ধীবর, সত্যি করে বলো, ঐ রঙীন মাছগুলো তুমি কোত্থেকে ধরে এনেছিলে ?'

'শহরের কাছেই ছোট খাটো চারটে পাহাড় আছে।' ধীবর বলে, 'আর সেই পাহাড়গুলোর মাঝে একটা ছোট্ট সায়র (সরোবর) আছে।' মাছ-গুলো যে সেই সায়র থেকে এনেছে বলে জানালো সে। জায়গাটা খুব বেশী দূরে নয় হাঁটা পথে মাত্র আধঘণ্টা সময় লাগে।

উজিরের দিকে ফিরে সুলতান হুকুম করলেন, সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর ঘোড়সোয়ারদের তৈরী হওয়ার জন্য। তিনি সেই রহস্যময় পাহাড় এবং সায়রটা নিজের চোখে দেখতে চান, সঙ্গে তার নির্দেশক হিসেবে যাবে সেই ধীবর।

যথা সময়ে সুলতান রওনা হলেন তার প্রাসাদ থেকে সেই পাহাড় ঘেরা সায়রের সন্ধানে। তাঁকে অনু-সরণ করলো তার সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর প্রভৃতি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা একটা পাহাড় ডিঙিয়ে গিয়ে পড়লেন একটা নির্জন মরুপ্রান্তরে, জীবনে যে জায়গাটা এর আগে কোনোদিন তারা দেখেননি। চারটে ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা সায়র যার নীল স্বচ্ছ জলে লাল, সাদা, হলুদ ও নীল রঙের মাছেদের পাখনা মেলে বিচরণ। সে এক অদ্ভুত প্রকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা স্বপ্নময় পরিবেশ বিরাজ করছিল সেখানে। মুগ্ধ সুলতান তার সৈন্য-সামন্তদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ এর আগে এই সায়রের জল কখনো দেখেছিলে ?' তারা সবাই মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয়, তাদের জীবনে এর আগে কখনো তারা সেখানে আসেনি।

তারপর তারা জনে জনে সেখানকার প্রতিটি অধিবাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তারাও সেই একই উত্তর দিলো, এ সায়র তারা চোখে কখনো দেখেনি এর আগে। সুলতান তখন তাঁর লোকজন-দের উদ্দেশে বললেন, 'এই রহস্যময় সায়র এবং তার রঙীন মাছগুলোর রহস্য ভেদ না করা পর্যন্ত আমি আমার রাজধানীতে ফিরে যাবো না, আর আমার সিংহাসনে বসে রাজকার্য পরিচালনা করার ইচ্ছেও

নেই।' তারপর সৈন্য-সামন্ত এবং লোক-লস্করদের হুকুম করলেন তারা যেন পাহাড়গুলোর চার-পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা তাঁর আদেশ পালন করলো।

সব শেষে তিনি তার প্রধান উজিরকে ডেকে বললেন, 'শোনো উজির, আজ রাতটা আমি এখানে থাকতে চাই। আমার মন বলছে, এই সায়র এবং সায়রের রঙীন মাছগুলোকে ঘিরে কোন ঐতিহাসিক কাহিনী জড়িত আছে সেই অজানা কাহিনীর



সূত্র আমি খুঁজে বার করতে চাই একা এই পাহাড় ঘেরা সায়রের চারপাশে ঘুরে। কিন্তু আমার এই উদ্দেশের কথা একা তুমি ছাড়া কাকপক্ষীও কেউ যেন জানতে না পারে। তাই তোমার কাজ হবে আমার তাবুর প্রবেশ পথের সামনে সর্বক্ষণ তুমি বসে থাকবে। কেউ আমার খোঁজে এলে তাকে বলবে, সুলতান অসুস্থ এবং তাঁর আদেশ আছে, কেউ যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না যায়। আর শোনো, আমার এই পরিকল্পনার কথা কেউ যেন জানতে না পারে, বুঝলে?'

প্রধান উজির সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিলো, তাঁর হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে।

তারপর সুলতান তাঁর নিজস্ব রাজবেশ ত্যাগ করে ছদ্মবেশ ধারণ করে কাঁধে তাঁর তলোয়ারটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নৈশ ভ্রমণের উদ্দেশে ভোর না হওয়া পর্যন্ত। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় পাহাড় চড়াই— উতরাই, খানা-খন্দর ডিঙিয়ে এক সময় ক্লান্ত হয়ে একটা পাহাড়ের ঢিবির ওপর বসে পড়লেন সুলতান। রাত্রির দ্বিতীয় যামে, ভোর হতে তখন খুব বেশী দেরী নেই, হঠাৎ তার নজরে পড়লো অদূরে একটা কালো মতো কি একটা বস্তু যেন দেখা যায়। তার মন এক অজানা আনন্দে নেচে উঠলো সহসা। স্বগোক্তি করে বললেন, 'মনে হয় ওখানে কেউ এক-জন নিশ্চয়ই আছে, যে আমাকে এই সায়র এবং

রঙীন মাছগুলোর রহস্য সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করলেও করতে পারে।'

কথাটা ভাবামাত্র গা ঝাড়া দিয়ে বেশ খানিকটা এগোতেই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো, কালো পাথর এবং লোহার বেড় দিয়ে মোড়া একটা রাজপ্রাসাদ। প্রসাদের প্রধাণ সিংহদ্বারটা ছিলো দুই পাল্লার। এক পাল্লা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিলো এবং অন্য পাল্লা ঈষৎ ভেজানো ছিলো।

একটা সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে সুলতান যেন দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। দ্রুত গতিতে পাহাড়ী চড়াই-উতরাই ডিঙ্গিয়ে সেই প্রাসাদের প্রধান ফটকের সামনে এসে অনেক হাঁক-ডাক করলেন তিনি কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেলো না। তবে কি প্রাসাদ জনম নবশূন্য? প্রাণের কোন স্পর্শ নেই সেখানে? সুলতান ভাবলেন বটে তবে সঙ্গে সঙ্গে আবার শেষ বারের মতো খুব জোরে বলে উঠলেন, 'কেউ আছো প্রাসাদে? আমি এক পথভ্রষ্ট পথিক। আজকের বাকী রাতটুকু আমি একটু আশ্রয় পেতে চাই এই রাজপ্রাসাদে। কিন্তু এবারও কোন সাড়া পাওয়া গেলোনা। নীরব রইলো সেই প্রাসাদটা। একবার, দুবার, তিনবার ডাকার পরেও কোন সাড়া না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সুলতান বুকে সাহস সঞ্চয় করে সিংহদ্বারের ভেজানো পাল্লা ঠেলে রাজপ্রাসাদের মাঝবরাবর জায়গায় এসেও কোন প্রহরী কিংবা কোন লোককে দেখতে পেলেন না। লোকজন না থাকলেও সুলতান দেখলেন রাজপ্রাসাদের দরজা থেকে শুরু করে বাতায়ন, অলিন্দ, অন্দর মহল বেশ পারিপাটি করে সাজানো-গোছানো। দেখলে মনে হয়, এই খানিক আগেও সেখানে লোক ছিলো, কোন কারণে এখন জনমানবশূন্য। নিঝুম, নিস্তব্ধ প্রাসাদপুরী। দরজায় দরজায় দামী পর্দা ঝুলছে, দেখলে মনে হবে ঘরের মধ্যে নিভৃতে কেউ বা কারা বিশ্রাম নিচ্ছে। রাজদরবারে বাদশাহের সিংহাসন আছে, আছে কুর্শি আমির, উজির, ওমরাহ এবং সভাপরিষদদের, কিন্তু শূন্য সিংহাসন, শূন্য আসন। পাখীর খাঁচা আছে, কিন্তু পাখী নেই। ঘোড়াশাল আছে, কিন্তু ঘোড়া নেই। পারিচারক-পরিচারিকাদের ঘর আছে, কিন্তু তাদের একজনের টিকিও চোখে পড়লো না সুলতানের। এক কথায়, সেই রহস্যময় রাজপ্রাসাদে সব কিছুই আছে, কিন্তু প্রাণের কোন স্পন্দন নেই। নিষ্প্রাণ সেই রাজপ্রাসাদ! মুষড়ে পড়েন সুলতান। সেই অদ্ভুত সায়র, বিচিত্র রঙীন মাছগুলো, এবং তার চেয়েও বিচিত্র এই রাজপ্রাদাদের রহস্যের হদিশ দেওয়ার জন্য এখানে কেউ বেঁচে নেই। এমনি এক সিদ্ধান্তে পৌঁছে অবশেষ সুলতান সেই রাজপ্রাসাদের একটি শয়নকক্ষের দরজার সামনে বসে পড়লেন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত দেহটা মেঝের ওপর এলিয়ে দিয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে একজনের মর্মভেদী আক্ষেপ কবিতার ছন্দে ছন্দায়িত হতে শুনলেন সুলতান।

আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি হয়নি
নিজেকে গোপন করার,
নিজের দুর্ভাগ্যকে কেবল নিজের মধ্যে
সীমাবদ্ধ রাখার,
বুকে আগুন, তবু খোদার কাছে অভিযোগ
জানাইনি।

কিন্তু কে সেই আগন্তুক?
আমার রাতের ঘুম নিলো কেড়ে!
কে সেই হতভাগ্য পুরুষ,
আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়াতে চাইছে,
কে সেই বেয়াকুফ?

বড় করুণ বড় মর্মন্তুদ, বড় মর্মস্পর্শী সেই কণ্ঠস্বর, শোনা মাত্র সুলতান উঠে দাঁড়ালেন, সেই কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে পর্দা ঠেলে শয়নকক্ষে প্রবেশ করতেই তিনি দেখলেন, কৌচের ওপর এক যুবক বসে আছে। সুপুরুষ, একটা সৌম্য ভাব ফুটে আছে তার চোখে-মুখে। শ্বেতশুভ্র কপাল, গোলাপ

রঙের চিবুক, চাহনি উদাস হলেও একটা প্রচ্ছন্ন তীক্ষ্ণতার রেশ থেকে যায় তার চোখের তারায়। কবির ভাষায় মনে পড়ে যায় :—

কার প্রতীক্ষায় সে বসে আছে, কে জানে।
তার চোখে আমি দেখেছি যেন অন্য কার, সবনাশ,
নাকি অভিশাপ ?
আমাকে দেখে তার উদভ্রান্ত চাহনি, সে কার সন্ধানে ?

বাদশাহ যুবকের মাথায় দামী হীরা-মণি-মানিক্য খচিত রাজমুকুট, কিন্তু বিষন্ন তাঁর মুখ, বিষণ্ণ তাঁর দৃষ্টি। সুলতান তাকে সালাম জানাতে মাথা নত করে তিনি কুর্নিশ করলেন, 'অপরাধ নেবেন না, ওঠার ক্ষমতা আমার নেই। আপনি ঐ কৌচটা আমার সামনে টেনে নিয়ে এসে বসলে খুশি হবো।'

'আমি আপনার অতিথি।' সুলতান বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার রাজ্যে আসা। আপনার রাজ্যে এমন অদ্ভুত সায়র এবং তার সেই রঙীন মাছগুলোর রহস্য জানতেই আপনার কাছে আমার আসা। কিন্তু আপনার এই নির্জন প্রাসাদে এসে আপনার আক্ষেপ শুনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে, আপনার দুঃখটা কিসের, কেনই বা আপনার এই আক্ষেপ ?'

সুলতানের মুখ থেকে সান্ত্বনার কথা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন বাদশাহ। তাঁর মনের সব বেদনা অশ্রু হয়ে ঝরে পড়লো কবিতার ছত্রে ছত্রে :—

যে শুয়ে থাকে তার দিলও বোধহয়
ঘুমিয়ে থাকে,
কিন্তু আমি তো ঘুমতে চাইনি
ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল আমাকে।
আল্লা জানেন আমি বেগুণাহ,
খোদার শেষ বিচারের প্রতীক্ষায়,
আমি দিন গুজারছি।
এই হলো আমার জীবনের ঘটনা-প্রবাহ।

সুলতান অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা শাহাজাদা আপনার কান্নার কারণটা কি তা তো বললেন না এখনো পর্যন্ত ?'

'ভেবেছিলাম আমার দুঃখের কথা অন্য কাউকে বলে শুধু শুধু তার মনটা ভারাক্রান্ত করে তুলবো না। কিন্তু আপনি যখন একান্ত জানতেই চাইছেন, তখন প্রকাশ না করে আর থাকতে পারলাম না।' এই বলে তিনি তাঁর পায়ের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দিলেন। তাঁর দেহের নিম্নাংশের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন সুলতান। শাহজাদার কোমরের নিচের অংশটা পাথরের, সেখানে রক্ত-মাংসের কোন চিহ্ন নেই, তবে তাঁর দেহের উর্দ্ধাংশ মানুষের দেহের মতোই রক্ত ও মাংস দিয়ে তৈরী এবং স্পর্শ কাতর।

যুবকের অমন করুণ অবস্থা দেখে সুলতান মুষড়ে পড়ে বলেন, 'ভাগ্যের কি বিচিত্র পরিহাস দেখুন, আমি এসেছিলাম আপনার রাজ্যের সেই অদ্ভুত সায়র এবং তার সেই বিচিত্র রঙীন মাছগুলোর রহস্য জানতে অথচ সেই আপনার জীবনই মনে হচ্ছে আর এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনীতে ভরা। আপনার সেই দুঃখের কাহিনী শোনার জন্য আমি খুব উদগ্রীব। খোদা আল্লা বোধহয় আপনার সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিয়ে ভালোই করেছেন। আপনি আর সময় নষ্ট করবেন না, তাড়াতাড়ি সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে বলুন মেহেরবানি করে।'

যুবক একটু সময় কি চিন্তা করে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বলবো বৈকি। সব বলবো। এমন কি সেই সায়রও সায়রের রঙীন মাছগুলোর কাহিনীও আপনাকে শোনাতে হবে আমাকে—'

'সে কি রকম ?'

'সেই সব কাহিনীর সঙ্গে আমার জীবনের করুণ কাহিনীও যে জড়িয়ে আছে। তাই সে কাহিনী না

বললে আমার জীবনের অনেক কিছু বলা হবে না !' এই বলে যুবকটি বলতে শুরু করলো—

'জানেন জাঁহাপনা, এক সময় এই রাজ্যে আব্বা-জান রাজত্ব করতেন, মহম্মদ তাঁর নাম ছিলো। এ জায়গাটা তখন একটা দ্বীপের মতো ছিলো, এখন চারটি পাহাড়ে ঘেরা শহর। তিনি প্রায় সত্তর বছর রাজত্ব করেছিলেন। তারপর খোদার ইচ্ছায় তাঁকে বেহস্তে চলে যেতে হয়, তাঁর মৃত্যুর পর আমি তাঁর স্থলাভিসিক্ত হলাম, হলাম আমি সুলতান! আমি আমার চাচার মেয়েকে শাদী করে আমার খাস বিবি করে নিয়ে এলাম। বিবি আমাকে খুব ভালোবাসতো। এমনো হয়েছে, কার্যোপলক্ষে আমি যখন প্রাসাদের বাইরে গেছি, সে তখন আমার অবর্তমানে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এই রকম ভালোলাগা, ভালোবাসার মুহূর্তগুলি আমরা ধরে রাখি দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে। তারপর একদিন চাচার মেয়ে গোসল করার জন্য হামামে ঢুকেছে, আর আমি রাঁধুনাকে বলি আমি আমাদের নৈশভোজের ব্যবস্থা করার জন্য। আমাদের শয়ন-কক্ষে ঢুকে বিছানায় এলিয়ে দিই, দেহটা, বুঝিবা একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। দুজন ক্রীতদাসী আমার পালঙ্কের নিচে বসেছিল। কিন্তু আমার চোখে ভালো করে ঘুম নাম নেই। আমার বিবির অনুপস্থিতি মনটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ঘুম আসছিল না, যদিও চোখ বুজে পড়েছিলাম বিছানায়, কিন্তু আমার মন তখন চাচার মেয়ের চিন্তায় মগ্ন ছিলো। আমি ঘুমাচ্ছি ভেবে সেই ক্রীতদাসী দুজন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল নিচু গলায়। একজন আর একজনকে বলছিল, 'জানো মাসুদা, সত্যি আমাদের প্রভুর কি দুর্ভাগ্য ভাই, বৃথাই গেলো তাঁর জীবন যৌবন। তাঁর জন্য মায়া হয়, অমন এক সজ্জন পুরুষের একটা অতি বাজে মেয়েমানুষ তাঁর বেগম? ছিঃ ছিঃ ও একটা বেহায়া মাগী, বাজারে বেশ্যা ছাড়া আর কি ভাবা যেতে পারে তাঁর বেগমকে!'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো ভাই', প্রত্যুত্তরে ক্রীতদাসী বলে, 'শুনেছি, বিশ্বাসঘাতিনী, স্বৈরিণী মেয়েমানুষদের আল্লা কতো তো শাস্তি দিয়ে থাকেন, কিন্তু আমাদের প্রভু যেন মাটির মানুষ, কোন সখ-আহ্লাদ নেই, নেই কোন আকাঙ্খা। তাই মনে হয়। চাচার মেয়ের থেকে অনেকাংশে ভালো একটি মেয়েকে তার বিবি হিসাবে পাওয়ার যোগ্যতা তাঁর আছে বৈকি। অথচ ভাগ্যের একটি পরিহাস যে, যে মেয়ের প্রতি রাত্রে নিত্য নতুন একটি মরদ তার শয্যা-সঙ্গী না হলে ঘুম আসে না, তাকেই তিনি তাঁর খাস বেগমের মর্যাদা দিয়ে তাঁর হারেমে থাকতে দিয়েছেন। এর থেকে আর কি দুঃখের কথা থাকতে পারে, বলো ভাই!'

তারপর আমার মাথার পাশে যে ক্রীতদাসীটা বসেছিল, সে বলে উঠলো, 'আচ্ছা আমাদের প্রভু কি বোবা, তা না হলে কেন তিনি তাঁর অমন বিশ্বাসঘাতিনী বেগমের সতীত্ব নিয়ে কৈফিয়ত চান না কেন?'

উত্তরে অপর ক্রীতদাসী বলে, 'বেচারার দুর্ভাগ্য কি সাধে বলেছি ভাই? তিনি কি আর জানতে পারছেন, তাঁর বেগম রাতের অন্ধকারে কোন্ পুরুষের সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে? তাছাড়া ও যা দজ্জাল মাগী, প্রভুর পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা করলে তবে তো! তাঁকে কিছু বলতে দিলে তবে তো? রোজ রাতে ঘুমতে যাওয়ার আগে ঐ শয়তানিটা প্রভুকে সরাব খেতে দেয় নিজের হাতে, আর সেই সরাবের সঙ্গে ভাঙ মিশিয়ে দেয়। তারপর সেই ভাঙ মেশানো সরাব খেয়ে একটু পরেই বেহুঁস হয়ে পড়েন তিনি, চোখ খুলতে পারেন না, অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েন। তখন তিনি জানতেও পারেন না বাকী রাতটুকু তাঁর বেগম কোথায় যায়, কিংবা কি সে করে! কিন্তু আমরা তো জানি কি করে সে। তারপর সে গায়ে দামী পোষাক চাপিয়ে, চোখে সুর্মা

লাগিয়ে, গায়ে দামী আতর, সুগন্ধী ছিটিয়ে সুলতানের শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়, ফেরে বাইরে ভোরের আলো ফোটার আগেই। নিজের শয়নকক্ষে ফিরে ঘুমন্ত হুজুরের নাকে কি একটা জিনিষ শুঁকিয়ে দেয়, আর তাতেই হুজুরের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

ক্রীতদাসীদের কথা শোনার পর মনে হলো আমার চোখের সামনে থেকে ঘরের বাতিগুলো যেন নিভে গেলো, আঁধার ঘনিয়ে এলো। তখনই আমার চাচার মেয়ে হামাম থেকে বেরিয়ে এলো। ক্রীতদাসীরা নৈশভোজের টেবিল সাজিয়ে দিলো, পরিবেশন করলো সুস্বাদু খাবার। বেগম নিজের হাতে আমার খাবার এগিয়ে দিলো, খুব যত্ন করে খাওয়ালো আমাকে প্রায় আধঘন্টা ধরে। তারপর সে আমার প্রিয় সরাব গ্লাসে ঢাললো এবং যথারীতি সে নিজে আমার হাতে তুলে দিলো সেই সরাবের গ্লাস, রোজকার এবং যথারীতি অভ্যেস মতো। কিন্তু সেদিন আমি তার দেওয়া সরাব পান করলাম না, কায়দা করে তার অলক্ষ্যে আমার বুকের মধ্যে ঢেলে দিলাম ঠোঁটে ঠেকিয়ে। তারপর অন্য-দিনের মতো পালঙ্কে দেহ এলিয়ে দিয়ে অচিরে নাক ডাকতে শুরু করে দিলাম ওকে শুনিয়ে, যাতে ও বুঝতে পারে যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে টোপটা ও গিলে ফেললো, মৃদু চিৎকার করে বলে উঠলো, 'রাতভোর ঘুমিয়ে থাকো, আল্লার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার যেন ঘুম আর না ভাঙে আমি তোমাকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি তোমার সারা দেহ কি করে যে এতোদিন আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সহবাস করেছিলাম ভাবতে অবাক লাগে। অবাক লাগে তোমার দেহটা কি করে আমার দেহের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে দিয়েছিলাম। আমি এখন অপেক্ষা করছি, আল্লা কখন তোমার জানটা ছিনিয়ে নেন। তোমার সুরৎ যেন আর দেখতে না হয়।'

তারপর ও উঠে দাঁড়ালো, আমার চোখের সামনে (পিছন ফিরে ছিলো বলে ও আমার চোখ মেলা দেখতে পায়নি) সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে সোহাগ করে আমার দেওয়া সব থেকে দামী-পোষাক পড়ে আরশির সামনে প্রসাধনে লিপ্ত হলো। চোখে সুরমা টেনে আমার তলোয়ারটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেয় ও। খানিক পরে প্রাসাদের ফটক খোলার শব্দ ভেসে এলো আমার কানে। আমারি আঙ্গিনা দিয়ে চললো আমার বিবি অভিসারে মোহিনী রূপে, পথে সুগন্ধি খুশবু ছড়িয়ে।

আমার চোখ থেকে ঘুম তখন উধাও। পালঙ্ক থেকে নেমে অনুসরণ করলাম। ওকে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে। দূর থেকেই দেখলাম, প্রাসাদের সিংহ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বললো মন্ত্র উচ্চারণের মতো, বুঝতে পারলাম না, সঙ্গে সঙ্গে ভাবি ভাবি তালাগুলো খসে পড়লো ভেঙ্গে পড়ার মতো। সিংহ দরজা তখন মুক্ত, অবারিত। তারপর ও হেঁটে চললো (আমি ওর পিছু নিলাম, ওর দৃষ্টি এড়িয়ে), থামলো শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে, স্তুপাকার আবর্জনায় ভর্তি। মাটির তৈরী কুঁড়ে ঘর, বাস আর খড়ের ছাউনি দেওয়া গোলাকৃতি ছাদ। সেই ঘরটার মধ্যেও ঢুকতেই আমি ছাদের ওপর উঠে বসলাম, খড়ের ছাদ বলে ঘরের ভেতরটা আমার চোখের সামনে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আমার চাঁচার সুন্দরী মেয়ে তখন অতি কুৎসিত ভয়ঙ্কর এক নিগ্রো ক্রীতদাসের সান্নিধ্যে, তার পুরু ঠোঁট দুটো অসম্ভব ঝুলে পড়েছিল, তার সামনে ইত্যাকার ছড়ানো আখের ছোবড়া। সারা অঙ্গে তার কুষ্ঠব্যাধি, বাতে পঙ্গু, নোংরা বিছানায় পিছন ফিরে বসেছিল সে। তার সামনে গিয়ে জমিণ চুম্বন করে সেলাম জানালো আমার বেগম।

মাথা তুলে তাকালো সে ওকে দেখার জন্য। তার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। খিস্তি করলো সে, 'হারামজাদী, এখন তোর সময়

হলো? এতক্ষণ কোন নাগরের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছিলি শুনি! এখানে সবাই হাড়িয়া খেয়ে যে যার মেয়ে-মানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করতে মেতে উঠেছে। আর আমি এখানে একা বসে তোর সুরৎ দেখতে না পেয়ে আমার সাধের হাড়িয়া খেতেও ভুলে গেছি।'

আমার বেগম তখন তার মন ভোলানোর জন্য ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে থাকে, 'আমার প্রাণনাথ, তুমি কি জানো না, কালু চাচাব ছেলের সঙ্গে আমার শাদী হয়ে গেছে? উঃ কি সেই যন্ত্রণা! ঘৃণায় তার দিক থেকে আমাকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হয়। না পারি তার সুরৎ দেখতে, না পারি সহ্য করতে সে যখন আমার নগ্ন শরীরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কাম চরিতার্থ করে। বিশ্বাস করো প্রাণনাথ, তার সঙ্গ আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। এক এক সময় আমার ভীষণ ইচ্ছে হয়, যদি আমার তেমন ক্ষমতা থাকতো, তার বিলাস-বহুল প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার করে দিই, তার সব ঐশ্বর্য, ধন-দৌলত লুট করিয়ে দিই, তাকে পথের ভিখিরী বানিয়ে দিয়ে তোমার কাছে চলে আসি চিরদিনের জন্য। বিশ্বাস করো, তার সেই ভোগের প্রাসাদে আর একটা দিনও সুবহ্ উঠা দেখতে আমার দিল চায় না। আমি তোমাবি বাঁদি হয়ে থাকতে চাই। আমি—'

আমার বেগমকে বাধা দিয়ে সেই নিগ্রো ক্রীত-দাসটা খিঁচিয়ে উঠলো, 'মিথ্যাবাদী কুত্তী চুপ কর। তোর অনেক ছেনালী-পনা আমি শুনেছি, আর নয়। আমি কালা আদমি, আমি যদি সাচ্চা নিগ্রোর বাচ্চা হই, তাহলে শপথ নিয়ে কবুল করছি, কাল



যদি তুই এ রকম দেরি করে আসিস, তোকে আর সঙ্গ দেবো না, এমন কি তোর শরীরের ওপর কর্তৃত্ব করা দূরে থাক এক কণাও স্পর্শ করতে দেবো না। কুত্তী, তুই জানিস না তোর ঐ সাদা চামড়ার মরদের সঙ্গে কামকেলি করতে গিয়ে যে সুখ তোকে সে দিতে পারে না, আমি তার চারগুণ সুখ দিয়ে তো'র গরমে ওঠা শরীরটা আ'মি কেমন ঠাণ্ডা করে দিই আমার যাদু-কাঠির স্পর্শে ?'

নিজের চোখে নিগ্রো ক্রীতদাসের খিস্তি-খেউড় শুনে এবং নিজের চোখে ওদের অবৈধ মেলামেশার দৃশ্য দেখে আমার মনে হলো, তখন যেন আমি আর আমার মধ্যে ছিলাম না, আমার চোখের সামনে সারা দুনিয়ার অন্ধকার যেন হামলে পড়ছিল, জানি না এ কোথায় আমি দাঁড়িয়ে আছি ! আমার পায়ের তলার জমিন সরে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে।

কিন্তু আমার বেগম তখন চোখে পানি নিয়ে মিষ্টি কথায় তাকে ভোলাবার চেষ্টা করছিল, 'আমার প্রিয়তম, আমার জান, আমার কলিজা, তুমি ছাড়া সুখ দেওয়ার মতো কোন মরদ নেই এই দুনিয়ায়, আর সেই তুমি যদি আমাকে তাড়িয়ে দাও, কে আমার এই পোড়া দেহটা ঠাণ্ডা করবে বলো ? তুমি, হ্যাঁ তুমিই তো ! আমার প্রিয়তম, আমার চোখের আলো যে তুমি। তারপর ও সেই শয়তানটার সঙ্গে রফা করার জন্য নিজের সব মান মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে পানির বদলে সুরমা মাখা চোখে মৃদু হাসির ঝিলিক হেনে আস্তে আস্তে পরনের পোষাক খুলতে থাকলো, কিছুই বাকী রাখলো না, এমন কি পেটিকোট, বুকের বন্ধনী এবং কাচুলি খুলে ফেললো নির্বিবাদে তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

তারপর তার মন গলানোর জন্য আমার বেগম তাকে শুধায়, 'আমার প্রিয় মালিক, তোমার হাতের রান্না কি আছে বলো, আমার ভীষণ ভুখ লেগেছে।' ওর দিল পসন্দ্ কথায় সত্যি সত্যি নিগ্রোটার মন বোধহয় গললো।

'গামলা খুলে দেখো', বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বিড়বিড় করে সে বলে, 'ইঁদুরের হাড়ের কিছু ঝোল তলায় পড়ে আছে, আর ঘরের ঐ কোণায় মাটির হাড়ির মধ্যে খানিকটা হাড়িয়া আছে, পান করতে পারো।'

আমার রাজপ্রাসাদের বেগম সেই কুখাদ্য কেমন তৃপ্তি করে খেলো, গলায় ঢাললো হাড়িয়া। তারপর হাত মুখ ধুয়ে সেই আঁখের ছোবড়ার ওপর নিগ্রো ক্রীতদাসের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো। এবার সে ওর নগ্ন দেহের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালো, তার কালো লোমশ হাত দুটো আমার বেগমের দু'জোড়া স্তনের ওপর এসে পড়লো ঠিক হিংস্র বাঘের মতো। কিন্তু বেগম তাতে একটুও ঘাবড়ায় না, তীব্র পেষণে যন্ত্রণার বদলে ওর মুখে কেমন একটা তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠতো দেখা গেলো, নগ্ন পা দু'টো ছড়িয়ে দিলো দু'পাশে, চোখে কামনার আগুন, বাসনার দংশন জ্বলজ্বল করতে থাকে। দু'হাত বাড়িয়ে তাকে আমন্ত্রণ জানায় ও।

এবার নিগ্রোটা একটু আগে তার শপথের কথা ভুলে গিয়ে পরনের তেল চিট্‌চিটে লেংটির মতো পোষাকটা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার বেগমের নগ্ন দেহের ওপর। থরথর করে কেঁপে উঠলো বেগমের দেহটা। আমার সুন্দরী বেগমের ফুলের মতো নরম দেহটা ঐ কুৎসিত লোকটার ভারী দেহের চাপে দলাই-মালাই হতে দেখে আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। আমার চোখের সামনে আমার বেগম, আমার চাচার মেয়েকে একটা নোংরা, কুৎসিত কালো আদমি উপভোগ করবে, আর পুরুষ হয়ে আমি সেটা সহ্য করবো ? বেহুশ ভাবটা কাটিয়ে উঠে খড়ের চাল থেকে নেমে এসে ঝড়ের বেগে সেই কুঁড়ে ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। তারপর আমার যে তলোয়ারটা বেগম সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, খাপ থেকে সেটা বার করে ভাবলাম এক সঙ্গে দুজনকেই কোতল করে ছাড়বো। প্রথমে পেছন থেকে নিগ্রো

ক্রীতদাসের গলায় তলোয়ারের কোপ দিলাম, ভাবলাম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে বুঝি সে—'

এই সময় শাহারজাদ বুঝলো, এবার ভোর হয়ে আসছে, তাই সে পরের দিন বলার অনুমতি নিয়ে তার গল্প বলা বন্ধ করলো। খুশি হয়ে বাদশাহ শাহরিয়ার চুমোয় চুমোয় রাঙ্গিয়ে দিলেন তার লাল টকটকে ঠোঁট, বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তাকে আদর করতে করতে ঘুমে ঢলে পড়লেন। সকাল হতে সেদিনও শাহারজাদের গর্দান নেওয়ার প্রশ্নটা মুলতুবি রাখলেন আগামী দিনের জন্য।

শাহারজাদ তার আগের দিনের কাহিনীর জের টেনে আবার বলতে শুরু করলো জানেন জাঁহাপনা, সেই যুবক শাপগ্রস্থ শাহাজাদ বাদশাহকে বললেন, 'সেই ক্রীতদাসের গর্দান নেওয়ার জন্য তার গর্দানে তলোয়ারের আঘাত করার পর আমি ভাবলাম তাকে বুঝি আমি কোতল করলাম, কিন্তু আসলে তার গর্দানের খানিকটা চামড়া এবং গর্দানের কিছু মাংস কাটা পড়ে আমার তলোয়ারের আঘাতে, তখনো তার জান একেবারে খতম হয়নি। তাতে আমার চাচার মেয়ের ঘুম যেন ভেঙ্গে যায়, ভাবলাম বোধহয় ওর ভুল ভেঙ্গে গেছে, এবার ও নিজেকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবে। তাই আমি তলোয়ারটা খাপের মধ্যে পুরে ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে চললাম শহরের দিকে। রাজপ্রাসাদে ফিরেই আমার পালঙ্কে গা এলিয়ে দিলোম, একটু পরে তামাম দুনিয়ার ঘুম এসে নামলো আমার চোখের কোলে।

পরদিন সকালে আমার বিবির ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই অবাক হয়ে দেখলাম, ও ওর মাথার সব চুল কেটে ফেলেছে এবং পর পরনে শোকের পোষাক।

তখন আমার চাচার মেয়ে কাতর অনুনয় করে বললো, 'আমার চাচার ছেলে, আমি যা করেছি তার জন্য তুমি যেন আমাকে দোষ দিও না লক্ষ্মীটি। একটু আগে দুঃসংবাদ এলো, আমার মা বেহস্তে গেছেন, আমার আব্বাজান পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত, এক ভাই সাপের কামড়ে মারা গেছে, আর এক ভাই উঁচু পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে। শোকে দুঃখে আমি এখন ভীষণ কাতর।'

ওর অমন দুঃখের কাহিনী শোনার পর আমার কেমন যেন মায়া হলো, আগের রাতের ওর সব অপরাধের কথা আমি নিমেষে ভুলে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ঠিক আছে, তুমি যা ভালো বোঝো তাই করতে পারে, আমি তোমায় বাধা দেবো না অবশ্যই।

সেই দিন থেকে পুরো একটা বছর ওর শোক পর্ব চললো দুঃখ এবং কান্নার মধ্যে দিয়ে। তারপর সেই শোকপর্ব শেষ হওয়ার পর ও আমাকে শুধালো,



'তোমার রাজপ্রাসাদে আমি একটা সমাধি বানাবো, তাতে একটা গম্বুজ থাকবে, যেখানে আমি রোজ আমার শোক প্রার্থনা জানাবো। আর সেটার নাম দেবো 'শোক-মঞ্জিল।'

আমি আবার ওকে বললাম, 'তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারো।'

আমার চাচার মেয়ে ওর ইচ্ছে মতো বিরাট একটা সমাধি তৈরী করালো! তারপর একদিন রাতের অন্ধকারে সেই সমাধির ভেতরে ওর অসুস্থ প্রেমিক নাগর সেই নিগ্রো ক্রীতদাসকে এনে তুললো। তবে দিনকে দিন ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছিল তার মারাত্মক ক্ষতের দরুণ। তাই সে

আগের মতো আমার বেগমকে আর দৈহিক সুখে তৃপ্তি করতে পারছিল না। কেবল হাড়িয়া খেয়ে দিন কাটাতো সে। তার বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে যায় সেই আহত হওয়ার দিন থেকে। তবু সে তখনো বেঁচে ছিলো, কারণ তার আখরি দিন তখনো ঘনিয়ে আসেনি। রোজ সকাল সন্ধ্যায় তার কাছে গিয়ে আঁখির পানিতে ভাসিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রেম নিবেদন করতে ও তাকে। এবং তাকে হাড়িয়া ও বলকারক ঝোল খাইয়ে আসতো সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য। এই ভাবে দুসবা সাল কাটলো। মনে মনে বিরক্ত হলেও আমি খু' ধৈর্য ধরে ওর সেই শোক-প্রার্থনা মেনে নিলাম এই ভেবে যে, মা-বাবা ও ভায়েদেব প্রতি শোক জানিয়ে ও যদি একটু শান্তি পায় তাতে আমাব আপত্তি কি থাকতে পারে?

যাইহোক. একদিন ওকে না জানিয়ে আমি সেই শোক মঞ্জিলেন সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও তখন শোক-মঞ্জিলের ভেতবে নিজের মুখে চড় মাড়তে মাড়তে কান্নার সুরে বলছিল, 'আমার কলিজা, কেন তুমি আমার চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছো? কথা বলো, আমাব জান, অন্ততঃ একটি বারের জন্যও তুমি আমাকে কিছু বলো। তুমি আমার প্রেম, তুমি আমার মালিক।' তাবপর ও আবৃত্তির সুরে শের বলতে শুরু করলো :—



তোমার মহব্বতের জন্য আমি দিশেহারা,
অথচ তুমি আমায় ভুলে গেছো,
তুমি কিন্তু আমার মনে আজো আছো,
অন্য কারোর মহব্বতে পারবো না দিতে সাড়া।

আমার এ দেহ, আমার এ দিল তোমার খুশি
মতো নাও,
তোমার পাশে আমার এ দেহ কবর দিও।
সেই কবরের ওপর আমার নাম ধরে ডেকো,
সাড়া দেবো তোমাকে।

এবার ও জোরে কেঁদে উঠে শের আবৃত্তি করলো :—

আমার মনের মাঝারে আসবে তুমি যবে,
বইবে আমার আনন্দ ধারা
আমার সুবমা চোখে তোমার দৃষ্টি যবে পড়বে,
সেই দিনটি হবে আমার কাছে মাতোয়ারা।
রাত্রি আমার কাছে এখন যেন এক বিভীষিকাময়,
তোমায় কাছে গেলে সব ভয় আমার দূর হয়।

আর একবার শের আবৃত্তি করলো ও :—

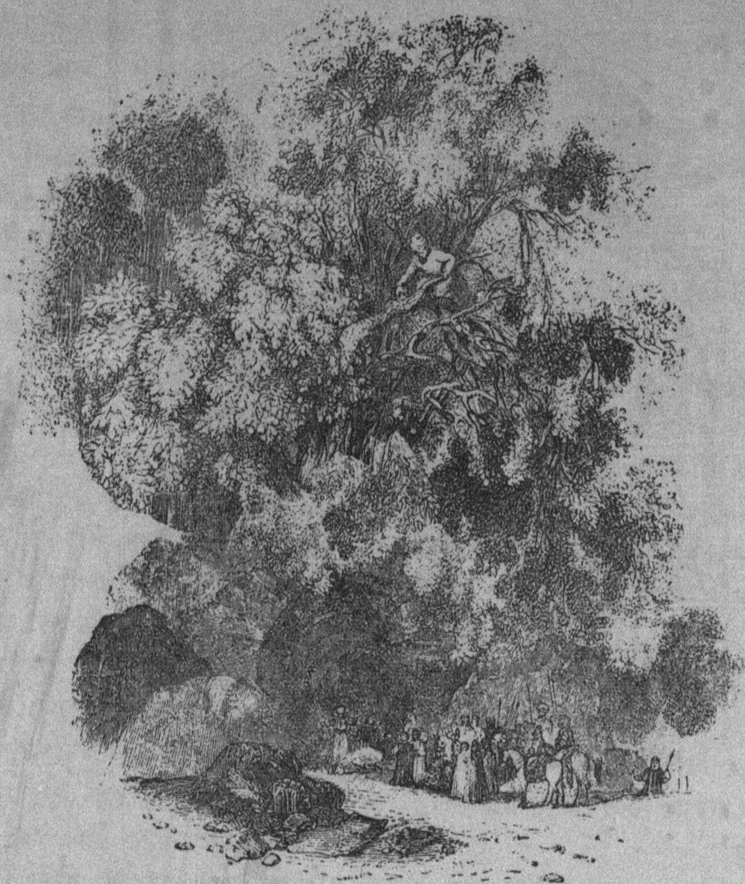
আমি জানি আমার সব দুঃখের অবসান হবে
একদিন, নতুন এক প্রভাতে,
তামাম দুনিয়া তখন আমার হাতের
মুঠোয় আসবে,
অথচ আমার সামনে এখন এক বুক
হাহাকার,
দিল চায় বিলীন হতে তোমাতে,
অথচ তুমি নেই সেই আগের মতো
আমার।

এক সময় কিছুক্ষণের জন্য শোক প্রার্থনা থামালে বাইরে থেকে আমি ওকে ডাকলাম, 'ও আমার চাচার মেয়ে, তোমার এই শোক প্রার্থনা বন্ধ করো, রোজ রোজ এভাবে চোখের পানি ফেলে কি লাভ?'

'আমাকে বিরক্ত করো না', প্রত্যুত্তরে ও বলে, 'এ আমাকে করতেই হবে, তা না হলে আমার ভয়ঙ্কর হাত দুটো আমার নিজের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবো।'









তাই আমি আর না ঘাঁটিয়ে ওকে ওর পথে চলতে দিয়ে বাইরে থেকে চলে এলাম। এবং সেই ভাবে আরো একটা বছর কাটলো: তিন বছরের মাথায় আমার কেমন যেন কৌতূহল হলো, হঠাৎ একদিন সেই শোক-মঞ্জিলের ভেতরে প্রবেশ করে তাকাতে প্রচণ্ড রাগ হলো আমার। ও আমাকে দেখতে পায়নি, পিছন ফিরে ও তখন কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, 'আমার মালিক, কতোদিন আমি তোমার সেই মিষ্টি কণ্ঠস্বর শুনিনি, তুমি আর আমার সঙ্গে কথা বলো না কেন?' এরপর ও একটা শের আবৃত্তি করতে থাকে:—

তুমি নীরব কেন ক্লান্ত প্রেমিক,
দৃষ্টি তোমার উদাস কেন, স্তব্ধ কেন চরণ?
অন্ধকারে আমি হাতড়ে বেড়াই অকারণ,
অথচ দেখো কেমন আকাশ ভরা সূয গ্রহ তাবা,
তুমি নীবব বলেই তো আমি এমন দিশেহারা,
আমি যে তোমারি প্রেমের পথিক।

বাঃ বাঃ, এই তোমার মা-বাবার নামে শোক-প্রার্থনা? এ তো দেখছি তোমার নাগরের অভিসারে প্রেম নিবেদন! বাঃ বা! তা কতদিন এ ভাবে চলবে তোমার গোপন অভিসার? শয়তানটা দেখছি এখনো জিন্দা আছে! জানোয়ারের জান বটে।

আমার গলার স্বর শোনা মাত্র সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো আমার বিবি। তখনো কাঁদছিল ও। তেমনি কাঁদতে কাঁদতেই অভিযোগ করলো ও আমার বিরুদ্ধে,—'কুত্তা, তোর জন্য আজ এই অবস্থা। তুই আমার প্রিয়তমকে তলোয়ার দিয়ে জখম করে আমার কলিজা লুট করে নিয়েছিস, 'আমার প্রেমিকের জীবন যৌবন ব্যর্থ করে দিয়েছিস এই তিন বছরে। ও এখন আমার কাছে জীবিত থেকেও মৃত।'

প্রচণ্ড রাগে আমি তখন চিৎকার করে বলে 'ওরে শয়তানি, আমারি নিগ্রো ক্রীতদাসের কাছে দেহ বিলিয়ে দেওয়ার জন্য তোর এই মহব্বতের শের গাঁথা? দাঁড়া আমি ছেনালীপনা এখুনি ঘোচাচ্ছি! হ্যাঁ, আমি ভালোর জন্যই সেই অপ্রিয় কাজটা করতে উদ্যত হলাম। খাপ থেকে তলোয়ারটা বার করে ওর গলায় কোপ মারতে গেলাম। কিন্তু ও আমার কথাগুলো হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিলো, আমার তখন কান্না পাওয়ার মতো অবস্থা। আমাব বেগম তখন চিৎকার করে বলছিল, 'যা অতীত তা আর কখনো ফিরে আসতে পারে না, আমি জানি। তবু আল্লার দোয়ায় তোর মতো শয়তানকে আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন তোর পাপের শাস্তি দেওয়ার জন্য। তোর পাপে আজ আমার কলিজা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেছে, আমার এই দেহ, এই যৌবন অসময়ে ঝরে যেতে বসেছে। তোর সেই পাপের ফল এবার ভোগ কর শয়তান!'

তারপর ও নিজের মনে বিড়বিড় কি যেন বললো, যা আমার বোধগম্য হওয়ার কথা নয়।

'আমি যদি সাচ্চা মুসলমানের মেয়ে হই, তোর অর্ধেক দেহ পাথর বনে যাক, আর বাকী অর্ধেক মানুষের দেহ নিয়ে তুই বেঁচে থাক অনন্তকাল।'

'সেই থেকে আমাকে তুমি এখন যা দেখছো, এই রকম হয়ে যাই। না পারি উঠতে, না পারি বসতে, এবং এই অবস্থায় আমাকে মৃত বলা যায় না, আবার জীবিতও বলা যায় না। শুধু আমাকে শাপগ্রস্থ করে আমার সেই শয়তানি বেগম চুপ করে বসে থাকেনি, আমার শহর, শহরের রাস্তা-ঘাট, বাড়ি ঘরদোর সব কিছু অভিশাপ দিয়ে ধ্বংস করে দেয়, ডাইনিটা তার ফুসমন্ত্র বলে শ্যামল সবুজ বনানী ঘেরা চার চারটে দ্বীপ চারটে পাহাড়ে পরিণত করে দেয়। যে পাহাড়গুলোর কথা একটু আগে তুমি জিজ্ঞেস করছিলে। আমার রাজ্যে তখন চারটি সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতো, মুসলিম, ইহুদি, খ্রীষ্টান ইহুদি এবং প্রাচীন পারস্যের পুরোহিত। আমার বেগম



ওর যাতুমন্ত্র বলে তাদেব মৎসে পবিণত কবে দেয়। মুসলিমবা হলো সাদা, পারস্যেব পুবোহিতরা লাল, খৃষ্টান ইহুদিব নীল, এবং ইহুদিবা হলুদ বঙেব মাছে রূপান্তবিত হয়ে যায়!'

এখ নে একটু থ'মলাম দম নেওয়ার জন্য, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় আমার গলা তখন শুকিয়ে আসছিল। ঢোক গিলে আবার বলতে শুরু করলাম, 'সেই থেকে আমার বেগম রোজ তুবেলা আমাকে চাবুক না মেরে খেতে দেয় না, আমার পিঠের ছাল না তুলতে পারলে ওর রাগ-ঝাল যেন মেটে না। শেষে আমার দেহের ওপর চাদর বিছিযে দেয়, আমাব ক্ষতস্থান থেকে ঝরে পড়া রক্তে সাদা চাদরটা লাল হয়ে যায়।'

এবপব সেই যুবক শাহজাদা তার সব তুঃখ-বেদনা শে‍ের ছত্রে ছত্রে উজাড় কবে দিলো :—

আল্লা, তোমার দরবাবে
আমাব কোন নালিশ নেই,
ধৈর্য আমাব সীমাহীন,
আমার তুর্ভাগ্য হোক আমারি মাঝে বিলীন।
আমি যেন এক পাথরের মূর্তি,
ওদের নির্মম আঘাত,

রক্ত ঝরে কলিজা নিংড়ে,
আমি নীরব থাকি বেহস্তের সুখ মনে করে।

এরপর যুবক শাহজাদের দিকে ফিরে সুলতান বললেন, 'তোমার দুঃখের কোন শেষ নেই দেখছি, কিন্তু, দোস্ত, তোমার সেই বেগমটি কোথায় বলতে পারো? আর সেই শোক মঞ্জিলটাই বা কোথায়, যেখানে আহত নিগ্রো ক্রীতদাসকে পাওয়া যেতে পারে।'

'সেই ক্রীতদাস এখন শোক-মঞ্জিলে অবস্থান করছে।' যুবক শাহাজাদা বলে, 'আর আমার বেগম তার ঘরের দরজার সামনে বসে তার জন্য আক্ষেপ করছে। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় আমার কাছে এসে প্রথমে আমাকে অভিশাপ দেবে, তারপর চামড়ার চাবুক দিয়ে একশোবার আমাকে মারবে। আমার তখন কান্না ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। আমি যে উঠে গিয়ে ওকে বাধা দেবো সে উপায়ও যে আমার নেই, আমার যে কোমর থেকে পা পর্যন্ত পাথর হয়ে গেছে, উঠবো কি করে? আমার ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানোর পর গরম গরম মাংসের ঝোল এবং হাড়িয়া নিয়ে যায় ও সেই ক্রীতদাসের কাছে তাকে নিজের হাতে আদর করে খাওয়ানোর জন্য। কাল সকালে আটটার সময় ও এখানে আসবে, থাকবেন আপনি সে সময়?'

'খোদা আল্লার নামে কসম খেয়ে আমি বলছি', সুলতান মৃদু চিৎকার করে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমার জন্য আমি একটা দৃষ্টান্ত রেখে যাবো যে, তামাম দুনিয়া চমকে উঠবে, ধন্য ধন্য করবে আমাকে, আমার মৃত্যুর পরেও লোকে আমাকে মনে রাখবে।'

তারপর শাহজাদার পাশে বসে সারাটা রাত তার সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটিয়ে দিলেন সুলতান। এক সময়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো, তখন ভোর হয়ে আসছিল। সুলতান উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের পোষাক পরে তলোয়ার হাতে বেরিয়ে পড়লো সেই শোক-মিছিলের উদ্দেশে, যেখানে নিগ্রো ক্রীতদাসটা মৃত্যুর প্রহর গুণছে। দূর থেকে মোমবাতির আলো চুঁইয়ে পড়ছিল শোক-মঞ্জিলের বাইরে। আতরের মিষ্টি সুবাস ভেসে এলো তাঁর নাকে। মোমবাতির আলো অনুসরণ করে ক্রীতদাসের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন সুলতান। সে তখন অঘোরে ঘুমচ্ছিল।

সুলতানের হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার। এক কোপেই ঘটনাস্থলে মৃত্যুর স্বাদ পেয়ে গেলো নিগ্রো ক্রীতদাসটা। তারপর তিনি তার মৃতদেহ কাঁধে তুলে নিয়ে রাজপ্রাসাদের কুয়োয় নিক্ষেপ করলেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপর তলোয়ারটা খাপের মধ্যে পুড়ে শোক-মঞ্জিল থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সামান্য একটু দূরে গিয়ে শাহজাদার বেগমের প্রতীক্ষায় রইলেন তিনি। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে তার ডাইনী বেগমকে তাঁর স্বামীর ঘরে প্রবেশ করতে দেখলেন। একটু পরেই তাঁর কানে ভেসে এলো চাবুকের সপ্ সপ্ শব্দ, এবং সেই সঙ্গে শাহজাদার কাতর কণ্ঠস্বর, 'আঃ যথেষ্ট হয়েছে, আর মেরো না আমাকে, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আচ্ছা, আমার চাচার মেয়ে, তোমার কি একটু দয়া হয় না?'

'দয়া?' খিঁচিয়ে উঠলো শাহাজাদার বেগম, 'তুমি আমাকে দয়া দেখিয়েছিলে? আমার মহব্বতের দাম দিয়েছিলে?' ওর দু চোখ দিয়ে ঘৃণা ঝরে পড়ছিল। কাঁপা কাঁপা হাতে শাহজাদার গায়ের ওপরে চাদরটা টেনে দিলো, একবার ভালো করে দেখলোও না ও, ওর চাবুকের আঘাতে তার গা দিয়ে কেমন রক্তের ধারা নেমেছে। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সটান সে চলে এলো এবার শোক-মঞ্জিলের সামনে। এবার ও চলেছে অভিসারে, সেই নিগ্রো ক্রীতদাসের কাছে, হাতে মাংসের ঝোল এবং দামী মদ!

কাঁদতে কাঁদতে সেই গম্বুজাকৃতির শোক-মঞ্জিলে চিৎকার করে বলে উঠলো,—'আমার মালিক, আজ তোমাকে কথা বলতেই হবে। আমি তোমার কোন

কথা শুনবো না, বলো, কথা বলো মালিক আমার সাথে ?' ওর মনের গোপন ব্যথা শেরের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ করে :—

আর কতদিন, কতোদিন তোমার
পবিত্র মহব্বত থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে,
আল্লা আমার কসুর মাফ করুন,
কতোদিন শুনিনি প্রিয়তমের মহব্বতের গান।

শাহজাদার বেগমের ন্যাকামো শুনলেন সুলতান আড়াল থেকে। সেই সময় দৈববাণীর মতো ফিস্-ফিস্ করে নিগ্রো ক্রীতদাসের কণ্ঠস্বর নকল করে বললেন, 'তোর আন্তরিকতার বড় অভাব! সেই কারণে খোদা আল্লা কেন, অন্য কোন মহান শক্তি নেই যে, তোর আগের সুখ ফিরিয়ে দিতে পারে।'

সেই কথা শোনা মাত্র আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় আমার বেগম, জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে। তারপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে ও জিজ্ঞেস করে, 'প্রিয়তম, এ কথা কি সত্যি যে, কথা বলার শক্তি তুমি ফিরে পেয়েছো ?'

সুলতান আবার নিগ্রোর কণ্ঠস্বর নকল করে নিচু গলায় বললেন, 'তোর সঙ্গে আমি কথা বলি, মহব্বত করি. সে অধিকার কি তোর আছে এখনো ?'

কেন ? নেই কেন ?

সুলতান প্রত্যুত্তরে বলেন, 'সূর্য্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যান্ত তুই তোর স্বামীকে নির্দয় ভাবে প্রহার করিস, যন্ত্রণায় ছটফট করে সে, অভিশাপ দেয় আমাদের দুজনকে। তুই তোর স্বামীর সঙ্গে অমন দুর্ব্যবহার না করলে আমি কবেই সুস্থ হয়ে উঠতাম। আর এই কারণেই তোর কথার জবাব আমি এতোদিন চাইনি।'

'প্রিয়তম, তোমার অনুমতি পেলে আমি তাকে শাপমুক্ত করে দিতে পারি।'

'হ্যাঁ, তাই কর এখুনি', সুলতান তেমনি ফিস্-ফিসিয়ে বললেন, 'আর আমাদের একটু বিশ্রাম নিতে দে।'

'ঠিক আছে প্রিয়তম, আমি তোমার আদেশ মেনে নিচ্ছি', এই বলে ও সেই শোক-মঞ্জিল থেকে বেরিয়ে সোজা রাজপ্রাসাদে চলে এলো। তারপর একটা ধাতুর পাত্রে জল ঢেলে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তেই আগুনে ফোটার মতো টগবগিয়ে উঠলো। সেই মন্ত্রপুত জল ও ওর স্বামীর গায়ে ছিটিয়ে দিতে গিয়ে ও বলে, 'আমি আমার আগের অভিশাপ তুলে নিচ্ছি, এবার তুমি তোমার আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাও।'

সঙ্গে সঙ্গে যুবক শাহজাদা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলো, নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। নিজের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলো সে, 'আল্লার ওপর আমার অসীম বিশ্বাস ছিলো, তাই তিনি আমাকে আমার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন।'

অতঃপর তার বেগম তাকে বলে, 'এবার এখান থেকে চলে যাও, ফিরে আসার চেষ্টা করোনা, করলে তোমার গর্দান যাবে।'

বেগমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যুবক শাহজাদা তার চোখের আড়াল হয়ে যায়। তারপর তার বেগম ফিরে যায় শোক-মঞ্জিলে।

'প্রিয়তম, তুমি ফিরে এসো আমার কাছে দু'চোখ ভরে আমি তোমাকে দেখি, তোমার সেই আগের সুন্দর রূপটা দেখাও আমাকে।'

নিচু গলায় সুলতান উত্তর দিলেন নিগ্রোর ভূমিকায়,—'এ তুমি কি করেছো ? তুমি তো আমার মূল রোগটা সারাওনি এখনো ক্ষতস্থান নিরাময় করেছো মাত্র।'

'আমার প্রিয়তম নিগ্রো সম্রাট! মূল রোগের চিকিৎসা কি তা তো বলবে ?'

প্রত্যুত্তরে সে বলে, 'তুমি কি জানো না, এই রাজ্যের চারটি দ্বীপের অধিবাসীরা প্রতিদিন মাঝ রাতে সায়রের পানি থেকে মাথা উঁচু করে (যাদের

তুমি মাছে রূপান্তরিত করেছো) বেহস্তের দিকে তাকিয়ে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে আমাকে অভিশাপ দিতে থাকে, আমার মৃত্যু কামনা করে। আর সেই কারণেই আমার স্বাস্থ্য দিনকে দিন এমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাই বলছি, এখুনি তুমি সেখানে গিয়ে তাদের মুক্ত করে দাও। তারপর ফিরে এসে আমার হাত ধরে আমাকে আমার এই মৃত্যু-শয্যা থেকে তুলে ধরো, দেখবে তখন আমি অনায়াসে উঠে বসবো, এমনিতেই এখন আমি একটু সুস্থবোধ করছি।'

সুলতানের কণ্ঠস্বর শুনে (তখনো ও সেই কণ্ঠস্বর ওর নিগ্রো প্রেমিকের বলেই মনে করছিল) আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলো, 'বিসমিল্লাহ! আমার মালিক, আমার প্রেমিক তুমি, তুমি আমাকে বুদ্ধি দাও, দাও আমাকে সব কিছু সুন্দর করে দেখার চোখ। এবার আমি তোমার নির্দেশে চললাম তোমার হুকুম তামিল করতে।'

তারপর ও লাফিয়ে উঠে ছুটে গেলো সেই পাহাড়ী উপত্যকার সায়রে। আনন্দে গদগদ হয়ে দু'হাতের চেটোয় সায়রের পানি ভরে—

ওদিকে শাহারাজাদ দেখলো পূবের আকাশ লাল আভাস ফুটে উঠছে। বাদশাহ শাহরিয়ারের কাছ থেকে পরদিন গল্প বলার অনুমতি নিয়ে সে তার কাহিনীর ওপর সাময়িক ইতি টেনে দিলো।

পরদিন আবার রাত্রি নামলে বাদশাহ শাহরিয়ার তার অসমাপ্ত কাহিনী শোনার জন্য ছটফট করে উঠলেন। মুচকি হাসি হেসে শাহরাজাদ আবার চলতে শুরু করলে,—'তাহলে শুনুন জাঁহাপনা, তারপর কি হলো জানেন? সেই যুবক শাহজাদার বেগম। হাতের চেটোয় ভর্তি পানির কাছে মুখ নামিয়ে এনে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র উচ্চারণ করলো, যা বোধগম্য নয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা অবাক কাণ্ড ঘটে গেলো সেই সায়রে। মাছগুলো মাথা তুলে উঠে দাঁড়ালো। সে এক বিস্ময়কর ঘটনা।

তখন সেই মাছগুলো আর মাছ নয়, মানুষের আকৃতি নিয়ে ডাঙ্গায় উঠে এলো তারা একে একে। একে একে সেই নির্জন জায়গাটা ভরে গেলো লোক সমাগমে, অভিশপ্ত সেই চারটি পাহাড় পরিণত হলো চারটি সুন্দর সাজানো গোছানো দ্বীপে। আবার হাট বসলো, বেচা-কেনা চললো হাটে-বাজারে, বসতি গড়ে উঠলো সেখানে। যে যার ডেরায় ফিরে গেলো। তাদের মুখ দেখলে বোঝাই যায় না, যে, তারা এতোদিন শাপগ্রস্থ হয়েছিল, যেন এই মাত্র গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলো।

তারপর সেই ডাইনী বেগম ফিরে এলো শোক-মঞ্জিলে সুলতানের কাছে। কেন না তখনো ওর বিশ্বাস, সুলতানই ওর প্রেমিক সেই নিগ্রো ক্রীতদাস। এবং বাধ্য হয়ে বললো, 'আমার প্রিয়তম! তোমার পবিত্র হাতখানি আমার দিকে প্রসারিত করে দাও, আমি স্পর্শ করি, এসো আমি তোমার হাত ধরে তোমাকে তুলে দিই।'

'এসো, আমার আরো কাছে এসো!' তেমনি নিচু গলায় সুলতান বললেন ওকে কিছু বুঝতে না দিয়ে।



তাঁকে নিগ্রো ভেবে আলিঙ্গন করার বাসনায় এগিয়ে যায় ও সুলতানের দিকে তাঁর কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে। থামের আড়ালে আলো-আঁধারের খেলায় ওর চোখ ধাঁধিয়ে যায়, স্পষ্ট করে দেখতে পায় না সুলতানকে। সেই সুযোগে আড়াল থেকে সুলতান তাঁর তলোয়ারটা বার করে ওর বুকের ওপর আঘাত করলেন। দ্বিতীয়বার আঘাত করতেই ওর ভারী দেহটা দু'আধখানা হয়ে মাটির ওপর ছিটকে পড়লো। তার কাজ শেষ।

তারপর তিনি ছুটলেন যুবক শাহজাদার প্রাসাদে। সে তখন শাপমুক্ত, কোমর থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত তখন রক্ত-মাংসের শরীর হয়ে গেছে তাঁর। সুলতানের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল সে। তাঁর উপ-কারের জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানাতে কুণ্ঠাবোধ করলো না সে তাঁর হাতে চুমু খেতে গিয়ে।

সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি এই রাজ্যে বসবাস করবে, নাকি আমার সঙ্গে আবার রাজধানীতে যাবে?'

'জাঁহাপনা, আপনি আমার যা উপকার করেছেন, তার ঋণ কোনদিনও শোধ করা যায় না। তাই মনে হয়, আমি বোধহয় কোনদিনও আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারবো না। আপনি আমার হাজার সেলাম নিন।'

তার কথায় মুগ্ধ হয়ে সুলতান বললেন, 'সেলাম যদি দিতে হয় তো আল্লাকে দিও, তোমার হয়ে, আমার পুত্রের মতো তোমাকে মনে করে আমি তোমার সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লার কাছে আন্তরিক প্রার্থনা জানাই। তাঁর দোয়াতেই তুমি আজ স্বাভাবিক হতে পারলে! অতএব—'

তারপর তারা মহা আনন্দে এ ওকে জড়িয়ে ধরে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। শাপ-মুক্ত শাহজাদা তাঁর আমির, ওমরাহ এবং উজিরদের ডেকে বলে দিলেন, তীর্থযাত্রী হয়ে তিনি বিভিন্ন ধর্মস্থানে যেতে চান, সেই মতো তারা ব্যবস্থা করে। দিন দশেক সময় লাগলো শাহজাদার তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা নিতে। তারপর সুল-তানের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো সে তার প্রাসাদ থেকে।

ওদিকে এক বছর হলো সুলতান তাঁর দেশ ছাড়া স্বভাবতই মন চঞ্চল দেশে ফেরার জন্য। শাহজাদার সৈন্য-সামন্ত, পাইক-পেয়াদার মূল্যবান উপহার-সামগ্রী মাথায় নিয়ে তাঁদের সহযাত্রী হলো। রাত-দিন বিরামবিহীন সেই যাত্রা, পুরো একটা বছর ঘুরে যাওয়ার পর অবশেষে তারা সুলতানের রাজধানীতে পা দিলো। রাজপ্রাসাদে খবর পাঠানো হলো, সুলতান দেশে ফিরছেন।

সুলতানের আগম বার্তা পাওয়ামাত্র উজির তার সমস্ত সৈন্য-সামন্ত দিয়ে এগিয়ে এলে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানোর জন্য। সুলতানের দেশে ফেরার আশা বলতে গেলে এক রকম হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছিল তারা। বহুদিন পরে সুলতানকে কাছে পেয়ে তারা আনন্দে ফেটে পড়লো। সৈন্যরা তাঁর সামনে জমিন চুম্বন করে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করলো।

দীর্ঘদিন পরে সুলতান তাঁর সিংহাসনে বসলেন আবার। যথারীতি তাঁর সামনে এসে উজির তাকে সেলাম জানালেন। তারপর সুলতানের মুখ থেকে শাহাজাদের শাপগ্রস্থ হওয়া থেকে শুরু করে তারপর কি ভাবে তিনি তাকে শাপমুক্ত করলেন, সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী তাঁর মুখ থেকে সবিস্তারে শোনার পর উজির তাঁকে তার নিরাপদে ফিরে আসার জন্য শুভেচ্ছা জানালো। সুলতান তাঁর প্রজাদের নানান উপহার সামগ্রী দিয়ে খুশি করলেন তাদের। তারপর এক সময় উজিরকে ডেকে তিনি শুধোলেন, 'সেই ধীবরের খোঁজ করো যে আমাদের জন্য রঙীন মাছগুলো ধরে এনেছিল।'

অচিরেই সেই ধীবরের খোঁজ মিললো এবং তাকে সুলতানের সামনে আনা হলে তিনি তাঁকে মূল্যবান পোষাক উপহার দিয়ে জানতে চাইলেন, তার অবস্থা কিরকম, তার কোন ছেলে মেয়ে আছে কিনা। ধীবর তাঁকে জানায়, তার দুই কন্যা এবং একটিমাত্র পুত্র।

সুলতান ডেকে পাঠালেন তাদের। এক কন্যাকে তিনি তাঁর বেগমের মর্যাদা দিলেন এবং শাহাজাদার সঙ্গে অপর কন্যার শাদী দিয়ে দিলেন। আর তার পুত্রকে তিনি তাঁর কোষাগারের প্রধাণ কোষাধ্যক্ষ পদমর্যাদায় ভূষিত করলেন। তাছাড়া শাহাজাদার রাজ্য সেই চারটি দ্বীপপুঞ্জে সুলতান তাঁর উজিরকে পাঠালেন সেখানকার উজির, আমিরদের দামী পোষাক এবং উপহার দেওয়ার জন্য।

তারপর থেকে মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত সেই গরীব ধীবরের দুই কন্যা দুই বাদশাহের খাস বেগম হয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে কাটিয়ে দেয়। আর সেই ধীবর সুলতানের রাজ্যে রাতারাতি ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হল।

'তবু আমি বলবো', শাহরাজাদ বাদশাহ শাহ-রিয়ারেব উদ্দেশে বলে, 'এর থেকেও রোমাঞ্চকর বাগদাদের সেই কুলি এবং তিন রমনীয় কাহিনী শোনাতে পারি, অবশ্য জাঁহাপনা যদি অনুমতি দেন—'

বাগদাদের কুলি এবং তিন রমণী

এক সময় বাগদাদে একটি কুলি মোট বয়ে দিন কাটাতো, বিয়ে-থা করেনি। একদিন হলো কি, মোট বওয়ার জন্য খদ্দেরের অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে অলস ভঙ্গিতে, সেই সময় এক তন্বী যুবতী তার সামনে এসে দাঁড়ালো, গায়ে মসলিন সিল্কের বোরখা, সোনালী ব্রোকেডের বর্ডার, সোনালী কাজ করা পায়ের জুতো। হাওয়ায় লম্বা লম্বা চুলগুলো উড়ছিলো। কাছে এসে সে তার মুখের ওপর থেকে নাকাবটা সরাতেই অবাক বিস্ময়ে কুলিটা তাকায় তার দিকে। আশ্চর্য! একই অঙ্গে এত রূপ? হরিণীর মতো কালো চোখে বিপুল প্রত্যাশা, বও জিজ্ঞাসা, ঠোঁটে মোনালিসার হাসি। প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে সমস্ত রূপ উজাড় করে দিয়েছে মেয়েটির প্রতি অঙ্গে। বোরখা ভেদ করে তার পুরুষ্টু স্তন জোড়া অতি স্পষ্ট, স্পর্শ করতে মন চাইবে যে কোন বয়সের যে কোন পুরুষের। তন্ময় হয়ে তার রূপ সুধা পান করে কুলি ছেলেটি। মেয়েটি সুললিত অন্তরঙ্গ কণ্ঠস্বর শুনে সম্বিৎ ফিরে পেলে ছেলেটি।

'এই শুনছো?' ঝুড়িটা কাঁধে চাপিয়ে এসো আমার সাথে!' আহা কি মিষ্টি আহ্বান। যেন সে মহব্বত করতে চাইছে কুলি যুবকটির সঙ্গে।

চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল কুলিটার। বিশ্বাস করতে মনে ভরসা পায় না সে। এ আহ্বান সত্যি সে তার নিজের কানে শুনেছে তো? না, কি নিশি ডাকাব মতো ডাক শুনলো সে। বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না, অথচ অবিশ্বাসে আবার আফশোস করতে না হয়! যাইহোক, শেষ পর্যন্ত সে তার ঝুড়িটা কাঁধে চাপিয়ে নিজের মনে বলে, 'আল্লার কি দোয়া! আজ আমার বড় শুভদিন!' তারপর সে তাকে অনুসরণ করতে থাকে।

একটা বাড়ির দরজার সামনে এসে থামলো মেয়েটি এক সময়। দরজায় কড়া নাড়তেই একটি বৃদ্ধ বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। মেয়েটি তার হাতে একটি স্বর্ণমুদ্রা গুঁজে দিলে লোকটি তার হাতে দামী একটা মদের বোতল তুলে দেয়। 'সরাবের বোতলটা

কুলির ঝুড়ির মধ্যে রেখে দাও', কুলি যুবকটিকে হুকুম করে আবার চলতে শুরু করলো মেয়েটি।

'আল্লা জানেন, আজ নিশ্চয়ই মেয়েটির বাড়িতে উৎসব আছে!' কুলিটা আবার নিজের মনে বলে মেয়েটিকে অনুসরণ করতে থাকলো, যতক্ষণ না সে একটা ফলের দোকানের সামনে গিয়ে থামে। তামাম দুনিয়ার ফল সে ভরতি করতে থাকে কুলিটার ঝুড়িতে,—সিরিয়ার আপেল, ওসমানী বেদানা, উমানের আখরোট, দামাস্কাসের আঙুর, নীলের শশা, মিশরের পাতিলেবু, মুলতানী কমলালেবু এবং চাটনী। চোখের ইশারায় কুলিটাকে সঙ্গে আসতে বলে মেয়েটি এবার গিয়ে ঢুকলো ফুলের দোকানে। সুন্দর সুগন্ধী ফুল কিনে তার ঝুড়িতে তুললো সে।

'চলো, এবার কষাইয়ের দোকানে যাওয়া যাক!'

একটি কষাইয়ের দোকানের সামনে এসে থামলো মেয়েটি। মুখের ওপর থেকে নাকাব সরিয়ে মাংস বিক্রেতাকে সে বললো, 'দশ সের ভেঁড়ার মাংস দাও।'

তারপর একটা দোকান থেকে কিছু শুকনো ফল, পেস্তা-বাদাম, আখরোট কিনে কুলির ঝুড়িতে চাপালো সে। কুলি যুবকের মাথা নুইয়ে পড়ে জিনিষের ভারে। অবাক হয় মেয়েটির সওদা করার বহর দেখে। আর ভাবে এর পরেও তার মাথার বোঝা আরো বাড়লে পথ চলবে কি করে সে।

মেয়েটির কিন্তু তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তার পরেও সে একটা মিষ্টির দোকানে গিয়ে ঢুকলো। তাতে রকমারি লোভনীয় মিষ্টি কিনতে দেখে যুবকের-



জিভে জল আসে। আঃ কতোদিন, কতদিন ভালো-মন্দ খায়নি সে।

শেষ পর্যন্ত বোঝার ভার সইতে না পেরে যুবকটি বলেই ফেললো, 'এতো জিনিষপত্র কিনবে আগে বললে না কেন, তাহলে একটা খচ্চর কিংবা মাদী উট সঙ্গে নিয়ে আসতাম।'

মেয়েটি মৃদুভাবে বলে, 'কথা না বলে এগিয়ে যাও, তোমাকে যা মজুরি দেবো কল্পনাও করতে পারবে না তুমি।'

একটা প্রসাধনী দ্রব্যের দোকানে ঢুকে আতর, গোলাপজল, কিছু প্রধাধনী দ্রব্য এবং আলেক-জেন্দ্রিয়ার মোমবাতি কিনে কুলি যুবকের বোঝা আরো খানিক বাড়িয়ে দিলো। আসার পথে মাখন ও তেল কিনে মেয়েটি দেখলো যুবকটির ঝুড়ি প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। কোন রকমে ঝুড়ির মধ্যে সেগুলো গুঁজে দিয়ে এবার সে তার বাড়ির পথে রওনা দিলো। যুবকটির দিকে ফিরে বললো সে, 'আমার পিছু পিছু এসো।'

কুলি যুবকটি তাকে অনুসরণ করে এক সময় অবাক চোখে দেখলো, একটি প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে এসে থামলো মেয়েটি। বাড়ির সামনে প্রশস্ত বাগিচা। গেটের ওপর এবনি কাঠের ওপর স্বর্ণাক্ষরে লেখা নামের প্রতিফলক। লোহার সেই গেটটা পেরিয়ে মেয়েটি বাড়ির প্রবেশ পথে এসে থামলো দরজায় কড়া নাড়ার জন্য। কুলি যুবকটি তার পিছনে দাঁড়িয়ে মেয়েটির সৌন্দর্য সুধা পান করতে থাকে। মেয়েটিকে যতোই সে দেখছে ততোই যেন অবাক হচ্ছে। তারপর ইচ্ছে হলো মেয়েটিকে একবার স্পর্শ করে। কিন্তু সেই সাহস তার এখনো পর্যন্ত হয়নি, অন্তত মেয়েটির কাছ থেকে সাড়া পায়নি।

একটু পরেই দরজা খুলে যায়। তার চোখের সামনে দরজার ওপারে ভেসে ওঠে দীর্ঘাঙ্গী অপরূপ সুন্দরী যুবতী, লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট, রূপের পসরা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন। সাদা ফুলের পাঁপড়ির মতো কপাল, পাতলা ঠোঁট, শাহবানের শেষ এবং রমজানের শুরুর অর্ধবৃত্তাকারের চাঁদের মতো দু'জোড়া চোখের ভুরু, নিষ্পাপ চোখের চাহনি, রক্তবর্ণ প্রবালের মতো পাতলা দুটি ঠোঁট, সারিবদ্ধ মুক্তোর মতো সাদা ধবধবে দাঁতগুলো তার হাসির মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছিল যেন। তার কণ্ঠনালী কৃষ্ণসারমৃগের কথা মনে করিয়ে দেয়, তার বুকে দাড়িম্ব ফলের মতো নিটোল দুটি স্তন যেন ঝুলে আছে। ওড়নার নিচে তার স্তন দুটি দাড়িম্ব ফলের মতো দুলছিল অসম্ভব। মেয়েটির স্থির দৃষ্টি পড়েছিল কুলি যুবকটির প্রতি, তার বুকের কাঁপনের অর্থ বুঝতে অসুবিধে হলো যুবকটির। তার সুন্দর চোখ দুটি চোখের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছিল প্রায়ই। এ যেন মেঘ রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা। কবির ভাষায় মেয়েটির রূপের বর্ণনা মনে পড়ে গেলো তার—

ও সূর্য, ও চাঁদ তোমরা মেঘের আড়ালে
লুকিয়ে থেকো না,
আমার প্রিয়ার ফুলের মতো মুখপানে তাকালে
তোমরা কেন বোঝো না,
তার হরিণী চোখের তারায় ছায়া নামে,
অবুঝ হয়ো না, মেঘের আড়ালে লুকিয়ে
থেকো না।
তার রূপের সুধা আমায় পান করতে দাও,
তার গোলাপের পাঁপড়ির মতো অধরে
আমার পিয়াসী মন যে চুম্বন খেতে চায়,
আমাকে থাকতে দাও আমার প্রিয়ার
বাহু ডোরে।

নব উদ্ভিন্ন-যৌবনা মেয়েটার রূপ দু'চোখ ভরে দেখতে গিয়ে কুলি যুবকটি তার সব বোধশক্তি বুঝি মুহূর্তের জন্য হারিয়ে ফেলে। আর একটু হলে তার মাথার বোঝাটা পড়ে যা'চ্ছিল, ঠিক সময়ে সামলে নিয়ে নিজের মনে বলে, 'এমন শুভদিন আমার জীবনে

আসেনি কোন দিন। এমন সুন্দরী দর্শনে আল্লা আমার দিন যাবে ভালো।'

সুন্দরী কিশোরীর উদ্দেশে যুবতী মেয়েটি বলে, 'জোড়গোড়া থেকে নেমে এসে বেচারার বোঝাটা তাড়াতাড়ি হাল্কা করো না।'

একতলা একটা বিরাট প্রশস্ত হলঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো তারা। সুন্দর কারুকার্য করা দরজা-জানালা। নানান রঙে, নানান ঢঙে সাজানো হলঘরের চারধারে ঝুলন্ত অলিন্দ, চার ধারে ধনুকের মতো সারি সারি বারান্দা। হলঘরের ঠিক মাঝখানে বিরাট গোলাকৃতি জলের একটা চৌবাচ্চা, চৌবাচ্চার মাঝখানে জলের ফোয়ারা। ঘরের এক কোণায় সুদৃশ্য কাঠের একটা কৌচের উপর আধ-শোয়া অবস্থায় বসেছিল একটি মেয়ে। ধবধবে সাদা গায়ের রঙ তার। তার উপর মুক্তোর গহনা তার গায়ে থাকার দরুণ তাকে আরো বেশী ফর্সা দেখাচ্ছিল। কৌচে ঠেসান দিয়ে ধনুকে এতো বেঁকে শুয়েছিল বলে তার নিটোল স্তন যুগল দূর থেকে ছোট ছোট দুটি পাহাড়ের চূড়ার মতো নাভী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল শ্বেতশুভ্র তুষারের মতোদেখাচ্ছিল। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কুলিটার ইচ্ছে হচ্ছিল তৃতীয় মেয়েটির শান্ত বুকের উপত্যকায় মুখ রেখে নিদ্রাসুখ উপভোগ করে।

তৃতীয় মেয়েটিও দেখছিল তাকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে। কৌচের ওপর থেকে উঠতে গিয়ে অপর দুটি মেয়ের উদ্দেশে সে বললো, 'তোমরা এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আছো কেন? বেচারার মাথা থেকে ভারি বোঝাটা নামিয়ে ওর কষ্টটা একটু লাঘব করে দাও না।'

প্রথম এবং দ্বিতীয় মেয়ে দুটি এবার কুলি যুবকটিকে তার মাথা থেকে ঝুড়িটা নামানোর জন্য সাহায্য করতে এগিয়ে গেলো। তৃতীয় মেয়েটিও কৌচ থেকে নেমে হাত লাগালো। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই কুলিটা তার ঝুড়ি থেকে সব সামান নামিয়ে মেঝের ওপর সাজিয়ে রেখে এবার উঠে দাঁড়ালো।

বড় মেয়েটি তার বটুয়া থেকে দুটি স্বর্ণমুদ্রা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, 'এই নাও তোমার মজুরি।'

কিন্তু কুলি যুবকটির মধ্যে চলে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না। মুগ্ধ চোখে সে তখন সেই তিন কন্যাদের সৌন্দর্য সুধা পান করছিল। সরাবের বোতল, আতরের খুসবু, এ সব কথা মনে করে সে তখন ভাবছিল, এখানে থাকতে পারলে আজকের দিনটা বেশ ভালো ভাবেই উপভোগ করা যাবে। বিশেষ করে বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ দেখতে না পেয়ে ফিরে যেতে বিলম্ব করছিল সে।

ওদিকে বড় মেয়েটি একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলো, 'কি ব্যাপার, ওতে তোমার মনঃপুতঃ হলো না বুঝি! মজুরিটা কি কম হয়ে গেলো?'

'আল্লার দোয়ায় মজুরি যা পেয়েছি তাতে আমি খুব খুশি। কিন্তু আমার চিন্তা যে অন্য। এতো বড় প্রাসাদে তোমরা তিনজন যুবতী লেড়কী রয়েছো, অথচ কোন পুরুষ নেই? পুরুষের সঙ্গ না পেয়ে তোমাদের রাত কাটে কি করে? পুরুষের স্পর্শ না পেলে নারী জীবন, যৌবনের কি স্বার্থকতা? তোমাদের এতো রূপ, কিসের জন্য তাহলে? তোমাদের অমন যৌবনদীপ্ত দেহ পুরুষদের উপভোগ করতে দিয়ে যদি না তাদের পৌরুষের স্বাদ পেলে, তাহলে কিসের দেমাক তোমাদের ঐ রূপ যৌবনের?'

একটু থেমে সে একটা শায়ের আবৃত্তি করলো :-

আমি তার ডুবন্ত শরীর
জড়িয়ে ধরলাম। ভেসে যেতে তার উলঙ্গ
উরুতে মাথা রাখলাম। মাছেদের মৈথুনে
জলের তলদেশ ভীষণ উপদ্রুত।
তা হোক। সেই উপদ্রুত অঞ্চলে
মিলনের ঐক্যতান।
আমি তখন তার উলঙ্গ দেহের
ঘ্রাণ নিতে ব্যস্ত।

এটাই পুরুষের ধর্ম, আর নারীর
ধর্ম, তার দেহের নৈবেদ্য সাজিয়ে
তুলে ধরা।

'তোমাদের উচিত অন্তত একজন পুরুষকে স্থান দেওয়া, যে তোমাদের তিনজনকে পালা করে সঙ্গ সুখ দিতে পারবে।'

তার কথা শুনে মেয়েগুলো খুব মজা পেলো, এবং তার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললো তারা, 'কিন্তু আমরা যে কুমারী, কাকে বিশ্বাস করে আমরা নিজেদেরকে তার হাতে ছেড়ে দেবো বলো? নারী জীবনের সব চেয়ে মূল্যবান সম্পদ তার হাতে যে খোয়া যাবে না, তার কি নিশ্চয়তা আছে? আমাদের দেহ লুটপাট করে স্রেফ মধুটি খেয়ে সে যদি পালিয়ে যায়? তখন আমাদের সর্বনাশের বোঝা কে বহন করবে?'

কুলি যুবকটি তাদের কথা শুনে হাসলো, 'আমাকে তোমরা অমন অকৃতজ্ঞ ভেবো না। মোট বইলেও আমার বিচার বুদ্ধি আছে। উপকারির অপকার করতে নেই, এ কথাটা আমার বেশ ভালোই জানা আছে। আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি তোমরা আমাকে যে ভাবে চালাবে, আমাকে যতোটুকু উপ-ভোগ করতে দেবে তার বেশী আমি কখনোই চাইবো না, দেখো! আমি তোমাদের কথা দিলাম—'

তার মিষ্টি কথা শুনে মেয়েগুলো মুগ্ধ হলো। নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস করে কি যেন আলোচনা করে বড় বোনটা তাকে বললো, 'হাট বাজার করার সময় তুমি তো নিজের চোখেই দেখেছো, বহুত খরচ-পাতি হয়ে গেছে আমাদের আজ। আজ তুমি যে আমাদের সঙ্গে স্ফূর্তি করতে চাইছো, তা তোমার



ট্যাকে কিছু মালকড়ি আছে তো? আমাদের জন্য কত খরচ তুমি করতে পারবে বলো?'

কুলি যুবকটি ফ্যালফ্যাল করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিই বা বলতে পারে সে? দুই দিনার মজুরি যার, এই তিন ধনী লেড়কীদের কতো-টুকুই বা আশ্বাস দিতে পারে সে?

এবার মেজো বোনটা রসিকতা করে বললো, 'দ্যাখো বাপু, তোমার যদি কিছু খরচ করার রেস্ত পকেটে থাকে, তবেই থেকে যাও এখানে, আর তা না থাকলে কেটে পড়ো তাড়াতাড়ি। আমাদের মতো সুন্দরী মেয়েদের শরীর মুফতে উপভোগ করা যায় না নাগর, বিশ্বরূপ দেখতে হলে ট্যাক কিছু হাল্কা করতে হয়। অতএব এবার এখান থেকে কেটে পড়ো।'

ছোট মেয়েটি এবার বাধা দিয়ে বললো, 'বেচারার সঙ্গে সেই থেকে তোমরা কি রঙ্গ-রসিকতা করছো দিদি? তোমাদের আজকের স্ফূর্তির খরচই যদি ও যোগাতে পারতো, কেন তাহলে তোমাদের ঐ ভারী বোঝা বয়ে আনতে যাবে? সেই সঙ্গে তোমাদের ভুললে চলবে না, ছোকরা যদি না আমাদের মোট বয়ে আনতো তাহলে ওর সঙ্গে পরিচয় হতো না আমাদের, আর ওর অমন বলিষ্ট চেহারার স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগও আমরা পেতাম না। তাই বলছি দিদি, ওকে রেখে দাও, আজ সারাদিন, সারারাত ওকে দিয়ে আমরা তিনজনে আমাদের দেহের খিদে পেট ভরে পুষিয়ে নিতে পারবো। তারপরেও যদি তোমরা ওর কাছ থেকে টাকা চাও, আমি সেই টাকাটা দেবো ওর হয়ে। কি, রাজি তো?'

কুলি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলো। ছোট মেয়েটির সামনের জমির উপর চুমু খেয়ে তাকে সুক্রিয়া জানিয়ে সে বললো, 'আমার আজকের প্রথম মজুরি এই দু'দিনার তোমার প্রণামী!'

তার কথা শুনে তিন বোন এবার মুগ্ধ হলো এবং বললো, 'বসো, আমরা তোমার সাদর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করি।' তারপর বড় মেয়েটি তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বললো, আল্লার দোয়ায় আমাদের কাছ থেকে কোন দুঃখ-কষ্ট তুমি পাবে না, তবে একটা সর্ত আমরা তোমাকে আমাদের কাছে থাকতে দেবো, এখানে যা ঘটতে দেখবে, সে নিয়ে কোন প্রশ্ন করবে না, কোন রকম কৌতূহল প্রকাশ করবে না।'

প্রত্যুত্তরে কুলি যুবকটি বললো, 'তোমার সর্তে আমি আমি রাজি। শোনো সুন্দরী, তোমার কথা মতো এখন থেকে আমি শুধু দেখে যাবো, কিন্তু কোন কথা বলবো না। এখানে আমার ভূমিকা হবে মূক ও বধিরের মতো।'

তারপর তিন বোন সেই জলের ফোয়ারার ধারে গিয়ে বসলো। টেবিলের ওপর সরাবের বোতল এবং বাজার থেকে কিনে আনা ফল ও ফুলগুলো সাজানো। বড় মেয়েটি বোতল থেকে একটা কাপে সরাব ঢেলে চুমুক দিলো। তার দেখা দেখি অপর দুই বোনও সরাব পান করলো। সব শেষে বড় বোন অন্য দুই বোনের মারফত এক কাপ সরাব পাঠালো সেই কুলি যুবকটির হাতে। মেয়েটি তার হাতে সরাবের পাত্র তুলে দিতে গিয়ে বললো :—

সরাবের নেশায় আমি ভোলাবো না তোমায়,
দর্পণে আমি তাকিয়ে দেখেছি,
তোমার চোখে আমার সর্বনাশ,
তবু তোমার ছবি আমি এঁকেছি।

ফুলের মতো নরম হাত থেকে সুরা-পাত্রটা হাতে তুলে নিতে গিয়ে কুলি যুবকটি গভীর দৃষ্টিতে তাকায় তার পানে। কৃতজ্ঞতায় তার মাথা নুইয়ে পড়ে। তার সব অভিব্যক্তি কাব্য হয়ে ঝড়ে পড়ে তার শায়রের প্রতি ছত্রে ছত্রে :—

যেন হাত বাড়ালেই ধরা দেবে
এমন সমর্পণের মুদ্রা তোমার প্রতিটি ভঙ্গীতে,
আমি দেখেছি,
তাই মদের নেশায় বিভোর আমি হবো না,

তোমার রূপের পরশ অঙ্গে মেখে
ফিরে যেতে চাই আজকের মধুর স্মৃতিটুকু
রেখে।

তারপর সে একটু থেমে তাদের তিনজনের হাতে চুমু খেলো এক এক করে। তারপর সে আলতো করে চুমুক দিলো সরাবের পাত্রে :—

কেন তোমায় আমায় মদ খেতে দাও
বারে বারে,
আমার মদের নেশা কেটে গেছে
তোমাদের রূপের ছটায়।
তাক লাগানো সেই গোপন রূপ
দেখার আশায় আমি সজাগ থাকতে চাই।
সুন্দরী গো, তোমাদের রূপের আগুনে
যদি অন্ধ হয়ে যাই সেও ভালো,
মেহেরবানি করে এবার
সুন্দরী গো, তোমাদের মুখের নাকাবটি
তোলো।

মেয়ে তিনটি তার কথায় কান না দিয়ে তাকে মদে বিভোর করে তোলার জন্য পালা করে তাকে মদ খাওয়াতে উঠে পড়ে লাগলো। প্রথমে বড় বোন কুলি যুবকটিকে কাছে টেনে এনে তার ঠোঁটের সামনে সরবতের পাত্রটা তুলে ধরে বলে, 'কি গো নাগর, এত তাড়াতাড়ি আমাদের রূপ দেখার জন্য অধীর হয়ে উঠলে? আমাদের সর্তের কথা মনে আছে তোমার?'

'হ্যাঁ, খুব মনে আছে।' মাথা নাড়লো কুলি যুবকটি।'

'সেই রূপে দিশেহারা হয়ে গিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করে বসো না যেন।' দ্বিতীয় মেয়েটি বসে মুখ টিপে হাসলো- তারপর তার ঠোঁটের সামনে সরাবের পাত্র এগিয়ে দিলো।

'আর আপনারা চাইলে কেলেঙ্কারীরটা তখন কিন্তু আরো বেড়ে যাবে।' কুলিটা বলে, 'হ্যাঁ, আগে থাকতে সতর্ক করে রাখছি, বিবিজানরা আপনারা আপনাদের রূপ দেখাতে গিয়ে বেসামাল হয়ে না পড়েন, দেখবেন।'

'বেশ করবো, আমরা বেসামাল হয়ে পড়বো, তাতে তোমার কি হে নাগর?' ছোট মেয়েটি এবার কোন রকমে হাসি চেপে তাকে কপট ধমক দিয়ে তার মুখের সামনে সরাবের পাত্র তুলে ধরে বলে, 'নাও, লক্ষ্মী সোনা এবার আমারটুকু খেয়ে নাও, দেখবে খুব মজা পাবে। তখন ন্যাকামো না করে



ভালমানুষটি সেজে মুখ বুজে আমাদের হুকুম মেনে নেবে, বুঝলে নাগর আমার?'

তাদের পায়ের সামনের জমিনের ওপর চুমু খেয়ে তাদের অসংখ্য সুক্রিয়া জানিয়ে কুলি যুবকটি আবার গান ধরলো—

প্রিয়তমা, এতো সরাব নয়,
এতো তোমাদের রূপ-সুধা,
দাও, আরো দাও বিবিজান,
তোমরা আমার কলিজা, আমার জান।

তারপর সেই কুলি যুবকটি উঠে দাঁড়িয়ে গৃহকর্ত্রী, অর্থাৎ বড় মেয়েটির সামনে মাথা নিচু করে বলে,

'আমি তোমার নোকর, হুকুম করো এবার আমায় কি করতে হবে। আমি এক পায় খাড়া তোমার হুকুম তামিল করতে।' এই বলে সে গান গাইতে শুরু করে দিলো :—

তোমার দুয়ারে আমি এক বান্দা হাজির,
হুকুম কর গো শাহাজাদী,
আমি অপেক্ষা করবো অনাদি,
অনন্তকাল, তোমার রূপে বিভোর
হয়ে থাকবো। তোমার মহব্বতের
ছায়া হয়ে থাকবো চিরদিন।

'অনেক হয়েছে,' বড় বোন তাকে আদর করে কাছে ডেকে এনে তার মুখের সামনে সরাবের পাত্র তুলে ধরে বলে, 'এবার একটু সরাব খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নাও। এর পরেই তো তোমাকে আমাদের সঙ্গে লড়তে হবে। আমাদের রূপের গোপন দরজার চাবিকাঠি তো তোমার কাছে নাগর, সেই রূপের দুয়ার তুমি খুলবে না? চাবি ঠিক আছে তো?' মেয়েটির আতর চোখে কাতর অনুনয়।

মৃদু হেসে কুলিটা তার হাত থেকে সরাবের পাত্রটা নিতে গিয়ে তার হাতে চুমু খেলো। তারপর সে গান ধরলো মেয়েটির কথার জবাব দেওয়ার জন্য :—

তুমি ঠিক বলেছো বিবিজান,
তোমার রূপের চাবিকাঠি আমার কাছে
বহাল তবিয়তে আছে,
কিন্তু ভয় হয় পাছে
যদি দেখি তোমার রূপের দুয়ার খোলা,
আমার আগে অন্য কেউ দেখে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি জবাব দিলো কাব্য করে—
এতোদিন আমার মনের দুয়ার ছিলো খোলা,
তবে রূপের দুয়ারে প্রবেশ নিষেধ
ছিলো, তুমি আসবে বলে,
আমি রূপের ডালি সাজিয়ে রেখেছি,
নেবো তোমায় আজ বরণ করে,
এসো প্রিয় আমার বাহু ডোরে।

কুলি যুবকের বাহুডোর থেকে নিজেকে মুক্ত করে বড় বোনটি সরাবের পাত্রে চুমুক দেয়, দুই বোনের স্বাস্থ্য কামনা করে। অপর দুই বোন বড় বোনের দেখাদেখি সরাব পান করতে থাকে। মুহূর্তের জন্যও সরাব পানে বিরতি দেয় না তারা (কুলি যুবককে তাদের মাঝে রেখে), মত্ত অবস্থায় তারা হেসে-কুঁদে নাচতে থাকে, গান গায় সায়র আবৃত্তি করে। এতো সব কাণ্ডকারখানার মধ্যে তারা সেই কুলি যুবককে নাচতে নাচতে, হৈ-হুল্লোর করতে করতে কয়তে কখনো তাকে চুমায় চুমায় ভরিয়ে দেয় ঠোঁট, কখনো বা তাদের দংশনে বেচারার ঠোঁট ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। কখনো কেউ কেউ তার মুখে সুস্বাদু খাবার নিক্ষেপ করছে, কখনো কেউ বা তার গালে সময় সময় থাপ্পর বসিয়ে দিচ্ছে, পরক্ষণেই আবার অন্য একটি মেয়ে তার ঠোঁটজোড়া কুলি যুবকের ঠোঁটের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে স্বর্গ সুখের স্বাদ দিতে কসুর করছে না। সব মিশিয়ে, যুবকের মনে হলো, সে যেন বেহস্তে এসে পড়েছি, তার সামনে বেহস্তের তিন অপ্সরা তাকে খাতির করতে গিয়ে বুঝিবা দিশেহারা। তারা একেবারে বেহেড মাতাল না হওয়া পর্যন্ত সরাব পান করা থেকে বিরত হলো না।

এক সময় বড় বোনটি তাদের সঙ্গ ছেড়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো জলের ধারে। এ যেন একটা মিনি সায়র। চারিদিকে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো পাড়। বড় মেয়েই এক এক করে তার দেহ থেকে সব পোষাক খুলে ফেললো, এক চিলতে সুতোও অবশিষ্ট রইলো না তার দেহে। তারপর সে তার নগ্ন দেহটা সেই জলাধারে নিক্ষেপ করলো, হাঁসের মতো সাঁতার কাটতে কাটতে মুখ ভর্তি কুলকুচো করে ছুঁড়লো

কুলি যুবকের গায়ে। যুবকটা হাসলো, নিজেকে ধন্য মনে করলো।

মেয়েটা এবার তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জলে ধুতে থাকলো স্তনজোড়া, স্তনজোড়ার মধ্যবর্তী যে জায়গাটার ঢল নেমেছে নাভীর অনেক নিচে, দুই উরুর সন্ধিস্থল, কুলি যুবককে দেখিয়ে দেখিয়ে পানি দিয়ে রগড়াতে থাকলো সেখানে সে। একটু পরে পানি থেকে থেকে উঠে এসে মেয়েটি এবার সেই কুলি যুবকটির কোলের ওপর ধুপ করে বসে পড়লো।

'আমার মালিক, আমার প্রেমিক দোস্ত', মেয়েটি তার দুই উরুর সন্ধিস্থলের দিকে কুলি যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শুধোয়, 'এই জায়গাটাকে কি বলে বলো তো নাগর ?'

'আমি বলি ওই জায়গাটা চেরা', কুলি যুবক কোন ভনিতা না করে সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করে দিলো মেয়েটির প্রশ্নের উত্তরে।

'হায়, হায়!' মেয়েটি চিৎকার করে বলে উঠলো, ছিঃ ছিঃ অমন নোংরা কথা মুখে আনতে তোমার লজ্জা করলো না ? বলে মেয়েটি তার জামার কলার ধরে টেনে কুলির গালে থাপ্পর কষিয়ে দিলো।

কিন্তু তাতেও ঘাবড়ালো না কুলি যুবক। আবার সে বললো, এবার আরো খোলাখুলি ভাবে সে বললো, 'তোমার জরায়ু, তোমার যোনিদেশ!'

'ছিঃ ছিঃ, এ তো দেখছি আর এক জঘন্য কথা, যা উচ্চারণও করা যায় না। কি করে তুমি বলতে পারলে ?' বলে সে দ্বিতীয়বার তার গালে চড় কষিয়ে দিলো।

'ওটা তোমার ভগাঙ্কুর!' কুলি যুবক নতুন করে আবার মন্তব্য করতেই মেয়েটি চিৎকার করে প্রতিবাদ করে উঠলো, 'না, এ কথা তুমি মুখে আনতে পারো না, এ পাপ অন্যায়!' মুখে প্রতিবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে সমানে তার হাত চলতে থাকে। কিল, চড়, লাথি, ঘুঁষি যেভাবে পারলো তাকে মেরে হাত-পায়ের সুখ করে নিলো। বেচারা মার খেতে খেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো মাটির ওপর এক সময়। অবশেষে তাদের দিকে ফিরে সে নাভির নিচে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করলো, 'আর তোমরা এটাকে কি বলো ?'

'ধোওয়া তুলসীপাতা।'

'বহুত সুক্রিয়া আল্লাকে, এটা তোমাদের শুভ-লক্ষণের পরিচয়।



তারপর আবার তারা তিন বোন সরাব পান করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। এক সময় দ্বিতীয় বোনটিও নিজেকে বসন মুক্ত করে জলে নেমে জলকেলিতে মেতে উঠলো। কুলি যুবক তার নগ্ন দেহের শোভা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেলো। কখন যে মেয়েটি জল থেকে উঠে তার কোলে আশ্রয় নিয়ে ছিলো, সে খেয়াল ছিলো না তার। সম্বিৎ ফিরে পেলো সে মেয়েটির ডাকে।

বড় বোনের মতো সেও সেই একই প্রশ্ন করলো তাকে। নগ্ন সুডৌল পা দুটো দুদিকে ছড়িয়ে শুধোয়, 'ও আমার চোখের আলো, বলো তো এটা কি ?'

আগের মতোই উত্তর দিলো সে, 'একটা চেরা জায়গা।'

আগের মতোই সে জবাব দিলো। বড়বোনের মতো মেজো বোনটিও রাগে চিৎকার করে উঠলো, 'ছিঃ ছিঃ, অমন অসভ্য কথা তোমার মুখে আনতে লজ্জা হলো না ?' কুলি যুবকটি আগের মতো আর এক ধাপ এগিয়ে গেলো। বড় বোনের মতো সেও তাকে কিল, চড়, ঘুঁষি মারতে থাকলো অতঃপর।

বেচারা। শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে জব্দ করার জন্য জিজ্ঞেস করলো, 'বলো তো সুন্দরী, তোমরা মেয়েরা আমাদের এটাকে কি বলো?' যুবকটির দৃষ্টি নিজের নাভির নিচে।

বড়বোনের মতোই মেজো বোনটি উত্তর দেয়, 'ধোওয়া তুলসী পাতা।'

এবং বলতে থাকে, 'না, না, আমি নিতে পারবো না।' তার চোখে মুখে অনাহার ভাব থাকলেও পেটে ক্ষুধার ভাবটা ঢাকতে পারে না মেয়েটি, ধরা পড়ে যায় কুলি যুবকটির কাছে।

এরপর ছোট বোনটি এক এক করে নিজের দেহ থেকে সব পোষাক খুলে ফেলে দিয়ে জলে ঝাঁপ দিলো, সাঁতার কাটলো হাঁসের মতো। কুলি যুবকটি অবাক বিস্ময়ে তার নগ্ন দেহের সৌন্দর্য দেখতে গিয়ে ভাবছিল, এতো রূপ? কেন জানি না, ছোট মেয়েটির ওপর ভয়ে যেন একটু বাড়তি দুর্বলতা জন্মে গিয়েছিল। সে তাকে আলাদা চোখে দেখতে শুরু করে দিয়েছিল তার দিকে তাকাতে গিয়ে কামনা-বাসনায় তার চোখ মুখ কেমন লাল হয়ে উঠেছিল মেয়েটি তার মনের ভাব বুঝতে পেরে জল থেকে উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো দু'হাত বাড়িয়ে।

মেয়েটির স্পর্শে কুলি যুবকটি কেঁপে ওঠে তার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে। কিন্তু ছোট মেয়েটির ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে। সে তখন যুবকটি উত্তেজিত করার জন্য তার সব ক্রিয়াকলাপ তাকে মেনে নিতে হলো। আর মনে মনে ভাবলো, এ কোথায় সে এসে পড়লো। এরপর কোথায় তাকে ভেসে যেতে হবে কে জানে?

কুলি যুবকটি থাকতে না পেরে এবার তাকে নিচে মার্বেল পাথরের জমিনের ওপর শুইয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো দু'হাত দিয়ে। তার বুকে তখন সমুদ্রের ঝড় উঠেছে। মেয়েটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। যুবকটির চোখে হাজারো প্রশ্ন।

মেয়েটি নীরবে সম্মতি জানায়। মিনতির মতো করুণ হয়ে গেছে ওর চাহনি। সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারে ওর রক্তের স্পন্দনে কোথায় যেন একটা দোলা লেগেছে, যা এর আগে ওর আর কখনো অনুভব করেনি। এর আগে বহু পুরুষের সঙ্গে মহব্বত করেছে, তাদের সঙ্গ দিয়েছে সে, কেউ কেউ জোর করে তার দেহ উপভোগ করেছে, কখনো নিজের থেকে কাউকে সে তার দেহ সঁপে দিয়েছে কিন্তু কেউ এমন করে তাকে নাড়া দিতে পারেনি। পুরুষ জাতটার সম্পর্কে বরাবরই সচেতন সে। কিন্তু এ যেন সম্পূর্ণ আলাদা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের এক অনুভূতি। কুলি যুবকটি প্রথম দেখা মাত্রই ভেতরে কেমন যেন একটা দুর্বলতা অনুভব করেছিল সে।

কুলি যুবকটি মুখ নিচু করতেই মেয়েটি সূর্যমুখী ফুলের মতো মুখটা তুলে ধরলো। মেয়েটি অনুভব করলো, যুবকটির চুমু খাওয়ার ধরণটাই যেন একেবারে আলাদা। উষ্ণ আর নিবিড়, কোমল অথচ বলিষ্ঠ। একটা মিষ্টি-মধুর আমেজে সমুদ্র-ঝিনুকের মতো, মুদে এলো মেয়েটির দু'চোখের পাতা। মনে হলো কবোষ্ণ একটা স্রোতে সে যেন অলস ভেসে চলেছে আর রক্তের কল্লোলে শোনা যাচ্ছে রিনি রিনি ধ্বনি। অন্য পুরুষদের বেলায় যা ছিলো নিতান্তই কৌতূহল, এযেন সে খেলা নয় এ যেন পরম পাওয়া, তার একান্ত আপন জনের কাছ থেকে উপহার পাওয়া। যুবকটি মাঝে মাঝে তার বাহুমুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করতে থাকে। কিন্তু মেয়েটি তাকে ততোই শক্ত করে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরে। তার ঠোঁটের কোণে দুষ্টু হাসি ফুটে উঠতে দেখলো কুলি যুবকটি। সে তখন অসহায়ের মতো মেয়েটির আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে মেঝের ওপর। মেয়েটি তখন কুলি যুবকটির সিংহ সদৃশ পৌরুষ প্রত্যক্ষ করতে করতে উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে।

তারপর যুবকটির ক্লান্ত দেহটা চাঙ্গা করার জন্য ছোট মেয়েটি তার ঠোঁটের সামনে সরাবের গ্লাস তুলে ধরলো। এই ভাবে আরো এক ঘণ্টা সরাব পান করে কাটালো তারা তিন বোন এবং তাদের একমাত্র পুরুষ সঙ্গী কুলি যুবকটি।

তারপর এক সময় সবচেয়ে বড় সুন্দরী মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে সে তার দেহ থেকে এক একটা করে সমস্ত পোষাক খুলে দূরে সরিয়ে রাখে। ওদিকে কুলি যুবকটি তখন আকণ্ঠ সরাব পান করে গলায় হাত বোলাচ্ছিল, তখন জ্বলে যাচ্ছিল তীব্র এ্যালকোহলের প্রতিক্রিয়ায়। কুছ পরোয়া নেহি। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে জলে ঝাঁপ দিলো সে। নীল জলে ভাসমান তার নগ্ন শরীরটার দিকে তাকিয়ে কুলি যুবকটির মনে হয় যেন রাতের নীল আকাশে এক ফালি চাঁদ ভাসছে, গোলাকৃতি সুন্দর মুখখানি-প্রভাতের সূর্যের মতো। খোদার দেওয়া দেহের সৌন্দর্য সে আবরণের আড়ালে ঢেকে রেখেছিল যেন। তারপর কুলি যুবকটি তার উদ্দেশে চিৎকার করে শায়র আবৃত্তি করতে থাকে :—

লাইটহাউসের খেতাব নিয়ে,
আমার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে
ফ্লুরোসেন্ট উরুদ্বয়,
বড় উপশিরাময়।
দু'টি গোলাপ ফুটে আছে,
ঝড়া পাঁপড়ি
ইতস্তত: ছড়ানো এদিক-ওদিক,
সঙ্গে কিছু বাসনা ও পাপ।
নিন্দুকে রটাবে
গোলাপ গাছটাকে আমি নষ্ট করে ফেলেছি
বড় ইচ্ছে ছিলো মুখ লুকাবো এমন বুকের,
দু'টি সু-উচ্চ চূড়ার ছায়া আছে যেখানে।

বড় বোন তার সেই আবেগময় শায়র শুনে জল থেকে উঠে এলো, সিক্ত দেহ। তার কোলের ওপর সিক্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে মুক্তোর মতো দাঁতগুলো বার করে সে তার দুই উরুর মিলন স্থানে কুলি যুবকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে শুধোয়, 'ও আমার-নাগর এ জায়গাটাকে কি আখ্যা দাও তোমরা, বড্ড জানতে ইচ্ছে করছো, বলো না?'

'ওটা আমাদের বেহস্তে যাওয়ার গোপন সুড়ঙ্গ।'

'তোফা। তোফা!' বড় বোনটি এবার চোখে বিলোল কটাক্ষ হেসে বলে, 'তা নাগর, অমন চুপচাপ বসে কি দেখছো? বেহস্তে যেতে ইচ্ছে করছে না এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে?'

যুবকটি এবার আর স্থির থাকতে পারলো না। মার্বেল পাথরের ওপর ফেলে মেয়েটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মেয়েটি অস্ফুট চিৎকার করে উঠলো, 'আঃ!' অতঃপর মেয়েটির নিরাবরণ দেহের উপরে যুবকটি তার নগ্ন দেহটা বিছিয়ে দিলো গুছিয়ে আয়াস করে। পা দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে দু'বাহু বাড়িয়ে যুবকটির গলা জড়িয়ে ধরলো মেয়েটি। দুটি দেহ মিলে গিয়ে একাকার হয়ে গেলো।

এদিকে মেজো ও ছোট বোন তাদের মিলন সুখ দেখে হিংসায় জ্বলে উঠলো, যুবকটির পিঠের ওপর কিল, চড় ঘুষি মারতে থাকে অবিরত। কিন্তু তাতে তার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটলো না বেহস্তের সুখ নিংড়ে বার করে নিতে। বরং মেয়েটির মধ্যে প্রবেশে বাড়তি সুবেধে হলো তার।

তারপর এক সময় দুটি দেহ স্তব্ধ, নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলো মার্বেল পাথরের ওপর। অনেকক্ষণ দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকার পর তারা উঠে দাঁড়ালো। আবার সবাই এক সঙ্গে নাচ আর গানে মেতে উঠলো, সেই সঙ্গে সরাবের ফোয়ারা ছুটলো পুরো আরো একটি ঘণ্টা।

একটি পুরুষকে কেন্দ্র করে তিন রমণীর রমণীয় রূপের হাট বসানো এবং হাসি আর ঠাট্টার কলকাকলি। যেন একই সুরে বাঁধা ঐক্যতান, যেখানে কোন ভেদাভেদ নেই, নেই স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রীর।

বেহস্তের তিন পরী আর এক কুলি মজুরের প্রেম প্রেম খেলা সরাবের নেশায় তখন তুঙ্গে। কোন্ এক ফাঁকে কুলি যুবকটি পোষাক চাপিয়ে নিয়েছিল তার গায়ে।

অবশেষে নিজেকে আবার সে পোষাক মুক্ত করে জলে ঝাঁপ দিলো। মনের সুখে মেয়েগুলোর মতো জলে সাঁতার কাটলো, গায়ের সব ক্লেদ ধুয়ে নিলো। তারপর এক সময় জল থেকে উঠে এসে বড় বোনের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়তেই মেয়েটি মুখ নামিয়ে চুমু খেলো সোহাগ করে। অন্য দুই বোন চুপচাপ বসে থাকতে পারলো না, ঘিরে ধরলো যুবকটিকে। বড় বোনের ঠোঁট থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে সে এ বার তাদের দিকে তাকালো পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে। যুবক আড় চোখে লক্ষ্য করলো, তাদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে রয়েছে তার নাভির নিচে। মনে মনে হাসলো সে, তারপর তেমনি হাসতে হাসতে সে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের দর্শনীয় বস্তুটি কি বলো তো?'

তার মুখে রসের কথা শুনে তারা যে যার গায়ে ঢলে পড়লো হাসতে হাসতে। এবং তাদের মধ্যে একজন জবাব দিলো, 'আমাদের সুখকাঠি।'

'না', মাথা নেড়ে কুলি যুবকটি তাদের প্রত্যেকের ঠোঁটে কামড় দিয়ে বসলো চুমু খেতে গিয়ে।

তারপর তারা সমবেতস্বরে বললো, 'তাহলে ওটা আমাদের বেহস্তে তুলে ধরার মই।'

'না', কপট মাথা দুলিয়ে সে এবার পালা করে তাদের তিনজনকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলো—

ওদিকে ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ বাদশা শাহরিয়ারের কাছ থেকে পরদিন তার কাহিনী শুরু করার অনুমতি নিয়ে থনকার মতো তার গল্পের ইতি টানলো।

পরদিন রাত নামলে দুনিয়াজাদ আবার আবদার করে বললো, 'কই দিদি, এবার তোমার গল্প শেষ করো।'

'হ্যাঁ, জাঁহাপনা 'বাদশাহ শাহরিয়ারের দিকে তাকালো শাহরাজাদ তাঁর অনুমতি পাওয়ার আশায়। বাদশাহ মৃদু হেসে সম্মতি দিলেন।

'তাহলে শুনুন জাঁহাপনা' শাহরাজাদ আবার বলতে শুরু করলে গতকালের কাহিনীর জের টেনে. 'সেই তিন রমণী কুলি যুবকের অহঙ্কারের সেই বস্তুটিকে যে নামেই সম্বোধন করুক না কেন, কিছুতেই মানতে রাজি হলো না সে। ওদিকে মেয়ে তিনটির ঠোঁট এবং স্তন চুম্বনে পাগল করে তুললো সে। তার আলিঙ্গনে তাদের পাখীর মতো নরম বুক পিষ্ট হতে থাকে। তবু আবেশে ক্লান্ত অবসন্ন অথচ প্রসন্ন হয়ে কুলি যুবকটির দেহের উপর ঢলে পড়ে তারা তাদের সুখের জানান দিয়ে দেয়। তাদের কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে যুবকটি সরাবের নেশায় উত্তেজিত হয়ে জলের ধারে শান বাঁধানো ঝোপের ওপর চিত করে শুইয়ে দেয় পালা করে চরম সুখ প্রাপ্তির আশায়। আগাম অনুমতি সে পেয়ে গেছে তাদের কাছ থেকে। রিরংসায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল তারা। এই মুহূর্তে তাদের শান্ত করতে না পারলে হিংস্র হয়ে উঠতে পারে সে, ভাবল কুলি যুবকটি।

এক সময় তিন রমণীদের সঙ্গ সুখ দিয়ে কুলি যুবকটি ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লেও প্রসন্ন চিত্তে তাদের দিকে তাকালো। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছিলো।

তিন বোন দেখলো, কুলি যুবকটিকে রাতে তাদের কাছে ধরে রাখলে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। তাছাড়া তাদের গোপন তথ্য সব জেনে যেতে পারে। অথচ ছোকরা এই কয়েক ঘণ্টায় তাদের যে সুখ দিয়েছে তা অতুলনীয়। কারোরই মন চাইছিলো না তাকে বিদায় করে দিতে। যুবকটি তো মুখ ফোটে না, তখন তিন রমণীর অবস্থা কতকটা সেই রকম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অপ্রিয় কথাটা তারা তাকে বলেই ফেললো, 'ও আমাদের মনের মানুষ, সঙ্গম যে একটা শিল্পকলা তাতো

শিকলায়, কিন্তু ঢের হয়েছে, এবার পোষাক গায়ে চাপিয়ে জুতো পড়ে কেটে পড়তো ভাই।'

'আল্লার কসম, এখনি তোমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার কথাটা ভাবামাত্র আমার বুকটা কেমন কেটে যাচ্ছে। উঃ তোমরা কি নিষ্ঠুর প্রিয়তমা? এতে সুখ দিলাম, কৃতজ্ঞতা বলে কি কিছু নেই তোমাদের। আল্লা তোমাদের আরো সুখ দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, লক্ষ্মীটি আজ রাতটা আমায় তোমাদের সঙ্গে কাটাতে দাও, কাল ভোর হতেই নাহয় চলে যাবো। আমি কথা দিচ্ছি, যা সুখ দিয়েছি তার থেকেও অনেক বেশী সুখ আমি তোমাদের দেবো। আমি তোমাদের বেহস্তের সুখ দেবো।'

ছোট বোনের কেমন মায়া হলো তার ওপর। বড় দুই বোনকে বুঝিয়ে সে বললো, 'দিদিভাই, এরই মধ্যে তোমরা তো টের পেয়ে গেছো, লোকটা কেমন ফুর্তিবাজ, কিন্তু যাই বলো, ছোকরা স্বার্থপর নয়। একা একা ভ্রমর হয়ে আমাদের ফুলের মধু খেয়ে পালাতে চায় না সে, যত্ন জানে, ও কি করে ফুলের কদর করতে হয়, ও জানে কি করে ফুল থেকে একটি পাঁপড়িও না খসিয়ে আদরে সোহাগে ফুলের ফাঁপিয়ে তুলতে হয়। তাই বলছি কি আজ রাতটা ওকে আমাদের কাছে থাকতে দাও।'

ছোট বোনের করুণ মিনতিতে দুই দিদি সম্মতি জানিয়ে কুলি যুবককে বলে, 'তোমাকে আমরা আজ রাতটা আমাদের সঙ্গে কাটাতে দিতে পারি, তবে আমাদের কয়েকটা শর্ত তোমাকে অবশ্যই মানতে হবে।'

'বেশ তো কি শর্ত তোমাদের বলো?' আশান্বিত হয়ে যুবক শুধোয়।

'প্রথম শর্ত হলো, তুমি যা দেখবে, সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন কিংবা কৌতূহল প্রকাশ করবে না। আর দ্বিতীয় শর্ত হলো, অহেতুক আমাদের কোন ব্যাপারে নাক গলাতে আসবে না।'

'ঠিক আছে,' সঙ্গে সঙ্গে কুলি যুবক রাজি হয়ে গিয়ে খুশিতে গদগদ হয়ে বলে, 'আমি রাজি তোমাদের শর্তে।'

'বেশ তাহলে এবার দরজার সামনে গিয়ে পড়ে দেখো তার ওপর কি লেখা আছে।'

অতএব সে উঠে দাঁড়িয়ে প্রবেশ পথের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং সে দেখলো স্বর্ণাক্ষরে দরজার ওপরে লেখা আছে, 'অহেতুক যে আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবে, সে যেন তার ফল ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকে।'

অতএব কুলি যুবক তাদের সামনে শপথ নিয়ে বললো, 'আমার ব্যাপারে নয় তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাবো না।'

'বাঃ এই তো পোষ মানা তোতা পাখীর মতো বুলি আওড়ানো হলো আমার প্রেমিক নাগরের।' বড় বোন তার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো তার ঠোঁটে, বুঝিবা কামড়টা একটু বেশী জোরে হয়ে গিয়েছিল, তাই তার ঠোঁট কেটে রক্ত বেরুলো। রক্তের স্বাদ নোনা, এই প্রথম অনুভব করলো মেয়েটা। ঠোঁটে বুলিয়ে সে তার ঠোঁটে সব রক্ত পান করে নিয়ে বলে, 'আমি দুঃখিত বন্ধু। যাই হোক, এর বদলে সুদে-আসলে আজ রাতে আমি তোমার সুখ দিয়ে পুষিয়ে দেবো, কেমন?'

ওদিকে খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল তাদের। বড় বোন খাবার সাজানোর ব্যবস্থা করলো, মেজোবোন মোমবাতি এবং সুগন্ধি চন্দন কাঠের ধূপ জ্বেলে দিয়ে গেলো এবং ছোট বোন সরাবের নতুন বোতল থেকে সরাব ঢালতে থাকলো সান্ধ্য বৈঠকটাকে জমিয়ে তোলার জন্য।

ঘরের মধ্যে মৃদু মোমবাতির আলোটা বেশ একটা মধুময় পরিবেশ রচনা করে তুলেছিল যেন। নতুন ফল এবং নতুন সরাবের নেশায় যখন তারা চারজন বিভোর, যখন তিন রমণী তাদের প্রেমিকের গুণকীর্তনে মশগুল, ঠিক সেই সময় দরজার কড়া

নাড়ায় শব্দ হতেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো তারা। অসময়ে কে এলো আবার? তিন বোন মুখ চাওয়া চায়ি করলো নিজেদের মধ্যে।

তাদের মধ্যে একজন উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়, একটু পরেই ফিরে এসে সে শুধোয়, 'সত্যি আজ রাতটা আমাদের খুব মজায় কাটবে, একটা নিটোল স্ফূর্তির রাত উপহার পাচ্ছি আজ আমরা।'

'কি রকম?' আবার দুই বোন প্রশ্ন চোখে তাকায় তার দিকে।

'প্রত্যুত্তরে সে বলে, 'প্রবেশ পথে পারস্যের তিনজন কালান্দ'র অপেক্ষা করছে। তিনজনেরই দাঁড়ি-গোঁফ, ভুরু এবং মাথা কামানো। এবং তিনজনের বাঁ-চোখ কানা, ঠুলি পড়ানো, দেখে মনে হয় তারা অদ্ভুত ধরনের লোক হবে নিশ্চয়ই। তারা বিদেশী রুম দেশ থেকে আসছে। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। এই প্রথম তারা বাগদাদ শহরে আসছে। তারা আমাদের এখানে রাতটা কাটাবার জন্য এসেছে। আর—'

'আর কি?' দুই বোন অধীর আগ্রহে জানতে চাইলো 'বল না এবার কি বললো সেই কালান্দার তিনজন?'

'যে কোন আস্তানা হলেই চলবে তাদের বললো তারা, এমন কি ঘোড়ার আস্তাবল কিংবা চাকর-বাকরদের বাইরের ঘর হলেও চলবে। কি করুণ মিনতি। সন্ধ্যে নামতেই তারা দিশেহারা হয়ে ছুটে এসেছে আমাদের কাছে। তাদের আশঙ্কা, এই রাতে কেই বা তাদের আশ্রয় দেবে? ভারী অদ্ভুত ধরণের লোক ওরা। তোমরা ওদের এখানে থাকতে



দিতে রাজি হয়ে যাও। আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ওদের সঙ্গে স্ফূর্তি করতে পারলে আজকের রাতটা আমাদের বেশ ভালোই কাটবে।'

নাছোড়বান্দার মতো সেই আগন্তুক বিদেশীদের হয়ে ওকালতি করতে থাকে মেয়েটি যতক্ষণ না তারা বললো, 'ঠিক আছে ওদের ভেতরে নিয়ে এসো। আর হ্যাঁ, ঘরে ঢোকার আগে দরজার লিখনটা ওদের দেখিয়ে দিও, তা না হলে অহেতুক আমাদের ব্যাপারে নাক গলালে ঝামেলা হতে পারে। '

'সে আর বলতে ?' মেয়েটা লাফাতে লাফাতে প্রবেশ পথের দিকে ছুটে যায়। এবং একটু পরে সেই তিনজন কালান্দারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো।

আগন্তুক তিনজন বিদেশী সৌজন্যবশতঃ তাদের সেলাম জানালো। তিন বোন তাদের খুব খাতির করে বসতে বললো, তারা নিরাপদে এখানে যে এসে পৌঁছেছে তার জন্য সুক্রিয়া জানাতে ভুললো না !

ঘরের চারিদিক চোখ বুলোতে গিয়ে কালান্দর তিনজন দারুণ অভিভূত। সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো ঘর, এবং চন্দন ধূপের গন্ধে ঘরটা তখন মম করছিল, বাতাসে ফুলের মিষ্টি সুবাস। মোম-বাতির মৃদু আলো। টেবিলের ওপর শুকনো ফল এবং সরাবের বোতল সাজানো। এ যেন এক স্বপ্নময় পরিবেশ, যেন তারা বেহস্তে এসে পড়েছে নিজেদের অজান্তে। তার ওপর বেহস্তের তিনজন সুন্দরী রমনী তাদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত। মনে হয় মেয়েগুলো কুমারীই হবে, ভাবলো তারা। এতো সুখ আশা করেনি তারা। তাই তারা এক বাক্যে স্বীকার করলো, 'আল্লার দোয়ায় আমরা খুব একটা ভালো আস্তানার আশ্রয় পেয়ে গেছি।'

তারপর সেই কুলি যুবকটার হাসি-খুশি মুখ দেখে ভাবলো, সে নিশ্চয়ই তাদেরই মতো আগন্তুক ভিক্ষুক হবে হয়তো। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করে, 'আমাদের মতো ভিক্ষুক ! তবে এখন জানতে হবে ছোকরা আরব দেশের, নাকি বিদেশী ?'

তাদের কথা কুলি যুবকটার কানে যেতেই সে রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশে বলতে বাধ্য হলো, 'বেশী কথা না কপচে লক্ষী ছেলের মতো বসে পড়ো এখন।' সে তাদের সতর্ক করে দিতেও ছাড়লো না, 'এ ঘরে ঢোকার মুখে দরজার পাল্লায় কি সব সর্ত লেখা আছে দেখোনি তোমরা ? দেখেই যদি থাকো, তাহলে অহেতুক কেন আমার সম্বন্ধে কৌতুহল প্রকাশ করছো তোমরা ?'

'ফকির সাহেব আমরা তোমার কাছে মাফ চাইছি', সঙ্গে সঙ্গে তারা আকুতি জানিয়ে বলে,



'এখন আমাদের জান তোমার হাতে, তুমি যা ভালো বোঝো করো।'

তাদের এমন ভয়ে ভয়ে কথা বলতে দেখে তিন বোন শব্দ করে হেসে উঠলো। এবং কালান্দার তিনজন ও কুলি যুবকের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়ে দিলো অতঃপর খুব যত্ন করে তাদের মাংস খাওয়ালো। তিন বোন তিনজন কালান্দারকে সরাব পরিবেশন করতে ভুললো না।

সরাবের নেশা যখন প্রথম জমে উঠেছে, তখন সেই কুলি যুবকটা কালান্দার ফকিরদের উদ্দেশ্যে বললো, 'ভাইসব আজ এমন শুভ রাতে আমাদের

আমোদ দেওয়ার জন্য তোমাদের ভিকার ঝুলিতে কোন কিস্‌সা রাখা নেই ?'

কালান্দার ফকিরদের মধ্যে সরাবের নেশা বেশ জমে উঠেছে। কথা জড়িয়ে আমার উপদ্রব তখন কোন রকমে টেনে টেনে তারা বললো, 'কিস্‌সার সঙ্গে তাল বাজনা না হলে কি জমে ভাইজান ?'

তাদের আবদার শোনামাত্র বড় বোন পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে একটা বিরাট আকারের মসুল জয়ঢাক, ইয়াকের একটা ফ্লুট এবং পারস্যের বীণা এনে হাজির করলো। অতঃপর প্রতিটি কালান্দার ফকির একটা করে বাদ্য যন্ত্র যে যার হাতে তুলে নিলো। বাদশার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েগুলো দরাজ গলায় গান গাইতে শুরু করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা একটা বিরাট হট্টগোলে পরিণত হয়ে গেলো।

তারা যখন গান বাজনায় মশগুল, ঠিক তখনি প্রবেশ পথের দরজায় আবার কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেলো। শব্দ শুনে ছোট বোন এগিয়ে গেলো আবাব কে এলো দেখার জন্য।

'শুনুন জাঁহাপনা', শাহরাজাদ বলে, 'রোজকার অভ্যাস মতো সেই রাতে খলিফা হারুন-অল-রসিদ নগর পরিক্রমায় বেবিয়েছিলেন তাঁব প্রজারা কে কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে নিজের চোখে তা দেখ করার জন্য। তখন তাঁর পবিচয় একজন সওদাগর, সাথী তাঁর উজির জাফর এবং আত্মরক্ষার জন্য তলোয়ার বাহক মসরুর।'

সেই তিন রমণীব বাড়িব পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তিনি সেই বাড়ি থেকে যেমন বাজনার আওয়াজ শুনে চমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর খলিফা তাঁর উজির জাফরকে কাছে ডেকে বললেন, 'আমি এই বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখতে চাই কে বা কারা এমন চিৎকার করে গান করছে।'

'না জাঁহাপনা, ওখানে আপনার যাওয়া ঠিক হবে না। বাড়ির বাসিন্দারা নিশ্চয়ই সরাব পান করে উন্মত্ত হয়ে এমন হৈ-হুল্লোর করছে। আমার আশঙ্কা সেখানে বদমাস কেউ থাকলে আমাদের অনধিকার প্রবেশে ক্ষেপে যেতে পারে।'

'কিন্তু আমি কোন অজুহাত শুনতে চাই না তোমার, আমি যাবোই।' খলিফা দৃঢ়স্বরে বললেন, 'তবে তোমার যখন অমন আশঙ্কা, তাহলে আমাদের আসল পরিচয় গোপন রেখে ঐ বাড়িতে ঢোকার ব্যবস্থা করো যাতে করে ওরা আমাকে চিনতে না পারে ?'

অগত্যা জাফরকে বলতে হলো, 'জো হুকুম।' তারপর সে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লো।

ছোট মেয়েটি দরজা খুলে দাঁড়াতেই জাফর তার সামনের জমিনের ওপর চুমু খেয়ে শুধালো, 'শোনো সুন্দরী, আমরা তিনরিয়া দেশের সওদাগর। আজ দশদিন হলো আমরা বাগদাদ শহরে এসেছি। একটা পান্থশালায় উঠেছি, আমাদের সামানপত্তর সব বিক্রী হয়ে গেছে। আজ রাত্রে এখানকার এক স্থানীয় ব্যবসায়ীব বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিলো, সেখানে প্রচুর খানাপিনার সঙ্গে সরাবের ব্যবস্থা ছিলো। পেট পুরে আমরা খাই তার বাড়িতে। কিন্তু তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফেরার পথে অন্ধকারে আমরা আমাদের পান্থশালার পথ হারিয়ে ফেলি। এদিকে ঘুরতে ঘুরতে অনেক রাত হয়ে গেলো। তাই আজকেব রাতটা যদি তোমাদের বাড়িতে থাকতে দাও তো খুব উপকার হয়। খোদা আল্লা তোমাদেব ভালো করবেন।'

মেয়েটি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো, লোক-গুলোর পরণে সওদাগরের পোষাক। এবং তাদের চেহারায় সম্ভ্রান্ত ও অভিযাত্যের ছাপ আছে, বিশ্বাস করা যায় তাদের। অতঃপর সে তার দিদিদের কাছে গিয়ে জাফরের কাহিনী পুনরাবৃত্তি করলো। সব শুনে তারা তাকে বললো, 'ঠিক আছে, এদের ভেতরে নিয়ে এসো।'

খলিফাদের এবং তাঁর সঙ্গীদের সাদর আহ্বান

জানিয়ে মেয়েটি তাদের ঘরে নিয়ে এলো। তাদের আসতে দেখে মেয়েগুলো উঠে দাঁড়িয়ে তাদের বসার জায়গা করে দিলো।

তাদের মধ্যে একটি মেয়ে। এবার খলিফা এবং তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশে বললো, 'আপনারা সম্মানীয় অতিথি। আমরা আপনাদের এখানে আজকের রাতটা থাকতে দিতে পারি একটা শর্তে।'

'কি সেই শর্ত?' তারা জিজ্ঞেস করলো।

মেয়েগুলো প্রত্যুত্তরে বললো, 'এখানে যা কিছু দেখবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না, আপনার যা জানার নয়, তা নিয়ে অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ করবেন না, সে আপনার ভালো লাগুক চাই না লাগুক!' খলিফা তাদের শর্তে রাজি হয়ে গেলো। তারপর তারা সরাব পান করতে বসলো এবং পেট ভর্তি করে সরাব গিললো।

এক সময় খলিফার নজর পড়লো কালান্দারদের ওপর। তিনি দেখলেন, তাদের প্রত্যেকের বাঁ চোখ কানা, ঠুলি পড়ানো। অমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বিস্মিত হলেন তিনি। আরো বিস্মিত হলেন তিন বোনেরা মন মাতানো রূপ ও সৌন্দর্য দেখে, সেই সঙ্গে মুগ্ধ হলেন।

দুই বোন সরাবের পাত্র হাতে নিয়ে খলিফার সামনে এসে তাঁকে আহ্বান জানালো পান করার

কিন্তু সরাবের পাত্র ফিরিয়ে দিতে গিয়ে তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'আমি তীর্থযাত্রী এখন, এই সময় সরাব পান করা নিষেধ আছে পয়গম্বর আল্লার।'

ছোটবোন তখন সোনার কারুকার্য করা চাদর বিছিয়ে সরবতের গ্লাস রাখলো খলিফার জন্য। খলিফা তাকে শুক্রিয়া জানিয়ে নিজের মনে বলেন, আল্লার দোয়ায় মেয়েটির অমন সুন্দর আতিথেয়তা ও চমৎকার ব্যবহারে খুবই প্রীত, আগামীকাল সকালে তাকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করতে হবে।

তারপর বড় বোন, বাড়ির কর্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে তার অন্য দুই বোনেদের উদ্দেশে শুধোয়, 'এসো, এবার আমার অতিথিদের একটু আমোদ-আহ্লাদে ভূষিত করি। বেচারারা, কত দূর থেকে এসেছেন, আজ রাতে আমাদের অতিথি হয়ে।'

এরপর তিন বোন হলঘর সাফ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কালান্দারদের ঘরের এক দিকে সোফার ওপর বসতে দিলো এবং বিপরীত প্রান্তে বসার ব্যবস্থা করলো খলিফা, জাফর এবং মসরুরের। তারপর বড়বোন সেই কুলি যুবকটির দিকে ফিরে



বললো, 'তোমার কি আক্কেল বলো তো, তুমি এখনো বসে আছো। আমাদের নবাগত অতিথিদের মতো? আরে বাবা, তুমি তো এখন আর আমাদের অতিথি নও! তুমি হলে গিয়ে এখন আমাদের ঘরের লোক, একান্ত আপনজন।'

লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়ালো, কুলি যুবকটা, কোমরে, কাপড়টা জড়িয়ে নিয়ে অপরাধীর মতো তাকালো, 'হুকুম করো বিবিজান, আমাকে কি করতে হবে?'

'ঠিক ঐ ভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকো।' বড় বোন এবার ঘরের মাঝখানে একটা আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'একবার এখানে এসে আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে তোমাকে।'

কুলি যুবক তৎক্ষণাৎ তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় তার সাহায্যের জন্য তভক্ষণে সে আলমারির ডালাটা খুলে ফেলেছিল। যুবক দেখলো গলায় শিকল বাঁধা দুটি মাদী কুকুর বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছে।

'ঐ কুকুর দুটোকে ধরো!'

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করে সে। শিকল দুটি ধরে মাদী কুকুর দুটিকে ঘরের ঠিক মাঝখানে টেনে নিয়ে এলো সে।

শূন্যে চাবুক ঘুরিয়ে কুলি যুবকের উদ্দেশে বড় বোন এবার হুকুম করলো, 'একটা মাদী কুকুরকে আমার সামনে ধরে নিয়ে এসো।'

গলার শিকল ধরে একটা মাদী কুকুরকে হিড়হিড় করে টেনে আনলো সে তার সামনে। কুকুরটার চোখ ভর্তি জল। মেয়েটির সামনে এসে তার চোখে যেন অশ্রুর বন্যা নামলো এবং সে চিৎকার করে উঠলো। তাকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই মেয়েটির, হাতের চাবুক শূন্যে কয়েকবার দুলিয়ে কুকুরটার পিঠে বেধড়ক পিটোতে থাকলো। আঘাত সহ্য করতে না পেরে কুকুরটা যতো বেশী চিৎকার করে, মেয়েটির উল্লাস যেন ততোই বাড়তে থাকে। তারপর হঠাৎই হাতের চাবুকটা ফেলে দিয়ে মাদী কুকুরটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে সোহাগ করলো, তার চোখের জল মুছিয়ে দিলো, চুমু খেলো তার তার কপালে। তারপর সে কুলি যুবকের দিকে ফিরে বললো, 'এটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় মাদী কুকুরটাকে নিয়ে এসো এখুনি।'

দ্বিতীয় মাদী কুকুরটাকে সে নিয়ে এলে মেয়েটি আগের মতোই ব্যবহার করলো তার সঙ্গে। সেই নিষ্ঠুর অমানুষিক দৃশ্য দেখে হঠাৎ খলিফার হৃদয় বিচলিত হয়ে উঠলো। জাফরকে কাছে ডেকে নিচু গলায় তিনি তাকে বললেন, 'মেয়েটিকে জিজ্ঞস করো তো, কেন অকারণ কুকুর দুটোকে মারলো সে?'

কিন্তু উজির ইশারা করে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'চুপ করে থাকুন জাঁহাপনা। আপনি কি ওদের সেই শর্তের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলেন?'

তাদের চুপিসারে কথা ছাপিয়ে মেজো বোনটির কণ্ঠস্বর ভেসে উঠলো। সে তখন তাদের বড় বোনকে উদ্দেশ্য করে বলছিল, 'দিদিভাই, তুমি তোমার জায়গায় গিয়ে বসো, আমরা এবার আমাদের প্রতিদিনের নিয়ম মতো কাজগুলো সেরে নিই।'

'ও হ্যাঁ, ঠিক আছে', বড় বোন উঠে গিয়ে তার কৌচের মধ্যে ডুবে যেতে শুধোয়, 'তোমরা চালিয়ে যাও বোন।'

তারপর মেজো বোন মেঝের ওপর বসে পড়লো। ওদিকে ছোট বোন পাশের ঘর থেকে বীণা জাতীয় একটা বাদ্য যন্ত্র নিয়ে এলো, সাটিনের কাপড় দিয়ে ঢাকা সেই বাদ্যযন্ত্রটা। ছোট বোন সেই বীণাটা হাতে তুলে নিয়ে করুণ সুরে বাজাতে বসলো, সেই সঙ্গে দুঃখের গান ধরলো সে :—

কিছু কিছু সময় আছে শুধু মহব্বতের জন্য,
কিছু কিছু দিল আছে শুধু দুঃখ দেওয়া জন্য।
তাই পিছন ফিরে তাকিয়ে যখন দেখি,
শুধু ফাঁকি, শুধু ফাঁকি॥

কিছু কিছু ঘটনা আছে জীবন থেকে নেওয়া,
কিছু কিছু মানুষ আছে শুধুই রটিয়ে যাওয়া।
তাই দূর থেকে যখন দেখি
তোমায় পেয়ার করি বলতে গিয়েও নীরব থাকি।

অমন দুঃখের গান শুনে মেজোবোন আক্ষেপ করলো মৃদু চিৎকার করে উঠে, 'হায়! হায়রে তোর পোড়া নসিব!' কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দেহ থেকে পোষাক খুলে ফেলে সে, এবং মেঝের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। মেয়েটির উন্মুক্ত পিঠের দিকে তাকাতে গিয়ে শিউরে ওঠেন খলিফা. চাবুকের আঘাতে দগদগে ঘা হয়ে গেছে সেখানে তার। বড়বোন উঠে গিয়ে তার চোখে-মুখে জল ছিটোতেই

জ্ঞান ফিরে পেলো সে। তার বড়বোন তার জন্য নতুন পোষাক আনলো, নতুন পোষাকে সজ্জিত হয়ে মেয়েটি আবার তাজা হয়ে উঠলো

ওদিকে খলিফা মনে মনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন একটাব পর একটা বিস্ময়কর সব ঘটনা ঘটে যেতে দেখে। অথচ সেই সব ঘটনার ব্যাখ্যা তাঁর জানা নেই। তাই তিনি আবার জাফরকে কাছে ডেকে নিচু গলায় বললেন, 'তোমার-কি চোখ নেই, দেখতে পাচ্ছো না মেয়েটির পিঠে কি রকম চাবুকের দাগ? এর পরেও কি চুপ করে থাকা যায়? মেয়েটির অমন দুরাবস্থা এবং অপর দুটি মেয়ের কাহিনী আমি শুনতে চাই, আমি জানতে ঐ দুই কালো মাদী কুকুরের রহস্য। কুকুব দুটোতে চাবুক মারার সঙ্গে অদৃশ্য কোন্ শক্তি বলে মেয়েটির পিঠে সেই চাবুকের দাগ ফিরে এসেছে বলে মনে হয়! কিন্তু কি সেই রহস্য? সেটা আমাকে জানতে হবে।'

কিন্তু জাফর প্রত্যুত্তরে বলে, 'জাঁহাপনা, আপনাকে আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ওদের শর্তের কথা,যে ব্যাপারেব সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই সে নিয়ে আমরা যেন অযথা মাথা না ঘামাই। অতএব—'

এক সময় মেঝবোনের কণ্ঠস্বর আবার শোনা যায়, 'আদবেব বোন, আমার কাছে এসো, আমার জন্য বাকী কাজটুকু সেরে ফেলো।'

'আল্লা তোমার দিল খুশ করুন। তোমাকে শান্তি দিন', ছোটবোন জবাব দিয়ে আবার সেই বীণাটা হাতে তুলে নিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরে আগের মতো করুণ সুরে ঝঙ্কার তোলে, বীণার সুরে ঠোঁট মেলায় সে, গান হয়ে ঝরে পড়ে তার মনের অভিব্যক্তি :—

আমাকে দেখতে দাও,
ফিরিয়ে দাও আমার বিলুপ্ত বোধশক্তি,
শুধু অনুভব নয়, অনুভূতি দিয়ে
আমি বিচার করতে চাই তোমার সব সাফাই,
সব যুক্তি।
তুমি বলেছো আকার মহব্বত তোমাকে
শুধু দুঃখ দেয়,
তোমার সব জ্বালা-যন্ত্রণা
অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে।

এবারেও গান শুনতে শুনতে মেজবোন হঠাৎ আর্ত চিৎকার করে উঠলো, 'হায় আল্লা! বলো, এ কথা ঠিক কিনা? তারপর প্রথম বারের মতো এবারেও সে তার পোষাক গা থেকে খুলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো, এবং জ্ঞান হারালো মাটিতে পড়ে গিয়ে। যথারীতি বডবোন এবারেও উঠে গিয়ে তার চোখে-মুখে জল ছিটোতেই সে তার জ্ঞান ফিরে পায়। আগের সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো, তার গায়ে নরম পোষাক উঠলো। আগের মতো এরপর আবার সে সতেজ হয়ে তার ছোটবোনকে অনুরোধ করলো, তার বাকীটুকু সেরে ফেলার জন্য।

অতঃপব সে আবার করুণ সুরে বীণা বাজাতে শুরু করলো। সেই সঙ্গে তাব মনেব সব দুঃখ বেদনা গান হযে ঝরে পড়লো কণ্ঠ দিযে।



জানি না আমার এই দুখের নিশি
শেষ হবে কবে!
জানি না আমাব সত্যিকারের মহব্বতের দাম
তুমি কবে দেবে।

আমি যে তোমারি সুখে করেছি নিজেরে
সমর্পণ,
তোমারি দুঃখে নিজের সব সাধ আহ্লাদ
দিয়েছি বিসর্জন।
আশা ছিলো সব ভুল বোঝাবুঝির
হবে অবসান,
আমার সকল দুঃখের হোক সমাধান।

তৃতীয় গানটা শোনার পর আগের দু'বোনের মতো এবারে মেজবোন চিৎকার করে উঠলো, নিজের পোষাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো। অবশেষে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লো! আগের দু'বারের মতো তৃতীয়বারও সেই এক দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গেলো। পিঠের ওপর সেই চাবুকের দাগটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

সেই দৃশ্য দেখে তিনজন ফকির কালান্দার নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিসিয়ে বলাবলি করলো, 'এ রকম ঘটনা ঘটতে পারে আগে জানলে, আমরা কখনোই এখানে আসতাম না, শহরের বাইরে কোথাও রাতটা কাটিয়ে দিতাম।'

তাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলেন খলিফা। তাদের দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, কেন আপনারা এ কথা বলছেন?'

'এ ধরণের ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখলে কার মন ভালো থাকে বলুন?'

'তা তো বটেই!' খলিফা এবার শুধান, 'কেন, আপনারা এ বাড়ির কেউ নন?'

'না', কালান্দাররা বলেন, 'এমন কি এক ঘণ্টা আগে ওদের যখন প্রথম দেখি, তার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমার চোখে ওরা কখনো ধরা পড়েনি।'

অবাক বিস্ময়ে ওদের দিকে তাকালেন, 'যে লোকটা আপনাদের পাশে বসে আছে, মনে হয় এ বাড়ির গোপন রহস্যকর কথাগুলো তার জানা থাকলেও থাকতে পারে। ওকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?'

অতঃপর সেই কুলি যুবকটির দিকে ফিরে তাকিয়ে ইশারা করলেন খলিফা।

কালান্দাররা তাকে প্রশ্ন করলেন। উত্তরে সে বললো, 'আল্লার কসম খেয়ে বলছি, যদিও আমি এই বাগদাদ শহরের লোক, এখানেই আমার ছেলেবেলা কেটেছে, যৌবনের ঔদ্ধত্য বেড়েছে তবু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, জানি না আপনারা সেই জবানবন্দী বিশ্বাস করবেন কিনা, তবু না বলে থাকতে পারছিনা, জন্মাবার পর থেকে আজই এই প্রথম আমি এ বাড়ির দরজা পেরিয়ে এখানকার এই অন্দরমহলে প্রবেশ করি। আর আমার সঙ্গ তাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকেছে। আল্লার দোয়ায় মোটামুটি তারা বেশ আনন্দ উপভোগ করেছে আমাকে কাছে পেবে।'

'তাহলে দেখছি, আমরা সবাই এখানে ওদের শর্তের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি।' কালান্দাররা বলে।

সব শুনে খলিফা বললেন, 'আমরা সাতজন পুরুষ, আর ওরা মাত্র তিনজন মহিলা, ভয় কিসের? অতএব আসুন, কি ব্যাপার খোঁজ নিয়ে দেখা যাক। আর তারা আমাদের প্রশ্নের উত্তর না দিলে তখন আমরা ওদের ওপর জোর খাটাবো।'

এই প্রস্তাবে এক রকম সবাই রাজী হয়ে গেলো, কেবল জাফর ছাড়া। জাফর শুধোয়, 'এটা আমার অধিকারের মধ্যে পড়ে না। আজ রাতে আমরা ওদের মেহমান, ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে অযথা নাক গলানো উচিত নয়। তাছাড়া আপনারা সবাই জানেন, প্রথমেই আমরা আজ রাতে এখানে থাকার জন্য ওদের শর্তে রাজী হয়ে যাই। যে শর্তের মূল বক্তব্য ছিলেন, আমাদের স্বার্থে ঘা না লাগলে ওদের কোন ব্যাপারে আমায় মাথা ঘামাতে পারবো না। এবং এই শর্তের খেলাপ হলে যে কোন শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অতএব আমি বলি কি, চুপ চাপ থাকাই ভালো, তা না হলে আমাদের শর্তের খেলাপ করা হয়। আর এদিকে রাত তো প্রায়

ভোর হয়ে এলো, বাকী রাতটুকু মুখ বুজে সহ্য করে যেতে ক্ষতি কি? তারপর ভোর হলে পর যে যার গন্তব্যস্থানে চলে যাবো।'

খলিফা তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'অতক্ষণ অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য আমার নেই। কালান্দারদের এখুনি প্রশ্ন করতে দাও।'

'এ রকম পরামর্শ আমি দিতে পারবো না' জাফর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো।

তারপর তাদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হলো, কে প্রথম মেয়েগুলোর কাছে তাদের প্রশ্ন রাখবে। অবশেষে সবাই এক বাক্যে কুলি যুবকটির নাম প্রস্তাব করলো।

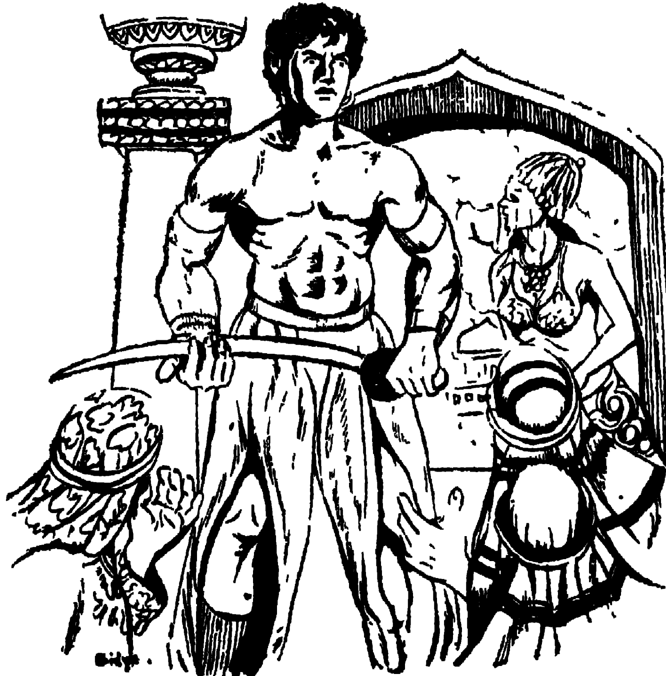
ওদিকে মেয়েগুলো তাদের ফিস্‌ফিস কানকানি শুনতে পেয়ে বড়বোন সেই কুলি যুবকটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার, তোমরা চুপি চুপি কি আলোচনা করছিলে?'

কুলি যুবকটি তার সামনে গিয়ে মাথা নত করে বলে, 'আপনি যখন জিজ্ঞেস করছেন, তখন সত্যি কথাটাই বলে ফেলি মালকিন, আমাদের জানার খুব ইচ্ছে, কেন আপনি ঐ মাদী কুকুর দুটিকে প্রহার করতে গেলেন? তারপর কাঁদতে কাঁদতে কেনই তা তাদের গালে চুমু খেতে গেলেন! সব শেষে ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে, আপনার মেজবোনের পিঠে চাবুকের দাগ কেন? এই সব প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে। এই জন্যেই তারা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে দীর্ঘ আলোচনার পর।

তারপর বাড়ির কর্ত্রী বড়বোন তার সেই অতিথি-দের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, 'এই কুলি যুবকটি আপনাদের হয়ে আমার কাছে দরবার করতে এসেছে, এ কথা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ', জাফর এতক্ষণ নীরব ছিলো মুখর হয়ে আপাততঃ সবাই উদ্ধার করলো সে।

এ কথা শুনে বড়বোন হঠাৎ চিৎকার করে বলে



উঠলেন, 'হায় আল্লা! তোমরা আমাদের ভুল বুঝছো! তোমরা আমাদের সম্মানিত মেহমান, আমি তোমাদের সেই শর্তের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। এখানে প্রবেশ করার সময় মনে আছে, কি শপথ তোমরা নিয়েছিলে? তোমাদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়, আমরা যা করবো, তা তোমাদের পছন্দ হোক চাই না হোক, সে নিয়ে অযথা কৌতূহল দেখাবে না। তবে দোষ তোমাদের যতো না, তার থেকে বেশী আমাদের, কারণ আমরা তোমাদের আদর-আপ্যায়ন করে আমাদের বাড়িতে মেহমান করে ডেকে এনে ভালোমন্দ খাইয়ে মহা অপরাধ করে ফেলেছি এখন সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝছি।'

তারপর সে হাতের জামা গুটিয়ে মেঝের ওপর তিনবার ঘুষি মারলো, এবং সেই সঙ্গে চিৎকার করে ডেকে উঠলো, 'জলদি চলে এসো!'

তার ডাকে সামনের আলমারির পাল্লা খুলে যায়। এবং সে পাল্লার ওপার থেকে দৈত্যের মতো চেহারার সাতজন নিগ্রো বেরিয়ে এলো, তাদের প্রত্যেকের হাতে ধারালো তলোয়ার। তাদের উদ্দেশে বড়বোনটি হুকুম করলো, 'এই সব বেয়াদপ লোক-গুলোকে লোহার শিকল দিয়ে একটার সঙ্গে আর একটাকে বেঁধে ফেলো।'

মুখ থেকে তার কথা খসার সঙ্গে সঙ্গে দৈত্য-গুলো তৎপর হয়ে উঠলো তাদের শিকলে আবদ্ধ করার জন্য। এক সময় তারা তাদের কাজ শেষ করে বড়বোনের দিকে তাকায়, 'মালকিন, আপনি হুকুম করুন, এবার এদের কোতল করে দিই!'

'না, ঠিক এখন নয়', প্রত্যুত্তরে বড়বোন বলে,'কিছু সময় ওদের রেহাই দাও। সেই ফাঁকে আমি ওদের কার কি রকম অবস্থা, সেটা জেনে নিতে চাই কোতল করার আগে।'

'হে মালকিন', সেই কুলি যুবকটি এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো, 'অন্যদের পাশে আমাকে কোতল করবেন না দয়া করে। এরা সবাই অপরাধী, প্রত্যেকে তাদের শর্তের অবমাননা করেছে আপনা-দের ব্যাপারে অহেতুক কৌতূহল দেখিয়ে। ওদের প্রত্যেকের শাস্তি হওয়া উচিত। আল্লার দোয়ায় ঐ এক চোখ কালান্দার ফকিরগুলো আমাদের বাগদাদ শহরে এসে না ঢুকলে আজকের রাতটা অতি মনোহর, অতি সুন্দর ভাবে কাটতে পারতো।' তার কথা শুনে বড়বোন হাসিতে ফেটে পড়লো।

যুবক কুলি নিজের স্বপক্ষে সাফাই গাওয়া শেষ হতেই শাহরাজাদ দেখলো ভোর হয়ে আসছে। পর-দিন শাহরিয়ারের কাছ থেকে গল্প বলার অনুমতি নিয়ে সে তার কাহিনীর ইতি টানলো তখনকার মতো।

পরদিন রাতে বাদশাদ শাহরিয়ার নিজের শয়ন-কক্ষে এসে প্রবেশ করলো। শাহারজাদ তার কাহিনীর জের টেনে আবার বলতে শুরু করলো, 'জানেন জাঁহাপনা, বেচারা সেই কুলি যুবকের আক্ষেপ শুনে বড়বোনের সে কি হাসি! যেন থামতেই চায় না। যাইহোক, এক সময় সে তার হাসি থামিয়ে উপস্থিত প্রত্যেক মেহমানকে উদ্দেশ্য করে বললো, তোমাদের বাঁচার আয়ু আর মাত্র এক ঘণ্টা। এর মধ্যে তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়ে দাও। যদি শুনি সত্যি তোমরা নিরপরাধ এবং অসহায়, তাহলে তোমাদের সব অপরাধ মুকুব করে দেবো, তা না হলে তোমাদের মৃত্যু অনিবার্য!'

মেয়েটির শেষ সিদ্ধান্ত শুনে ভয়ে আঁতকে ওঠেন খালিফা। তার উজির জাফরকে উদ্দেশ্য করে তিনি নিচু গলায় বলেন, 'শুনলে তো জাফর, এবার ওকে আমাদের আসল পরিচয়টা শুনিয়ে দাও, তা না হলে কোন অনুরোধ উপরোধেই মৃত্যু আমাদের কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

'এখন আর কিছু করার নেই জাঁহাপনা। এটা আমাদের প্রাপ্য ছিলো', গম্ভীর হয়ে বললো জাফর।

এবার খলিফা রেগে গিয়ে বললেন, 'এখন রসি-

কথা করার সময় নয়, ব্যাপারটা একটু গভীর ভাবে দেখার চেষ্টা করো জাফর।'

ওদিকে বড়বোন কালান্দার ফকিরদের সামনে গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি তিনজন ভাই?'

'না মালকিন, আল্লা আমাদের সেই সৌভাগ্য দেননি, আমরা ফকির এবং বিদেশী। আমরা গরীব, দেশে দেশে ভিক্ষে করে খাই।'

তারপর বড়বোন তাদের একে একে জিজ্ঞেস করলো, 'আশ্চর্য, দেখছি প্রত্যেকেরই একটা করে চোখ কানা, কি করে এমন ঘটনা ঘটলো? তোমরা কি জন্মান্ধ?'

'না মালকিন' একজন কালান্দার উত্তর দিলো, জন্মের সময় আমরা দু'টো চোখেই দেখতে পেতাম। কিন্তু এক অদ্ভুত ভাবে আমরা প্রত্যেকে আমাদের একটা করে চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলি।'

তারপর বড়বোন আবার দুজন কালান্দারকে একই প্রশ্ন করলো, এবং তারাও সেই একই উত্তর দিলো। তারা আরও বলে, তারা নাকি বিভিন্ন দেশের লোক। তবে ঘটনাচক্রে তারা তিনজন একত্রে এসে মিলেছে আল্লার দোয়ায়। বিচিত্র তাদের জীবন কাহিনী। তারা তিন দেশের তিন বাদশাহের পুত্র এবং শাহজাদা।

'বড় বিচিত্র জীবন তো তোমাদের!' বড়বোন এবার সহানুভূতির সঙ্গে তাদের বলে, 'ঠিক আছে, তোমরা একে একে তোমাদের জীবন কাহিনী শোনাও আমাদের। সেই সব কাহিনী শুনে আমরা যদি সন্তুষ্ট হই, তাহলে তোমাদের মৃত্যুদণ্ড মকুব করে দেবো। এবার বলো, কি কারণে আমাদের এই প্রাসাদে তোমাদের আগমন?'

প্রথমে সেই কুলি যুবক এগিয়ে এলো তার জীবনের কাহিনী শোনাতে। শুরুতেই সে বলে, 'মালকিন তুমি তো দেখেছো, আমি গরীব কুলি, তোমাদের মোট বয়ে খাই। তুমি আমাকে তোমার মোট বয়ে আনার জন্য তোমাদের প্রাসাদে ডেকে নিয়ে এসেছিলে, সে কথা তোমার অজানা নেই নিশ্চয়ই! এ ছাড়া আমার জীবনে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, যা অদ্ভুত কিছু আমার জীবনে ঘটেছে, তা তোমাদের প্রাসাদেই, আজ দুপুরবেলায়। আর সে সব তোমাদের চোখের সামনেই ঘটেছে। আমার জীবনে কোন ঘটনা নেই, বরং এখানে এসেই আমি যেন এক ঘটনা হয়ে গেছি। এই হলো আমার জীবনের কাহিনী। আমার একান্ত অনুরোধ, তোমরা আমাদের সবাইকে ক্ষমা করো, শাস্তি দাও।'

কুলি যুবকের মুখ থেকে কথাগুলো শুনে বড়বোন হাসিতে ফেটে পড়লো। তারপর হাসি থামিয়ে সে বলে 'ঠিক আছে, এখন অন্য কোথাও গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করো।'

'খোদা আল্লার কসম খেয়ে বলছি, আমার সঙ্গীদের কাহিনী না শোনা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না।'

তারপর প্রথম কালান্দার এগিয়ে এসে তার কাহিনী বলতে শুরু করলো।

প্রথম কালান্দারের কাহিনী

'তাহলে শুনুন মালকিন, আমার দাড়ি গোঁফ না থাকার আসল কারণটা কি! আর আমার একটা চোখ কানা কেন, সেই কাহিনী আপনার জানা দরকার।'

আমার আব্বাজান ছিলেন এক রাজ্যের বাদশাহ। আর আমার চাচাও ছিলেন অন্য এক রাজ্যের বাদশাহ। শুনলে আপনি অবাক হবেন, আমি এবং আমার চাচার ছেলে একই দিনে জন্মগ্রহণ করি। তারপর দিন যায়, মাস যায়, আমরা ক্রমশ, বড় হয়ে উঠতে থাকি। আমি প্রায়ই আমার চাচার প্রাসাদে গিয়ে তার সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে আসতাম। চাচা আমাকে খুব পেয়ার করতেন।



আমরা তখন যুবক আমি এবং আমার চাচাতো ভাই তখন জিগরী দোস্ত হয়ে গেছি। আমি যখনই সেখানে যেতাম সে আমার জন্য মোটাসোটা নাদুস নুদুস ভেড়া জবাই করে মাংসের কাবাব বানাতো আমার জন্য সব থেকে দামী সরাবের ইন্তিজাম করতো। সেই সব দিনগুলো আমরা চুটিয়ে উপভোগ করতাম। কি সুখেই না কাটতো সেই সব দিনগুলো। একদিন হলো কি, প্রচুর সরাব পিয়ে আমরা দুই ভাই তখন বেহুড মাতাল। কথা জড়িয়ে গেছে, পা টলছে, সেই সময় আমার চাচেরা ভাইজান বেশ শরীফ মেজাজে শুধোয়, 'ভাইজান, তুমি আমার প্রাণের দোস্ত, তোমাকে যে আমার একটা উপকার করতে হবে। তবে আগে বলো 'না' বলবে না?'

'বেশ, আমি ওয়াদা করলাম, তুমি যা হুকুম করবে তাই আমি করবো ভাইজান।'

আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়া মাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে। খানিকপর ফিরে এল সঙ্গে এক লাস্যময়ী অপরূপ সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে মুখের ওপর অতি মিহির ওড়না, তাতে তার সৌন্দর্য এবং রূপ আরো বেশি করে ফেটে পড়ছিল যেন দামী অতি মূল্যবান গহনা, যার দাম অনেক। ভাইজান আমার দিকে ফিরে তাকালো (তখনো মেয়েটি তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল) এবং আমার কসমের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শুধোলে সে, 'আমার আসার আগে এই মেয়েটিকে সঙ্গে করে গোরস্থানে নিয়ে যাও (গোরস্থানের বর্ণনা দেয় সে সংক্ষেপে) এবং সেখানকার একটা কবরের ঘরের (নির্দিষ্ট একটা সৌধের বর্ণনা দেয় সে) ভেতরে ঢুকে আমার জন্য অপেক্ষা করো, দেখো কেউ যেন না তোমাদের দেখতে পায়।'

আমি তখন নিরুপায় তার কথা অমান্য করতে পারি না, কারণ আগেই আমি কসম খেয়ে বলেছি, তার কথা শুনবো, অবাধ্য হবো না। অতএব মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সেই নির্দিষ্ট সৌধের ভিতরে গিয়ে বসলাম দুজনে। একটু পরেই আমার সেই চাচাতো ভাই এসে হাজির হলো, হাতে তার গামলা ভর্তি পানি, চুন, বালি ও জল মেশানো আস্তর এবং একটি কুঠার জাতীয় বাটালি। এসেই সোজা সে সেই সৌধের মাঝখানে চলে গেলো। সেখানে ছিলো একটা বিরাট পাথরের চাঁই, কুঠার দিয়ে সেই পাথরের চাঁইটা সরিয়ে এক পাশে রেখে দেয় সে। তারপর কুঠার দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করে দিলো সে, বেশ খানিকটা মাটি কাটার পর বেরিয়ে আসে একটা লোহার পাত, সুরঙ্গের দরজা, সেটা সরাতেই নিচে নামার একটা সিঁড়ি বেরিয়ে আসে, সিঁড়িটা নিচে গিয়ে মিশেছে একটা সুন্দর মনোরম প্রাসাদে।

তারপর সে মেয়েটির দিক ফিরে বলে, 'এসো, একটু পরেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হতে যাচ্ছে এবার।'

সঙ্গে সঙ্গে সে সিঁড়ি বেয়ে নিচে উধাও হয়ে যায়। তারপর আমার চাচাতো ভাই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেলো, 'ও আমার প্রাণের দোস্ত ভাইজান, আমি নিচে নেমে গেলে তুমি ঐ লোহার পাতটা এই সিঁড়ির মুখে আগের মতো আবার চাপা দিয়ে দেবে, তারপর আলগা মাটি সেই গর্তের মুখে চাপা দিয়ে সব শেষে পাথরের চাঁইটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে চুন বালির আস্তর মাখিয়ে দিও এমন করে যেন বোঝা না যায় যে, জায়গাটা খোঁড়া হয়েছিল। ফিরে যাওয়ার আগে জল ঢেলে চুন বালির প্রাস্টার করতে ভুলে যেও না যেন। জানো ভাইজান', সে আবার বলে, 'বছর খানেক আগে নিচে ঐ মনোরম প্রাসাদটা আমি তৈরি করেছি। তোমার মতো ভালো দোস্ত পেলাম বলেই মেয়েটিকে নিয়ে আজ আমি সেখানে প্রবেশ করতে যাচ্ছি আল্লার দোয়ায় আর দিন দিনগুলো যেন সুখে শান্তিতে কাটে। আমার এতো দোস্তকে ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কি করবো। বলো, বুঝতেই পাচ্ছো, এমন সুন্দরী যুবতীকে উপভোগ করার লোভটাও আবার ছাড়তে পারছি না। বিদায় ভাইজান, বিদায় দোস্ত!' এই বলে সে সিঁড়ি পথে অদৃশ্য হয়ে যায় চিরদিনের জন্য।

ভাইজান আমার চোখের আড়াল হয়ে গেলে পর আমি তার কথা মতো সুরঙ্গের মুখ বন্ধ করলাম। এখন বুঝতেই পারা যায় না যে, জায়গাটা কখনো খোঁড়া হয়েছিল। ভাইজান দেখলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হতো। যন্ত্রচালিতের মতো কাজ করে গেলাম আমি সরাবের নেশার ঝোঁকে। প্রাসাদে ফিরে এসে শুনলাম চাচা শিকারে বেরিয়েছেন। তাঁর দেখা না পেয়েই আমাকে একা একা ঘুমোতে হলো সে রাতে। পরদিন ভোর হতেই আগের দিন সন্ধ্যায় সেই ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেলো, মনে পড়ে গেলো আমার এবং চাচাতো ভাইজানের সলা-পরামর্শের কথা। আমার মনে তখন দারুণ অনুশোচনা অবিবেচকের মতো ভাইজানের কথা শোনার জন্য। ছিঃ ছিঃ এ আমি কি করলাম? চাচা ভাইজানের খোঁজ করলে আমি কি জবাব দেবো তখন? এই সব চিন্তা তখন আমার মনটাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল যেন। আগের দিনের সন্ধ্যায় স্মৃতি এখন আমার কাছে যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হলো। অথচ আমি তো জানি, এ ঘটনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, থাকার কথাও নয়। তবু মন মানে না, বারংবার মনে পড়ে চাচার কাছে কি জবাবদিহি করবো?

শেষে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ভাইজানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। গোরস্থানে সব সৌধগুলোই প্রায় এক। রাতের অন্ধকারে ভাইজানের কথা মতো সেই সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে এসেছিলাম, দিনের আলোয় সেই জায়গাটা এখন আর খেয়াল করতে পারছিলাম না। তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম সেই সুড়ঙের পথটা কিন্তু কোথায় গেলে দেখা পাবো তার? কে আমাকে সেই পথের ঠিকানা বাতলে দেবে জানি না। ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে এলাম আবার শহরে। তখন আর একটা রাত প্রায় শুরু হতে চলেছে। আমি তখন দিশেহারা। এ কোন্ সমস্যায় ফেলে গেলো ভাইজান আমাকে! চিন্তায় খানা-পিনা বন্ধ তখন আমার। ভাইজানের ভাগ্যে তখন কি ঘটছে, এই ভাবনায় আর একটা দুঃস্বপ্নের রাত্রি কেটে গেলো। দ্বিতীয় দিন সকালে ভাইজানকে ফিরতে না দেখে আবার গেলাম সেই গোরস্থানে। এবারেও ব্যর্থ হতে হলো, সেই সুরঙ্গ পথটা এবারেও খুঁজে পেলাম না। এই ভাবে সাত সাতটা দিন কেটে গেলো, প্রতিদিন সকাল হতেই গোরস্থানে যাই, কিন্তু সুড়ঙ্গ পথে ভাইজানের

কোন হদিশ পাই না। মন আমার ক্রমশই বিষণ্ণ, ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আমার তখন পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। এভাবে এখানে অনিদ্রায়, অনাহারে দিন কাটালে আমি বোধহয় সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবো। তাই শেষে ঠিক করলাম, দেশে ফিরে যাবো আমার আব্বাজানের কাছে।

কথাটা ভাবা মাত্র আমি তখন ফিরে চলি আমার দেশে, আমার আব্বাজানের রাজ্যে।

কিন্তু আমার নিজের শহর, আব্বাজানের রাজধানীর প্রবেশ পথে ঢোকার মুখে বাধা পেলাম, একজন সশস্ত্র লোক এসে আমাকে ঘিরে ধরলো এবং আমাকে ঘিরে ধরলো এবং আমাকে বন্দী করলো তারা সবাই আমার আব্বাজানের প্রজা, ভৃত্য। আমার আব্বাজান এ দেশের সুলতান, আর আমি শাহজাদা। ভাগ্যের একি পরিহাস? আমার আব্বাজানের বিশ্বস্ত সৈনিক, প্রজা এমন কি আমার কয়েকজন খাস ভৃত্যের হাতে শেষে আমি বন্দী হলাম? এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কে আমার বুক কেঁপে উঠলো তখন। নিজের মনকে জিজ্ঞেস করলাম, তবে কি আমার আব্বাজানের জীবনে কোন অঘটন ঘটলো? যারা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের আমি সেই প্রশ্নটা করলাম, জানতে চাইলাম, আমাকে বন্দী করার উদ্দেশ্য কি তাদের? কিন্তু তারা আমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিলো না।

যাইহোক একটু পরে আমাদের প্রাসাদের এক খাস ভৃত্য, বোধহয় আমার এই দুরাবস্থা দেখে তার মায়া হলো, নিমকহারামি করতে বিবেকে বাধলো, আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চুপি চুপি আমাকে খবর দিলো, তোমার আব্বাজানের ভাগ্যাকাশে এখন ধূমকেতু বিরাজ করছে, তিনি আর বেঁচে নেই। তার সৈন্য-সামন্তরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাকে কোতল করা হয়েছে তাঁর উজিরের পরামর্শে। সেনাপতি উজিরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, সে এখন উজিরের ডানহাত। উজির তোমার আব্বাজানকে খতম করে বাদশাহ হয়ে সিংহাসনে বসেছেন এ রাজ্যের। আমরা এখন তাঁর আজ্ঞাবাহ মাত্র। তার হুকুমেই আমরা তোমাকে বন্দী করতে এসেছি।

আব্বাজানের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যাই। ওরা তখন আমাকে বহন করে নিয়ে আসে উজিরের সামনে। আমার তখন জ্ঞান ফিরে এসেছে। আমার বাবার হত্যাকারীকে দেখে আমার সারা শরীর ঘৃণায়, রাগে অপমানে জ্বলতে থাকে। মনে পড়ে আমার আর উজিরের মধ্যে বহুদিনের পুরনো সেই বিদ্বেষের কথা, যে বিদ্বেষের জন্য আজ সে বিশ্বাসঘাতক, স্বয়ং এবং এতো নিচে নেমে এসেছে।

আজ থেকে বহু বছর আগে, আমি তখন নিতান্তই ছেলেমানুষ, একদিন আমাদের প্রাসাদের ছাদ থেকে ধনুকের ছিলায় পাথর ছুঁড়ে পাখী শিকার করছিলাম। উজিরের বাড়ি ছিলো আমাদের প্রাসাদের কাছেই। সেই সময় উজিরের বাড়ির ছাদে একটা সুন্দর পাখী বসেছিল পাখীটাকে দেখে আমার খুব লোভ হলো শিকার করার জন্য। উজির তখন সেখানেই ছিলো। আমার ধনুকের ছিলা থেকে একটা পাথরের টুকরো দ্রুত বেগে ধাওয়া করলো সেই পাখাটার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পাখাটার গায়ে না লেগে উজিরের একটা চোখের উপর আছড়ে পড়লো। পাথরের টুকরোর আঘাতে উজিরের একটা চোখ খতম হয়ে যায়। সেই অপ্রীতিকর ঘটনার পর থেকেই আমার প্রতি উজিরের বিদ্বেষের সূত্রপাত। এ প্রসঙ্গে একটা সায়র মনে পড়ে গেলো :—

আমাদের নসিব বড় বিচিত্র,
কখনো বা আমাদের নিজেদের পায়ে পদদলিত,
এবং অবহেলিত।

আমরা পিছন ফিরে তাকাতে ভয় পাই,
কলঙ্কময় অতীতের স্মৃতি মনে করে আঁতকে
উঠি
ভয়ে ভূত দেখার মতো।
আশ্চর্য! এক মৃত্যুর জন্য
আর এক মৃত্যু যে ওঁৎ পেতে বসে আছে,
জেনে শুনেও গুটিয়ে নিই নিজেকে,
বুঝতে চাই না, মৃত্যু এসে বলবে হেসে
এবার তোমার পালা।



তাই উজিরের চোখে চোখ রাখতে গিয়ে আমি কিছুতেই বলতে পারি না। কেননা আমার আব্বাজান এই রাজ্যের সুলতান ছিলেন এক সময়, আর আমি শাহাজাদা।

কিন্তু আমি তো জানি, আমার ওপর উজিরের দারুণ একটা বিদ্বেষ ছিলো, সেটা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেই বিশ্বাসঘাতক উজিরের অনুগত সৈনিক ও প্রজাদের হাতে এখন আমি বন্দী। সরাসরি আমার কোতলের হুকুম দিলো সে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম 'কি অপরাধে আমার এই গুরুতর শাস্তি?'

প্রত্যুত্তরে সে তার চোখের ঠুলটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'এর থেকে বড় অপরাধ আর কি হতে পারে?'

'কিন্তু সেটা তো একটা দুর্ঘটনা মাত্র!' আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করি, 'আমি তো আর ইচ্ছে করে করিনি।'

'তাই নাকি? তুমি যদি তোমার ইচ্ছাকৃত অপরাধকে দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দিতে চাও, তাহলে আমিও তোমার মতো', চিৎকার করে সে তার সৈন্যদের উদ্দেশে বলে উঠলো, 'ওকে আমার সামনে ধরে নিয়ে এসো!' এবং তারা আমাকে তার কাছে নিয়ে যেতেই হাত বাড়িয়ে সে আমার বাঁ চোখটা তার নখের খোঁচা দিয়ে ঘায়েল করে দেয়। তারপর থেকে এই যে দেখছেন, আমার এক চোখ কানা। আমার এক চোখ অন্ধ করে দিয়েই সে আমাকে রেহাই দিলো না। তারপর সে আমার হাত পা বেঁধে একটা বাক্সের মধ্যে পুরে জহ্লাদকে হুকুম দিলো, বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে আমাকে কোতল করার জন্য। কোতল করার পর আমার মৃতদেহ যেন পশু-পাখীদের খাওয়ার জন্য ফেলে দেওয়া হয়।

তারপর জহ্লাদ আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে এলো কোতল করার আগে চোখের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে গেলে যন্ত্রণায়, দুঃখে আমার চোখ ছাপিয়ে জল বেরিয়ে এলো, এবং তার দিকে তাকিয়ে একটা শায়র আবৃত্তি করলাম :—

অন্ধজনে দয়া করো,
এ আমার প্রার্থনা নয়,
উজিরের অন্ধত্বের অনুতাপে আমিও
একদিন
হয়েছিলাম দগ্ধ।
এখন মৃত্যু তার শিবির থেকে অনেক দূরে,
ছিলো তখন,
আমার থেকে এতো কাছে নয়,
মৃত্যুর পদধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি,
ভয়ঙ্কর সেই দাপাদাপি আমার বুকে
বাজছে।

আমার দুঃখের শায়র শুনে জহ্লাদের করুণা হলো বোধহয় (সে ছিলো আমার আব্বাজানের বিশ্বস্ত ভৃত্য), নিমকহারামী করতে পারে না। আমার পায়ের

কাছে নতজানু হয়ে চিৎকার করে ওঠে সে, 'হুজুর আপনি হুকুম করুন, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি? আপনাদের অনেক নিমক খেয়েছি, বেইমানী আমি করতে পারবো না। আপনাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি. আপনি এ রাজ্য ছেড়ে অন্য কোন রাজ্যে পালিয়ে যান, আর কোনদিন যেন ফিরে না আসেন। তাহলে আপনার সাথে আমারও গর্দান যাবে।'

তখনকার অবস্থায় প্রাণে বাঁচাটা যেন আমার কাছে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, জহ্লাদের ওপর কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠেছিল কানায় কানায় আমি তার হাতে চুমু খেলাম এবং ভাবলাম, আল্লায় দোয়ায় প্রাণে বেঁচে গেছি, এ আমার অনেক সৌভাগ্য, একটা চোখ খোওয়া যাওয়ার চেয়ে মৃত্যুর থেকে অনেক শ্রেয়।

আর বিলম্ব না করে চাচার রাজধানীতে ফিরে গেলাম। তাঁকে সবিস্তারে আব্বাজানের হত্যা-কাহিনী এবং আমার অন্ধত্বপ্রাপ্তির ঘটনা বলতে তিনি খুব দুঃখ পেলেন, চোখের জল সামলাতে পারলেন না। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'বিপদের ওপর আর এক বিপদ। তুমি হয়তো জানো না, এদিকে তোমার ভাইজানের কোন হদিশ নেই অনেকদিন, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জানি না তার ভাগ্যে কি ঘটছে, তার কোন সংবাদ আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি।'

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেলাম না। তবু যথাসাধ্য তাঁর দুঃখের ভাগীদার হতে চাইলাম। আমাকেও তিনি সান্ত্বনা দিলেন আমার আব্বাজানের অসময়ে মৃত্যুর জন্য, আমার একটা চোখ হারানোর জন্য। আমার চোখের ক্ষতস্থানে নিজের হাতে তিনি ওষুধ লাগিয়ে দিলেন। তারপর আমাকে সমবেদনা জানানোর জন্য তিনি বললেন, 'একটা চোখ গিয়ে তুমি প্রাণে বেঁচেছো এটাই যথেষ্ট।'

তাঁর মুখ থেকে অমন ভালো ভালো কথা শুনে ভাইজানের অন্তর্ধান রহস্যের ব্যাপারটা আমি চেপে রাখতে পারলাম না। আমি তাঁকে সে দিনের সন্ধ্যায় ঘটনা সব খুলে বললাম তাঁকে। অতঃপর তাঁর মুখ থেকে বিষাদের ছায়া সরে গিয়ে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো ব্যস্ত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'চলো, আমাকে সেই কবরের সৌধটা দেখাবে চলো।'

'আল্লা আমার গুস্তাফি মাফ করবেন', প্রত্যুত্তরে বললাম, 'কিন্তু চাচা, সেই কবরের সৌধটা তো আমি দেখাতে পারবো না। রাতের অন্ধকারে কাজ সারতে হয়েছিল, তাই জায়গাটা ঠিক খেয়াল করতে পারিনি। আপনার বলার আগে সেদিনের সেই ঘটনার পর আমি অনেকবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু জায়গাটার হদিশ করতে পারিনি।'

যাইহোক, চাচাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা গোরস্থানে গিয়ে হাজির হলাম এবং ডাইনে বাঁয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে খুঁজতে থাকলাম সেই সুড়ঙ্গ পথটা, যতক্ষণ না সেই নির্দিষ্ট সৌধটা আবিষ্কার করি। অবশেষে সেটার হদিশ পেতেই আমরা দুজনে আনন্দিত হয়ে উঠলাম। সৌধের মধ্যে প্রবেশ করে আমরা মাটি খুঁড়তে শুরু করে দিলাম সেদিনের মতো। এক সময় সুড়ঙ্গ পথের সিঁড়িটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আবিষ্কারের আনন্দ উপভোগ করার সময়টা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। আমরা দুজন স্তব্ধ বিস্ময়ে সেই সিঁড়ি পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম, সেখান থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে আসছিল।

একটা অশুভ কিছু চিন্তা করে নিয়ে চাচা ভারাক্রান্ত গলায় বলে উঠলেন, 'খোদা আল্লা তাকে রক্ষা করুন।"

তারপর আমরা সেই সিঁড়ি পথ দিয়ে তরতর করে নামতে শুরু করলাম। অবশেষে আমরা একটা ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলাম। ঘরের চারধারে ফুল ছড়ানো। ঘরের মাঝখানে একটা কামান, তার পাশেই একটা কৌচ। সেদিকে ছুটে যান চাচা কামানটা পরীক্ষা করে দেখার

জন্য। কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি থমকে দাঁড়ালেন তার প্রিয় পুত্র এবং সেই মেয়েটির মৃতদেহ মেঝের ওপর আলিঙ্গনে আবদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। তাদের সারা দেহ পুড়ে গিয়ে গিয়ে কাঠকয়লার ছাই হয়ে গেছে। দেখে মনে হয়, তাদের দেহে কেউ যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল হাত-পা বেঁধে। মুক্তির কোন পথ তারা খুঁজে পায়নি। নৃশংসভাবে খুনের শিকার হয়েছে তারা।

সেই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে চাচার মধ্যে কোন অনুশোচনা হলো না, আশ্চর্য! ঝুঁকে পড়ে ছেলের মুখের ওপর থুতু ছিটিয়ে দিলেন। তারপর স্বগোক্তি করে বললেন, 'আল্লা তোমার উপযুক্ত বিচারই করেছেন। তোমার মতো শয়তান দুশ্চরিত্র লোকের শাস্তি ঠিক এমনি হওয়া উচিত!' ওদিকে শাহরাজাদ দেখলো পূবের আকাশে লালের আভা ফুটে উঠেছে। তাই পরদিন রাতে তার কাহিনীর জের টানার অনুমতি নিয়ে নীরব হলো। বাদশাহ শাহরিয়ার কৌতূহলী হয়ে আগেই শাহরাজাদকে অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন।

পরদিন রাতে বাদশাহ শাহরিয়ার রাজকার্য সমাধা করে তাঁর শয়ন কক্ষে আবার ফিরে এলে পর শাহরাজাদ তার আগের দিনের অসমাপ্ত কাহিনীর জের টেনে বলতে শুরু করলো, 'তাহলে শুনুন জাঁহাপনা, তারপর কি ঘটলো। কালান্দার তখন বড়মেয়েটি, খলিফা এবং জাফরের উদ্দেশে তার জীবনের অবশিষ্ট কাহিনী শোনাচ্ছিল!—

হঠাৎ আমার কাকা তাঁর পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে তাঁর মৃত পুত্রের পোড়া দেহের ওপর জুতো পেটা শুরু করে দিলেন। কাঠকয়লার মতো ভাইজানের মৃতদেহ খসে খসে টুকরো টুকরো হয়ে পড়তে থাকলো। ভাইজানের অমন নৃশংসভাবে মৃত্যু হওয়ার জন্য আমার মন একেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, তার ওপর তার মৃতদেহের সঙ্গে চাচার অমন নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'আল্লা ওর আত্মার সদ্‌গতি করুন। চাচা, আপনি একটু শান্ত হোন। আপনি কি বুঝতে পারছেন না, ভাইজানের মৃত্যুকে আমি কতো শোকাতুর? আমার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠছে, ভাইজানকে আর আমি কোন দিন জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবো না, কথাটা যখনই মনে হচ্ছে, তখনি আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। অথচ এই সময় আপনি তার পোড়া দেহের ওপর এমন নিষ্ঠুর ভাবে অত্যাচার চালাচ্ছেন? কি আছে ওর দেহে এখন? পোড়া কাঠকয়লা ছাড়া আর কিছু তো নয়! ও এমন কি অপরাধ করেছে যে, মৃত্যুর পরেও তাকে আপনার জুতোর আঘাত সহ্য করতে হবে?'

'ওকি অপরাধ করেছে শুনবে তাহলে?' রাগে উত্তেজনায় চাচা এবার চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'অল্প বয়স থেকেই আমার ঐ অপদার্থ পুত্র তার নিজের বোনের প্রেমে পড়ে যায়। প্রথম প্রথম আমি আমার মেয়ের কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখতাম, নিজের মনে বলতাম, ছেলেমানুষ ওরা, কি করতে কি করছে, সে বোঝার বয়স ওদের নয়, যাইহোক, যৌবন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ওদের পাপ-বোধটা ক্রমশই যেন বাড়তে থাকে। আমি তোমার ভাইজানকে ভালো কথায় কতো বুঝিয়েছি, এ অন্যায়, এ পাপ, তবু সে আমার কথা শোনেনি। তখন আমি তাকে ধমক দিয়েছি, ভয় দেখিয়েছি, তাকে আমি কিছুদিনের জন্য নির্বাসনে পাঠিয়েছি, তবু সে তার স্বভাব বদলাবার কোন রকম চেষ্টা করেনি। ভাইবোনের সেই অবৈধ প্রেম নিয়ে আমার প্রজা এবং ভৃত্যদের মধ্যে কানাঘুষো হতে শুনেছি, তখন শরমে আমার মাথা কেটে গেছে। আমার তখন দারুণ চিন্তা, তাদের সেই খোস গল্পের কথা বিদেশে রটে গেলে তখন তাদের কাছে আমার

মুখ দেখাবার আর উপায় থাকবে না। শেষে নিরুপায় হয়ে ঐ শয়তান পুত্রের সঙ্গে আমার মেয়ের মেলামেশা বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। মেয়েকে অন্দরমহলে নজরবন্দী করে রাখি। কিন্তু—

এখানে একটু থেমে চাচা আবার বলতে শুরু করেন, 'কিন্তু আমার মেয়েও কম অপরাধী নয়। ভায়ের মতোই সে উশৃঙ্খল জীবন যাপন করতে চেয়েছিল। ভায়ের জন্য পাগল সে। ভায়ের সঙ্গে অবৈধ জীবনযাপন করতে সেও তাকে কম মদত দিতো না। একটু চোখের আড়াল হলেই তারা দুজনে গোপনে নির্জনে [illegible] মিলিত হতো কাকপক্ষীতে কেউ জানতে পারতো না। কিন্তু সেটা ছিলো তাদের কাছে খুব বেশি ঝুঁকির ব্যাপার। তারপর আমার ছেলে যখন দেখলো, আমি তাদের আলাদা করে দেওয়ার চেষ্টা করছি, তখন তাদের মিলনের আর কোন উপায় দেখতে না পেয়ে আমার ছেলে তখন এই বিলাসবহুল প্রাসাদ তৈরী করার ব্যবস্থা করে অত্যন্ত গোপনে। আমি শিকারে গেলেই ওরা দুজন তখন এখানে এসে গা ঢাকা দিতো স্ফূর্তি করার জন্য, প্রেমের বন্যায় নিজেদের ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি তাকে কতো বুঝিয়েছি, এ সব ব্যভিচার, ভোগবিলাস বন্ধ না করলে, আল্লা তাকে ক্ষমা করবেন না। পরে একদিন দোজকের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে তাকে।

কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। ব্যভিচার যুগে যুগে, সেই ধারা অব্যাহত রেখে এগিয়ে যায় সে কদম কদম। তবে খোদা আল্লার কৃপায় আজ তার সব নোংরামী, সব ব্যাভিচার স্তব্ধ। আর ছেলেটার মতো মেয়েটাও বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছিল। তবে এ সবই শয়তানের খেলা! সে খেলা আজ বন্ধ, চিরদিনের জন্য।

এই পর্যন্ত বলে চাচা এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। আমিও তাঁর সঙ্গে কান্নায় যোগ দিলাম। তাঁর কান্নার মধ্যে পুত্রশোকের একটা প্রচ্ছন্ন ছায়া পড়েছিল। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'এখন থেকে তুমিই আমার ছেলে, আমার ছেলের মতো হয়ে থাকবে, আমার প্রাসাদে।'

আমার চোখ দিয়ে আবার অশ্রু ঝরে পড়লো, তবে সে অশ্রু দুঃখের নয়, আনন্দাশ্রু। আব্বাজানের উজির তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে খতম করলো, তারপর সে আমার একটা চোখ নষ্ট করে ক্ষান্ত হলো না, আমাকে খোতল করতে চাইলো। যাইহোক, জল্লাদের দয়ায় আমি প্রাণে বেঁচে যাই এ যাত্রায়। এরপর [illegible] এসে দেখলাম আমার চাচেরা ভাইজান মৃত। চাচা আমাকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে চাইছেন। এ কম সৌভাগ্যের কথা?

তারপর ওপারে উঠে [illegible] সিঁড়িপথ ঠিক আগের মতো বন্ধ করে দিলাম। [illegible] এখন বোঝাই যায় না যে, জায়গাটা খানিক আগে খোঁড়া হয়েছিল! সেখান থেকে ফিরে এলাম প্রাসাদে। কিন্তু সবে মাত্র একটু বসেছি সামান্য বিশ্রাম নেওয়ার জন্য অমনি যুদ্ধের দামামা [illegible] শব্দ শোনা গেলো। খবর এলো, বিদেশী এক সৈন্য আমাদের রাজ্য আক্রমণ করেছে। [illegible] আমার চাচার সৈন্য-সামন্তরা তখন অপ্রস্তুত [illegible] শত্রুপক্ষের আক্রমণে বাধা দিতে [illegible] শেষের দিকে আমাদের সৈন্যরা নাজেহাল হয়ে শেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পড়লো। কিন্তু আমরা তখনো বুঝতে পারছিলাম না, কোন দেশ আমাদের রাজ্য আক্রমণ করলো? খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, আমার আব্বাজানকে হত্যা করে যে উজির তার রাজ্যের বাদশাহ হয়ে সিংহাসন দখল করেছিলো, যে আমার একটা চোখ নষ্ট করে দিয়েছিল, সেই উজিরই চাচার রাজ্য আক্রমণ করেছে এখন।

খবরটা শোনামাত্র বিচলিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু আমার হাত-পা বাঁধা, কিছুই করার নেই। আমি নিজে অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারি। কিন্তু

আমার আব্বাজানের সৈন্যরা আমাকে বেশ ভালো-ভাবেই চেনে। অতএব তাদের কাছে আমি ধরা পড়ে যাবো। আমি এখনো বেঁচে আছি জানতে পারলে তারা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে খতম করে ফেলবে।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। আমার চেহারার পরিবর্তন করতে হবে। কাজটা খুবই সহজ, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। খুর দিয়ে আমি আমার নিজের চুল দাড়ি কামিয়ে ফেললাম। তারপর এখন আমার গায়ে এই যে ছেঁড়া কম্বলটা দেখছেন, এটা তখন গায়ে চাপিয়ে, হাতে একটা ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে চুপি চুপি প্রাসাদের পিছন-দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম নিঃশব্দে। পথ দুর্গম, হাতে অর্থ নাই বললেই চলে। তবু প্রাণের ভয়ে সেই বিপজ্জনক পথ দিয়ে হেঁটে অবশেষে আপনাদের এই বাগদাদ শহরে এসে পৌঁছেছি। আমার কাছে খবর ছিলো, এখানকার সুলতান আল্লার পয়গম্বর খলিফা হারুন অল রসিদ খুবই দরদী মানুষ। গরীব মানুষের আর্জি তিনি খুব সহানুভূতির সঙ্গে শুনে থাকেন। তাই আমি এই শহরে এসেছি তার কাছে আমার আর্জি পেশ করার জন্য। আমার এই দুঃখের কাহিনী শুনে তিনি কি আর আমাকে দয়া করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন, এই বিশ্বাস নিয়েই একটানা দীর্ঘ পথ হেঁটে এখানে এসেছি। এই শহরের রাস্তা-ঘাট কিছুই আমার জানা ছিলো না। জানা ছিলো না কোথায় আশ্রয় পাবো আজকের রাতটা। চিন্তিত মন নিয়ে রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করছিলাম। তখন সন্ধ্যা, আঁধার নামছে শহরে একটু একটু করে। ঠিক সেই সময় ঐ কালান্দার আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। জানা গেলো সে-ও এই শহরে নবাগত বিদেশী। তারপর উনার সঙ্গে আলোচনা করছিলেন, রাত্রি যাপন করার জন্য একটা বাসস্থানের সন্ধান কি করে করা যায়। কথাবার্তায় জানলাম উনিও বিদেশী, আস্তানার খোঁজে ঘুরছেন এই শহরে। তাই আমরা তিনজনে একসঙ্গে আপনাদের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালাম, আপনারা দরজা খুলে দিয়ে আমাদের আশ্রয় দিলেন। এই হলো আমার দাড়ি-গোঁফ কামানোর কাহিনী, আর আমার একটা চোখ খোয়া যাওয়ার দুঃখের কাহিনী।

তখন কালান্দারের এমন করুণ কাহিনী শুনে জোবায়দা তাকে কাছে ডেকে খানিকটা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হায় আল্লা, কালান্দার তোমার কপালে এত দুঃখ ঘটেছে, তা আমি কোনদিন চোখে দেখিনি, বা এমন নিষ্ঠুর কাহিনী কখনো শুনিনি।'

[illegible] দিকে তাকিয়ে তাকে শুধোলেন, 'তোমার কোন চিন্তা নেই, তুমি মুক্ত। আমি তোমার কাহিনী শুনে সন্তুষ্ট। তুমি নির্ভয়ে এখন যেখানে খুশি ফিরে যেতে পারো।'

কিন্তু উত্তরে সে বললো, 'বাকী দুজন কালান্দারের জীবনের কাহিনী না শোনা পর্যন্ত আমি এখান থেকে এক পাও নড়ছি না।'

তারপর দ্বিতীয় কালান্দার এগিয়ে এলো, জমিনের ওপর চুমু খেয়ে তার জীবনের কাহিনী শোনাতে শুরু করলো।

দ্বিতীয় কালান্দারের কাহিনী

জানেন মালকিন আমি জন্মান্ধ নই। আমার জীবনের এক বিচিত্র কাহিনী শোনাচ্ছি আপনাদের। ফকিরের বেশ ধারণ করে আছি বলে আমাকে যেন গরীব ভাববেন না আপনারা। জানেন, আমি

বাদশাহ, বাদশাহের পুত্র। ছেলেবেলা থেকেই আমি শাহাজাদার মতো মানুষ হয়ে এসেছি। আমার আব্বাজান ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ, ঐশ্বর্যে, মর্যাদায় ছিলেন অতুলনীয়, সেই সঙ্গে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে তাঁর সমকক্ষ তখন কেউ ছিলো কিনা সন্দেহ। তাঁর নিজের মতো করে আমাকেও তিনি লেখা-পড়া শেখান। অল্প দিনের মধ্যেই আমার অগাধ



পাণ্ডিত্যের কথা ছড়িয়ে পড়লো স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র। দেশ বিদেশের বাদশাহ, সুলতানরা আদর করে আমাকে আহ্বান করে নিয়ে যেতেন তাঁদের দেশে আমার পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য। রীতিমতো আমার পাণ্ডিত্যের সমাদর হতো তাঁদের কাছে। নিজের ঢাক ঢোল নিজেই পেটাচ্ছি বলে দোষ নেবেন না যেন। আমার সম্বন্ধে তৃতীয় কোন ব্যক্তি এখানে নেই বলেই নিজের কথা নিজেকেই বলতে হচ্ছে

একবার হলো কি হিন্দের এক বাদশাহ আমার পাণ্ডিত্যের খবর পেয়ে আমার আব্বাজানের কাছে খবর পাঠালেন, তিনি আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চান, আমি তাঁর রাজ্যে যাই যত শীগ্‌গীর সম্ভব। অতঃপর আব্বাজান আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। ছ'টা জাহাজ ভাড়া নেওয়া হলো বাদশাহকে উপহার দেওয়ার সামগ্রী তাঁর রাজ্যে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমার সঙ্গী হলো আবার আব্বাজানের অতি বিশ্বস্ত সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর।

দীর্ঘ একমাস সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার পর আমাদের জাহাজগুলো নোংড় করলো সেই বাদশাহের রাজ্যে। অনেকগুলো ঘোড়া এবং উট আমাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। তাদের পিঠে শাহাজাদার জন্য আনা উপহার সামগ্রীগুলো চাপিয়ে আমরা বাদশাহের রাজধানীর দিকে এগিয়ে চললাম অতঃপর। কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতেই ধুলি-ঝড় উঠলো সারা আকাশ কালো করে। অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেলো চারিদিক ঝড়ের দাপটে। আমরা ছিটকে পড়লাম বিক্ষিপ্তভাবে, একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কোন উপায় আর তখন নেই। তারপর এক সময় ঝড় থামলো, আঁধার গেলো কেটে। ভালো করে চোখ মেলে তাকাতেই দেখলাম, এক নির্জন মরু-প্রান্তে জনা পঞ্চাশ লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল আমাদের ঘিরে ফেলেছে। তখন আমরা দলে মাত্র চারজন, অবশিষ্ট সঙ্গে ছিলো দশটি উটের পিঠে বোঝাই করা বিভিন্ন ধরণের মনোহারী উপহার-সামগ্রী, যেগুলোর লোভে ডাকাতদল আমাদের আক্রমণ করতে উদ্যত।

হাত নেড়ে আমরা তাদের ইঙ্গিত করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, আমরা শান্তির দূত। তাতে কোন ফল না হতে তারপর আমরা চিৎকার করে বললাম, 'আমি তোমাদের বাদশাহের আহ্বানে এদেশে অতিথি হয়ে এসেছি অতএব দয়া করে তোমরা আমাদের অনিষ্ট করো না।'

কিন্তু তারা আমাদের অনুরোধের বিরোধিতা করে উত্তর দিলো, 'আমরা তাঁর রাজ্যের অধিবাসী নই, কিংবা তাঁর প্রজাও নই, তাই তোমাদের অনুরোধ রাখতে আমরা বাধ্য নই।'

এরপর তারা তাদের স্বরূপ প্রকাশ করতে তৎপর হয়ে উঠলো, লুঠের কাজে নেমে পড়লো। প্রথমেই তারা আমার কয়েকজন ক্রীতদাসকে কোতল করে ফেললো, প্রাণের ভয়ে অন্যেরা পালিয়ে বাঁচলো। আহত হয়ে আমিও রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলাম

সব কিছু ফেলে রেখে দিয়ে। সেই সুযোগে আরব দস্যুরা আমাদের টাকা পয়সা, দামী উপহার সামগ্রী লুঠ করে পালিয়ে যায়। আমি তখন কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি, সে খেয়াল নেই। ছুটতে ছুটতে এক সময় একটা পাহাড়ের ওপর গিয়ে হাজির হলাম। রাতটা সেই পাহাড়ের একটা গুহায় কাটাতে হলো।

তারপর ভোরের আলো ফুটে উঠতেই আবার আমার যাত্রা হল শুরু। তখন শীত ফুরিয়ে আসছে, দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু করেছে। বসন্তের ফুলে ফুলে সাজানো শহর। নৃত্যরত নর্তকীর মতো ঝরনার জল কলকল শব্দে শহরের প্রান্তরেখা ছুঁয়ে বয়ে চলেছে। পাখীরা মিষ্টি সুরে গান গাইছে আপন খেয়ালে। প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে তার সমস্ত শোভা উজার করে দিয়েছে সেখানে। সেখানে কোন ভয় নেই, নির্ভয়ে পথ চলা যায়। কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়ঃ—

এখানে ভয় নেই, এখানে সবার মুখে
মুক্তির গান,
সে গানের ভাষা বড় মর্মস্পর্শী,
আমাকে মহব্বত দাও, আমি তোমাকে
সুখ দেবো।
সুখের কথা বলতে মানা,
দুঃখ সেখানে অজানা, চির অচেনা
রূপসী শহরে—
বেহস্তের প্রতিচ্ছবি দেখি ভুল করে।



অমন সুন্দর ছবির মতো শহরে আসতে পেরে খুব খুশি হলাম। খোশ মেজাজে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি, একজন দর্জিকে তার দোকানে বসে থাকতে দেখে তাকে সেলাম জানালাম। সে আমাকে প্রতি সেলাম জানিয়ে খাতির করে আমাকে তার দোকানে বসতে দিলো, জানতে চাইলো তাদের দেশে আমার আগমনের হেতুটা কি! আমি তাকে তাদের দেশের বন্দরে নামার পর থেকে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলে গেলাম। সব শোনার পর তার মুখে এক অজানা ভয়ের ছায়া পড়তে দেখলাম।

'শোনো বাছা', ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর তার, 'এ কথা অন্য কাউকে আর বলো না। এ দেশের বাদশাহ তোমার আব্বাজানের সব থেকে বড় শত্রু। তাই আমার চিন্তা এখানে তোমার পরিচয় জানাজানি হয়ে গেলে তোমার প্রাণের আশঙ্কা আছে! এখন বুঝছি, এ দেশের বাদশাহ কেন তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। উদ্দেশ্য অসৎ। প্রসঙ্গ তোমাকে হত্যা করা। তোমাকে নিয়ে এখন কি যে করি!

দারুণ চিন্তায় পড়লো সে। তারই মধ্যে সে আমাকে যত্ন করে মাংস ভাত খাওয়ালো, সরবৎ দিলো। তার দোকানে আমাকে থাকতে দিলো। অনেক রাত পর্যন্ত আমার চিন্তায় উদ্বেগ প্রকাশ করলো সে। এই ভাবে তিনদিন আমি তার সঙ্গে কাটালাম। চতুর্থ দিনে সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'বাছা, এমন কোন বিদ্যা তোমার জানা নেই যা ভাঙ্গিয়ে তুমি রুজি-রোজগার করতে পারো?'

'আইনের ব্যাপারে আমি বিশেষজ্ঞ', প্রত্যুত্তরে বললাম, 'লোকে আমাকে হাকিম বলে। তাছাড়া বিজ্ঞান ও সাহিত্যে আমার যথেষ্ট চর্চা আছে। হিসাবশাস্ত্রও খুব ভালো জানি।'

'ও সব বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে এ দেশে রোজগার হয়না, এখানে ও সবের কোন কদর নেই বাছা', দুঃখ করে সে বলে, 'দেখছি জীবিকা নির্বাহের কোন পথই তোমার জানা নেই।'

'আমি যা জানি তা তো তোমাকে বললাম।

আমি কিছুই গোপন করিনি। সত্যি কথার কোন দাম নেই ?'

'কেন থাকবে না বাছা ?' দর্জি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, 'কোন চিন্তা নেই আল্লা আছেন আমাদের ওপরে তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।' এই বলে সে একটা কুঠার এবং দড়ি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'বনে চলে যাও। বন থেকে কাঠ কেটে এনে এখানকার বাজারে বিক্রী করবে, দেখবে তাতেই তোমার রোজকার খরচা উঠে আসেন। আল্লা তোমায় রক্ষা করুন।

তার উপদেশ মত আমি তখুনি বনে চলে গেলাম। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে সন্ধ্যায় জ্বালানী কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রী করলাম, যার মূল্য হলো আধ দিনার। এই ভাবে প্রতিদিনের রোজগারে কিছু অংশ খরচ করতাম নিজের জন্য, বাকাটা জমাতাম। এই ভাবে একটা বছর কাটার পর একদিন আমি আমার কাঠ কাটার সঙ্গীদের ছেড়ে গভীর জঙ্গলের ভেতরে চলে গেলাম। একটা ঢালু জায়গায় মরা গাছ বেছে নিয়ে কাটতে শুরু করলাম। গাছের গুঁড়ি কাটতে গিয়ে মাটির অনেক নিচ পর্যন্ত খুঁড়তে হলো। এক সময় হঠাৎ কুঠারের মুখে একটা তামার বালা উঠে এলো। অবাক হলাম। আরো খানিকটা মাটি কাটতেই দেখি একটা কাঠের পাটাতন। কাঠের পাটাতনটা সরাতেই চোখে পড়লো একটা সিঁড়ি, সিঁড়িটা দিয়ে নিচে নেমে গিয়ে সুন্দর মনোরম প্রাসাদ দেখতে পেলাম। সুন্দর সাজানো-গোছানো একটা ঘরে প্রবেশ করতেই আর এক প্রস্থ অবাক হতে হলো, পালঙ্কের ওপর এক সুন্দরী যুবতীকে আলিস্যে শুয়ে থাকতে দেখে, আমার চোখের সামনে যেন একটা বেহেস্তের পরীকে দেখতে পাচ্ছি। রূপ যেন তার সঙ্গে ফেটে পড়ছে। মুক্তোর মত সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠলো মেয়েটি যখন কথা বললো। পুরুষ্টু স্তন, সরু কোটিদেশ।

ভয়ে ভয়ে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি মানুষ, নাকি দৈত্য ?



উত্তরে আমি বললাম, 'আমি মানুষ।'

আশ্বস্ত হয়ে মেয়েটি বলে, 'আজ প্রায় পঁচিশটা বছর আমি এখানে বন্দিনী হয়ে আসার পর কোন মানুষের মুখ দেখতে পাইনি, তা তুমি এলে কি করে এখানে?'

'হে সুন্দরী, তোমার রূপের আকর্ষণেই বোধহয় আমার সব দুঃখ কষ্টের লাঘব হয়ে গেলো। এ আমার পরম সৌভাগ্যও বলতে পারি।'

তারপর আমি তাকে এ দেশে আসার পর থেকে আমার দুর্ভাগ্যের কথা আগাগোড়া বলে গেলাম। চোখের জল ফেলে আমাকে সমবেদনা জানালো সে।

কান্না জড়ানো স্বরে মেয়েটি বললো, 'এবার দুঃখের কাহিনী তোমায় বলি শোনো। আমি আবলুস দ্বীপের বাদশাহ ইফতিমাসের কন্যা। চাচার ছেলের সঙ্গে আমার শাদী হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু আমার শাদীর দিন আফ্রিদি দৈত্য ইবলিসের মাসতুতো ভাই জারজিস বিন রাজমুস আমাকে শাদীর উৎসব থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পাখীর মতো উড়ে এসে এই পাতাল-প্রাসাদে আমাকে লুকিয়ে রাখে। তবে আমার কোন অভাব সে রাখেনি। দামী অলঙ্কার, পোষাক, আসবাবপত্র থেকে শুরু করে ভালো ভালো খাবারে ভরিয়ে রেখেছে সে এই পাতালপুরী। দশদিন পর সে আমার কাছে আসে। একদিন এক রাতের আমার কাছে থাকার জন্য এলে। রাত্রে সে আমাকে উপভোগ করে। অস্বীকার করবো না, তাকে আমার পছন্দ না হলে হবে কি, তাকে দিল দিতে না পারলেও, সে আমাকে খুব দৈহিক সুখ দিতো, হাজার হোক দৈত্যের শরীর তো?'

অর্থপূর্ণ হাসি হেসে মেয়েটি বলে, 'আমার পরিবারের অনুমতি না নিয়েই সে আমাকে এখানে নিয়ে আসে। রাতে কিংবা দিনে যখনই কোন প্রয়োজন হলে দেওয়ালে ঐ যে চোরা-কুটুরি দেখতে পাচ্ছো, ওটার মধ্যে কতকগুলো সাংকেতিক চিহ্ন খোদাই করা আছে, তার ওপর হাত বোলালেই সে এসে হাজির হবে এই পাতালপুরীতে। আজ থেকে চারদিন আগে সে এখানে শেষ এসেছিল, এখনো ছ'দিন বাকী আছে তার এখানে ফিরে আসতে। কথা দাও, একদিন তুমি আমাকে সঙ্গ দিয়ে সুখ দেবে, তার ফেরার দিন তুমি এখান থেকে চলে যাবে, কেমন?'

'ঠিক আছে তাই হবে', আমি বললাম, 'জারজিস ফিরে গেলে আবার আমি তোমায় কাছে ফিরে আসবো, বুঝলে হে সুন্দরী?'

আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়ে সে এবার উঠে দাঁড়ায়। তারপর সে আমার হাত ধরে হামামে নিয়ে যায়। প্রশস্ত স্নানের ঘর এবং সুন্দর করে সাজানো। আমরা যে যার দেহ পোষাকমুক্ত করলাম। আমরা দুজনে এক সঙ্গে স্নান করলাম। সে আমার নগ্ন দেহের ওপর হাত বুলিয়ে তেল মাখিয়ে দিলো। তারপর আমরা দুজনে একসঙ্গে গা ভাসিয়ে দিলাম, যতক্ষণ না আমাদের তপ্ত দেহ শীতল হয়।

ঘরে ফিরে এসে ডিভানের ওপর আমার পাশে এসে বসলো মেয়েটি। খুব যত্ন করে খাওয়ালো সে আমাকে। নিজের হাতে আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে সে বললো, 'তুমি খুব ক্লান্ত, একটু ঘুমিয়ে নাও, পরে গল্প করা যাবে।'

মেয়েটিকে সুক্রিয়া জানিয়ে ডিভানের ওপর দেহটা এলিয়ে দিলাম, একটু পরেই গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম। এখানে আসার পর থেকে ঘটে যাওয়ার অপ্রিয় ঘটনাগুলো ভুলে গেলাম।

ঘুম ভাঙ্গতেই দেখলাম, মেয়েটি আমার পায়ে তেল মালিশ করছে। তাকে আমার সুক্রিয়া জানিয়ে তার শুভ কামনা করলাম।

আলোচনা প্রসঙ্গে সে বললো, 'দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমি একা এখানে এই পাতালপুরীতে কাটাচ্ছি। বস্তুত সুক্রিয়া আল্লাকে, তিনি আমার দুঃখের কথা জানতে পেরে বোধহয় তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে

সুখ-দুঃখের দুটো কথা বলার জন্য। খোদা আল্লা, তোমার দেয়া অপরিসীম? আমি ধন্য। খুশির ছোওয়া তার কথায়. 'সরাব খাবে? কি সরাব তোমার পছন্দ?'

'তোমার পছন্দই আমার পছন্দ।'

তারপর সে উঠে গিয়ে সরাবদান থেকে একটা পুরনো মদের বোতলের ছিপি খুলতে গিয়ে গুণগুনিয়ে গান গেয়ে উঠলো :—

যদি জানতেম তুমি আসবে,
ছড়িয়ে দিতেম তোমার আসার পথে
আমার মহব্বতের খুসবু চোখে পানি
মিশায়ে,
যদি জানতেম মিলন হবে তোমার সাথে
বিছায়ে রাখতেম আমার এলো কেশ,
তোমার পায়ে লাগতো না ধুলায় পরশ,
আমার দুখের নিশি হলো শেষ।

তার অমন মিষ্টি গান শুনে আমার মনে সমস্ত গ্লানি যেন ধুয়ে মুছে গেলো, নতুন করে আমি যেন আমার [illegible] শিখলাম, আমার হৃদয় কানায় কানায় ভরে গেলো আনন্দ সুখে। অজস্র [illegible] তাকে। রাত গভীর না হওয়া পর্যন্ত আমরা গল্পগুজব করে কাটালাম। তারপর তার সাথে রাত কাটালাম সহবাসে, প্রতিটি মুহূর্ত রমণীয় করে তুললো সে আমায়, রমণ সুখ আমাকে উপঢৌকন দিয়ে। আমার জীবনে অমন মধুময় রাত্রি [illegible] এর আগে কখনো আসেনি। সে রাত যেন এক ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন সুখের স্বাক্ষর বহন করছিল।

মেয়েটিকে তখন আমার খুব ভালো লেগে গেছে। ও আমার মন প্রাণ ভরিয়ে দিয়েছে। আমার চোখে তখন ভালোবাসার নেশা, ওকে ছাড়া তখন আমার মনে অন্য কোন চিন্তা কাজ করছিল না। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, ওকে ছাড়া আমার মুহূর্তও চলতে পারে না। ওকে বললাম, 'তোমাকে এই পাষাণপুরীতে একা রেখে যাবো না। আমার অনুপস্থিতিতে ঐ আফ্রিদি দৈত্যটা তোমার ফুলের মতো এমন নরম শরীরটা ছিঁড়ে খাবে,—এ আমি সহ্যই করতে পারবো না।'

'এতো অধৈর্য হচ্ছো কেন তুমি?' মেয়েটি আমাকে বোঝায়, 'আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না, আর ঐ দৈত্যটাও বারোমাস আমাকে তোমার কাছ থেকে আড়াল করে রাখছে না। দশদিন অন্তর একদিন মাত্র আমার কাছ থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকছো। আর বাকী ন'টা দিন তো তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে পাচ্ছো। তখন তুমি আমাকে তোমার খুশি মতো উপভোগ করতে পারো। এখন আমি তোমাকে বাধা দেওয়া দূরে থাক বরং তোমাকে সাহায্য করবো।'

'না না আর একটা দিনও আমি ঐ দৈত্যটাকে ভোগ করতে দেবো না তোমাকে। তুমি, তুমি শুধু আমার। আমি এখনি ঐ শয়তানটার লেখা মুছে দিচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে সে এসে পড়বে। তখন তাকে সামনা-সামনি পেয়ে তোমাকে উপভোগ করার স্বাদ আমি ঘুচিয়ে দেবো। দৈত্যদের হত্যা করা আমাদের অভ্যাস।'

'আল্লার কসম, অমন সর্বনাশের কাজটা তুমি করো না।' মেয়েটি গানের মাধ্যমে তাকে বোঝায় :--

আমার প্রেমে বিভোর তুমি জানি,
তাই বলে অন্ধ হয়ে মুছো না
দেওয়াল লিখন,
দেখবে তখন আমি থাকবো না,
হারায়ে আমায় খুঁজবে,
আমার ছবি তখন তোমার মনে স্মৃতি
হয়ে থাকবে।

তার গান আমার কানে এলো, কিন্তু গ্রাহ্যের মধ্যে আনলাম না। তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠে গিয়ে পায়ে পায়ে দেওয়ালের গায়ে সেই চোর

কুঠরির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মুছে দিলাম সেই সাংকেতিক লেখাগুলো, আর তারপর —'

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো, প্রভাত সমাগত, চুপ করে গেলো সে।

পরদিন রাত্রি আবার সমাগম দেখে বাদশাহ শাহারিয়ারকে উদ্দেশ করে শাহরাজাদ বললো, 'তারপর কি হলো জাঁহাপনা শুনুন তাহলে। সেই বাড়ীর কর্ত্রী বড়ো [illegible] ক্ষতি। [illegible] তার জীবনের কক্ষ। [illegible] করলো:

সেই চোর-কুঠরির ভিতরে লিখনগুলো মুছে দিতেই মেয়েটি ডুকরে কেঁদে উঠলো, 'একি সর্বনাশ করলে তুমি আমার!'

একটি [illegible] যায়, সেই [illegible] —

'ঐ বোধহয় দৈত্যটা এলো!' মেয়েটি ভয়ে আঁতকে উঠে [illegible] করে বলে উঠলো, 'এরপর আমার বাঁচার আর কোন উপায় আর রইলো না। কিন্তু তুমি এখান থেকে পালাও, যে পথ দিয়ে এসেছিলে, এখনি সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে যাও লক্ষ্মীটি।' মেয়েটি কাতর মিনতি জানায়, 'দৈত্যটা তোমাকে আমার সঙ্গে দেখতে পেলে তোমাকে প্রাণ নিয়ে এখান থেকে ফিরে যেতে দেবে না। তুমি পালাও।'

আমার তখন সরাবের নেশা ছুটে গেছে, ছুটে গেছে প্রেমের নেশা। অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা সিঁড়ি-পথের দিকে ছুটলাম। সিঁড়ির দুটো ধাপ উঠতেই খেয়াল হলো, আমার চটি জোড়া এবং কুঠারটা ফেলে এসেছি। কথাটা মনে হতেই আবার দ্রুত পায়ে মেয়েটির ঘরে ফিরে গেলাম। আর এই ফিরে যাওয়াটাই হলো আমার সর্বনাশের মূল কারণ। সারা পাতালপুরী কাঁপিয়ে আফ্রিদি দৈত্যটা তখন এসে হাজির সেখানে। ভয়ঙ্কর বিভৎস চেহারা। বিকট চিৎকার করে মেয়েটিকে সে জিজ্ঞেস করে, 'কি এমন ঝামেলা হয়েছে যে, এভাবে আমাকে বিরক্ত করলে? আমি [illegible], না জানি হঠাৎ কোন বিপদ ঘটলো বুঝি। কি ব্যাপার?'

'না, না-আমি বরকে [illegible] ডাকিনি।' প্রত্যুত্তরে মেয়েটি বললো, 'তোমাকে [illegible] দেখতে না পেয়ে দিল ভারি খারাপ [illegible], তাই ব্যথাটা ভোলার জন্য একটু সরাব [illegible] একঘেয়েমি [illegible] জন্য। [illegible] হামামে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়া[illegible] সরাবের নেশা তখন মাথায় চড়ে [illegible], টাল সামলাতে না পেরে [illegible] আছড়ে পড়ি।'

দৈত্যটা তার কথা বিশ্বাস [illegible] চারদিকে না চোখ [illegible] দেখলো। হঠাৎ আমার চটি জোড়া [illegible] তার চোখে পড়তেই [illegible] মতো [illegible] গুলো কার? [illegible] গুলো যার, তার সঙ্গে [illegible] তুই স্ফূর্তি করছিলি না?'

'বিশ্বাস করো, এর আগে ওগুলো আমার চোখেই পড়েনি', মেয়েটি [illegible] মুখ করে বলে, 'আমার মনে হয়, তোমার পোষাকের সঙ্গে ওগুলো এসে গেছে।'

'অসম্ভব! এ হতে পারে না। তুই একটা মিথ্যুক! তুই একটা বেশ্যা!'

তারপর সেই আফ্রিদি দৈত্যটা মেয়েটিকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে মাটির ওপর শোয়ালো। হাত দুটো তার ক্রুশ করে গেঁথে দিলো মাটির সঙ্গে, যাতে শত অত্যাচারেও সে নড়তে না পারে। তারপর তার মুখ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য চললো নির্মম অত্যাচার, যা চোখে দেখা যায় না, কানে শুনলেও ব্যথায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়। তাই আমি তখন আড়াল থেকে ঘরে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম। সেই অভিশপ্ত পাতালপুরীর প্রবেশ পথে

ঢাকনা লাগিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দিলাম। ওপরে উঠে এসে আমার মন অনুশোচনায় ভরে উঠলো। ছিঃ ছিঃ। এ আমি কি করলাম? আমার দোষে একটা ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়ের জীবন শেষ হতে চলেছে এখন। এতোদিন সে তবু প্রাণে বেঁচে ছিল। দৈত্যটা দশদিন অন্তর তার উপর দৈহিক অত্যাচার করলেও তাকে প্রাণে শেষ করে দেয়নি। এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর তো বন্দী দশা। আর আজ? আজ সে আমারি দোষে প্রাণ হারাতে চলেছে। এ ছাড়া, এ পাপ আমার সহ্য হবে কি করে। আল্লা, তুমি আমাকে শাস্তি দাও।'

আব্বাজান ও তার শাসিত রাজ্যের কথা আমার মনে পড়লো। আমি একজন শাহজাদা হয়ে আজ এখানে কাঠুরের কাজ করে জীবন যাপন করছি। জীবনের কি বিচিত্র পরিহাস। তবু এই সামান্য সুখটুকু বুঝি আমার কপালে সহ্য হবে না। আফ্রিদি দৈত্যটা আমাকে নিশ্চয়ই খুঁজবে এরপর গরু খোঁজার মতো। নতুন এক বিপদের কথা মনে হতেই আমার চোখে জল ভর্তি হয়ে গেলো। আমার সব দুঃখ যন্ত্রণা গান হয়ে ঝরে পড়লো আমার কণ্ঠ থেকে :—

আমার ভাগ্যের চাকা। কবে ঘুরবে,
রাত্রি শেষে দিন আসে,



আমার দুঃখ হবে অবসান,
আমি গাইবো আবার জয়গান।

আমার বন্ধুর বাড়িতে ফিরে এসে দেখি, বন্ধু দর্জি চিন্তিত হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখেই সে বলে উঠলো, 'কাল সারা রাত তোমার দুশ্চিন্তায় চোখের পাতা দুটো এক করতে পারিনি। ভয় হচ্ছিল কোন জন্তু জানোয়ারের খপ্পরে তুমি পড়লে না তো! আল্লার দোয়ায় তুমি যে সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছো তাতেই আমার সব দুশ্চিন্তা চলে গেছে।'

দর্জির এমন বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাবের পরিচয়ে খুশি হয়ে তাকে সুক্রিয়া জানিয়ে আমি ঘরের এক কোণায় গিয়ে বসে নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা ভাবতে লাগলাম। মাথায় তখন কি যে ভূত চাপলো, চোর-কুঠুরিতে কেন যে হাত দিতে গেলাম। এই সব কথা যখন ভাবছিলাম, আমার দর্জি বন্ধু তখন আমার সামনে এসে বলে, 'একজন পার্শি বৃদ্ধ ভদ্রলোক তোমার খোঁজ করছেন। তার হাতে তোমার কুঠার এবং চটিজোড়া দেখলাম। ভদ্রলোক বললেন, তিনি নাকি আজ সকালে জঙ্গলে গিয়েছিলেন, সেখানে এগুলো পড়ে থাকতে দেখেন। তারপর তিনি এখানকার কাঠুরিয়াদের আড্ডাখানায় যান। তাঁরা তোমার কুঠার ও চটিজোড়া চিনতে পেরে তাকে তোমার এখানকার ঠিকানা দেয়।'

পার্শি ভদ্রলোকের এখানে আসার উদ্দেশ্যটা জানা মাত্র ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেলো। এ অবস্থায় আমি কি যে করবো সেটা স্থির করার আগেই আমার ঘর কাঁপিয়ে সেই পার্শি ভদ্রলোক এসে হাজির হলো, তাকে চিনতে আমার অসুবিধে হলো না ঐ লোকটা আসলে সেই আফ্রিদি দৈত্য। মনে হয় সেই পাতালপুরীর মেয়েটির ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেও সে তার মুখ থেকে আমার পরিচয় আদায় করতে পারেনি। তাই সে আমার কুঠার

এবং চটিজোড়া দেখিয়ে তাকে শাষিয়ে থাকবে, আমি ইবলিসের বংশধর জারজিস চললাম তোর নাগরকে ধরে আনতে। তারপর সে নিশ্চয়ই কাঠুরিয়াদের কাছে গিয়ে আমার কুঠার এবং চটিজোড়া দেখিয়ে ঠিকানা সংগ্রহ করে থাকবে।

দরজায় উঁকি মেরে বাইরে তাকাতে যাবো, আফ্রিদি দৈত্যটা আচমকা আমার একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো। এতো মানুষের হাত নয়, এ যে দৈত্যের হাত, লোহার মতো শক্ত। বাদুর ঝোলার মতো আমাকে শুন্যে ঝুলিয়ে সে আমাকে সেই পাতালপুরীতে নিয়ে এলো। মেয়েটির রক্তাক্ত শরীরটা দেখে আমার চোখের জল আর স্থির থাকতে পারলো না। ক্লান্ত চোখে মেয়েটি তাকালো আমার দিকে।

দৈত্য জারজিস তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'বল শয়তানী, এই লোকটা তোর নাগর না?'

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো সে এবার, অচেনা চাহনি। 'আমি ওকে চেনা দূরে থাক, এর আগে কখনো ওকে দেখিনি।'

'কি বললি?' আফ্রিদি দৈত্য এবার বিকট চিৎকার করে উঠলো, 'এতো অত্যাচারের পরও তুই স্বীকার করবি না?'

মেয়েটি তখনো বলে, 'আমার জীবনে এই লোকটিকে আমি কখনো দেখিনি। তাছাড়া আল্লার নামে আমি কেন মিথ্যে বলতে যাবো?'

'বেশ তো তুমি যদি ওকে নাই চেনো দৈত্যটা বলে, তাহলে তুমি এই তলোয়ারটা নাও এবং ঐ লোকটার দেহ থেকে মুণ্ডুটা নামিয়ে দাও এই তলোয়ার দিয়ে।'

তলোয়ারটা হাতে নিয়ে সে আমার দিকে এগিয়ে এলো ধীর পায়ে। আমি আমার চোখের ভ্রু নাচিয়ে, তাকে ইঙ্গিত করে বলতে চাইলাম, আমাকে তুমি ক্ষমা করো, আমাকে বাঁচাও, হত্যা করো না দয়া করে। চোখের জলে আমি তার মন পাওয়ার চেষ্টা করলাম। ক্ষমার করুণ আবেদনে সাড়া দিলো সে ইঙ্গিতে, 'এমন নিষ্ঠুর কাজের ভার আমার ওপর ন্যাস্ত রয়েছে, এখন আমি কি করি?'

আমি তাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম, 'এটা মার্জনা করার সময়, সব কিছু ভুলে গিয়ে নতুন করে উপলব্ধি করবার সময়। আমি তোমায় ভালোবাসি প্রিয়তমা—'

আমার করুণ আবেদনে সাড়া দিয়ে মেয়েটি করুণ সুরে গেয়ে উঠলো:

তুমি আমাকে মহব্বত করো,
বড় দেরীতে তুমি এলে,
তুমি আমার জন্য জান দিতে পারো,
বড় ব্যথা তুমি দিলে।
তুমি যে আমার কতো আপনজন,
তুমি যে আমার কতো চেনা,
মুখের ভাষায় তা বোঝানো যায় না,
চোখের ভাষায় জানাই তোমায় আমার
সমর্থন।



তারপর মেয়েটি তার হাতের তলোয়ারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রতিবাদ করলো, 'যাকে আমি চিনি না, যে আমার কোন ক্ষতি করেনি কি করে তার গর্দান নেবো? আমার বিচারে সেটা অন্যায়, সেটা পাপ।'

'ও সব ন্যাকামো রাখো,' আফ্রিদ দৈত্যটা এবার খিঁচিয়ে উঠলো', আমার আর জানতে বাকী নেই, ঐ লোকটা তোর নাগর, তোর প্রেমিক বিশ্বাস-ঘাতিনী, তাই তুই ওকে কোতল করলি না। কিন্তু সেই সত্যটা জানাতে অস্বীকার করছিস তুই। এর থেকে আমার কাছে এটাই স্পষ্ট যে, তুই ওকে ভালোবাসিস বলেই ওর প্রতি করুণা প্রদর্শন করলি।'

তারপর সে যুবকের দিকে ফিরে সে বললো 'তাহলে তুমিও কি ঐ মেয়েটিকে চেনো না।'

'কে ঐ মহিলা, আমি তো তোমাকেই জিজ্ঞেস করবো ভাবছি। বিশ্বাস করো, এর আগে আমি কখনো একে চোখেও দেখিনি।'

'খুব ভালো কথা', দৈত্যের কণ্ঠে বিদ্রূপের স্বর ধ্বনিত হয়, 'তা হলে এই তলোয়ারটা নাও। আর এই তলোয়ার দিয়ে তুমি যদি ঐ অপরিচিত মেয়েটির গর্দান উড়িয়ে দাও, তাহলেই বুঝবো তোমার কথা সত্যি, সত্যি তুমি ওকে চেনো না। আর তা হলেই হবে তোমার মুক্তি। তখন তোমার সঙ্গে আর নিষ্ঠুর ব্যবহার আমি করবো না।'



'ঠিক আছে, আমি সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছি', প্রত্যুত্তরে তার হাত থেকে তলোয়ারটা নিলাম। তারপর আমি দ্রুত পায়ে মেয়েটির সামনে এগিয়ে গিয়ে তলোয়ারটা উঁচিয়ে ধরলাম তাকে কোতল করার জন্য। কিন্তু হঠাৎ মেয়েটি তার চোখের ভ্রূ নাচিয়ে আমাকে ইশারা করলো, তার চোখের সেই ইশারায় কি করুণ মিনতি, তোমাকে ভালোবেসে এই দুর্গতি। এর পরেও তুমি আমার ভালোবাসাকে পদদলিত করে আমার গর্দান নিতে যাচ্ছো? এই কি তোমার মহব্বতের নমুনা?'

আমি তার চোখের ভাষা পড়তে পারি। ছিঃ ছিঃ এ আমি কি করতে যাচ্ছি? নিজেকে ধিক্কার দিই। আর নিজের জান বাঁচানোর জন্য আমি এমন নিষ্ঠুর ভাবে তার ভালোবাসাকে অপমান করতে যাচ্ছি, তাকে নির্দয় ভাবে হত্যা করতে যাচ্ছি? চোখের ভাষায় আমি তার সেই করুণ আকুতির উত্তর দিতে গিয়ে তাকে বোঝালাম ইশারায়, 'তোমার মহব্বত আমি ভুলিনি, কখনো ভুলতে পারবো না প্রিয়তমা। তোমার জন্য আমি জান দিতে প্রস্তুত।' তার চোখে চোখ রেখে তার প্রতি আমার মহব্বতের কথা গান গেয়ে ব্যক্ত করলাম :—

আমি ভুল করিনি ভালোবাসায়,
কি করে বোঝাই তোমায়,
দিল এক মসজিদ,
কোরাণের থেকেও পবিত্র, এ
আমার জিদ।
তোমার সাথে আমি করেছি সংসার,
আর তোমার চোখে দেখেছি আমার
সর্বনাশ।
তাই এর পরেও আসে যদি মরণ,
এসো, হাসি মুখে দুজনায় করি তারে বরণ।

গানের শেষে আমার দু'চোখে জল আসে। আমি এখন বেশ ভালো করে জেনে গেছি, এ অশ্রু আমার বেদনার, আমার আসন্ন মৃত্যুর। এরপর ঐ আফ্রিদি দৈত্যটা আমাকে আর ক্ষমা করবে না। তবু এ সব জেনেও আমি আমার হাতের তলোয়ারটা ফেলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, সেটা ফেলে দিতে গিয়ে দু' ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার ওপর, আমার মনের সব কালিমা ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেলো। এরপর জান দিতে আমার কোন ক্ষোভ থাকার কথা নয়।

তবু শেষবারের মতো আমি তার কাছে কাতর অনুনয় জানালাম, 'হে দৈত্য সম্রাট, আমি জানি তুমি অনেক শক্তির, তোমার বীরত্ব, তোমার শক্তির কাছে আমার সামর্থ অতি নগণ্য। তবু একটা কথা তোমাকে স্মরণ না করিয়ে দিয়ে পারছি না। তুমি তো নিজের কানে শুনলে ঐ নিরপরাধ মেয়েটির মনের অভিব্যক্তি। ওর মনের মধ্যে কোন পাপ নেই, নেই কোন লুকোচাপা। কেমন স্পষ্ট ভাবে ও জানিয়ে দিলো তোমাকে, ও আমাকে চেনে না, আদৌ ওর আগে কখনো দেখেনি। আমি ওর কোন ক্ষতি করিনি। তাই আমার মতো নিরপরাধ লোককে কোতল করবে কোন অপরাধে? বিবেকের দংশনে ও তোমার কঠিন আদেশও প্রত্যাখান করতে বাধ্য হলো। আমার বক্তব্যও ঠিক তাই। আমার বিবেকও আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, মেয়েটি তো আমার কোন ক্ষতি করেনি। কেন ঐ অপরিচিতা মেয়েটিকে আমি বিনা দোষে হত্যা করতে যাবো? না, না এমন জঘন্য অপরাধে আমি নিজেকে দোষী করতে পারবো না। তার চেয়ে তুমি আমার সরাবের সঙ্গে জহর মিশিয়ে আমাকে পান করতে দাও, বিনা প্রতিবাদে আমি সেই জহর পান করে মৃত্যু বরণ করতে চাই তোমার সামনে।'

'দেখছি তোমাদের দুজনের মধ্যে দারুণ সমঝোতা রয়েছে। কিন্তু এবার তোমাদের মজা দেখাচ্ছি, দেখাচ্ছি তোমাদের এই সমঝোতা কি করে ভেঙ্গে যেতে হয়।' এই বলে প্রথমে সে তলোয়ারটা

মাটির ওপর থেকে তুলে নিয়ে মেয়েটির হাত দুটো কেটে তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। তারপর সেই একই ভাবে তার পা দুটোই কেটে উড়িয়ে দিলো।'

মেয়েটির প্রতি অমন নিষ্ঠুর অত্যাচার আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না, আমি তখন জেনে গেছি, মেয়েটির মৃত্যু আসন্ন। মরা মাছের চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকালো সে আমাকে বিদায় জানাতে। ইশারায় সে আমাকে তার কাছে যেতে বললো, বিদায় চুম্বন দেওয়ার জন্য। আমি তো জানি, একটু পরে আমারো মৃত্যু হবে ওর মতো। তাই সেই দৈত্যটার চোখ রাঙানি অগ্রাহ্য করে আমি তার কাছে গিয়ে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়তে যাই তাকে চুমু খাওয়ার জন্য, তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য। আমি তখন দারুণ মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম, ঐ নিষ্ঠুর দৈত্যটাকে জানিয়ে দিতে চাইছিলাম, আমি ঐ মেয়েটিকে মহব্বত করি। হ্যাঁ, সে কথা স্বীকার করতে এখন আর কোন দ্বিধা আমার থাকার কথা নয়।

কিন্তু সে আমার ইচ্ছের কথাটা জানতে পেরেই আমাকে এক ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দেয়। তারপর সেই রক্তাক্ত তলোয়ার দিয়ে অবশেষে তার মুণ্ডুটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো এক কোপে এবং রাগে উত্তেজনা গজরাতে গজরাতে বলতে থাকলো, 'মরতে বসেও নাগরের সঙ্গে তোর পিরিত গেলো না! এবার পিরিত কর? মেয়েটির কাটা মুণ্ডুর দিকে তাকিয়ে সে উল্লাসে ফেটে পড়ে, 'তুই ভেবেছিলি আমার চোখের সামনে শেষ সাধটুকু মিটোবি, না? না, তা আমি হতে দিইনি।'

তারপর সে আমার দিকে ফিরে বলে, 'আমাদের দৈত্যকুলের নিয়ম কি জানো? ব্যাভিচারিণীর বিবির একমাত্র সাজা হলো মৃত্যু। অথচ ঐ মেয়েটাকে আমি ওর শাদীর দিনে ভাগিয়ে নিয়ে এসে তুলি এই পাতালপুরীতে। এখানে ও আমাকে ছাড়া অন্য কোন পুরুষ মানুষের মুখ দেখতে পাবে না বলে। প্রতি দশদিন অন্তর আমি এখানে এসেছি, রাত কাটিয়েছি ওর সঙ্গে সহবাস করে, ওকে উপভোগ করে, ওকে দৈহিক সুখ দিয়ে এক পার্শি মানুষের ছদ্মবেশে। তবু ঐ শয়তানির দেহের ক্ষুধা মেটেনি। তা না হলে তোমাকে মাত্র একদিন দেখা মাত্র এ ভাবে মজে যায়! তাই তো ওকে ওর উপযুক্ত শাস্তি দিলাম, নিজের হাতে ওকে কোতল করে। যাইহোক তোমার বেলায় আমি এটুকু বলতে পারি যে, তোমার সঙ্গে ঐ মেয়েটার ব্যভিচার আমি নিজের চোখে দেখিনি। তবু তোমাকে আমি অক্ষত অবস্থায় ফিরে যেতে দেবো না। তোমাকে জানে না মারলেও মানুষের আকৃতি নিয়ে বহাল তবিয়েতে থাকতে দেবো না। এখন বলো তোমার কি প্রার্থনা?'

'আমার প্রার্থনা?' আমি ভয়ে আঁতকে উঠলাম।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার প্রার্থনা বৈকি!' দৈত্যটার মুখে ক্রুর হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়, মানে, কি আকৃতি নিয়ে তুমি এখান থেকে ফিরে যেতে চাও বলো, সে মতো আমার যাদু-মন্ত্রে আমি তোমায় ভদ্র মানুষের রূপ বদলে দেবো। তুমি কি কুকুর, গাধা কিংবা বাঁদরের রূপ ধারণ করতে চাও?'

আমি তখন ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম (মনে আশা ছিলো, শেষ পর্যন্ত দৈত্যটা আমার ওপর সদয় হবে), 'খোদা আল্লা, আমাকে রক্ষা করুন। আল্লা আমাকে সুবুদ্ধি দিন, একজন নিরপরাধ মুসলমানকে তোমার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।'

চোখের পানি ফেলে আমি তাকে বার বার কাতর মিনতি করতে থাকি, 'এ অবস্থার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত দৈত্য সম্রাট। তুমি মহান। এমন নির্মম সাজা তুমি আমাকে দিও না।'

'বেশি বক্‌বক্‌ করো না। আমার সময়ের দাম অনেক।' প্রত্যুত্তরে দৈত্যটা ধমকানি দিয়ে বলে, 'তোমার গর্দান নেওয়ার ক্ষমতা আমি যথেষ্ট রাখি,

তবে অমন চরম শাস্তি আমি তোমাকে দেবো না। পরিবর্তে তোমার পছন্দের কথা আমাকে এখনি জানিয়ে দাও, অর্থাৎ কি রকম জানোয়ারের রূপ তুমি ধারণ করতে চাও বলো।

আমি তখন শেষ বারের মতো মানুষের রূপ নিয়ে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, 'হে দৈত্য সমাট, আমি শুনেছি, এক পরশ্রীকাতর আর এক পরশ্রীকাতরকে সময় সময় ক্ষমা করে দিয়ে থাকে, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে থাকে, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিলে ভালোই হবে তোমার।'

'সে কি রকম শুনি?' কৌতূহল প্রকাশ করলো সে।

অতঃপর আমি তাকে বলতে শুরু করলাম।

এক পরশ্রীকাতরের কাহিনী

তাহলে শোনো আফ্রিদিব দৈত্য সম্রাট, কোন এক শহরে দুজন লোক বাস করতো পাশাপাশি বাড়িতে, উভয়ের বাড়ির মাঝখানে একটা দেওয়াল ছিলো। তাদের মধ্যে একজন অপরকে দারুণ হিংসা করতো এবং তাকে সব সময় হিংসার চোখে দেখতো। সব সময় সে চেষ্টা করতো তার সেই প্রতেবেশীর অনিষ্ট কি করে করা যায়। লোকে কথায় বলে, হিংসের গাছ কখনো বড় হতে পারে না। সেই সত্যটা একদিন উপলব্ধি করলো নিরীহ প্রতিবেশী ভদ্রলোক। মনে মনে সে বললো, 'খোদা আল্লা! তোমার দুনিয়ায় থাকবার জায়গার কি অভাব?' তারপর সে অন্য এক শহরে গিয়ে একখণ্ড জমি কিনে মনের মতো করে বাড়ি বানালো। সেখানে শুকনো পাতকুয়া ছিলো, বহু বছরের পুরনো এবং প্রায় জরাজীর্ণ বলা যেতে পারে। নতুন জায়গায় এসে নতুন মন নিয়ে পয়গম্বর আল্লার প্রার্থনায় মনযোগ দিলো সে। সেই সঙ্গে বেশ কয়েকজন ফকিরও তার সঙ্গী হলো। আল্লার নাম শুনে অনেকেই সেখানে ভীড় করতে থাকে। অচিরেই সে বেশ নাম করে ফেলে। সেখানে ভীড় করতে থাকে। অচিরেই সে বেশ নাম করে ফেলে। সৎ লোক হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

ইতিমধ্যে সেই পরশ্রীকাতর প্রতিবেশীর কানে তার খ্যাতির কথা চলে যায়। চমকে উঠলো সে, সর্বনাশ, সেখানে সবাই তাকে খাতির করছে, ভক্তিও শ্রদ্ধা জানাচ্ছে: নিজের চোখে না দেখলে সে লোকের কথা বিশ্বাস করতে চায় না। অতএব আর কালক্ষয় না করে চললো সে তার সেই প্রাক্তন প্রতিবেশীর পবিত্র আখরায়। নিরীহ ফকির সাহেব তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো।

পরশ্রীকাতর প্রতিবেশী নিচু গলায় তাকে শুধোয়, 'তোমাকে একটা কথা বলার ছিলো দোস্ত; সেই জন্যই তোমার এখানে আমার ছুটে আসা। আমি তোমাকে একটা শুভ খবর দিতে চাই। চলো তোমার নির্জন কক্ষে, সেখানেই তোমাকে কথাটা বলবো।'

অতঃপর সেই নিরীহ ফকির সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে তার ভক্তদের চলে যেতে অনুরোধ করলো। তারা সবাই বাড়ির ভেতরে চলে গেলে পর সেই পরশ্রী-কাতর প্রতিবেশী তাকে বলে 'কিন্তু এখানে তো তোমাকে সেই কথাটা বলা যাবে না। কথাটা অত্যন্ত গোপনীয় এবং একান্ত তোমার যে কথাই

অন্য কারোর শোনার কথা নয়। এখানে পাশে-পাশের ঘর থেকে কেউ শুনে ফেলতে পারে। তোমার ঐ কুয়োর পাড়টা বেশ নির্জন দেখতে পাচ্ছি', আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখায় সে, 'চলো, ওখানেই যাওয়া যাক।'

একটু পরেই সেই পুরনো কুয়োর পাড়ের ওপর তাদের উঠতে দেখা যায়, এবং ওঠামাত্র সেই পরশ্রী-কাতর প্রতিবেশী নিরীহ ফকির সাহেবকে সজোরে ধাক্কা মারতেই নিচে পড়ে যায় সে। অন্ধকার কুয়োর ভেতরটা. া বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলো। সে তখন বুঝে গেছে, তার প্রাক্তন প্রতিবেশী এখনো তার পুরনো বদ অভ্যাসটা ছাড়তে পারেনি তাছাড়া এখন যেন সে বড় বেশি বেপরোয়া, বড় বেশি নিষ্ঠুর, বড় বেশি পরশ্রীকাতর এখন আর অস্বীকার করা যাবে না, দ্বিতীয়বার শিকার হলো সে ঐ শয়তানটার। সেই শুকনো কুয়াটা তখন ভুতুড়ে জায়গায় পরিণত হয়েছিল ভু তরা তাকে একটা পাথরের ওপর বসাতে সাহায্য করলো। তারপর তাদের মধ্যে একজন তার অনুগামীদের জিজ্ঞেস করলো, 'এই লোকটা কে?'

তারা উত্তর দিলো, 'এই লোকটা শাব আগের এক পরশ্রীকাতর প্রতিবেশীর হিংসায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষে আমাদের এই শহরে বাস করতে এসে এই বাড়িটা সে পবিত্র স্থান হিসেবে অনুভব করে। তার আধ্যাত্মিক ভাব আমাদের প্রভাবিত করেছে, তার শাব ন পাঠ আমাদের মুগ্ধ করেছে। কিন্তু সেই পরশ্রীকাতর প্রতিবেশী তার অমন খ্যাতির কথা শুনে ছুটে আসে এখানে। হিংসায় উন্মত্ত হয়ে সে তাকে এই কুয়োর মধ্যে ঠেলে ফেলে দেয়, যেখানে আমরা এখন আছি। কিন্তু এই লোকটির সুখ্যাতি আজ রাত্রে আমাদের দেশের সুলতানের কানে আসে। কাল সকালে তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন তাঁর মেয়ের ব্যাপারে।

'তা তাঁর মেয়ের অসুখটা কি?' একজন জিজ্ঞেস করলো।

অপরজন উত্তর দেয়, 'ড্যামড্যামের পুত্র মেমানের আত্মা ভর করে তাঁর মেয়ের উপরে। মেয়েটির মহব্বতের জন্য উন্মাদ সে। তবে এই শেখ সাহেবের যদি এই রোগ নিরাময় করার পন্থা জানা থাকে, তাহলে তাঁর মেয়ের অসুখ অতি সহজেই সারাতে পারে সে।'

এরপর তাদের মধ্যে একজন জানতে চাইলো, 'তা এ অসুখের ওষুধটা কি?'

উত্তরে সে বলে, 'সেই শেখ সাহেবের ভোজনালয়ে একটা কালো রঙের বিড়াল আছে, তার লেজের শেষ অংশে একটা সাদা চিহ্ন আছে, সেখান থেকে সাতটি সাদা লোম সংগ্রহ করে পোড়াতে হবে। তার ধোঁয়া মেয়েটির গায়ে লাগালেই তার ওপর ভর করা প্রেতাত্মা উধাও হয়ে যাবে। তারপর আর কখনো সে ঐ মেয়েটির ওপর ভর করতে পারবে না; বাকী জীবন স্বাভাবিক হয়ে বেঁচে থাকবে সে।'

'জানো আফ্রিদি', আমি তাকে বললাম, 'এ সব কথা সেই নিরীহ প্রতিবেশীর কানের সামনে আলোচনা করা হয় কান পেতে সে শোনে তাদের সব কথা।

পরদিন রাত্রি শেষে সকালের আলো ফুটে ওঠার পর ফকিররা তাদের প্রভু শেখ সাহেবকে দেখার জন্য সেই কুয়োর সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়ে তারা দেখলো, কুয়োর দেওয়াল বেয়ে শেখ সাহেব উঠে আসছে ওপরে।

নিরীহ প্রতিবেশী শেখ সাহেব তখন জেনে গেছে, সুলতানের কন্যার রোগ নিরাময়ের ওষুধ। কালো বেড়ালের লেজের সাদা অংশ থেকে সাতটা লোম তুলে রাখলো। ওদিকে ভোর হতেই সুলতান সশরীরে এসে প্রবেশ করলেন তাঁর আমীর ওমরাহ এবং উজিরকে সঙ্গে নিয়ে। শেখ সাহেব তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালো এবং তাঁর পাশে

বসে শুধালো, 'আপনার এখানে আগমনের হেতু কি আমি বলবো ?'

সঙ্গে সঙ্গে সুলতান উত্তর বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলো।'

'আপনি আপনার কন্যার আরোগ্যের ব্যাপারে আমার পরামর্শ নিতে এসেছেন', শেখ সাহেব তার কথার জের টেনে বলতে থাকে, 'কিন্তু তাঁকে না দেখা পর্যন্ত আমি কিছু বলতে পারবো না জাঁহাপনা। আপনি এখুনি তাঁকে এখানে আনার ব্যবস্থা করুন, আমি কথা দিচ্ছি, খোদা আল্লার দোয়ায় আমি তাঁকে দেখা মাত্র তার সব ব্যাধি নিরাময় করে দিতে পারবো, সে বিশ্বাস আমার আছে।'

কন্যার আরোগ্য হওয়ার কথা শুনে সুলতান তো মহাখুশি। লোক-লস্কর পেয়াদ পাঠিয়ে তিনি তাঁর কন্যাকে সেখানে নিয়ে এলেন তৎক্ষণাৎ। তারপর শেখ করলো কি, রাজকুমারীকে একটা পর্দার আড়ালে বসিয়ে সেই কালো হুলো বেড়ালের লেজের প্রান্ত-ভাগ থেকে সংগ্রহ করা সাত-গাছা লোমের বাষ্পস্নান করালো তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট আর্তনাদ শোনা গেলো, রাজকুমারীর মাথায় এতোদিন যে শয়তানটা ভর করেছিল, সে আর টিঁকতে পারলো না, তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেলো সে সেই মুহূর্তে। রাজকুমারী তখন সম্পূর্ণ সুস্থ, তিনি আবার তাঁর আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন, আগের মতোই স্বাভাবিক ভাবে ঠোঁট নেড়ে শুধোলেন, 'আমার কি হয়েছিল,' যেন দীর্ঘদিন পর ঘুম থেকে জেগে ওঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে, কে আমাকে এখানে নিয়ে এলো ?'

কন্যাকে আরোগ্য লাভ করতে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন সুলতান, তাঁর কন্যার দু'চোখে চুম্বন এঁকে দিলেন এবং সেই পবিত্র শেখের হাতে চুমু খেলেন। তারপর তিনি তাঁর প্রভুদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন', আপনারাই বলুন, আমার কন্যার আরোগ্যকারীর প্রাপ্য পুরস্কার কি ?'

তখন সবাই এক সুরে উত্তর দেন, 'আপনার কন্যাকে তিনি তাঁর বেগম হিসেবে পাওয়ার দাবী রাখেন।'

'ঠিক আছে, আপনাদের হুকুমই বলবত রইলো', তাদের উপদেশ মেনে নিলেন সুলতান। তারপর নির্দিষ্ট দিনে শাদী হয়ে গেলো তাঁদের, এবং শেখ সাহেব দামাদ হলেন সুলতানের।

কিছুদিন পরে সুলতানের উজির মারা গেলেন। সুলতান তখন তাঁর মন্ত্রীপরিষদের সভ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে এখন কাকে মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করা যায় ?'

'আপনার দামাদ,' উত্তর দেয় রাজসভাসদরা।

অতএব শেখ সাহেব উজিরের আসন অলঙ্কৃত করলো। তারপর কিছুদিন পরে সুলতানও বেহস্তে চলে গেলেন।

তখন প্রজারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে মন্ত্রী শেখ সাহেবকেই সুলতান হিসেবে স্বীকার করলো। পরবর্তী সাতকারের শাসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে।

একদিন তিনি আমির এবং উজিরদের সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়ে তাঁর পুরনো পাড়ার ওপর নজর পড়লো তাঁর। সেই সঙ্গে নজর পড়লো তাঁর পুরনো প্রতিবেশী সেই হিংসুটে লোকটার ওপর, সে তখন তার পথে দাঁড়িয়েছিল। তখন সুলতান তাঁর এক মন্ত্রীকে হুকুম করলেন তাঁর সেই পুরনো প্রতিবেশীকে তাঁর কাছে ডেকে আনার জন্য। মন্ত্রী তাকে ডেকে আনলে সুলতান হুকুম করলেন, তাকে যেন তাঁর কোষাগার থেকে এক হাজার স্বর্ণ দিনার দেওয়া দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, দশটি উটের পিঠে বাণিজ্যিক জিনিষ-পত্র উপহার দেওয়া হলো তাকে ব্যবসা করার জন্য। তারপর তিনি তাঁর চিরশত্রুকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে তার সব অপরাধ ক্ষমা

করে দিলেন।'

আফ্রিদি নীরবে শোনে তার কথাগুলো।

'শুনলে তো আফ্রিদি এক মহানুভব ইনসানের দয়ার কথা। যে লোকটা তার শত্রু, যার জন্য সে দেশছাড়া, যে তাকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল, তাকে সে কেমন অনায়াসে মাফ করে দিলো। আর তুমি আমাকে আমার সামান্য অপরাধের জন্য ক্ষমা করতে পারছো না দৈত্য সম্রাট?'

এতো সব বলা সত্ত্বেও সে কিন্তু বিন্দুমাত্র টললো না। উল্টে খিঁচিয়ে উঠে সেই আফ্রিদি বললো, 'মেলা ফ্যাচ-ফ্যাচ করো না। মনে রেখো, তোমাকে কোতল করার মধ্যে কোন ভয় নেই, কিন্তু তোমাকে মাফ করার কোন আশা নেই, কিন্তু আমার যাদু-মন্ত্রে তোমার পালাবার কোন পথ নেই।'

তারপর সে আমাকে সবলে মাটির ওপর থেকে তুলে নিয়ে শূন্যে উড়ে নিয়ে এলো আসমানে, সেখান থেকে নিচের জমিন স্তুপাকৃত শাদা তুলোর মতো দেখাচ্ছিল। এক সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে একটা পাহাড়ের চূড়ায় এসে নামলো সে। তারপর সে একমুঠো ধুলো পাহাড়ের ওপর থেকে তুলে নিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র যেন পড়লো। তারপর সেই মন্ত্রপূত তুলো আমার গায়ে ছিটিয়ে দিতে গিয়ে সে বলে, 'এবার তুমি তোমার মানুষের খোলস ছেড়ে বানর হয়ে যাও।' সঙ্গে সঙ্গে আমি লেজ-হীন একশো বছরের বুড়ো বানরে পরিণত হয়ে গেলাম। সেই দৈত্যটা চলে যাওয়ার পর আমি আমার সেই কুৎসিত, ঘৃণিত আকৃতি দেখে খুব কাঁদলাম

পরক্ষণেই আবার ভাবলাম, ভাগ্যে যা লেখা আছে তা তো মেনে নিতেই হবে আমাকে, এই নিষ্ঠুর নিয়তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এখন সময়ের অপেক্ষা করতে হবে আমাকে।

তারপর ধীরে ধীরে পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে এলাম নিচে সমতল ভূমিতে। কোথাও প্রাণের স্পর্শ নেই খাঁ খাঁ করছে সমুদ্র-তীর। একা একা ঘুরে বেড়াই সেখানে, এই ভাবে এক মাস কেটে যায়। তারপর একদিন সমুদ্র-তীরে দাঁড়িয়ে আছি, দূরে একটা ভাসমান জাহাজের মাস্তুল চোখে পড়লো, জাহাজটা সেদিকেই এগিয়ে আসছিল। আমি তখন লুকিয়ে থাকি একটা প্রস্তর-খণ্ডের আড়ালে। তারপর সেই জাহাজটা সমুদ্র তীরে আসতেই এক লাফে জাহাজে গিয়ে উঠলাম।

সওদাগর এবং যাত্রী ঠাসা জাহাজ। তাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলে উঠলো, 'দলপতি, ঐ কুৎসিত জানোয়ারটাকে জাহাজ থেকে হটিয়ে দিন', অন্য আর একজন বললো, 'তা না হলে ও আমাদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনতে পারে।'

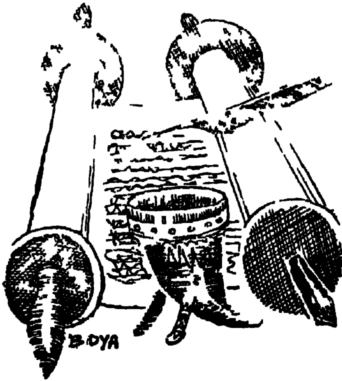
শুনে দলপতি বলে, 'এসো, ঐ জন্তুটাকে হত্যা করি।' অন্য আর একজন বলে, তলোয়ার দিয়ে ওর শিরচ্ছেদ করে দাও!' আর একজন সায় দিয়ে বলে, 'তার চেয়ে ওকে কোতল করো!' তৃতীয় ব্যক্তি বলে, 'ওকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলো!'

ভাগ্যের কি পরিহাস, আমার দুঃখের কথা কেউ শুনতে চায় না। সবাই আমার মৃত্যু কামনা করছে। বেশ বুঝতে পারি বাঁচার আর কোন পথ নেই আমার সামনে, শেষে মরীয়া হয়ে জাহাজের দলপতির পা দুটো জড়িয়ে ধরে নীরবে কাঁদতে থাকি, আমার দু'গাল বেয়ে অশ্রুর বাদল নামে। আমার চোখে পানি দেখে দলপতির বোধহয় দয়া হলো, এবং সওদাগরদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই বানরটি তার নিরাপত্তার জন্য আমার দয়া ভিক্ষা চাইছে, ওকে আমি রক্ষা করবো। এখন থেকে ও আমার হেপাজতে থাকবে। অতএব কেউ যেন ওর ক্ষতি না করে।'

তারপর থেকে আমি ওঁর গোলাম হয়ে গেলাম, নীরবে ওঁর কাজ-কর্ম করতে থাকি ওঁর পরিচারকের মতো। তিনি যা হুকুম করতেন আমি সব বুঝতে

পারতাম, কেবল কথা বলতে পারতাম না। কাজের মধ্যে দিয়ে আমি ওঁকে খুশি করতে চেষ্টা করি, যাতে উনি আমার ওপর সদয় হন; আমার কথা শোনেন। আমার দুঃখ, কেউ আমার কথা শোনে না, শুনলেও বুঝতে চায় না। আমি যে জানোয়ার! আমার কি বলার থাকতে পারে, হয়তো ওরা তাই ভাবে।

এই ভাবে পঞ্চাশ দিন পরে জাহাজটা একটা বিরাট শহরের বন্দরে এসে নোঙর করলো। সেই শহরটা ছিলো জ্ঞানী-গুণী এবং শিক্ষিত মানুষের। আমরা সেখানে পৌঁছন মাত্র সুলতানের আমির এবং আমলারা ছুটে এলো এবং সওদাগরদের আদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললো, 'আপনাদের জানিয়ে রাখি, সুলতানের উজির কিছুদিন হলো মারা গেছেন। উনি ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত, তার সমকক্ষ কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। তার মতো গুণী ব্যক্তি কাউকে না পেলে অন্য কাউকে উজিরের আসনে বসাতে চান না সুলতান।' ওদের মধ্যে থেকে একজন একটা জড়ানো কাগজের পুটলা কাগজের ওপর আপনারা সওদাগরদের সামনে মেলে ধরে বলে, 'এই কাগজে প্রত্যেকে কিছু লিখে দিন। আপনাদের মধ্যে যে গুণে মৃত উজিরের সমকক্ষ বলে মনে হবে তাকেই তিনি তাঁর নতুন উজির হিসেবে আহ্বান জানাবেন।'



তারপর এক এক করে প্রতিটি সওদাগর সেই কাগজের ওপর এক লাইন লিখে নিজের নাম স্বাক্ষর করলো। শেষ সওদাগর তার নাম স্বাক্ষর করামাত্র আমি উঠে দাঁড়ালাম (ঠিক বানররা যেমন করে দাঁড়ায়) এবং তাদের হাত থেকে সেই কাগজের গোলাটা একরকম ছিনিয়ে নিলাম। তারা ভয় পেলো, আমি বোধহয় সেটা ছিঁড়ে ফেলে দেবো, কিংবা জলে ফেলে দেবো। তারা আমার কাছ থেকে একটা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে, কিন্তু তার আগেই আমি সেই কাগজের ওপর সই করে দিলাম। আমার লেখা পড়ে তো সবাই তাজ্জব বনে গেলো। এ কি করে সম্ভব! তারা তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকলো, 'বানর যে এভাবে লিখতে পারে এর আগে আমরা কখনো দেখিনি।'

নাবিকনেতা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'ঠিক আছে ওকে লিখতে দাও। যদি দেখা যায়, হিজি বিজি কেটে কাগজটা ও অযথা নষ্ট করে ফেলেছে, তাহলে আমায তখুনি ওকে লাথি মেরে দেবো এবং ওকে খতম করে ছাড়বো। আর যদি দেখা যায় যে, একজন জ্ঞানীগুণীর মতো লিখেছে, তাহলে আমি ওকে আমার পুত্র হিসেবে গ্রহণ করবো। এর আগে ওর মতো এমন বুদ্ধিমান এবং ভদ্র ব্যবহারের বানর কখনো চোখে দেখিনি।

আমি তখন আমার ডান হাতের থাবা দোয়াতের মধ্যে ডুবিয়ে আঙুল দিয়ে কয়েকটা শায়েরী লিখলাম কাগজের ওপর। তারপর সেটা সুলতানের আমলাদের হাতে তুলে দিলাম। তারা সেটা সুলতানের সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো। আমার লেখা ছাড়া অন্য কারোর লেখাই সুলতানের মন জয় করতে পারলো না। সমবেত আমলাদের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'এই সব শায়েরীর লেখককে দামী পোষাক পরিয়ে এবং উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে মাদী খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে আমার দরবারে নিয়ে এসো।'

সুলতানের কথা শুনে তারা তো হেসে খুন।

তাদের সেই হাসি দেখে সুলতান বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'আমি তোমাদের হুকুম করলাম, এতে হাসির কি আছে?'

'জাঁহাপনা', উত্তরে তারা বলে, 'আমরা আপনার কথা শুনে হাসিনি, আর সেব হাসির যথেষ্ট কারণ আছে বলেই হাসছি।'

'তা সেই কারণটা কি শুনি?'

'জাঁহাপনা, ঐ শায়েরীর লেখক, যাকে আপনি আপনার সামনে হাজির করতে বললেন, সে আদমের পুত্র নয়, বানর ... লেজহীন বেদুন, জাহাজের নাবিকনেতা আশ্র... ন!'

'তোমরা যা বল..., সব সত্যি?'

'হ্যাঁ জাঁহাপনা, আপনার সামনে মিথ্যে বলার মতো সে রকম দুঃসাহস আমাদের নেই।'

অমন আজব কথা শুনে সুলতান তো দারুণ বিস্মিত, সেই সঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'আমি নাবিক নেতা এই অদ্ভুত বানরটিকে কিনতে চাই।'

সুলতানের লোক-লস্কর, বাজনা বাদ্য সহ মহা-সমারোহে ম...-খচ্চরের পিঠে চড়ে রাজদরবারে চলেছি, পথে সুলতানের প্রজারা আমার গায়ে মানুষের দা... পোষাক দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, 'আচ্ছা সুলতান কি অবশেষে এই বানরটিকে তাঁর মন্ত্রীর আসনে বসাতে চান?'

রাজদরবারে প্রবেশ করা মাত্র সুলতানের সামনে দরবারি কায়দায় জমিন স্পর্শ করে তিনবার চুম্বন করলাম তার সম্মানে এবং আমির, আমাত্য এ... পারিষদদের দিকে ফিরে একবার জমিনের ওপর ঠোঁট রাখলাম তারপর সুলতান আমাকে বসতে হুকুম করলে আমি হাটু মুড়ে সম্মানত অতিথির মতো বসলাম আমার অমন ভব্য ভদ্র ব্যবহার দেখে উপস্থিত সুলতান এবং তাঁর আমির আমাত্যরা দারুণ অবাক হলো।

এক সময় সুলতান তাদের সবাইকে স্থান ত্যাগ করতে বললেন। সবাই চলে যায়, আমি, সুলতান, একজন খোঁজা এবং তাঁর এক বিশ্বস্ত বাচ্চা নোকর কেবল সেখানে থেকে গেলাম। সুলতানের ফরমাশ মতো আমার সামনে ফরাসে খাবার সাজানো হলো। খাবারের তালিকায় ছিলো নানান জাতের পাখীর মাংস, যেমন কোয়েল, পাতিহাঁস ইত্যাদি। তারপর সুলতানের ইঙ্গিতে তাঁর সামনে জমিনের ওপর আবার চুমু খেয়ে খানা শুরু করলাম তার সাথে। খানা শেষে সাত রকম জল দিয়ে হাত ধুলাম। তারপর কাগজ টেনে নিয়ে পর পর কয়েকটি শায়েরী লিখলাম সুলতানের আতিথেয়তার বর্ণনা দিয়ে। অনেকদিন পর ভালো খাবার খেতে পেয়ে এবং মানুষের মতো ব্যবহার পেয়ে আমি তখন খুব তৃপ্ত, আমার মন তখন খুশিতে ভরে উঠেছে কানায় কানায়। সুলতানের প্রশংসায় দিল উজাড় করে লিখলাম শায়েরী।

আমার সেই শায়েরীগুলো নিবিষ্ট মনে পড়লেন সুলতান। আমার লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য, এ সবই খোদার কৃপা, তা না হলে একটা বানরের কলম দিয়ে এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ শায়েরী বেরিয়ে আসতে পারে!'

তারপর সুলতান আমাকে সরাব পান করতে দিলেন। এক নিঃশ্বাসে সরাবের পাত্র নিঃশেষ করে কলম টেনে নিয়ে আবার শায়েরী লিখতে বসলাম :

মানুষের কথা আমি বলতে চাই,
পারি না, দুঃখ আমার তাই।
বুকে আমার আগুন জ্বলে,
বোঝাতে পারি না কথার ছলে।
আমার কাছে ফারাক কিছু নেই
রাত কিংবা দিনের,
কি করে বোঝাই
আমি যে পুত্র এক আদমের।
সরাবের নেশায় আমি বিভোর
বুঝি না আমি সরাব পান করছি,
নাকি সরাব আমাকে পান করছে,
আমি যে এক জানোয়ার!

সুলতান আমার শায়েরী পড়ে মন্তব্য করলেন, 'এই সব গুণগুলো যদি কোন মানুষের মধ্যে দেখা যেতো, তাহলে তাকে সর্বকালের, সর্বসময়ের সেরা পণ্ডিত হিসেবে মেনে নিতো লোকে।'

তারপর তিনি দাবার ঘুঁটি সাজিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সঙ্গে দাবা খেলবে তুমি?'

মাথা নেড়ে সায় দিলাম, 'হ্যাঁ।'

তারপর দু'টি খেলায় আমি জয়ী হলাম। বিস্মিত সুলতানের মুখে কোন কথা নেই। আমি তাঁর সেই বিস্ময় ভাবটা কাটানোর জন্য কাগজ কলম টেনে নিয়ে একটি শায়েরী লিখতে বসলাম যার বক্তব্য এই রকম:—

দিন যায় রাত্রি নামে,
দুই অতিথি কলহে মত্ত
তখনো দোস্তি তাদের দূর অস্ত,
তবু তারা সঙ্গী হয় একই শয্যার রাত্রির
প্রথম যামে।

আমার শায়েরী পড়তে পড়তে সুলতানের চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর খোজাকে ডেকে বললেন, 'শোনো মুকবিল, তুমি তোমার শাহাজাদীর কাছে গিয়ে খবর দাও, আমি তার জন্য এখানে অপেক্ষা করছি তাকে এই অদ্ভুত-প্রাণী বানরটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য।'

একটু পরেই সেই খোজার সঙ্গে শাহাজাদী এলো। আমাকে দেখা মাত্র সে তার মুখ ঢেকে দিলো নাকাবে মাথা নিচু করে অনুযোগ করলো সে, 'আচ্ছা আব্বাজান, তুমি কি তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছো? তা না হলে বাইরের এক-জন পুরুষ আগন্তুকের সামনে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছো?'



'এ তুমি কি বলছো সিত আল-হুনা একটু আশ্চর্য হয়েই সুলতান বললেন, 'এখানে আমাদের পরিচিত একজন বাচ্চা নোকর, হারেমের খোঁজা এবং তোমার আব্বাজান ছাড়া বাইরের কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'কিন্তু আব্বাজান, তুমি যাকে বানর ভেবে তোমার পাশে বসিয়েছে, আসলে সে কিন্তু এক ভদ্র, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী এবং শিক্ষিত যুবক, এক বাদশাহের শাহাজাদা। আফ্রিদি জারজিসের যাদু-মন্ত্র বলে বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে বেচারা। এই আফ্রিদি নিজের হাতে তার বিবিকে কোতল করে, সে হল আবনূস দ্বীপপুঞ্জের শাহেনশাহ ইফিতামাসের কন্যা।'

কন্যার কথা শুনে সুলতান সবিশেষ বিস্মিত হলেন। আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সম্বন্ধে শাহাজাদী যা যা বললো সব সত্যি?'

'হ্যাঁ, ওঁর প্রতিটি কথা সত্য', মাথা নেড়ে সায় দিলাম, দু'ফোঁটা পানি আমার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো।

এবার তিনি শাহাজাদীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা তুমি এতো সব জানলে কি করে?'

'তাহলে শুনবে আব্বাজান কি করে এতো সব জানলাম? ছেলেবেলায় এক বৃদ্ধার সঙ্গে আমার আলাপ হয়, সে ছিলো দারুণ ছলনাময়ী, ডাইনি প্রকৃতির মহিলা, যাদু-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলো। সেই মহিলাই আমাকে তার যাদুবিদ্যা শিখিয়েছিল, আমি এখন প্রতিটি মানুষের অতীত বলে দিতে পারি। অবশ্য এ সব যাদু-বিদ্যা নিজের আয়ত্তে আনতে গিয়ে আমাকে অনেক পড়াশোনা করতে হয়েছে। তা প্রায় একশো সত্তর রকমের যাদু-মন্ত্র আমাকে শিখতে হয়েছে সেই সব যাদুমন্ত্রে আমি তোমার এই বিরাট শহর কাফ পর্বতের ওপারে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারি, কিংবা কাফ পর্বতের ওপারে তোমার প্রজারা যেখানে সুখে-স্বাচ্ছন্দে বসবাস করছে সেটা আমি একটা বিরাট সায়রে পরিণত করে দিতে পারি, যে সায়রে তারা মাছের রূপ ধারণ করে সাঁতার কাটবে।'

'শাহজাদী, আমি তোমার যাদুমন্ত্রে সারাজীবন তোমার বশীভূত হয়ে থাকবো, যদি তুমি ঐ শাপভ্রষ্ট যুবককে ফিরে আমার মানুষে রূপান্তরিত করে দাও। বেচারী, তার এতো বিদ্যা-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও বানর হয়ে জানোয়ারের জীবন যাপন করছে। তুমি ওকে মানুষ করে দিলে আমি ওকে আমার উজিরের আসনে বসাবো, তারপর তোমার সঙ্গে ওর শাদী দেবো।'

'এমন শুভ কাজ আমি আনন্দের সঙ্গে করবো আব্বাজান', এই বলে শাহজাদী নিজের হাতে একটা লোহার ছবি তুলে নেয়, ছুরি দিয়ে হিব্রু ভাষায় আল্লার নাম লেখে জমিনের ওপর। তারপর সেই ছুরি দিয়ে জমিনের ওপর একটা বিরাট রেখা টানে শাহজাদী। এবং তারপর—এই সময় শাহরাজাদ দেখলো বাইরের আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। পরদিন আমার তার গল্প বলার অনুমতি নিয়ে থামলো সে।

পরদিন আবার রাত গভীর হতেই শাহরাজাদ তার অসমাপ্ত কাহিনী শুরু করতে গিয়ে বললো, 'তাহলে শুনুন জাঁহাপনা, সেই কালান্দার তার জীবনের করুণ কাহিনী বলে চলে বড় বোনের কাছে ঃ—

শুনুন মালকিন, তারপর কি ঘটলো। তারপর সুলতানের কন্যা ছুরির আঁচড়ে খোদাই করা বৃত্তের মধ্যে হিব্রু ভাষায় কয়েকটা নাম লিখলো এবং সেই লেখাগুলোর ওপরে বিড়বিড় কি সব মন্ত্র উচ্চারণ করলো, যার অর্ধেক আমরা অনুমান করলাম, বাকী অর্ধেক আমাদের বোধগম্য হলো না। মুহূর্তের মধ্যে সারা প্রাসাদকক্ষ একটা কালো শ্লেটের মতো অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেলো। মনে হলো সারা আকাশ ভেঙ্গে পড়লো রাজ-প্রাসাদের ওপরে। আর ঠিক

সেই সময়ে ভয়ঙ্কর কদাকার দেখতে সেই আফ্রিদি জারজিসকে তার নিজস্ব চেহারায় সভাকক্ষে প্রবেশ করতে দেখলাম। তার আঙুলগুলো লোহার শাবলের মতো, জাহাজের মাস্তুলের মতো পা, চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত আগুনের গোলা। উপস্থিত আমরা সবাই ভয়ে আঁতকে উঠলাম। কিন্তু সুলতানের কন্যার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

তীক্ষ্ণ স্বরে আফ্রিদির উদ্দেশে সে বললো, 'শোনো কুত্তা তোমাকে কোন সম্ভাষণ জানাবো না, আদর-আপ্যায়ণও নয়।'

সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিদি একটা সিংহে রূপান্তরিত হয়ে গেলো এবং অভিযোগ করলো, তুমি বিশ্বাস-ঘাতিনী। তুমি আমাদের যাদু-বিদ্যার শপথ ভঙ্গ করেছো। কথা ছিলো, আমরা কেউ কারোর কাজে বাধা সৃষ্টি করবো না কিন্তু এখন দেখছি, তুমি সেই কথার খেলাপ করলে।

'তোমার মতো জঘন্য চরিত্রের লোকের সঙ্গে, শাহজাদী তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, 'কি করে আমার সাথে চুক্তি হতে পারে?'

'তাই নাকি?' তাহলে এবার আমাদের শপথ ভঙ্গের প্রতিফল কি হতে পারে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে', সিংহের বেশধারী আফ্রিদি দৈত্য তার থাবা উঁচিয়ে শাহজাদীর দিকে ছুটে যায়। কিন্তু শাহজাদী তার থেকেও ক্ষিপ্রগতিতে নিজের মাথার একগাছি চুল ছিঁড়ে শূন্যে হাওয়ায় দুলিয়ে যায়। সেই ধারালো তলোয়ারের এক কোপে সিংহবেশী আফ্রিদি দৈত্যের বিরাট দেহ দ্বিখণ্ডিত করে দেয় শাহজাদী।

কিন্তু কি আশ্চর্য সিংহের খণ্ডিত দুটি অংশ শূন্যে উড়ে গিয়ে মুণ্ডটা কাঁকড়াবিছেয় পরিণত হয়ে যায়। শাহজাদীও চুপচাপ বসে থাকে না, চোখের পলকে মানুষের দেহের খোলস ছেড়ে একটা বিরাট সাপের আকার ধারণ করলো সে। তারপর কাঁকড়াবিছে এবং সাপের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। সাপটা কখনো তার লেজ দিয়ে কাঁকড়াবিছেটাকে জড়িয়ে ধরে জমিনের ওপর আছাড় মারে, কখনো বা তার ফণা উঁচিয়ে তার দিকে ছুটে যায়। এই ভাবে ঘণ্টা খানেক লড়াই চলে তাদের মধ্যে।

তারপর এক সময় রণে ভঙ্গ দিয়ে কাঁকড়াবিছেটা শকুনি হয়ে যায়, এবং সাপটা ঈগলের রূপ ধারণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে শকুনির ওপর। এক ঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড লড়াইয়ে বিধ্বস্ত হয়ে শকুনিটা এবার একটা কালো হুলো বেড়ালের বেশ ধরে এবং রাগে উত্তে-জনায় ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে



ঈগলও তার খোলস ছেড়ে তখন নেকড়ে বাঘ হয়ে গেছে। রাজ-প্রাসাদে বেড়াল বাঘে লড়াই চললো দীর্ঘক্ষণ। এক সময় হলো বেড়ালটা প্রায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হওয়া মাত্র একটা বিরাট ডালিম ফল হয়ে দরবার প্রাঙ্গণের ফোয়ারার ঠিক মাঝখানে গিয়ে ভাসতে থাকলো। খানিক পরে সেই ডালিমটা শূন্যে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে একটা বিরাট তরমুজে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু সেটা রাজপ্রাসাদের ছাদে ধাক্কা খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে পড়ে মার্বেলের মেঝের ওপরে এবং সারা মেঝের তরমুজের বীচিগুলো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। তখন সেই নেকড়ে বাঘটা একটা সাদা মোরগের রূপ ধারণ করে তাড়াতাড়ি তরমুজের বীচিগুলো মুখে পুড়তে থাকে, একটা বীচি মেঝের ওপর ফেলে রাখতে চায় না সে। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে, তরমুজের শেষ বীচিটা চৌবাচ্চার দেওয়ালের ফাঁকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। মোরগটা তখন ডানা ঝাপটিয়ে চিৎকার করতে করতে আমাদের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করতে চাইছিলো, 'আর কোন তরমুজের দানা অবশিষ্ট আছে?' এ তো গেলো তার মনের কথা, কিন্তু আমরা তার কথার এক বর্ণও বুঝতে পারিনি। তখন সে এতো করে চিৎকার শুরু করে দিলো যে, সেই শব্দে মনে হলো রাজপ্রাসাদ বুঝি ভেঙ্গে পড়বে আমাদের মাথার ওপরে। সে তখন মরীয়া হয়ে তরমুজের শেষ দানাটা খুঁজে বার করার জন্য মারবেলের মেঝের ওপর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে থাকলো। এক সময় ফোয়ারার ধারে একটা ভাঙ্গা মারবেলের পাথরের খাঁজে তরমুজের দানাটা তার চোখে পড়ে, অনেক চেষ্টাতে সেটা সে তার ঠোঁটের নাগাল পেলো বটে, কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, অতো কষ্ট করেও সেটা সে উদরস্থ করতে পারলো না, ঠোঁট থেকে ছিটকে চৌবাচ্চার জলে গিয়ে পড়লে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা একটা মাছে পরিণত হয়ে গেলো। মোরগটা সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট মাছের আকার ধারণ করে সেই ছোট মাছটার ওপর ঝাঁপ দিয়ে তলিয়ে গেলো একেবারে অতল জলে। একটু পরে জলের ভেতর থেকে অস্পষ্ট গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসতেই ভয়ে আমাদের দেহ কুঁকড়ে গেলো। স্থলে এবং শূন্যে শাহজাদী জয়ী হলেও বোধহয় জলে তার পরাজয় হলো। একটা অশুভ আশঙ্কার দোলায় আমরা দুলছি হঠাৎ আমাদের চোখে পড়লো, জল থেকে উঠে আসছে দৈত্যের আসল চেহারা নিয়ে আফ্রিদি, তার শরীরটা যেন একটা আগুনের পিণ্ড, সারা শরীর থেকে আগুনের হল্কা ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, যার উত্তাপ অনুভব করছি আমাদের দেহে তার চোখে, মুখ এবং নাক দিয়ে উত্তপ্ত ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

ওদিকে শাহজাদীকেও তা আসল চেহারা নিয়ে জল থেকে উঠে আসতে দেখা যায়, তার শরীরটাও একটা জ্বলন্ত অঙার হয়ে উঠেছিল তখন, যেন একটা বিরাট জ্বলন্ত কয়লার চাঁই। শাহাজাদীর চোখ-মুখ-নাক দিয়ে ধোঁয়া উদগিরণ হচ্ছিল। দেখতে দেখতে রাজপ্রাসাদের হলঘরটা ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। আমাদের চোখ-মুখে প্রচণ্ড জ্বালা তখন। অসহ্য। ওরা তখন প্রচণ্ড লড়াইয়ে ব্যস্ত, সেটা ছিলো ওদের আখরি লড়াই এক পক্ষের বাঁচার লড়াই, অপর পক্ষের খতম হওয়ার লড়াই।' রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলু-খাগরার প্রাণ যাওয়া তা অবস্থা হচ্ছে আমাদের। আগুনের তাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য চৌবাচ্চার জলে গিয়ে ঝাঁপ দিই। কিন্তু আফ্রিদি দৈত্যটা তখন তার জ্বলন্ত দেহটা দিয়ে আমার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। ফিরে আসতে হলো।

দুই অগ্নিপিণ্ডের লড়াই এক সময় চরমে উঠলো। আফ্রিদি দৈত্যটা চাইলো তার দেহ-নিসৃত অগ্নিপিণ্ড দিয়ে আমাদের পুড়িয়ে মারে। কিন্তু শাহজাদী তার জ্বলন্ত দেহ দিয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। তবু এক সময় আফ্রিদির দেহ থেকে একটা অগ্নিপিণ্ড ঠিকরে বেরিয়ে এসে আমার বাঁ চোখে

লাগতেই চোখটা নষ্ট হয়ে গেলো। এবং আর একটা অগ্নিপিণ্ড দৈত্যের দেহ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসে সুলতানের থুতনীতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে মুখের নিম্নাংশটা পুড়ে গেলো, নিচের পাটির দাঁতগুলো এক এক করে খসে পড়লো মেঝের ওপর। আফ্রিদির দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা তৃতীয় অগ্নিপিণ্ডটা সুলতানের বিশ্বস্ত খোঁজা কামট্রাটের বুকে গিয়ে বিঁধতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আমরা তখন ধরে নিয়েছি মৃত্যু আমাদের অবধারিত। তাই মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে আল্লার নাম জপ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখতে পেলাম না।

আমরা যখন আমাদের আসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় উদ্বিগ্ন, ঠিক তখনি শাহজাদীর চিৎকার আমাদের কানে ভেসে এলো ?

'আল্লাহ্ তোমার অপার করুণার কথা আমি অনেক শুনেছি। শুনেছি, তোমার প্রতি যাদের অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি এবং শ্রদ্ধা আছে, যারা নিস্পাপ তাদের তুমি রক্ষা করো। আর যারা পাপী, অত্যাচারী, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তোমার প্রতি যাদের এতটুকু শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই তাদের তুমি খতম করো। সেই রকম একজন ব্যাভিচারী ঐ আফ্রিদি দৈত্য তোমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের সবনাশটা করতে চাইছে। আল্লাহ্ শুনেছি তুমি মহান শক্তির অধিকারী। আমি তোমার কাছে শক্তি-ভিক্ষা করছি। আমাকে তুমি এই মুহূর্তে এমন শক্তি দাও, যাতে করে ঐ শয়তানটাকে এখনি খতম করতে পারি।'

কথাটা শেষে করেই শাহাজাদী শেষ বারের মতো আফ্রিদির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিদির বিশাল দেহটা মারবেলের মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লো। অতঃপর তার নিষ্প্রাণ দেহটা তারই দেহের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়ে একটা ভস্মের স্তূপাকারে পরিণত হয়ে গেলো।

এর পরেই ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো শাহজাদী আমাদের কাছে। হাপাতে হাঁপাতে সে বলে, 'শীগগীর এক পেয়ালা পানি এনে দাও আমাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে পেয়ালা ভর্তি পানি এলো। সেই পানির ওপর বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র উচ্চারন করলো শাহজাদী। তারপর সেই মন্ত্রপুতঃ পানি আমার দেহের ওপর ছিটিয়ে দিতে গিয়ে বললো, 'সত্যের দোহাই দিয়ে এবং সর্বশক্তিমান খোদা



আল্লাহর নাম নিয়ে এই মন্ত্রপুতঃ পানি আমি তোমার দেহের ওপর ছিটোচ্ছি, তাঁর দোয়ায় এবার তুমি তোমার আসল রূপ নিয়ে ফিরে এসো।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার আমার আগের রূপ ফিরে পেলাম। আমি মানুষে পরিণত হয়ে গেলাম, তবে দুঃখ এই যে, একটা চোখটা আমাকে হারাতে হলো।

তারপর শাহজাদা সুলতানের দিকে ফিরে তারস্বরে বলতে থাকে, 'আব্বাজান আমার সারা শরীরটা আগুনে জ্বলে যাচ্ছে। শয়তানটার তাপ আমার বুকে এসে লেগেছে, মৃত্যু আমার আসন্ন। আফ্রিদি একজন দৈত্য, আর আমি একজন মানবী, দৈত্যের সঙ্গে পারবো কি করে বলো? যদি মানুষ হতো, তাহলে তো লড়াইয়ের শুরুতেই ওকে আমি খতম করে দিতে পারতাম। তরমুজের দানাগুলো মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত দৈত্যের সঙ্গে লড়াইয়ে আমিই জয়ী হচ্ছিলাম প্রতিক্ষেত্রে। কিন্তু ভাগ্যের এমন পরিহাস যে, তরমুজের শেষ দানাটা কোন রকমে ঠোঁটের নাগাল পেলেও শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারলাম না, সেটা ছিটকে গিয়ে পড়লো চৌবাচ্চার জলের মধ্যে। অথচ সেটা ঠিক সময়ে উদরস্থ করতে পারলে সেই মুহূর্তে দৈত্যটার নিশ্চিত মৃত্যু ঘটতো। তার পরেও জলে-স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র লড়াইয়ে আমার কাছে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়েছিল সে। আমার হাতে নিশ্চিত মৃত্যু জেনে অগ্নিকক্ষের দরজা খুলে আত্মহত্যা করতে যায় সে। কিন্তু আমার মাথায় তখন জিদ চেপে বসে, নিজের হাতে ওকে আমি খতম করবো। তাই ওর দেখাদেখি আমিও অগ্নিকক্ষের দরজা খুলে প্রবেশ করি নিজের দেহটা অঙ্গারে পরিণত করার জন্য। ইচ্ছে ছিলো সেই আগুন দিয়ে ওকে পুড়িয়ে মারি, নিজের হাতে ওকে খতম করি।

কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে শেষ পর্যন্ত এরকম জিদের বসে আমি ওর পিছু নিলাম। ও তো অগ্নিকক্ষে প্রবেশ করে আত্মহত্যা করতেই চেয়েছিল, নিজের হাতে ওকে খতম করার বাসনা ত্যাগ করলে এখন আমাকে এভাবে অসময়ে চলে যেতে হতো না। তবে এ সবই আমার নিয়তি আব্বাজান। হয়তো আল্লার মনে এটাই ছিলো। এরই নাম বিধিলিপি, কে খণ্ডাবে। এই মুহূর্তে আল্লা ছাড়া আর কাউকে আমি স্বীকার করি না। তার আর প্রাণ, তার কর্তৃত্ব আমাকে মানতেই হবে। মহম্মদ আল্লাহর পয়গম্বর, তার আদেশে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে তোমাদের ছেড়ে। আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করুন। এবার আমার যাবার সময় হয়ে এলো আব্বাজান। আমার সারা দেহ জ্বলে যাচ্ছে। উঃ—

এতো বলে শাহজাদার কথা জড়িয়ে এলো, চোখ বুঁজে এলো। একসময়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লো সে আফ্রিদি দৈত্যের দেহাবশেষের পাশে, সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটাও একটা ছাই-এর ডেলায় পরিণত হয়ে গেলো।

আমরা শোক প্রকাশ করলাম তার জন্য। নিজেকে আমার তখন ভীষণ অপরাধী বলে মনে হলো। মনে হলো, শাহজাদার মতো যদি আমার অবস্থা হতো, তাহলে তার অমন সুন্দর মুখ পুড়ে ছাই হওয়ার বীভৎস দৃশ্য আমাকে দেখতে হতো না। আমার শাপমুক্তির জন্য তাকে এভাবে আত্মাহুতি দিতে হলো, সেই অনুশোচনায় আমার সারা মন দগ্ধ হতে থাকলো তখন।

কন্যাকে হারিয়ে শোকে-দুঃখে সুলতানের তখন পাগলের মতো অবস্থা। নিজের হঠকারিতার জন্য নিজেকে অভিযুক্ত করলেন তখন তিনি ভাবছিলেন, আমাকে বানর থেকে মানুষ করে দেওয়ার জন্য শাহজাদাকে অনুরোধ না করলে আজ তার এ অবস্থা হতো না নিশ্চয়ই। সেখানে তাকে অনুতপ্ত সুলতান নিজের দুর্মতির জন্য আল্লাহর কাছে মাফি চাইলেন। তারপর কন্যার ভস্মীভূত দেহা-

ধশেষের সামনে গিয়ে আর স্থির থাকতে পারলেন না। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মেঝের ওপর।

হারেমের বেগমরা এবং ক্রীতদাসীরা দ্রুত ছুটে এলো তার তার জ্ঞান ফেরানোর জন্য।

তারপর বাদশাহী মর্যাদায় শাহজাদীর উদ্দেশে সাতদিন ধরে রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হলো।

পরে সুলতানের আদেশে শাহজাদার ভস্মীভূত দেহের ছাই সংরক্ষিত করবার উদ্দেশে একটা স্মৃতি-মিনার তৈরী করা হলো। আর আফ্রিদির দৈত্যের পোড়া দেহের ছাই আল্লাহর অভিশাপের হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হলো।

তারপর কন্যার শোকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাসখানেক পড়ে আল্লাহর কৃপায় সুস্থ হয়ে উঠে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন একদিন তার দরবারে

'শোনো বাছা. তুমি এখানে আসার পর থেকেই আমাদের অমঙ্গল দেখা দেয়। তোমার জন্য আমার কন্যাকে হারাতে হলো, এই একমাসের মধ্যে প্রায় শতাধিক প্রজা প্রাণ হারিয়েছে অসময়ে। আমার থুতান পুড়ে গেছে, নিচের পাটির সব দাঁত আগুনে পুড়ে খসে পড়েছে, এমন কি আমার অতি বিশ্বস্ত খোঁজাও তোমার অশুভ আবির্ভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। অবশ্য তোমাকে আমি অপরাধী করতে চাই না, তোমার কোন দোষ নেই বাছা। শুধু তোমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আমাদের ভাগ্য জড়াতে গিয়ে আজ আমাদের এই ভাগ্য বিড়ম্বনা। এ আমাদের নিয়তি ছাড়া আর কিছু নয়। যাইহোক আল্লাহর কৃপায় আমার কন্যা তার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তোমাকে বানর থেকে মানুষ করে দিয়ে গেছে। তুমি তোমার আসল রূপ ফিরে পেয়েছো, এই যথেষ্ট। এবার তুমি এখান থেকে বিদায় হও। তোমার ভাগ্য আমাদের সঙ্গে থাকলে আরো কি দুর্ভাগ্য আমাদের জীবনে নেমে আসে কে জানে। তাই আবার আমি বলছি, এই মুহূর্তে তুমি আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও। আর যদি না যাও আমি তোমাকে অবশ্যই খতম করে দিতে বাধ্য হবো আমাদের সুখ-শান্তির জন্য।

তারপর আমি তার সামনে থেকে চলে এলাম নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে একা একা। বিশ্বাস করুন মালকিন, তখন নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল আমার। আমি অপয়া, অপদার্থ এবং হতভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়। এছাড়া তখন আমার অন্য আর কোন পরিচয় থাকার নয়। স্মৃতিমন্থন করতে গিয়ে আমার তখন মনে হলো, কেন আমার দেখা হলো সেই দর্জির সঙ্গে, কেনই বা সেই সুন্দরী পাতাল নগরীর প্রেমে পড়তে গেলাম, আর কেনই বা সেই আফ্রিদ দৈত্যটা আমাকে খতম করতে উদ্যত হয়েও প্রাণে বেঁচে গেলাম আমি। তা না হলে বানরের রূপ নিয়ে সুলতানের প্রাসাদে প্রবেশ করতে হতো না আমাকে। তবে আল্লাহর অপার কৃপার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার বাঁ-চোখটা নষ্ট হলেও আজ আমি আমার মানুষের রূপ ফিরে পেয়েছি।

সুলতানের প্রাসাদ ছেড়ে আসার আগে বাথরুমে প্রবেশ করে প্রথমে আমার দাড়ি-গোঁফ এবং ভ্রু কামিয়ে সারা মাথায় ছাই মেখে নিই। তারপর কালান্দরের কালো চলের পোষাক চাপিয়ে অজানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। বিশ্বাস করুন মালকিন, তারপর থেকে নিজের ওপর কেবলি ঘৃণা হয়েছে, সেই ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য তো আমিই দায়ী। সেই অনুশোচনায় আমার চোখের ঘুম উধাও, কেবলি কেঁদে চলেছি—

তারপর নানান দেশ ঘুরে অবশেষে আমার স্বপ্নের দেখা এই বাগদাদ শহরে এসে হাজির হই আজ রাত্রে। শুনেছি এখানকার সুলতান নাকি বড় বাণিক, দুঃখীর দুঃখ শোনেন মন দিয়ে, তার দুঃখের ভাগ নেন তিনি নির্বিবাদে। ইচ্ছে ছিলো,

তাঁর কাছে আমার এই ছোট্ট জীবনের সব দুঃখ খুলে বলি। এখানে এসে আল্লার দোয়ায় প্রথমেই দেখা হয়ে যায় আমাব এক ভাই ঐ প্রথম কালান্দরের সাথে। এই শহরে সে-ও নবাগত, আমার মতোই তার জীবন ভাগ্য-বিড়ম্বিত। তাই তাকে আদাব জানিয়ে বললাম, 'আল্লাহ তোমাকে শান্তি দিন!' তারপর ঐ তৃতীয় কালান্দরের সঙ্গে আমাদের দেখা হতেই সে বলে ওঠে, 'আল্লাহ তোমাদের মনে শান্তি ফিরিয়ে দেন যেন' এ শহরে আমি এক আগন্তুক।'

প্রত্যুত্তরে আমরা তাকে বললাম, 'আমরাও এ শহরে আগন্তুক।' আমরা এখানে শন্তির খোঁজে এসেছি।' তারপর আমরা তিনজন কালান্দব এখানে এসে হাজির হই, তার আগে আমরা কেউ কারোর জীবনের দুর্ভাগ্যের কাহিনী জানতাম না। এই হলো আমার জীবনের করুন কাহিনী, আমার দাঁড়ি-গোঁফ এবং ভ্রু কামানোর কাহিনী। লজ্জায়, ঘৃণায় এ কাজ করে আমি কালান্দরের বেশ ধারণ করেছি। শুনলেন তো আমার বাঁচোখ খোয়া যাওয়ার করুণ ইতিহাস।

সব শুনে বড়বোন বলে, 'সত্যি তোমাব জীবনের কাহিনী বড় অদ্ভুত, বড় বিচিত্র। আমি তৃপ্ত। তুমি মুক্ত, তুমি এখন এখান থেকে ফিরে যেতে পারো।'

'কিন্তু মালকিন, আমি এখান থেকে নড়ছি না, যতক্ষণ না আমার সঙ্গী তৃতীয় কালান্দরের করুণ কাহিনী নিজের কানে শুনছি।'

এরপর তৃতীয় কালান্দর এগিয়ে এসে বললো, 'তাহলে শুনুন মালকিন। আমাব জীবনের কাহিনী ঠিক ওদের মতো নয়, তবে আরো চমকপ্রদ এবং রোমাঞ্চকর অবশ্যই। ওদের ক্ষেত্রে অজান্তে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলেও আমাব এই চোখটা খোয়া যাওয়ার জন্য মূলতঃ আমি নিজেই দায়ী। এর জন্য নিয়তিকে আমি আমার ভাগ্যের পরিহাস হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই না। তাহলে শুনুন আমার জীবনের কাহিনী।

তৃতীয় কালান্দরের কাহিনী

জানেন মালকিন, আমিও একজন বাদশাহ, আমার আব্বাজানও বাদশাহ ছিলেন। আমি বাদশাহ খাজিবের পুত্র অজিব। আমার রাজত্বকালে প্রজারা বেশ সুখে-শান্তিতে কাটাচ্ছিল। কারোর ওপরই অন্যায় অবিচার আমি করিনি কখনো। আমার সাম্রাজ্যটা সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিলো বলেই বোধহয় ছেলেবেলা থেকে সমুদ্রযাত্রা আমার খুব প্রিয় ছিলো। সমুদ্রের মধ্যেকার দ্বীপগুলো ছিলো আমাব অধিকারে, সেই দ্বীপগুলো পরিদর্শনে যেতাম রণতরী সাজিয়ে।



এক মাসের সমুদ্রযাত্রার এমনি এক আয়োজন করে দশখানি রণতরী ভাসিয়ে কুড়িদিন কাটানোর পর হঠাৎ একদিন সমুদ্রের বুকে প্রচণ্ড জলোচ্ছাস

দেখা দিলো, সেই সঙ্গে দারুণ ঝড়ঝঞ্ঝা। যাহোক সারাদিন, সারারাত্রি সেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চলার পর শান্ত হলো সমুদ্র, শিশুর মতো আবার কলকলিয়ে উঠলো। আমাদের জাহাজগুলো তখন একটা অজানা ছোট্ট দ্বীপের তীরে গিয়ে ভীড়ে ছিল। সেই অজানা দ্বীপে কয়েকদিন কাটিয়ে আবার আমরা সমুদ্রযাত্রা শুরু করলাম দেশে ফেরার জন্য।

একটানা কুড়িদিন সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার পরেও হারানো পথের নিশানা খুঁজে পেলাম না। আমরা তখন এক অজানা সমুদ্র পথে ভেসে চলেছি পথে হারানো পথিকের মতো। ফেরার পথ তখন দূর অস্ত। তখন খোদা আল্লাহর কাছে আমার একটিই প্রার্থনা কেবল, খোদা আমাদের সঠিক পথের ঠিকানা দেখিয়ে দাও। আমি আমার দেশে ফিরতে চাই।

জাহাজের নাবিক নেতা তখন দিশেহারা। এ সমুদ্রপথ তার অচেনা, কোথায় চলেছে সে জানে না। কেবল অদূরে সমুদ্রের ওপারে দেখা যায় একটা অজানা পাহাড়, কখনো সেটা উজ্জ্বল, আবার কখনো কালোয় মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে। পাহাড়টার গায়ে গাঁথা আছে হাজার হাজার চুম্বক, সেটার নাম চুম্বক-পাহাড়। সেই পাহাড়টার দিকে আমাদের জাহাজ যতো এগোবে, চুম্বকের আকর্ষণ ততই বাড়বে। এক সময় চুম্বকের আকর্ষণ খুব তীব্র হয়ে উঠলে আমাদের জাহাজগুলো সেই চুম্বক-পাহাড়ের গায়ে আছড়ে গিয়ে পড়বে। জাহাজের ধাক্কায় জাহাজগুলো তখন ভেঙ্গে চুড়মাড় হয়ে যাবে। এগারো দিন হলো আমরা সমুদ্রে পথ হারিয়ে অচেনা জায়গায় ভেসে চলেছি। আগামীকালই আমাদের জাহাজগুলো দূরের ঐ চুম্বক-পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে।

জাহাজের নাবিক নেতা বিমর্ষ গলায় বলতে থাকে, 'আমাদের দিন এখন খুব সীমিত, মৃত্যুর প্রহর গুণতে হবে এখন থেকে। এখন খোদা আল্লাহর নাম স্মরণ করা ছাড়া অন্য কোন পথ তো দেখতে পাচ্ছি না জাঁহাপনা। অদ্যই শেষ রজনী আমাদের! আগামী কালই ঐ চুম্বক-পাহাড়ের ধাক্কায় বেঘোরে আমাদের সবার প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। আজ পর্যন্ত যতো জাহাজ পথ হারিয়ে ঐ পাহাড়ের আকর্ষণের আওতায় গিয়ে পড়েছে, কোন জাহাজই অক্ষত অবস্থায় ফিরে যেতে পারেনি, জাহাজের সব যাত্রীদেরই প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে ঐ নিষ্ঠুর পাহাড়ের মরণ-ফাঁদের কোলে। তাই আমার আশঙ্কা, আমরা কেউই আর জীবিত থাকছি না আগামীকাল।

একটু থেমে তেমনি বিমর্ষ গলায় নাবিক নেতা আবার বলতে শুরু করে, 'জানেন জাঁহাপনা ঐ পাহাড়ের চূড়ায় হলুদ রঙের একটা বিরাট গম্বুজ আছে, আন্দালুসিয়ার, দশটা খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই গম্বুজটা। আর সেই গম্বুজের উপরে রয়েছে পিতলের একটি ঘোড়-সওয়ার। রণ-সাজে সজ্জিত সেই ঘোড়-সওয়ার, যার বুকে একটি সীসার ফলক আটকানো আছে। সেই সীসার ফলকে তার নাম লেখা আছে এবং সেই সঙ্গে সেই মারাত্মক দৈববাণীটা লেখা আছে, 'যতদিন সে ঐ ঘোড়ার উপরে সওয়ার হয়ে থাকবে, এই পাহাড়ের আওতায় কোন জাহাজ এসে পড়লে তার আর নিস্তার নেই, সেই জাহাজের কোন যাত্রী তার মৃত্যুর পরওয়ানা অস্বীকার করতে পারবে না। তাই ঐ ঘোড়-সওয়ারকে ঐ ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলতে না পারলে মানুষের জীবন নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা কখনো বন্ধ হবে না।

তারপর মালকিন, তৃতীয় কালান্দার বলতে থাকে, আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় নাবিক নেতা চোখের জলে ভাসিয়ে দিতে থাকে। এবং আমরা সবাই তখন জেনে গেছি, আমাদের মউৎ অবশ্যম্ভাবী। তাই আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে যে যার ইচ্ছের কথা প্রকাশ করলাম।

উদ্দেশ্য আমাদের মধ্যে যদি কেউ এই অনিবার্য মৌতের হাত থেকে রেহাই পায়, তাহলে সে আমাদের ইচ্ছের কথা আমাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে প্রকাশ করবে।

সেই রাত্রে আমাদের কারোর চোখে ঘুম এলো না। পরদিন ভোর হতেই আমরা দেখলাম, আমাদের জাহাজগুলো সেই কালো চুম্বক পাহাড়ের খুব কাছে গিয়ে প ড়ছে। সেই সময় সমুদ্রের জল উত্তাল হয়ে উঠলো। আমাদের জাহাজগুলোয় বেশ কিছু লোহা I লো, চুম্বকের আকর্ষণে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড় ই সেগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। উত্তাল জলের স্রোতে আমরা তখন কে কোথায় ভেসে গেলাম ঠাওর করতে পারলাম না কেউ। যে ক'জন বেঁচে রইলাম কেউ কাউকে চেনার মতো অবস্থা তখন আমাদের ছিলো না।

জানেন মালকিন আমার নিজের ক্ষেত্রে বলতে পারি, খোদা আল্লাহর কৃপায় সেই প্রচণ্ড দুর্যোগেও আমি বেঁচে গেলাম সে যাত্রায়। আমার জাহাজ উত্তাল জলের ঢেউ-এ পড়ে গেলেও ভাসতে ভাসতে সেই পাহাড়ের কোনে বালির চরে গি য় আটকা পড়লাম। সেই পাহাড়ে ওঠার পথ দেখতে পেয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করে আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম।

ওদিকে তখন ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরা-জাদ তার কাহিনী অসমাপ্ত রেখে পরদিন আবার তার কাহিনী শুরু করার অনুমতি চাইল শাহরিয়ারের কাছে।

পরদিন রাত আবার গভীর হলে বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে শাহরাজাদ তার আগের দিনের সেই অসমাপ্ত কাহিনী বলতে শুরু করলো, জাঁহাপনা, সেই তৃতীয় কালান্দার তখন বড়বোনকে বলতে থাকে। (বাকী লোকেরা তার কথা কান খাড়া করে শুনতে থাকে এবং ক্রীতদাসরা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে থাকে):—

আল্লাহর নাম নিয়ে এক পা এক পা করে সিঁড়ি বেয়ে সেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলাম। আল্লাহর কৃপায় অনুকূল হাওয়া বইছিল বলে আমার উঠতে একটুও কষ্ট হলো না। গম্বুজের নিচে দাঁড়িয়ে খোদা আল্লাহকে শুক্রিয়া জানিয়ে সেখানে আমার ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলাম বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। এক সময় ঘুম নেমে আসে আমার চোখে, স্বপ্নের মধ্যে এক রহস্যময় কণ্ঠস্বর আমার কানে ভেসে এলো, 'ওহে খাজিবের পুত্র। ঘুম থেকে জেগে উঠে তোমার পায়ের তলাকার মাটি খুঁড়ে দেখতে পাবে একটা পিতলের ধনুক এবং তিনটি সীসের তৈরী তীর, সেই তীর-ধনুকটা দৈবশক্তি সম্পন্ন। তারপর সেই ধনুকে একটার পর একটা তীর ছুঁড়ে গম্বুজের উপরে ঐ ঘোড় সওয়ারকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করো। তার-পরেই দেখবে ঘোড় সওয়ারটা গম্বুজচ্যুত হয়ে সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাবে, সেই সঙ্গে তামাম দুনিয়ার মানুষ এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রেহাই পাবে চিরদিনের মতো। ঘোড় সওয়ারের পতনের সাথে সাথে দেখবে ঘোড়াটাও তোমার পায়ের নিচে এসে পড়েছে। তখন তুমি তাকে ধনুকের গর্তে রেখে মাটি চাপা দিয়ে দিও।

আর তারপরেই দেখতে পাবে, সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে উঠছে সেই জল ফাঁপতে ফাঁপতে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় তোমার পায়ের নিচে এসে ঠেকবে। এবং তখনই তোমার চোখে পড়বে অদূরে ঘোড়-সওয়ারের মতো অবিকল দেখতে (যাকে তুমি তীর-বিদ্ধ করে সমুদ্রের জলে ফেলে দেবে) একটি লোক হাল্কা ছোট একটা নৌকো চালিয়ে এগিয়ে আসছে তোমার দিকে, তার দু'হাতে থাকবে দুটি বৈঠা। সে তোমাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যই আসবে। তবে ভুলেও যেন তার সামনে বিসমিল্লাহ কিংবা আল্লাহর নাম নেবে না কখনো, নিলেই একটা

অঘটন ঘটে যেতে পারে। তারপর একটানা দশ-দিন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সে তোমাকে এক নিরাপদ দ্বীপে পৌঁছে দেবে। সেখান থেকে কাছাকাছি বন্দরে তুমি পৌঁছে যাবে খুব সহজেই। সেই বন্দরের লোকেরাই দেশের লোকদের কাছে তোমার খবর পৌঁছে দেবে। তবে এ সবই সম্ভব যদি না তুমি তার সামনে আল্লাহর নাম না নাও।

সেই অনিন্দ্য-সুন্দর স্বপ্ন শেষ হতেই আমার ঘুম গেলো ভেঙ্গে। স্বপ্নে পাওয়া দৈববাণীর প্রতিটি আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম, এবং সেই রহস্যময় ভবিষ্যৎবাণীগুলো এক এক করে ফলে যেতে থাকলো আমার চোখের সামনে, শাহজাদা।—তৃতীয় কালান্দর বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত একটা ছোট্ট হাল্কা নৌকার দাঁড় টেনে ব্রোঞ্জ-মানুষের মতো অবিকল চেহারার সেই লোকটা আমার দিকে এগিয়ে এলো। তার বুকে আঁটা ফলকে সেই দৈববাণীটা লেখা আছে, আমি তার নৌকোয় উঠে বসলাম। দশ দিন সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার পর স্বপ্নে শোনা সেই নিরাপদ দ্বীপের কাছে গিয়ে পৌঁছতেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'খোদা, আল্লাহ! তুমিই আমাদের পয়গম্বর, আমাদের উদ্ধারকর্তা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তুমি! তুমিই আমার একমাত্র ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র মত এবং পথ?

আমার কথা শেষ হওয়া মাত্রই সেই নৌকোটা হঠাৎ সমুদ্রের জলে ডিগবাজি খেলো এবং আমাকে জলের উপরে আছড়ে ফেললো। একটু পরেই নৌকাটা সমুদ্রের অতল জলে তলিয়ে গেলো। মোটামুটি ভালো সাঁতার জানি, রাত্রি নামা না পর্যন্ত সারাটা দিন সমুদ্রের উত্তাল জলে সাঁতার কাটলাম। হাত-পা এবং কাঁধ দুটো অবশ হয়ে আসতে থাকলো। তখনো সমুদ্রের সেই প্রলয় নৃত্যের নূপুর ধ্বনি আমার কানে এসে আছড়ে পড়ছিল। আসন্ন মৃত্যুর কথা চিন্তা করে আল্লাহর স্মরণ নিলাম। খোদার অপার করুণা, তিনি বোধহয় আমার প্রার্থনা শুনতে পেয়েছিল। মনে হলো এক সময় আমার দেহটা শূন্যে একবার উত্থিত হয়েছিল বোধহয়, তারপর আমার জ্ঞান ছিলো না। জ্ঞান যখন ফিরলো, তাকিয়ে দেখি, বালুকা-বেলায় আমার ক্লান্ত অবশ দেহটা পড়ে আছে। এ সবই পয়গম্বরের ইচ্ছা। সূর্য-স্নাত আলোয় ভিজে পোষাক মেলে দিলাম, শুকিয়ে গেলো খানিক পরে।

চোখ মেলে ভালো করে তাকাতে গিয়ে দেখি, চারিদিকে জল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা একটা সুন্দর সবুজ দ্বীপের মধ্যে একটা গাছের নিচে আমি একা নিঃসঙ্গ, সেখানে আমার জীবন অনিশ্চিত, যে কোন মুহূর্তে আমার জীবন বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। নিজেকে আমি শুধোই, 'একটা নৌকার জন্য আমাকে আবার কি ভয়ঙ্কর মাশুল দিতে হবে কে জানে। কিন্তু শিয়রে নিশ্চিত মৃত্যু জেনে যখন শেষের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তের প্রহর গুনছি, ঠিক তখনই দূর সমুদ্রে আগুয়ান একটা জাহাজ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, ছোট্ট একটি বিন্দুর মতো। জানি না, জাহাজটা আমার মৃত্যুবাণ বহন করে নিয়ে আসছে কিনা। এবার আর কোন ভুলচুক নয়, আগে-ভাগে সেই গাছের উপরে উঠে বসলাম নিজেকে গাছের পাতায় আড়াল করে রাখলাম।

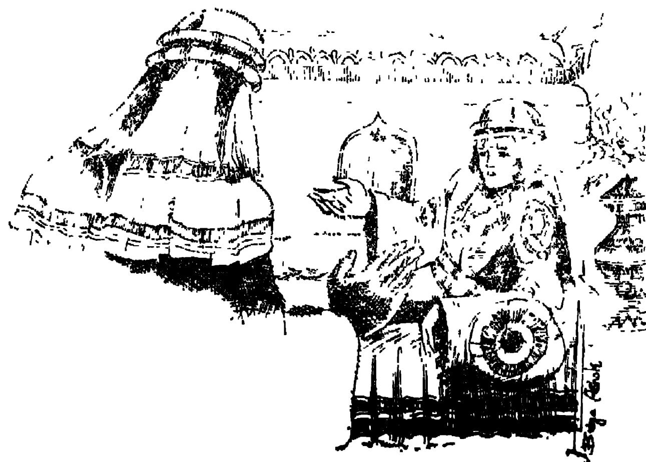
যথা সময়ে জাহাজটা দ্বীপের সামনে এসে নোঙর করলো। জাহাজ থেকে নামলো দশজন নিগ্রো ক্রীতদাস, সবার হাতে মাটিকাটা একটা কোদাল এবং ঝুড়ি। তারা দ্বীপের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। একটু সময়ের অপেক্ষা, তারপরেই সেখানকার মাটি খুঁড়ে একটা লোহার পাত বার করলো, পাতাল-পুরীর দরজা সেটা। দরজাটা খোলার পর তারা আবার ফিরে যায় জাহাজে। একটু পরে তারা মাথায় করে বসবাস করার উপযোগী আসবাবপত্র, খাবার-দাবার বয়ে এনে সেই

দরজা পথের সিঁড়ি বেয়ে পাতাল-পুরীতে রেখে আসতে থাকে। সব শেষে তাদের সঙ্গে জাহাজ থেকে নেমে এল এক বৃদ্ধ শেখ বছর পনেরোর এক কিশোরের হাত ধরে। গাছের উপর থেকে দেখলাম, ভারি সুন্দর দেখতে সেই ছেলেটি। পরণে দামী পোষাক। মণি-মুক্তা-খচিত পোষাকের আড়াল থেকে ছেলেটির রূপ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার সেই অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ দেখে কাব্য করে বলতে ইচ্ছে হলো ঃ

কি অপরূপ রূপ তোমার,
হে সুন্দর,
লজ্জায় মুখ নত করে
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা দ্বীপপুঞ্জ,
কে তুমি! আমার হাজার প্রশ্ন
তোমাকে ঘিরে।

তারপর জানেন মালিক, সেই গুপ্ত দরজা দিয়ে নিচে পাতালপুরীতে নেমে যাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক কি তারও বেশি সময় তাদের কোন পাত্তা ছিলো না। এক সময় বৃদ্ধ শেখকে সঙ্গে নিয়ে সেই দশজন ক্রীতদাস আবার উপরে উঠে এসে গুপ্ত দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দিলো, সেই কিশোরটি কিন্তু ফিরলো না। তারা তাকে পাতাল-পুরীতে বন্দী করে রেখে জাহাজে ফিরে গেলো। একটু পরেই জাহাজটা আবার ভাসতে শুরু করলো সমুদ্রে।

আমার তখন দারুণ কৌতূহল। অচেনা জায়গায় ঐ সুন্দর ফুটফুটে ছোট্ট কিশোরটিকে কেনই বা তারা ওখানে বন্দী করে রেখে গেলো, সেটা জানার ভীষণ ইচ্ছে হলো আমার। ঐ সুড়ঙ্গ-পথে নামার কায়দা আমি সব দেখে রেখেছিলাম গাছের উপর থেকে। জাহাজটা চোখের আড়াল হয়ে যাওয়ার পর গাছ থেকে নেমে সেই গুপ্ত দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর মাটি খুঁড়ে লোহার দরজা খুলে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম অতঃপর। সুন্দর করে সাজানো একটা হলঘর। মেঝের উপর নানান রঙের কার্পেট পাতা রয়েছে। কারুকার্য খচিত সিল্কের কাপড় দিয়ে মোড়া দেওয়াল। দামী দামী সোফা-কৌচ শোভা পাচ্ছিল হলঘরে, সেই সঙ্গে সুগন্ধী আতরের খুশবু। সুমিষ্ট গন্ধে মন তখন আমার বিভোর। আমি যেন কোন বাদশাহের হারেমে প্রবেশ করেছি নীরবে নিভৃতে। ভালো করে চোখ মেলে তাকাতে গিয়ে চোখে পড়লো হলঘরের এক কোণায় একটা কৌচের উপর হেলান দিয়ে বসে আছে সেই কিশোরটি, সামনে টেবিলের উপর নানান রঙের সুন্দর সুন্দর ফুলের তোড়া শোভা পাচ্ছিল। একা বসেছিল সে বিরাট হলঘরে, তৃতীয় কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব অনুভূত হলো না।



আমার চোখে তার চোখ পড়তেই তার মুখটা এক অজানা আতঙ্কে ছেয়ে গেলো, মনে হলো আমাকে দেখে সে খুব ভয় পেয়েছে। তবে আমি আমি তাকে সালাম জানিয়ে হাতের ইশারায় শান্ত হতে বলে মুখ খুললাম, 'তোমার কোন ভয় নেই দোস্ত। আমার তরফ থেকে তোমার কোন অমঙ্গল হওয়ার আশঙ্কা নেই। তোমার মতোই আমি একজন রক্ত-মাংসের মানুষ, আমি এক বাদশাহের পুত্র। তোমাকে আমি সঙ্গ দিতে এসেছি তোমার একাকিত্ব ঘোচাতে এসেছি। একটু থেমে তাকে বললাম, 'এবার তুমি আমাকে তোমার কাহিনী শোনাও। কি কারণে তোমাকে এই পাতালপুরীর এমন বন্দীজীবন বেছে নিতে হলো, বলো ?'

আমি যে কোন দৈত্য নই আমি তার মতোই একজন মানুষ, তার বক্তব্যের কথাটা উপলব্ধি করে কিশোরটি মুখ খুললো, 'তাহলে ভাই আমার জীবনের বিচিত্র কাহিনী বলি, শোনো তুমি। আমার আব্বাজান একজন জওহরী, হীরে, মণি মুক্তোর ব্যবসায়ী, প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী। অনেকদিন পর্যন্ত খোদা আল্লাহ্ তার বংশ রক্ষা করার জন্য একটি ছেলেও দেননি। একদিন রাত্রে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে একটা দৈববাণী শুনতে পান তিনি, খুব শীগগীর তিনি একটি ছেলের পিতা হতে যাচ্ছেন, তবে সেই পুত্র স্বল্পায়ু হবে। আল্লার নাম নিয়ে আমার আব্বাজানের ঘুম ভাঙলো পরদিন সকালে। পরদিন রাতে আমার মা আমাকে গর্ভে ধারণ করলেন। এবং আমার পিতা তার গর্ভবতী হওয়ার তারিখটা লিপিবদ্ধ করে রাখলেন সেদিন। আমি আমার পিতার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান। আমার জন্মলগ্নে আব্বাজান প্রতিবেশীদের এবং ফকির সাহেবদের খুব ধুমধাম করে খাওয়ালেন।'

তারপর সেই দৈত্যবাণীর কথা স্মরণ করে তিনি একদিন তামাম দুনিয়ার গণৎকারদের ডেকে পাঠালেন আমার ভবিষ্যৎ জানার জন্য। আমার জন্মলগ্নের দিন-ক্ষণ এবং ঠিকুজি বিচার করে তাঁরা আমার আব্বাজানকে একটা অশুভ সংবাদ দিলেন, 'আপনার পুত্রের আয়ু মাত্র পনেরো বছর। তার বয়স ঠিক পনেরো বছর পূর্ণ হওয়ার দিন তার জীবনে একটা অমঙ্গলের ছায়া দেখা যাচ্ছে, এবং সেই মুহূর্তটা সে যদি নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিতে পারে তাহলে দীর্ঘদিন বাঁচবে সে। আর তার মৃত্যুর কারণটা এই রকম : সমুদ্রের মাঝখানে একটা বিরাট উঁচু চুম্বকের পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে একটি পিতলের ঘোড়সওয়ার আছে। সমুদ্রে সেই ঘোড়-সওয়ারের পঞ্চাশ দিন পরে আপনার পুত্রের মৃত্যু ঘটবে। মৃত্যু ঠিক নয়, একরকম হত্যাই বলা যেতে পারে। আপনার পুত্রের হত্যাকারী বাদশাহ খাজিরের পুত্র আজিব।'

গণৎকারদের ভবিষ্যৎবাণী শোনার পর আব্বাজান তো দারুণ মুষড়ে পড়লেন। আমার পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত আমাকে বাড়ির বাইরে যেতে দিলেন না। বাড়িতেই আমার পড়াশোনা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হলো। তাই অচিরেই প্রচুর জ্ঞান হাসিল করে আমি শিক্ষিত মানুষ বনে গেছি। দশদিন আগে আব্বা খবর পান, সেই ঘোড়সওয়ারকে নাকি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছে, এবং যে তাকে ফেলেছিলো তার নাম আজিব, বাদশাহ খাজিরের পুত্র। খবরটা শোনার পর থেকে তো কেঁদে-কেটে অস্থির, গণৎকারদের ভবিষ্যৎবাণী বুঝি এবার ফলতে শুরু করেছে। কারণ আজ থেকে দশদিন আগে আমার বয়স পনেরো পূর্ণ হয়েছিল। যাইহোক, আমার মৃত্যুর শঙ্কিত আব্বাজান হঠাৎ দৈত্য জিনের মত উঠে পড়ে লেগে গেলেন আমার মৃত্যু-যোগ খণ্ডন করার জন্য। জমিনের নিচে এই পাতালপুরী আগেই তৈরি করে রেখেছিলেন তিনি। সেই অশুভ খবরটা শোনার পর আল্লার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র বোঝাই করলেন এখানে। তারপর আজ এখানে আমাকে ছেড়ে

রেখে গেলেন তিনি। দশদিন অতিবাহিত ইতিমধ্যে। আজ থেকে চল্লিশ দিন পরে আমার বিপদ কেটে গেলে তিনি আবার এখানে এসে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। শাহজাদা আজিবের ভয়েই তার এই ব্যবস্থা নেওয়া। এই হলো আমার কাহিনী এবং এখানে আমার নিঃসঙ্গ থাকার কারণ।'

জহুরীর ছেলের আশ্চর্য কাহিনী শুনে আমি তো অবাক। নিজের মনে বলি 'হাঁ, আমিই সেই শাহজাদা আজিব যে এক সময় কাণ্ডকারখানা ঘটিয়েছি। কিন্তু এবার দুনিয়ার মালিক আল্লাহ আমার সাক্ষী, আমি বিশ্বাস করি, নিশ্চয়ই আমি তাকে খুন করতে যাবো না।'

তাই আমি তাকে ভরসা দিতে গিয়ে বললাম, তুমি আমার মালিক প্রভু। আল্লাহর নাম নিয়ে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি বেঁচে থাকতে তোমার অমন সর্বনাশ হতে দেবো না কখনো। এই চল্লিশ দিন আমি তোমার পাশে থাকবো, তোমার আজ্ঞাবাহক নফরের মতো তোমার সেবা করবো। বিপদে তোমাকে সাহায্য করবো, দেখি কে তোমার সর্বনাশ করতে আসে। তারপর চল্লিশ দিন পার তোমাকে বিপদমুক্ত করে তোমার দেশে আমি ফিরে যাবো। তারপর সেখান থেকে তোমার লোক-লস্করদের সঙ্গে নিয়ে আমি আমার নিজের দেশে ফিরে যাবো। খোদা আল্লাহর দোয়ায় আমার জন্য এ-যাত্রায় তুমি নিশ্চয়ই প্রাণে বেঁচে যাবে।'

আমার কথা শুনে খুব খুশি হলো ছেলেটি, মনে জোর পেল, তার মন থেকে অস্বস্তির ভাবটা কেটে গিয়ে মনে হলো আমাকে সে তার দোস্ত হিসেব গ্রহণ করতে রাজী। বিরাট আকারের মোমবাতির আলোয় পাতালপুরী আলোকিত করে তুললাম। আমি তাকে নিজের হাতে নৈশভোজ পরিবেশন করলাম, তার হাতে সরাবের পাত্র তুলে দিলাম এবং নিজেও খেলাম। এই ভাবে গল্পগুজব করতে করতে রাতের অধিকাংশ সময় কেটে গেলো।

পরদিন সকালে জল গরম করে ছেলেটির গোসলের ব্যবস্থা করলাম। আমার আদর-যত্নে প্রীত হয়ে ছেলেটি খুশিতে গদগদ হয়ে বলে, 'এ যেন খোদার আশীর্বাদ, আমার এই বিপদের দিনে আমার কাছে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন বুঝছি, তুমিই আমার সত্যিকারের দোস্ত। প্রথমে তোমাকে দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে ছিলাম, সেই ভয়টা এখন আর আমার নেই। আল্লাহর দোয়ায় আমি যদি বিপদমুক্ত হয়ে বেঁচে থাকি, বাদশাহ খাজিবের পুত্র আজিবের হাত থেকে আমি যদি রক্ষা পাই, যদি গণৎকারদের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যে প্রমাণ হয়, আব্বাজানকে বলে তোমার উপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা আমি করবো। এবং তোমাকে প্রচুর ধন-সম্পত্তি যৌতুক দিয়ে তোমার দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দেবো। আর যদি একান্তই আমার মৃত্যু হয়, এবং আমার সব আশীর্বাদ তোলা থাকবে তোমারি জন্য।'

উত্তরে আমি তাকে বলি, 'শয়তান যে দিনটিতে তোমার সর্বনাশ করবে, সেই দিনটি যেন না আসে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই, তোমার শেষ দিন আসার আগেই যেন মৃত্যু হয়। তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে চাই দোস্ত। তোমার প্রাণ রক্ষা করতে আমি আমার জান কবুল করছি।'



জানেন মালকিন, এই ভাবে দিনের পর দিন আমি তাকে আদর যত্ন করতে গিয়ে কেমন যেন একটা মায়ায় পড়ে গিয়ে এই বললাম, 'গণৎকাররা মিথ্যে কথা বলেছে। বাদশাহ খাজিবর পুত্র আজিব নাকি তাকে হত্যা করবে। না, আমি তাদের সব ভবিষ্যতবাণী মিথ্যে প্রমাণ করে দেবো।'

তবে আমার মনের ভাব ছেলেটির কাছে সম্পূর্ণ গোপন রেখে প্রতিদিন প্রতি রাত্রে নানান ধরণের গল্প বলে এবং খেলাধূলা করে তার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কটা ক্রমশঃ সহজ করে তুললাম। আমরা দুজন দুজনের সত্যিকারের দোস্ত হয়ে গেলাম। এই ভাবে উনচল্লিশটা দিন পার করে অবশেষে সেই অভিশপ্ত চল্লিশতম দিনে এসে উপস্থিত হলাম। চল্লিশতম রজনীতে ছেলেটি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমাকে বলে, 'তুমি আমার প্রকৃত দোস্ত, আমার ভাইজান, আমি যে এখনো বেঁচে আছি, সে সবই খোদারই কৃপায়, তাঁকে আমার সুক্রিয়া জানাই, তোমার দোস্তকে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন। আমার দুঃখের দিনগুলিতে সঙ্গ দেওয়ার জন্য যদি না তিনি পাঠাতেন আমার আশঙ্কা ভয়ে শঙ্কায় হয়তো করেই আমি খতম হয়ে যেতাম। আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন তোমাকে তোমার দেশে ফিরিয়ে দেন। ভাইজান, এখন আমি গোসল করতে চাই, আমার জন্য গরম জলের ব্যবস্থা করো।'

'হ্যাঁ দোস্ত আমি তোমার হুকুমের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, আমি এখুনি জল গরমের ব্যবস্থা করছি।'

আমি তাকে হামামে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে তাকে ভালো করে গরম জলে স্নান করলাম, তার ক্লান্তি দূর করলাম।

তারপর ছেলেটি বলে, 'দোস্ত, এবার আমাকে তরমুজ কেটে খাওয়াও একটু চিনি মিশিয়ে দিও।'

ভাঁড়ার ঘর থেকে একটা তরমুজ সংগ্রহ করে নিয়ে এসে তাকে বললাম, 'মালিক, তোমার কাছে ছুরি আছে?'

'ঐ তো, আমার মাথার উপরে তাকের মধ্যে রয়েছে।'

অতএব পালঙ্কের উপর উঠে তাড়াতাড়ি করে তাক থেকে ছুরিটা নিতে যাই, ছুরিটা হাতে নিয়ে নামতে যাবো হঠাৎ পাটা আমার ফসকে যায় তাকে সামলাতে না পেরে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুরি হাতে ভারি দেহ নিয়ে যুবকের বুকের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম আর সেই মুহূর্তে গণৎকারের ভবিষ্যতবাণী ফলে গেলো। আমার হাতের ছুরিটা ছেলেটির বুকে



আমূল বিঁধে গিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো সে। তারপর যে মুহূর্তে আমি জানলাম ছেলেটি খুন হয়েছে এবং আমি তার খুনী, নিজের উপরে ভীষণ রাগ হলো, চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম, নিজে নিজের গালে চড় বসিয়ে দিলাম উত্তেজনায়। আল্লাহর কাছে অনুযোগ করে আপন মনে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'হায় আল্লাহ, এ আমি কি করলাম। গণৎকারদের ভবিষ্যতবাণী আমি যে মানতে চাইনি তখন। ভেবেছিলাম তাদের সব গণনা আমি মিথ্যে প্রমাণ করবো। এমন সুন্দর ফুটফুটে ছেলের মৃত্যু আমি চাইনি। আমি যে তাকে কথা দিয়েছিলাম, তার মৃত্যুর আগে আমার যেন মৃত্যু হয়। কিন্তু তা হলো কই? আমি যদি তরমুজ কাটার জন্য চেষ্টা না করতাম, তাহলে বোধহয় অমন অঘটন ঘটত না। এর জন্য আমার মনে কম অনুশোচনা হচ্ছে না! এ কি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা? কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা! সহ্য করা যায় না আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। বিশ্বাস করো, এর পিছনে আমার কোন হাত ছিলো না, ছিলো না কোন অভিপ্রায়। আমি নির্দোষ, নিরপরাধ। কিন্তু এ তোমার কি ইচ্ছা, এ তোমার কি খেলা প্রভু?

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো ভোর হয়ে আসছে। তাই সে তার কাহিনী অসমাপ্ত রেখে বাদশাহ শাহরিয়ারের দিকে তাকাল তাঁর অনুমতি পাওয়ার জন্য।



পরদিন রাত গভীর হলে পর শাহরিয়ার তাঁর ক্লান্ত দেহটা পালঙ্কের ওপরে এলিয়ে দিলে শাহরাজাদ তার অসমাপ্ত কাহিনী বলতে শুরু করলো।

জানেন মালকিন, বড়বোনকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'আমি খুনী, নিশ্চিত করে জেনে যাওয়ার পর সেই পাতালপুরীর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম, সাবধানে গর্তের মুখটা লোহার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। এবং তার ওপর মাটি ছড়িয়ে দিলাম। তারপর সমুদ্রের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলাম, একটা জাহাজ দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসছে, ভীষণ ভয় পেলাম তখন। একটু পরেই তারা এখানে এসে যখন দেখবে ছেলেটি মৃত, তারা ধরে নেবে, আমিই তাকে খুন করেছি। এবং তারা তখন আমাকে হত্যা করবে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না।'

অতএব আমি তখন খুব উঁচু একটা গাছের ওপরে চড়ে বসে আমার শরীরটা গাছের পাতায় ঢেকে দিলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে জাহাজটা তীরে এসে নোঙর করলো। সেই জহুরীকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে ক্রীতদাসরা পাতালপুরীর দরজা খুলতে গিয়ে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। লোহার ঢাকনার ওপর ছড়ানো মাটি তখনো ভিজে এবং আলগা ছিলো। তাদের সন্দেহ হলো, তবে কি তাদের আসার আগে কেউ এখানে এসেছিল? বৃদ্ধ জহুরী ভাবেন, তাঁর আদরের একমাত্র ছেলে কি তাহলে—

দ্রুত লোহার ঢাকনা সরিয়ে ক্রীতদাসরা ত্রস্ত পায়ে নিচে নেমে গিয়ে দেখে, তাদের সন্দেহটা অমূলক নয়। মৃত অবস্থায় ছেলেটি পালঙ্কের উপরে পড়ে আছে, বুকের উপরে বিদ্ধ ছুরি, তখনো রক্ত ঝরে পড়ছিল ফোঁটা ফোঁটা ক্ষতস্থান থেকে, তার পরনের নতুন পোষাক রক্ত মাখা। সেই মর্মান্তিক দৃশ্যটা দেখে তারা তাদের চোখের জল সম্বরণ করতে

পারলো না। চীৎকার করে খুনীকে অভিশাপ দিতে থাকে তারা। তাদের মধ্যে একজন ওপরে উঠে এসে বৃদ্ধ জহুরীকে সেই দুঃসংবাদটা দিয়ে বললো, তাঁর বংশ রক্ষা করার জন্য কেউ আর রইল না। ডুকরে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধ।

অবশেষে ছেলেটিকে নতুন একটা সিল্কের কাপড়ে জড়িয়ে উপরে তুলে নিয়ে এলো এবার। তারা ফেরার জন্য তৈরী হলো। বৃদ্ধ তখন ছেলেটির মুখের উপর থেকে সিল্কের আচ্ছাদন সরিয়ে তার নিহত পুত্রের মুখ দেখতে গিয়ে কাঁকিয়ে ওঠার মতো কেঁদে উঠলেন, শোকে দুঃখে নিজের দাড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

গাছের উপর থেকে সেই মর্মান্তিক দৃশ্য আমাকে দেখতে হলো, অনুশোচনায় আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। নিজেকে তখন আমার ভীষণ অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। যন্ত্রণায় আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল তখন। গাছের একটা ডাল শক্ত করে আঁকড়ে ধরলাম পড়ে যেতে গিয়ে। মনের দুঃখে আমি গেয়ে উঠলাম—

আল্লাহ, আর কতো অজস্র বেদনা তুমি দেবে,
আর কত করুণ দৃশ্য আমায় দেখতে হবে
জীবনের এই দুঃখের দিনে,
আর কত দুঃখের বোঝা তুমি আমার
বাড়াবে,
তুমি অন্তর্যামী, তুমি জানো,
আমি কোন অপরাধ করিনি এখানে।

বৃদ্ধ জহুরীর জ্ঞান যখন ফিরতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, সূর্য তখন অস্তাচলে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি আবার তাকালেন পাকা টম্যাটোর মতো তার নিহত পুত্রের দিকে। তিনি তখন তার ভাগ্যের কথা ভাবছিলেন, আর তার চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছিল।

ওদিকে জাহাজ তখন ছাড়বার জন্য প্রস্তুত। ক্রীতদাসরা তাদের প্রভুকে অনুসরণ করে জমিন থেকে ধুলো তুলে যে যার মাথায় ঠেকালো। তারপর নিহত ছেলেটির মৃতদেহ জাহাজের সামনে নিয়ে আসে। একটু পরেই তারা সবাই জাহাজে উঠে বসলো, এবং একটু পরেই জাহাজটা জলে ভাসতে থাকলো।

এক সময় জাহাজটা আবার চোখের আড়াল হতেই আমি গাছ থেকে নেমে এলাম এবং লোহার দরজা সরিয়ে পাতালপুরীতে নেমে গেলাম। শূন্য পাতালপুরী। পাতালপুরীর সব কিছু তখন আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল ছেলেটির কথা। তার অভাবে আমার বুকটা হাহাকার করে উঠল। আমি যে তাকে কথা দিয়েছিলাম, আমার জান দিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করবো। তার মৃত্যু হলো, অথচ আমি এখনো বেঁচে আছি, এর চেয়ে বেশি দুঃখ আর কি হতে পারে আল্লাহ।

তারপর মালিকন, সেই দ্বীপে আমি দিনের বেলায় একা একা ঘুরে বেড়াই, আর রাত্রে সেই পাতালপুরীতে গিয়ে নিদ্রা যাই, আমার দুঃখের বোঝা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। এই ভাবে একটি মাস কাটানোর পর হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম, সমুদ্রে চড়া পড়েছে, জল সরে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে একদিন সেই বিরাট সমুদ্র মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেলো। ভাবলাম, এবার আমার দুঃখের বোঝা বোধহয় হাল্কা হতে শুরু হলো। আল্লাহ আমার প্রার্থনা শুনতে পেয়েছেন। এবার আমি পায়ে হেঁটে জনমানব শূন্য সেই দ্বীপ ছেড়ে লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছতে পারবো। মনের আনন্দে আমি তখন হাঁটতে শুরু করলাম। খানিক দূর যেতেই অদূরে আগুনের শিখা দেখতে পেয়ে মনটা আমার খুশিতে ভরে উঠলো। মানুষ ছাড়া আগুন জ্বলতে পারে না। তাহলে ওখানে নিশ্চয়ই মানুষের বসতি আছে।

বালির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই আগুনের কাছে গিয়ে দেখি, সেটা আগুন নয়, তামার প্রাসাদের উপরে সূর্যের আলো পড়ে জ্বলজ্বল করছিল. দূর থেকে সেটা আগুন বলেই মনে হচ্ছিল। খুব আনন্দ হলো, এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে প্রাসাদ থাকা মানেই লোকজনের মুখ দেখতে পাওয়া। গেটের সামনে দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে সবে মাত্র একটু বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি, সেই সময় দামী পোষাকে সজ্জিত দশটি যুবক এসে আমার সঙ্গে দেখা করলো, তাদের প্রত্যেকের বাঁ-চোখ কানা, ... পড়ানো। তাদের সঙ্গে এলো এক বৃদ্ধ শেখ তাদের আগমনে আমি বুকে বল পেলাম যেন।

আমাকে সেলাম জানিয়ে তারা সম্ভাষণ জানালো এবং আমার সেখানে আগমনের কারণ জানতে চাইল। আমি আমার সুখ দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে বললাম তাদের। তারা আমার জীবনের করুণ কাহিনী শুনে আহত হলো। আমাকে সহানুভূতি জানিয়ে আহ্বান জানালো প্রাসাদের অভ্যন্তরে যাওয়ার জন্য।

সুন্দর করে সাজানো প্রাসাদ কক্ষ। জমিনের উপরে দামী গালিচা পাতা রয়েছে। ঘরের চারপাশে দামী কৌচ—নীল গালিচায় মোড়ানো। এবং ঘরের মাঝখানে ছোট একটি কৌচ, আর দশটি কৌচের মতোই নীল গালিচায় ঢাকা। প্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করা মাত্র সেই দশটি যুবক দশটি কৌচে আসন গ্রহণ করলো। এবং বৃদ্ধ শেখ ঘরের মাঝখানের ছোট কৌচের উপরে বসে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো। 'হে যুবক, মেঝের উপর বসে পড়ো। তবে আমাদের ব্যাপারে কোন রকম কৌতূহল প্রকাশ করবে না, জানতে চাইবে না, আমাদের সবার বাঁ-চোখ কানা কেন?'

বৃদ্ধ শেখ উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে মাংসের পাত্র ও মদ নিয়ে এসে দশটি যুবককে পরিবেশন করলো নিজের হাতে। সেই সঙ্গে আমাকেও। তখন আমি যেন তাদেরই একজন হয়ে গেছি। তারপর তারা আমার কাছে আমার সেই দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী শুনতে চাইল গভীর আগ্রহ নিয়ে। এবং অধিক রাত্রি পর্যন্ত আমি আমার জীবনের করুণ কাহিনী বলে গেলাম তাদের সামনে।

তারপর সেই যুবকরা সমবেত ভাবে বলে উঠলেন, 'প্রার্থনা করার সময় তো হয়ে এলো শেখ, কই আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের ব্যবস্থা তো এখনো করলেন না?'

প্রত্যুত্তরে শেখ বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ এখুনি এনে দিচ্ছি', এই বলে সে উঠে দাঁড়ালো এবং একটা আলমারির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেলো তার দেহটা। একটু পরেই সে ফিরে এলো, হাতে তার দশটি পাত্র জাতীয় ট্রে। ট্রের মুখগুলি ঢাকা দেওয়া, ট্রের ভিতরে নানা মতো জিনিষ। প্রতিটি যুবকের সামনে একটি করে ট্রে সাজিয়ে দেয় সে এবং একটি করে মোমবাতি জ্বেলে দিলো সে নিজের হাতে। তারপর এক এক করে ট্রের ঢাকনা সে খুলে দিতেই আমার চোখে পড়লো কিছু ছাই, কাঠকয়লার গুঁড়ো।

যুবকরা সবাই তখন তাদের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে কেঁদে উঠলো। এবং কাঁদতে কাঁদতেই তারা সেই কালি-ঝুলি মেখে মুখ কালো করে ফেললো এবং যে যার বুক চাপড়াতে চাপড়াতে হতাশ সুরে চিৎকার করে বললো, 'আমরা বেশ আরামেই ছিলাম, কিন্তু আগবাড়া ভাবটা আমাদের ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে দিলো।' তাদের সেই হা-হুতাশ চললো পরদিন সকাল না হওয়া পর্যন্ত, যতক্ষণ বৃদ্ধ ফকির তার আসন থেকে উঠে গিয়ে তাদের জন্য গরম জলের ব্যবস্থা করলো।

হামামে গিয়ে কালি-ঝুলি মাখা ভালো করে ধুয়ে মুছে পরিস্কার পোষাক পড়ে ফিট ফাট বাবু সেজে যখন বসলো, তখন তাদের চেনাই যায় না যেন।









জানেন মালকিন, ক্রম-পরিবর্তিত ঘটনাগুলো দেখে আমি তো তখন থ। সেই বাগু কারখানার পিছনে যে গূঢ় রহস্যটা লুকিয়েছিল সেটা না জানা পর্যন্ত আমার মন কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না। আমার মনে তখন কেবল একটাই চিন্তা ওর ঠিক ঠিক উত্তরগুলো আমাকে জানতেই হবে। তাই আমি সেই যুবকদের কাছে আমার সেই বহু প্রতীক্ষিত প্রশ্নটা উত্থাপন করলাম, 'অস্বীকার করবো না, আমি [illegible] সবাই খোলা মন নিয়ে এখানে এসেছি হাসি-খুশিতে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার জন্য, অথচ নিজের কানে শুনলাম তোমাদের হা-হুতাশ, বুক-ফাটা আক্ষেপ। কেন এমন হলো দোস্ত? খোদা অলৌকিক [illegible] সবাই সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ। তবু [illegible] কালি-ঝুলি [illegible] দৃশ্য [illegible] করলো, তা [illegible] তোমাদের শরীরে [illegible] না বললে বেঁচে থাকতে পারবো না। তোমাদের একটা চোখ কেন কানা হলো, কেন বা তোমরা অমন বিশ্রীভাবে মুখে কালি-ঝুলি মাখলে, কারণ জানতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে। বলবে দোস্ত, তোমাদের সেই করুণ ইতিহাস আমাকে?'

এবার তারা আমার দিকে এমন অদ্ভুত চোখে তাকালো, যেন আমি কোন ভয়ঙ্কর প্রশ্ন করেছি। তারপর উত্তরে তারা বললো, 'হে যুবক তোমার যৌবন সুলভ কোন কৌতূহল প্রকাশ করো না এখানে, কোন প্রশ্ন আমাদের করো না। উত্তর দিলে তোমার খুব ক্ষতি হবে।'

তারপর তাদের সঙ্গে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম অবশেষে। তারা ঘুম থেকে জেগে উঠতেই বৃদ্ধ শেখ আমাদের জন্য কিছু খাবারের যোগাড় করলেন। আগের দিনের মতো বৃদ্ধ আমাদের খাবারের পাত্রগুলো নিজেই পরিষ্কার করলেন। এরপর রাত্রি নামা না পর্যন্ত তারা গল্প-গুজব করে কাটিয়ে দিলো। এক সময়ে রাত্রি নামতেই তারা বৃদ্ধের উদ্দেশে বলে, 'এবার আমাদের জিনিষ-পত্র নিয়ে আসুন, নিদ্রা যাওয়ার সময় যে হয়ে এলো।'

আগের দিনের মতো একটা পাত্রে ছাই এবং পোড়া পাত্রের কালো ঝুল নিয়ে এসে তাদের সামনে রাখলো বৃদ্ধ শেখ। এবং আগের দিনের মতো সেই ছাই ও কালো ঝুল তারা তাদের মুখে মাখলো। সেই অদ্ভুত দৃশ্য আমাকে একমাস অপেক্ষা করে দেখতে হলো তাদের সঙ্গে থেকে। যতো দেখি ততই যেন অবাক হই। আমার কৌতূহল ভরে যায় কানায় কানায়। এক সময় এমন অবস্থায় এসে পৌঁছুই যে, তখন খা যা-দাওয়ার কথা একেবারে ভুলে যাই। অবশেষে আমি যেন আমার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। অধৈর্য হয়ে তাদের বলি, 'শোন দোস্ত, তোমরা আমার এই [illegible] কৌতূহল [illegible] বলো তোমরা [illegible] কেন তোমাদের [illegible] কানা [illegible], আর কেনই বা [illegible] না [illegible] বেশ [illegible] কিন্তু আমাদের ভীষণ [illegible] [illegible] দিলো। আর কেনই বা তোমাদের বাঁ-চোখ কানা হয়ে গেলো?'

উত্তরে তারা বলে, 'এ সব [illegible] গোপন রাখলেই ভালো হয়। আমরা তোমার ভালোর জন্য এসব কথা গোপন রাখতে চাইছি। আমাদের মতো তোমার সর্বনাশ যাতে না হয়, যাতে একটা চোখ হারিয়ে আমাদের মতো তোমাকে দুরবস্থায় পড়তে না হয়, সেই জন্যই তোমার কোন প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে চাই না।'

'তবু তোমাদের বলতেই হবে। যেচে আমি আমার সব সর্বনাশ চেয়ে নিয়ে বলছি, তোমরা আমার কৌতূহল মেটাও। এ ধরণের কৌতূহল চেপে রাখার থেকে ক্ষতি স্বীকার বোধহয় অনেক ভালো। অবশ্য তোমরা যদি একান্তই বলতে না চাও, তাহলে আমি আমার দেশে ফিরে যাচ্ছি। তোমাদের অমন কষ্টের দৃশ্য আমি দিনের পর দিন দেখতে

পারবো না। এ প্রসঙ্গে বহুল প্রচলিত সেই প্রবাদটার কথা মনে পড়ে গেলো :

'সেই ভালো তোমরা অপেক্ষা করো,
আমি চলে যাই।
আমার এই মন, এই চোখ বড়
ব্যথা পায়, তোমাদের সালাম জানাতে
চাই।

তারপর তারা আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, 'মনে রেখো, তোমার সর্বনাশের জন্য পরে যেন আমাদের দোষারোপ করো না।'

এরপর একটা ভেড়া নিয়ে এসে তারা তাকে জবাই করে গায়ের ছালটা ছাড়িয়ে ফেললো। ভেড়ার ছালটা আমার হাতে তুলে দিয়ে এবং আমার হাতে একটা ধারালো ছুরি দিয়ে তারা বললো, 'এই চামড়ায় তোমার দেহটা ঢেকে ফেলো, তারপর আমরা সেলাই করে দেবো বাইরে থেকে। তখন তোমার দেহটা ঠিক একটা ভেড়ার আকৃতি পাবে। তোমাকে এই প্রাসাদের ছাদে রেখে আসা হবে ঐ অবস্থায়। এক সময় রুখ পাখি আসবে তোমাকে জ্যান্ত ভেড়া ভেবে তার ঠোঁটে করে নিয়ে যাবে আকাশের অনেক উপর দিয়ে, অনেক উঁচু একটা পাহাড়ের আকাশ ছোঁয়া চূড়ায় গিয়ে নামবে সে এক সময়। তোমার যখন মনে হবে, পাখিটা আর উড়ছে না, তখন তুমি ঐ ছুরি দিয়ে সেলাই কেটে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তোমাকে দেখে রুখ পাখিটা ভয় পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উড়ে পালাবে তোমাকে মুক্ত করে দিয়ে। তারপর সেখান থেকে আধবেলা হাঁটতে হাঁটতে নেমে আসবে পাহাড়ের নিচে, যেখানে তোমার চোখে পড়বে একটা বিরাট রাজ-প্রাসাদ, সোনার পাতে মোড়া প্রাসাদ, প্রাসাদের গায়ে দামী দামী মনি-মানিক্য বসানো। তোমার বাসনা মতো সেই প্রাসাদে প্রবেশ করবে তুমি, যেমন আমরা একদিন প্রবেশ করি তোমার মতো এক অদম্য কৌতূহল নিয়ে, এবং হাতে হাতে তার ইনাম আমরা পেয়ে যাই। পরে বাঁ-চোখ হারিয়ে প্রতিদিন রাত্রে মুখে কালি-ঝুল মাখাটাও আমাদের ইনামের একটি অংশ। আমাদের জীবনের বাকী ইতিহাস বলতে গেলে সে কাহিনী অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে, অনেক সময় লাগবে।'

জানেন মালকিন, তাদের জীবনের সেই রহস্য কাহিনী শোনার পর এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করলাম আমি মনে মনে, এবং তাদের নির্দেশ মতো যা করার আমি করলাম এক এক করে।

এক সময় রুখ পাখিটা তার সেই বিরাট দেহটা বহন করে নিয়ে এসে সেই উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় এনে নামালো। তারপর ভেড়ার চামড়ার খোলস থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে শুরু করলাম সেই প্রাসাদে পৌঁছানো না পর্যন্ত। আমি সেখানে যেতেই প্রাসাদের দরজা খুলে যায় [illegible] একটা বিরাট হল [illegible] ঘোড়-দৌড়ের মাঠের [illegible] চারিদিকে এক [illegible], চন্দন কাঠের দরজা। [illegible] একটা মিষ্টি সুবাস ভেসে আসে। সেই বিরাট প্রাসাদ কক্ষের উপরে ঝুলন্ত আলিন্দ। সেদিকে তাকাতেই আমার দৃষ্টি স্থির হলো। [illegible] চোখে দেখলাম চল্লিশজন সুন্দরী যুবতী [illegible] খচিত হলঘরের একটা [illegible] আলিন্দের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের পরনে দামী পোষাক, অঙ্গে হীরা-জহরতের গহনা। সেই সব গহনাগুলোর উপরে আলো [illegible] করছিল চাঁদের আলো মতো [illegible] যেন একটা আকাশ [illegible] চল্লিশটি যুবতী যেন এক একটা পূর্নিমার চাঁদের মতো ভাসছিল আমার চোখের সামনে। তাদের সেই অপরূপ রূপ দেখে আমার খুব ইচ্ছে হলো সেই রূপ-সাগরে ডুব দিয়ে অবগাহন করি, তার জন্য আমি তখন তাদের আজ্ঞাবাহক ক্রীতদাস হতেও রাজি ছিলাম মনে মনে।

আমাকে দেখে তারা সবাই আমার কাছে এগিয়ে এলো এবং তাদের কোকিল-কণ্ঠের মিষ্টি-মধুর সুর ধ্বনিত হলো আমার কানে।

'এসো আমাদের মালিক, তুমি আজ আমাদের মেহমান। এসো, আমাদের সঙ্গে আনন্দ করো, স্ফূর্তি করো। আজ আমাদের কি সৌভাগ্য তোমাকে আমরা আমাদের একান্ত কাছে পেয়েছি। জানো মালিক, সারাটা মাস ধরে আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। খোদা আল্লাহর কাছে সুক্রিয়া জানাই, তোমার মতো এমন একজন সুপুরুষ যুবককে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আর আমরাও কম সুন্দরী নই তোমার কাছে, সে তুমি দেখতে পাচ্ছো নিশ্চয়ই।'

তারপর তারা আমাকে একটা উঁচু ডিভানের উপরে বসিয়ে বলে, 'আজ তুমি আমাদের মালিক, আমাদের প্রভু, এবং আমরা তোমার ক্রীতদাসী, অতএব প্রভু, এবার তোমার যা ইচ্ছে হয় আমাদের হুকুম করো, আমরা তোমার আজ্ঞা পালন করবো।'

তাদের অমন মন ভোলানো কথায় আমার দিল গেলো ভরে। তাদের মধ্যে একজন আসর থেকে উঠে গিয়ে মাংস নিয়ে এলো, আমরা সবাই বেশ তৃপ্তি সহকারে খেলাম। তাদের মধ্যে কয়েকজন গরম পানি দিয়ে আমার হাত পা ধুইয়ে দিলো খুব যত্ন করে এবং আমার নোংরা পোষাক বদলাতে ব্যস্ত হলো। অন্যেরা তখন সরবৎ তৈরী করে এনে আমার মুখের সামনে ধরলো। নিজের হাতে



আমাকে কিছুই করতে হলো না, আশ্চর্য। আমাকে পেয়ে তারা আমার চারপাশে খুশির আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। কি ভাবে যে তারা আমাকে আদর করবে ভেবে পায়না। তারা যেন দিশেহারা আমাকে তাদের সোহাগ জানাতে।

রাত নামা না পর্যন্ত তারা আমার সঙ্গে গল্প গুজব-করে কাটাল। তারপর এক সময় পাঁচটি যুবতী আসর ছেড়ে উঠে যায়। একটু পরে তারা ফল, ফুল, সুগন্ধী খাবার এবং শেষে সরাবের ট্রে নিয়ে এলো। খাবার ও সরাব পান করে তারা নাচ-গান ও হৈহুল্লোড়ে মেতে ওঠে। তাদের সেই আনন্দের অংশীদার আমিও হলাম। চল্লিশটি সুন্দরী যুবতীর স্পর্শ-সুখে আমি তখন এতই অভিভূত যে, আমি তখন আমার সব দুঃখ-যন্ত্রণা নিমেষে ভুলে গিয়ে বলে উঠলাম, 'আ, এরই নাম জীবন। এই ভাবেই জীবনকে উপভোগ করতে হয়। তা না হলে জীবন?'

তারা তখন আমার মনের গোপন খবরটা বুঝি পেয়ে গেছে। তাই আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললো, তুমি আমাদের মালিক। আমাদের মধ্যে একজনকে তুমি বেছে নাও, যাকে তোমার পছন্দ হয়। সেই হবে আজ রাতে তোমার শয্যা-সঙ্গিনী। এর পর থেকে চল্লিশ দিনের আগে তাকে তুমি আর তোমার শয্যায় আহ্বান করতে পারবে না। বুঝলে আমাদের মালিক।'

অতঃপর আমি এক নিখুঁত সুন্দরী যুবতীকে নির্বাচন করলাম আমার সেদিনের শয্যা-সঙ্গিনী হিসাবে। হরিণীর মতো সদা-সতর্ক তার চোখের দৃষ্টি, মুক্তোর মতো সুন্দর সারিবদ্ধ দাঁত, উন্নত নাসা, কাঁধের উপরের এলায়িত ঘন কালো চুল, জোড়া ভ্রূ, সু-উচ্চ বুক-জোড়া ঠিক যেখানে ঢল নেমেছে, নাভীর ঠিক উপরের উপত্যকার যে কোন পুরুষের মুখ লুকোতে ইচ্ছে হবে।

প্রথম রাত্রে সেই মেয়েটিই হলো আমার রাতের সঙ্গিনী বলতে পারেন, আবার বিবিও বলতে পারেন। আমার মনে হয়, সে আমাকে তার যে আদর সোহাগ এবং দৈহিক সুখ দিয়ে সারারাত ধরে তৃপ্তি দিলো, বোধহয় শাদী করা বিবিও তা দিতে পারে না। এক কথায় আমরা দুজন দুজনের দেহ লেহন করে চলি সারারাত ধরে। পরদিন প্রভাত সমাগম হতে সে আমাকে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে স্নান করালো, নতুন পোষাক পড়িয়ে দিলো। তারপর রাত নামা না পর্যন্ত আগের দিনের মতো খাওয়া-দাওয়া, নাচ গান এবং সরাব পান করে সারাটা দিন কাটালাম আমরা।

দ্বিতীয় দিন রাত গভীর হলে দ্বিতীয় একটি মেয়েকে বেছে নিয়ে আগের মতো সেই মেয়েটির ঘরে রাত কাটালাম। আগের রাতের মতোই মেয়েটির সঙ্গে সুখ-তৃপ্তি কথা ভাসিয়ে দিলাম।

এই ভাবে চল্লিশটি যুবতী আমার সঙ্গে চল্লিশটি সুখের রাত্রি ও দিন কাটিয়ে তারা একদিন তাদের নববর্ষের দিনে হাজির হলো। কিন্তু সেই দিনটি তাদের কাছে মোটেই সুখকর হলো না। তারা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে আমার কাছে এলো আমার কাছে বিদায় নিতে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি তাদের দিকে। শঙ্কিত হই, তাহলে কি সুন্দরী চল্লিশটি ললনার সঙ্গ আমাকে ত্যাগ করতে হবে? আমার কথায় বিস্ময় ঘনায়, 'কি ব্যাপার? তোমরা আমার মনটাকে এভাবে ভেঙ্গে দিচ্ছো কেন?'

'তোমাকে ছেড়ে যেতে আমাদেরও কি কম কষ্ট হচ্ছে।' কাঁদতে কাঁদতে তারা বলতে থাকে, 'তোমাকে আমরা এর আগে কখনো দেখিনি, এর আগে তোমাকে এতো কাছে কখনো পাইওনি। তুমি আসার আগে আমাদের জীবনে বহু পুরুষ এসেছে তারা আমাদের দেহ নিয়ে খেলা করেছে, তৃপ্তি পেয়েছে তারা এবং আমাদেরও দিয়েছে। কিন্তু তোমার মতো এমন অভুতপূর্ব সুখ বোধহয় কেউ দিতে পারেনি এর আগে। তুমিই আমাদের প্রথম

পুরুষ, যে আমাদের সুখের সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে পেয়েছে। তোমার পৌরুষ, তোমার সঙ্গ পেয়ে এতদিন আমরা এক স্বপ্নের দেশে বিচরণ করছিলাম। তাই তো তোমাকে ছেড়ে যেতে আমাদের এত কষ্ট হচ্ছে। তবু, তবু আমাদের চলে যেতে হবে তোমাকে ছেড়ে, এটাই এখানকার নিয়ম।' বলে তারা আবার কাঁদতে শুরু করলো।

তখন আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, 'তা তোমাদের এই কান্নার প্রকৃত কারণ কি তা তো আমাকে খুলে বলবে? তা না বললে আমার যে এখন পেট ফাটার মতো অবস্থা।'



'মালিক, তুমি, হ্যাঁ তুমিই আমাদের আজকের কান্নার কারণ। তুমি যদি আমাদের কথা মন দিয়ে শোনো, তাহলে তোমার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ হবে না কখনো। আর যদি না শোনো, তাহলে তোমার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ অনিবার্য, ফিরে কোন দিন তোমার সঙ্গে আমাদের আর মিলন হতে পারে না। কিন্তু আমাদের দিল বলছে, তুমি আমাদের কথা শুনবে না, তাই তো আমাদের এই কান্না, এতো হা-হুতাশ।'

'এবার বলো, এর উপায় কি?

'তাহলে শুনুন আমাদের মালিক, আমরা সবাই এক বাদশাহের কন্যা, যিনি এখানে এক সময় বছরের পর বছর ধরে থাকতেন আমাদের সঙ্গে। বছরে চল্লিশ দিন আমরা এখান থেকে অন্যত্র চলে যাই, এবং পরের বাকী দিনগুলি কাটানোর জন্য এখানে অপেক্ষা করি হাসি আর আনন্দের মধ্যে দিয়ে। আমাদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আজই আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হচ্ছে। আমাদের আশঙ্কা আমাদের অনুপস্থিতিতে এই চল্লিশ দিন এখানে থাকাকালীন তুমি আমাদের নির্দেশ অমান্য করবে এবং তাতেই তোমাকে আমাদের হারাতে হবে। এই নাও চাবির গোছা, চল্লিশটা ঘরের চাবি আছে এর মধ্যে। উনচল্লিশটা ঘর খুলে তুমি দেখতে পারো, কিন্তু চল্লিশতম ঘরটা তুমি কখনো খুলতে পারবে না (আল্লাহ এবং আমাদের জীবনের দোহাই!), আমাদের উপদেশ অমান্য করলে তোমার সঙ্গে আমাদের চির-দিনের বিচ্ছেদ ঘটে যাবে।'

আমি তাদের আশ্বাস দিয়ে বলি, তোমাদের সঙ্গে বিচ্ছেদের কারণ থাকলে আমি কথা দিচ্ছি, সেই ঘরটা খুলতে যাবো না কখনই। তারপর তাদের মধ্যে থেকে একটি মেয়ে আমার কাছে এসে দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে শায়েরী উচ্চারণ করলো:

ফিরে এসে আমার যদি
তোমার দেখা পাই প্রিয়তম,
দিল উজাড় করে জানাবো সালাম,
পেরিয়ে এসে সাত সমুদ্র তেরো নদী।
তামাম দুনিয়া তখন হাসবে,
তোবা তোবা জানাবে।
আর যদি তুমি হও আমাদের চোখের আড়াল,
আমরা তখন হাসবো না,
আমরা কাঁদবো,
খোদার কাছে নালিশ জানাবো



তার গালে আমার গাল, তার কাঁপা কাঁপা অধর আমার অধরে তখন মিলে গিয়ে একাকার। তার চোখের জলে আমার চোখ তখন ঝাপসা হয়ে উঠেছে। তার কান্না আমি তখন সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার হৃদয় চিরে যদি তাকে দেখাতে পারতাম, তাহলে সে নিশ্চয়ই দেখতে পেতো, আমার দিল সে কতখানি হরণ করে বসে আছে। শুধু সেই বা কেন বলছি, আমার হৃদয়ের আসনে চল্লিশটি বোনের আদর আর ভালবাসা খোদাই হয়ে গেছে তাদের অশ্রুর আখরে সেটা কখনো ভোলার নয়, মোছার নয়।

সেই কথাটা তাদের বোঝাবার জন্য বললাম, 'আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে তোমাদের কাছে আমি ওয়াদা করছি, চল্লিশতম ঘরের দরজা আমি খুলবো না।' হাসি মুখে আমি তাদের বিদায় জানালাম। তারপর তারা সবাই বেহেস্তের পরীর মতো ডানা মেলে আকাশে উড়ে গেল, হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানাতে জানাতে, শূন্য প্রাসাদে আমাকে এক বুক নিঃসঙ্গতার মধ্যে ফেলে রেখে দিয়ে।

তারপর সন্ধ্যা নামলে কি খেয়াল হলো প্রথম ঘরের দরজা খুললাম। এবং সেই দরজা খুলে সেখানে প্রবেশ করেই আমার মনে হলো, আমি যেন বেহেস্তে পৌঁছে গেছি ঘর নয় যেন একটা সাজানো বাগান, পাকা ফল ঝুলতে দেখলাম গাছে গাছে। গাছের আড়াল থেকে পাখিদের মিষ্টি সুরের গান ভেসে আসে বাতাসে সুগন্ধা ফুলের খুশবু মিষ্টি ফুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে এবং পাখিদের করুণ সুরের গান শুনতে শুনতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। চোখ বন্ধ করলেও পাকা আপেলের লাল রঙটা আমার মুদিত নয়নের সামনে বার বার ভেসে উঠতে থাকে।

পরদিন দ্বিতীয় ঘরটির তালা খুলে প্রবেশ করতেই দেখি চারিদিকে ফুলের বাগান, মাঝখান দিয়ে ছোট্ট একটা ঝরণা বয়ে যাচ্ছে। ঝরণার দুপাড়ে গোলাপ, জেশমন, লিলি এবং নাম না জানা আরো অনেক ফুলের সারি সারি গাছে রঙ বেরঙের ফুল ফুটে আছে। ফুলের খুশবু নাকে এসে লাগে, বুক ভরে ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ নিই।

তারপর তৃতীয় ঘরে প্রবেশ করে আমি অবাক হয়ে যাই, বিরাট হলঘরের দেওয়াল এবং মেঝের উপরে দামী দামী পাথর বসানো। চন্দন কাঠের খাঁচায় সুন্দর সুন্দর রঙিন পাখির ঝাঁক দুলছে, এবং তাদের মিষ্টি সুরের গান শুনতে শুনতে এক সময় আমি ঘুমিয়ে পড়ি সেখানে। ঘুম ভাঙলো ভোরের আলো ফুটে উঠতে। সব দুঃখ-কষ্ট আমি তখন ভুলে গেছি যেন।



তারপর চতুর্থ দিনের রাত্রে চতুর্থ দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই আমার চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার উপক্রম হলো। সেই ঘরের মধ্যে ছোট ছোট চল্লিশটি ঘর, সব ঘরেরই দরজা খোলা ছিলো। প্রতিটি ঘর হীরা জহরত, এবং মণি-মাণিক্যে ঠাসা। এক সঙ্গে এতো দামী দামী ধনবস্তু চোখে কখনো দেখিনি। ভাবতে অবাক লাগে একজন বাদশাহের পক্ষে এতো সম্পদ সংগ্রহ করা কি করে সম্ভব হলো। আমি কি তবে ভুল দেখছি? না, বার বার সেই একই দৃশ্য দেখতে আমার ভুল ভাঙলো। হ্যাঁ, আমি ঠিকই দেখেছি,

এক সঙ্গে এতো সম্পদ, অসম্ভব হলেও নিজের চোখকে অস্বীকার করতে পারলাম না। আনন্দে গদ গদ হয়ে তখন নিজের মনে বলে উঠি, 'আমি এখন এতো সব সম্পদের মালিক। বিশ্বাস করে মেয়েগুলো আমার হাতে চাবির গোছা তুলে দিয়ে গেছে। আল্লাহর দোয়ায় আমি এখন এই মহামূল্যবান প্রাসাদপুরীর একছত্র মালিক। বাদশাহের চল্লিশটি সুন্দরী কন্যা আমার হাতের মুঠোয় এখন। আমার এই অধিকারের উপর কেউ কোন দাবী করতে পারবে না।

এই ভাবে টানা উনচল্লিশ দিন ধরে প্রতি রাত্রে এক একটা ঘরে যত প্রবেশ করি ততই যেন অবাক হই। একটা বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতে আর একটা বিস্ময়ের মুখোমুখি হতে হলো আমাকে। তবু যেন আমার ক্লান্তি নেই, নেই কোন জড়তা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এখানে এসে আমার সব দুঃখ, সব বেদনা যেন উধাও হয়ে গেছে, তার বদলে অসীম আনন্দে আমার দিল খুশ হয়ে ওঠে। আপন মনে পরিচিত শায়েরী আওড়াই, ভালো ভালো সুস্বাদু খানা খাই আর আরামে নিদ্রা যাই রাজপ্রাসাদের দামী শয্যায়।

তবে তখনো বাকী ছিলো সেই অভিশপ্ত চল্লিশতম ঘরটি, যে ঘরে প্রবেশ করতে বারবার নিষেধ করে গিয়েছিল মেয়েগুলো। আল্লাহর নামে আমি শপথ নিয়েছিলাম তাদের কাছে এই বলে যে, আমি তাদের কথার অমান্য করে কখনো সেই ঘরটিতে প্রবেশ করবো না। কিন্তু কোথায় রইলো আমার সেই শপথের কথা। কোথায় রইলো তাদের ফিরে পাওয়ার চিন্তা? তারা আমার চোখের একটু আড়াল হতেই আমি যেন ভুলতে বসেছি তাদের কথা, তাদের চোখের জলে ভাসানো কাতর অনুনয়ের কথা। আমার সেই অদম্য কৌতূহলটা তখন দানা বাধতে বসেছে আমার মনে। আমার মধ্যে তখন একটা শয়তান যেন বাসা বেঁধে বসেছে। সেই শয়তানটা আমাকে ভুল পথে পা বাড়াতে শেখাচ্ছে। বার বার আমার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে যেন বলছে, ঐ দরজাটা খোল, ঐ দরজাটা খুলে না দেখলে তোর কিছুই দেখা হবে না। ঐ ঘরের মধ্যেই তোর ভূত, ভবিষ্যত সব কিছুর ইঙ্গিত আছে। দেখ, খুলে দেখ। এতদিন এখানে থেকে ঐ ঘরটা না দেখে এখান থেকে ফিরে গেলে তোর জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অতএব—

আমার মনেও তখন দারুণ কৌতূহল, কি আছে ঐ ঘরে দেখতেই হবে। জানতে হবে কেন মেয়েগুলো আমাকে ঐ ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করে গেলো?

তাই চল্লিশ দিনের দিন রাত্রে সেই চল্লিশতম ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করলাম। তারপর অনেক ভাবনা-চিন্তার পর এক সময় বলতে গেলে একরকম মনের জোরেই দরজাটা খুলে ফেললাম। সোনার পাত দিয়ে মোড়া দরজা। দরজা খুলে ঢুকতেই এক আশ্চর্য সুন্দর মিষ্টি প্রসাধনের সুবাস আমার নাকে এসে লাগলো, যার ঘ্রাণ আমি এর আগে কখনো নিইনি বুঝি। গন্ধটা এতোই তীব্র যে আমার মাথা ঘুরে গেলো তখুনি। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে মাটির উপরে পড়ে গেলাম। প্রায় একটি ঘণ্টা আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমি আমার মনকে শক্ত করে উঠে দাঁড়ালাম।

ঘরের মধ্যে তখনো আতরের খুশবু ভরপুর। সোনবাতির মিষ্টি আলোয় তখন ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত মায়াজাল সৃষ্টি করেছিল যেন। ঘরের চারপাশে চারটি সোনার চিরাগ জ্বলজ্বল করছিল।

জানেন মালকিন, সেই আলোয় ঘরের মধ্যে ভালো করে তাকাতে গিয়ে দেখি, এক কোনায় কালো অন্ধকার রঙের একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াটা কেমন যেন কৃত্রিম কৃত্রিম বলে আমার মনে হলো। সেই সঙ্গে এও মনে হলো, ঘোড়াটা সাধারণ ঘোড়া নয়, যেন একটা রহস্যময় ঘোড়া।

সেই রহস্যের সূত্র খুঁজে বার করার কৌতূহল জাগলো আমার মনে। আমার ঐ এক অভ্যাস, কোন কৌতূহলই আমি বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারি না। এক্ষেত্রেও তাই হলো। এবং সেই শয়তানটা আমার ওপর ভর করে বসলো সেই মুহূর্তে। আর কাল বিলম্ব না করে সেই ঘোড়াটা আমি ঘর থেকে বার করে নিয়ে এলাম মুক্তাঙ্গনে এবং তার পিঠে চড়ে বসলাম। কিন্তু সে গোঁ ধরে বসলো, প্রাসাদ ছেড়ে এক পাও নড়বে না। আমাকে তখন ঘোড়ায় চড়ার দারুন ইচ্ছে, তাই সেই ঘোড়ার পিঠে সজোরে কয়েক ঘা চাবুক মারতেই নড়ে চড়ে উঠলো ঘোড়াটা। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার দুদিক থেকে দুটি অদৃশ্য ডানা তার পিঠের উপরে গজিয়ে উঠলো। তারপর ডানা মেলে দিয়ে আকাশের দিকে উড়তে শুরু করে দিলো ঘোড়াটা। তার ডানা দুটো আগে আমার চোখে পড়েনি কি আশ্চর্য। আমার তখন কি ভয় জানেন মালিক, যদি সে আমাকে আকাশ থেকে নিচে ফেলে দেয়? তার হাতে আমার প্রাণ ভোমরা। একটু বেয়াদপি করলেই সে আমাকে জমিনের উপর ফেলে দিতে পারে। কথাটা মনে হতেই শক্ত করে পক্ষীরাজ ঘোড়াটা আমি জড়িয়ে ধরলাম।

এক সময় ঘোড়াটা তার চলার গতি কমিয়ে দিয়ে নিচে নেমে আসে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সেই তাম্র-প্রাসাদের ছাদের উপরে আমাকে নামিয়ে দিলো। ঘোড়াটা এক মিনিট কি ভেবে প্রচণ্ড একটা ঝাকুনি দিয়ে আমাকে নিচে, মাটির উপরে ফেলে দিলো। তারপর তার ডানার ঝাপটা আমার বাঁ-চোখে এসে লাগে, রক্ত ঝরতে থাকে। এই ভাবেই আমার বাঁ-চোখটা হারাতে হয়, জানেন মালিক। আমার বাঁ-চোখের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝড়তে থাকে, সেই সঙ্গে অসম্ভব যন্ত্রনা অনুভব করি। সেই ফাঁকে পক্ষীরাজ ঘোড়াটা আকাশে উড়ে গিয়ে আমার দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায় এক সময়।

তারপর বাঁ-চোখের ক্ষতস্থানে এক হাতে চাপা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসি। প্রাসাদের কক্ষে সেই দশজন যুবককে যে যার কৌচের উপরে বসে থাকতে দেখল।

তারা আমাকে দেখামাত্র একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, 'তোমাকে আর আমি আহ্বান জানাবো না। আর তোমাকে কোন রকম সম্ভাষণও জানাবো না। এখানে আমারা দশজন বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছি। এরপর তোমাকে আমরা গ্রহণ করতে পারবো না। তুমি যাও, এখুনি এখান থেকে পত্রপাঠ বিদায় হও! আর এক মুহূর্তও আমরা তোমাকে এখানে আশ্রয় দিতে পারবো না। তখন তোমাকে আমরা বার বার বারণ করেছিলাম তোমার অন্যায় কৌতূহল না করতে। ঠিক আছে, এখন তার হাতে হাতে ফল পেলে তো? এবং এখান থেকে ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ো!'

কাতর অনুনয় করে আমি তাদের বোঝাই, 'আমি তোমাদের একজন হয়ে এখানে থাকতে চাই। কই নিয়ে এসো আমার জন্য ট্রে ভর্তি কালি ঝুলি, মুখে তা মেখে আমি যে তোমাদের সমাজে বাস করতে চাই।'

'না, আল্লাহর দোহাই, তুমি আমাদের শত নিষেধ সত্ত্বেও আমাদের কথা তুমি শোনোনি। অতএব এখান থেকে বিদায় হও এখুনি।'

অতএব তারপর তারা আমাকে একরকম গলা ধাক্কা দিয়ে তাদের প্রাসাদ থেকে বার করে দেয়। তখন আমি সেই প্রথম বুঝতে পারি, আমার জীবনে দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। এরপর আমাকে অনেক ত্যাগ, অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হবে।

অতঃপর দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে এক কালান্দর ফকিরের বেশে বেরিয়ে পড়লাম পথে। আমার চোখে ভর্তি জল তখন। আমার এই দুরবস্থার জন্য তখন নিজেই নিজের উপর দোষারোপ করলাম। আমি জানি, আমার ভাগ্যে অনেক বিপর্যয়ের লিখন লেখা

আছে, যা আমি খণ্ডাতে পারি না। এই মুহূর্তে সেই দশজন যুবকের কথা আমার মনে পড়ে গেলো। তাদের আক্ষেপের কথা পুনরাবৃত্তি করে আপন মনে আমি আওড়ালুম : 'বেশ সুখেই আমি দিন কাটাচ্ছিলাম, আমার অদম্য কৌতূহলটাই আজ আমাকে এমন দুরাবস্থায় ফেলে দিলো।'

তারপর দিনের পর দিন একটানা হাঁটতে হাঁটতে আজ সন্ধ্যায় এই বাগদাদ শহরে এসে পৌঁছলাম। শুনেছি এই শহরে আল্লাহর কৃপায় কেউ কোনদিন কষ্ট পায় না। এখানকার খলিফা হারুন-অল্-রসিদ বাগদাদের পথে পথে ঘুরছে একটা আশ্রয়ের সন্ধানে। আমার মতো তাদের দুজনের চোখের ঠুলি লাগানো। অর্থাৎ আমার মতো তাদেরও এক চোখ কানা। এবং তারাও আমারি মতো এই শহরে নবাগত। এর পরের ঘটনা আপনি তো জানেনেই মালকিন। আপনাদের কাছে এসে আমরা আজ রাতটুকু থাকার জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করি, এবং আপনি আমাদের এখানে থাকতে অনুমতি দেন দয়া করে।

মালকিন, এই হলো আমার জীবনের করুণ কাহিনী আমার বাঁ-চোখ কানা হওয়ার ইতিহাস,



অত্যন্ত দয়াশীল মানুষ। তার কাছে গিয়ে আমার দুঃখের কাহিনী বললে হয়তো তাঁর দয়া হতে পারে আমার উপরে, আমাকে তিনি আশ্রয় দিতে পারেন। তাঁর দান-ধ্যানের খ্যাতি জগৎ-জোড়া। তাঁকেই আমার ভাগ্যবিধাতা মনে করে এই বাগদাদ শহরে চলে এসেছি। কিন্তু আজকের রাতটা কোথায় আশ্রয় নেবো? কে আমাকে আশ্রয় দেবে?

এই সব কথাগুলো যখন ভাবছি, তখন পথে আমার মতো আরো দুজন কালান্দর ফকিরের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। তারাও দাঁড়ি-গোঁফ কামিয়ে আমার দাঁড়ি-গোঁফ কামিয়ে কালান্দর ফকির হওয়ার কারণ।

'ঠিক আছে, তোমার কাহিনী-শুনে আমি খুশি।' বড়বোন সব শুনে বলে, 'তুমি মুক্ত, তুমি এখন এখান থেকে চলে যেতে পারো।'

'কিন্তু আল্লাহর দোহাই মালকিন, আমি তো এখন যেতে পারবো না। এখানে আর যারা যারা আছে, তাদের জীবনের কাহিনী না শুনে তো আমি এখান থেকে এক পাও নড়তে পারবো না।'

তারপর বড়বোন, খলিফা, জাফর এবং মনসুর-এর

দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'এবার তোমরা তোমাদের কাহিনী·শোনাও এক এক করে।

জাফর এবার উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দেয়, 'আমাদের কাহিনী নতুন করে আর কি শোনাবো মালকিন? আমাদের কাহিনী তো আমরা এ বাড়িতে ঢোকার মুখেই শুনিয়েছি আপনার ছোটবোনকে। কেন, শোনেননি তার কাছ থেকে?'

ছোট বোনের মুখ থেকে বড়বোন যখন শুনলো, যে তারা এখানকার সওদাগর, বেশি রাত হয় যাওয়ার জন্য তাদের কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, তখন সে তাদের উদ্দেশ্য করে বলে, 'ঠিক আছে তোমাদের স্বার্থে প্রত্যেককে বেঁচে থাকার অনুমতি আমি দিলাম। এখন তোমরা মুক্ত, এবার এখান থেকে যেতে পারো।'

অতএব ত'রা সবাই সেখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে নামলো। রাস্তায় নেমে কালান্দরের উদ্দেশে খলিফা বললেন, 'তা তোমরা এখন যাবে কোথায়? রাত তো এখনো শেষ হয়নি?'

'খোদা আল্লাহ জানেন কোথায় আমাদের যেতে হবে।' উত্তরে তারা বলে, 'আমরা তো সামান্য কালান্দর ফকির মাত্র।'

'ঠিক আছে, আমাদের সঙ্গে তোমরা এসো, বাকী রাতটুকু না হয় আমাদের সঙ্গেই কাটাবে', এই বলে জাফরের দিকে ফিরে খলিফা বলেন, 'এদের সঙ্গে তুমি তোমার আস্তানায় নিয়ে যাও। কাল সকালে আমার সামনে এদের হাজির করো' এদের জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী নতুন করে শুনতে চাই আবার।'

খলিফার আদেশ মতো কাজ করলো জাফর, এবং খলিফা তাঁর প্রাসাদে ফিরে এসে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নিদ্রাদেবী বাধ সাধলেন, বাকী রাতটুকু তাঁর জেগে কাটাতে হলো এক দুশ্চিন্তায়। তিনজন কালান্দর-শাহজাদার জীবনের করুণ কাহিনী শোনার পর থেকে তাঁর মনের শান্তি ছিলো না। তাছাড়া তিনবোন এবং দুটি কুত্তীর ইতিহাসটা না শোনা পর্যন্ত তিনি যেন শান্তি পাচ্ছিলেন না।

সকাল হতে না হতেই তিনি তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করামাত্র জাফরকে কাছে ডেকে এনে হুকুম করলেন, 'সেই তিনটি মেয়েকে এবং তাদের মাদী কুকুর দুটি আর সেই সঙ্গে তিনজন কালান্দরকে আমার সামনে এখুনি হাজির করো।'

একটু পরেই জাফর তাদের সবাইকে দরবারে এনে হাজির করলো। তিনি বোনের আপাদমস্তক বোরখার আড়ালে ঢাকা ছিলো। তার সবাই খলিফার সামনে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো।

উজির জাফর তখন সেই তিনবোনকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুরু করলেন,—'গতকাল রাত্রে আমরা তোমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে গিয়ে তোমাদের হাতে বন্দী হই। অবশ্য তবে তোমরা আমাদের আসল পরিচয়টা জানতে না। যাইহোক, তোমাদের মধুর ব্যবহারে আমরা সবাই খব খুশি। এবার তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই, তোমরা এখন আব্বাসের পঞ্চম সন্তান খলিফা হারুণ-অল-রসিদের দরবারে এসেছো। তাই তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এখানে ওঁর সামনে যা বলতে সব সত্যি বলবে, কোন মিথ্যের আশ্রয় নেবে না, বুঝলে?

জাফরের মুখ থেকে সত্যের স্রষ্টা এবং দয়ালু হারুণ-অল্-রসিদের নাম শুনে বড়বোন এগিয়ে গিয়ে



বলে, 'জাঁহাপনা, শুনেছি আপনি সত্যের প্রতিষ্ঠাতা, আপনি সবার বিশ্বাসের প্রতীক আমার কাহিনী বড় বিচিত্র, শুনলে অনেকের চোখ খুলে যাবে। আমি তাদের কাছে একটা বড় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবো। যে কেউ আমাদের জীবনের করুণ কাহিনী থেকে শিক্ষা নিতে পারে—'

'আজ এই পর্যন্ত জাঁহাপনা—'ভোর হয়ে আসছে, দেখে শাহরাজাদ তার কাহিনী থামিয়ে পরদিন আবার তার অসমাপ্ত কাহিনী বলার অনুমতি চেয়ে নিলো বাদশাহ শাহরিয়াদের কাছ থেকে।

পরদিন রাত্রে শাহজাদা শাহরিয়ার তাঁর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করলে শাহরাজাদ আবার তার কাহিনী শুরু করতে গিয়ে বললো, তাহলে সেই সুন্দরী তিন বোনের বড়জনের মুখ থেকেই তার জীবনের কাহিনী শুনুন শাহজাদা। বাদশাহ খলিফার আদেশ পেয়ে সে তখন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তার জীবনের আশ্চর্য কাহিনী বলতে শুরু করলো :

বড় বোনের কাহিনী

আমার সেই আশ্চর্য কাহিনীর শুরুতেই আপনাকে বলে রাখি, আমার সাথে এই দুটি মাদী কুকুর দেখছেন এরা আমার নিজের সহোদরা, এরা দুজনেই আমার বড়, আমরা তিনজন একই বাবা মায়েব সন্তান। আর ঐ যে দুজন বোনকে দেখছেন, ওরা আমার দুই বিমাতার দুই কন্যা। তবে আমাদের সবার বাবা একজনই। আমার বাবা মৃত্যুর সময় আমাদের তিন সহোদরা বোনের জন্য তিনহাজার দিনার নগদ রেখে যান। কিছুদিন পরে মায়েরও মৃত্যু ঘটে। তখন সেই তিনহাজার দিনার আমরা তিন বোনে সমান ভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিই। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে এক হাজার দিনার করে পাই।

যথা সময়ে আমার দুই বড় দিদির শাদী হওয়ার পর তারা যে যার স্বামীর ঘরে চলে যায় বসবাস করার জন্য। তাদের স্বামীরা বিবিদের অর্থ পেয়ে রাতারাতি সওদাগর বনে যায় এবং সমুদ্রে পাড়ি দেয় সওদা করার জন্য। দিদিরা আমার ভগ্নীপতিদের সঙ্গে সমুদ্র যাত্রা করে। পাঁচ বছর একটানা এক বন্দর থেকে আর এক বন্দরে ঘুরতে ঘুরতে ভগ্নীপতিরা দিদিদের সব অর্থ অপচয় করে ফেলে। তখন তারা দেউলে বনে গেছে। বিদেশ-বিভূঁইয়ে দিদিদের ফেলে রেখে তারা চম্পট দেয়। বড় দিদি তখন কপর্দক শূন্য অবস্থায় দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে ছিন্ন মলিন পোষাক পরে ফিরে আসে আমার কাছে। তার তখন ভিখারীর মতো অবস্থা। দীর্ঘদিন পরে প্রথম



সাক্ষাতে তাকে আমি চিনতে পারিনি। শীর্ণকায় দেহ, গায়ে একপুরু ধুলো। চোখের কোলে কালি পড়েছে, তার দেহে আগের সেই জৌলুষ আর ছিলো না।

পরে তাকে চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ হাল তোমার কি করে হলো বড়দি?' সে তখন

কাঁদতে কাঁদতে অপদার্থ বড় ভগ্নীপতীর নির্বুদ্ধিতার কথা বললো আমাকে। সওদা করার নামে কি করে বড় ভগ্নীপতি আমার বড় দিদির সব অর্থ অপচয় করেছে, সবিস্তারে বর্ণনা দিলো সে। সব শুনে আমার কেমন মায়া হলো। হামামে নিয়ে গিয়ে ভালো করে তাকে স্নান করলাম সুগন্ধী সাবান তার মলিন দেহে ঘসে ঘসে। তারপর তাকে আমার নতুন পোষাকে সাজালাম আমার মনের মতো করে। এরপর থেকে একটু একটু করে তার রূপ খুলতে থাকে। দু'বেলা খেতে পেয়ে তার স্বাস্থ্য ফিরলো, ফিরলো তার যৌবন, বাড়লো রূপের জৌলুষ। তাকে ভরসা দিলাম, আব্বাজানের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ এখন ফুলে-ফেঁপে বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। সেই অর্থ আমরা দুজনে ভাগ করে নেবো, তার চিন্তার কোন কারণ নেই, অর্থাভাবে তাকে কষ্ট করতে হবে না।

এরপর আমরা আমাদের মেজদির কথা চিন্তা করলাম। শাদীর পর থেকে তারও কোন খবর নেই। তার অদৃষ্টে কি ঘটল কে জানে। তারপর পুরো একটা বছর ধরে বড়দিকে আমার সাধ্য মতো আদর যত্ন করে তার সব দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিলাম, কিন্তু আর এক দিদির চিন্তায় আমার মন তখন আচ্ছন্ন হয়েছিল।

কিছুদিন পরে সেই দিদিও একদিন আমার কাছে ফিরে এলো ভিখারীর বেশে। তার দুঃখের কাহিনী বড়দিদির থেকেও বেশি করুণ, আরো মর্মান্তিক। তখন আমি তাকে বড়দিদির থেকেও বেশি খাতির যত্ন করে আমার সঞ্চিত অর্থের ভাগ দিলাম তাকে।

তারপর কিছুদিন থাকার পর তারা আবদার করে বসলো, ছোট বোন, লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে তোমাকে বলছি, আমাদের আবার শাদী করতে ইচ্ছে হচ্ছে। স্বামী ছাড়া আমাদের মতো বিধবাদের কোন গতি নেই বোন। তাছাড়া কতদিনই বা তোমার অন্ন ধ্বংস করবো বলো?'

সব শুনে আমি তাদের বোঝালাম, 'শাদীর কি হাল একবার তো তোমরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলে। আজকের দুনিয়ায় ভালো স্বামী পাওয়া মুশকিল। তোমরা আবার সেই ফাঁদে পা ফেলতে যাচ্ছো?'

কিন্তু তারা আমার উপদেশ মানতে রাজি হলো না। আমার অনুমতি না নিয়েই তারা আবার শাদী করে বসলো। তা সত্ত্বেও আমি তাদের বিয়েতে আমার সাধ্য মতো যৌতুক দিলাম। যৌতুকের অর্থ এবং জিনিষপত্র নিয়ে তারা যে যার স্বামীর ঘর করতে চলে গেলেন।

কিছুদিন যেতে না যেতেই তাদের দ্বিতীয় স্বামীরা তাদের সর্বস্ব আত্মসাত করে নিয়ে তাদের ছেড়ে প্রস্থান করে। আগের মতো আবার তারা আমার কাছে ফিরে এসে ইনিয়ে-বিনিয়ে সেবারের মতো তাদের মাফ করে দিতে অনুরোধ জানালো। 'হাজার হোক, তুমি তো আমাদের ছোট বোন, আমরা তোমার দিদি, তুমি না দেখলে কে আমাদের দেখবে বলো! আমরা তোমাকে কথা দিচ্ছি, আর আমরা শাদীর নাম করবো না, আর আমরা ভালোবাসার নাম নেবো না।'

আমি তাদের দুরাবস্থার কথা চিন্তা করে সেবারের মতো মাফ করে দিয়ে বলি, 'এসো দিদিরা, তোমাদের থেকে আর কে আমার আপনজন আছে বলো?'

তখন আমি আগের থেকে আরো বেশি করে আমার ভালোবাসা দিয়ে আদর যত্ন করতে থাকলাম। এই ভাবে পুরো একটি বছর কাটল। তারপর একদিন সেই প্রথম আমি মনস্থ করলাম, একটা বিরাট জাহাজ মনের মতো করে সাজালাম, ভালো ভালো সামগ্রীতে ভরে তুললাম জাহাজটা, সওদা করতে বেরোবো। সমুদ্রযাত্রার আগের দিন বড় দুই দিদিকে কাছে ডেকে শুধোলাম, 'আমি বাণিজ্যে যাবো, ফিরে আসা না পর্যন্ত তোমরা কি বাড়িতে থাকবে, নাকি আমার সাথী হবে?'

'আমরাও তোমার সঙ্গে যাবো', সঙ্গে সঙ্গে তারা উত্তর দেয়, 'আমরা তোমাকে আমাদের কাছ ছাড়া করতে চাই না।'

তারপর আমি আমার অর্থ দু'ভাগে ভাগ করলাম, এক ভাগ আমার সঙ্গে রাখলাম, বাকি অর্থ আমার একজন বিশ্বাসী লোকের কাছে গচ্ছিত রাখলাম এই ভেবে যে, যদি আমার জাহাজটা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হয়, তখন কপর্দক শূন্য হয়ে বাড়ি ফিরে এসে সেই অর্থ অনেক কাজে লাগবে।

নির্দিষ্ট দিনে দুই দিদিকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রযাত্রা শুরু করলাম। কিছুদিন আমাদের জাহাজটা জলে ভাসার পর কাপ্তেনের গাফিলতির ফলে পথ হারিয়ে অজানা এক সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। আমরা তখন পথ-ভ্রষ্ট। অশান্ত সমুদ্রে আমরা তখন দিশেহারা।

অনেক চেষ্টার পর জাহাজের দিক পরিবর্তন করে অবশেষে আমাদের জাহাজটা এক অজানা বন্দরে নোঙর করলো। আমি তখন দারুণ চিন্তিত। এ কোন বন্দর কে জানে। অজানা বন্দরের অচেনা মানুষজন কে কেমন হবে কে জানে। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম, অজানা জায়গা হলেও একেবারে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে না। তাছাড়া অজানা জায়গা হলেও সওদা তো করা যাবে।

জাহাজের ক্যাপ্তেনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা এই অচেনা শহরের কি নাম বলুন তো ?'

'আল্লাহ জানেন, আমি জানি না। এর আগে এই শহরে কখনো আসিনি, আর এই সমুদ্রও আমার অজানা। যাইহোক আমাদের দুশ্চিন্তা যখন এখানে এসে শেষ হয়েছে, তখন না হয় এখানে দুদিন থেকে আপনি আপনার সওদা কেনা-বেচা করে নিন। তারপর না পোষালে না হয় অন্য বন্দরের উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা শুরু করা যাবেখন।'

তারপর ক্যাপ্টেন জাহাজ থেকে নেমে শহরের খোঁজ করতে চলে যায়। বেশ কিছু সময় পরে ফিরে এসে সে বলে, 'আল্লাহ, আমাদের মনের কথা শুনতে পেয়েছেন, সুন্দর সাজানো গোছানো একটা শহর এখানে তৈরি করে রেখেছেন।'

অতএব জাহাজ থেকে নেমে আমরা শহরের দিকে যাত্রা করলাম। শহরের প্রবেশ পথে একজন প্রহরী পেটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে। কিন্তু কাছে যেতেই চোখে পড়ল প্রস্তর মানুষ সে, তার নড়বার-চড়বার ক্ষমতা নেই। তারপর আমরা শহরে গিয়ে ঢুকলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, শহরে কোন প্রাণের সাড়া নেই, একটা প্রাণীও চোখে পড়ল না এখনো পর্যন্ত। আরো অবাক হলাম, শহরের বাড়ীগুলো দেখে, সব কালো পাথরের তৈরি। দোকান-পাট খোলা, থরে থরে সাজানো সোনা, রূপার গহনা, কিন্তু দোকানী নেই। অমন তাজ্জব ব্যাপার দেখে আমরা বলাবলি করলাম, 'নিঃসন্দেহে এ সবের মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে।'

তারপর আমরা যে যার ধান্দায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। যে যা পারলো, সোনা, রূপার গহনা, দামী দামী সামানপত্র সংগ্রহ করলো। আর আমি নিজে তখন দুর্গের দিকে এগিয়ে গেলাম। সুরক্ষিত দুর্গ। রাজ প্রাসাদের সিংহদরজা সোনার তৈরি। প্রাসাদের দেওয়ালগুলোও সোনা-রূপায় মোড়ানো। দূর থেকে বাদশাহকে তাঁর দরবারে উজির আমির পরিবৃত অবস্থায় সোনার সিংহাসনে বসে থাকতে দেখলাম। সোনার সিংহাসনের উপরে মণি মুক্তা ও পান্না খচিত। তাঁর চারপাশে শ্বেতকায় পঞ্চাশজন ক্রীতদাস দাঁড়িয়েছিল। তাঁর পরনে সোনার পোষাক। কিন্তু তাদের একেবারে সামনা-সামনি যেতেই আমার চোখকে অবিশ্বাস করতে হলো। কি আশ্চর্য, তারা তখন কালো পাথরে পরিণত হয়ে হয়ে গেছে। দৃশ্যটা দেখে আমি তখন বিস্ময়ে অভিভূত।

যন্ত্রচালিতের মতো আমি তখন বাদশাহের বিরাট হারেমে গিয়ে প্রবেশ করলাম। স্বর্ণ খচিত পর্দা ঝুলছিল হারেমের প্রতিটি দরজা জানলায়। জমিনের

উপরে সিল্কের কার্পেট, কার্পেটে সোনার ফুল লাগানো। সেখানে বেগমকে পালঙ্কের উপরে শুয়ে থাকতে দেখলাম, তাঁর মাথার মুকুটটা জ্বলজ্বল করছিল, মুকুটের হীরা জহরতগুলো যেন এক একটা সন্ধ্যাতারা। তাঁর কণ্ঠে হীরার নেকলেস। দূর থেকে তাঁর গায়ের অলঙ্কারগুলো আসল বলেই ভ্রম হয় যেন, কিন্তু কাছে যেতেই আল্লাহর অভিশাপে কিনা কে জানে, সব কিছু নিমেষে কালো পাথরে পরিণত হয়ে গেলো।

সামনে একটা খোলা দরজা দেখে সেদিকে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল একটা বিরাট মঞ্চ, সিঁড়ির সবটা ধাপ বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে দেখি, সারা মঞ্চটা কার্পেট দিয়ে ঢাকা, কার্পেটে সোনা লাগানো। মঞ্চের ঠিক মাঝখানে একটা মেহগনি কাঠের টুলের উপরে রাজহাঁস জাতীয় পাখির ডিমের আকারে একটি মহামূল্যবান হীরা রাখা আছে, সেই হীরার আলোয় সারা মঞ্চ আলোকিত। স্পষ্ট দেখা যায় মঞ্চের মাঝখানে একটা রাজ সিংহাসন, দামী মখমলের গদী। তার চারপাশে সোফা-কৌচ, স্বর্ণখচিত কার্পেট জমিনের উপরে। সুন্দর করে সাজানো-গোছানো সবকিছু, কি আশ্চর্য প্রাণের কোন সাড়া শব্দ নেই সেখানে।

মঞ্চ থেকে নেমে আমি আবার ঘুরতে থাকি প্রাসাদের চারপাশে। মাঝে মাঝে চিরাগবাতি জ্বলে থাকতে দেখে মনে হলো, নিশ্চয়ই এখানে প্রাণের চিহ্ন আছে। তবে কার অভিশাপে কে জানে তারা আমার চোখের আড়ালে থেকে আছে এখনো। জীবন্ত মানুষের খোঁজে প্রাসাদের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঘোরাঘুরি করলাম। কিন্তু মাত্র সেই একই দৃশ্য সোনা, রূপা, এবং হীরা-মণি-মানিক্যে ঠাসা প্রাসাদ, মানুষজনও আছে, তবে তারা পাথরের মত কঠিন, অনড়, ডাকলে সাড়া দেয় না।

এমন অদ্ভুত প্রাসাদে একা আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু ফিরে যাওয়ার পথ তখন বন্ধ, কারণ সে পথ আমি হারিয়ে ফেলেছি। অগত্যা ক্লান্ত হয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে ফিরলাম আমি মঞ্চের ঘরে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে মঞ্চের উপরে উঠে একটা কৌচের উপরে দেহটা এলিয়ে দিলাম একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। চিরাগবাতির আলোয় কোরানের অংশ বিশেষ পড়তে শুরু করলাম। ঘুমোবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মন আমার তখন এতই অশান্ত যে. চোখের পাতা দুটো এক করতে পারলাম না। রাত্রির দ্বিতীয় যামে নিচু গলায় হলেও কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে কাকে যেন খুব মিষ্টি গলায় কোরান পাঠ করতে শুনলাম। নিস্তব্ধ রাত্রে কৌচ থেকে উঠে সেই অপরিচিত কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম। এক সময় আধ-ভেজানো একটা দরজার সামনে এসে থামলাম। মনে হলো, আওয়াজটা সেই ঘর থেকেই আসছিল। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলাম। সিলিংএর উপর থেকে দুটি চিরাগবাতি ঝুলছিল। সেই আলোয় এক প্রিয়দর্শন যুবক কোরান পাঠ করছিল তখন। তাকে এখানে জীবিত দেখে আমি অবাক হলাম। যেখানে অন্যেরা পাথরে পরিণত, কি করে তার দেহে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায়?

যাইহোক, আমি তাকে সালাম জানালাম। প্রত্যুত্তরে আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো সেই নওজোয়ান, পাল্টা সালাম জানাল সে আমাকে। আমি তখন তাকে বললাম, 'আল্লাহর ঐ পবিত্র কোরান ওই থেকে কি পড়ছেন আপনি? সত্যের বাণী?'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে সে বলে, 'তার আগে বলো সুন্দরী, কি করে তুমি এখানে এলে?'

তখন আমি আমার এখানে আসার কাহিনী বললাম সংক্ষেপে। সেই সঙ্গে তাকে বললাম, 'এখানকার সব তাজ্জব ব্যাপার দেখে আমি দারুণ অবাক হয়েছি। তুমি ছাড়া অন্য সব মানুস পশু-পক্ষী সব দেখছি পাথরে পরিণত হয়ে গেছে। এখন

তুমি কি করে এ সবের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলে বলো তো?'

উত্তরে সে বললো, 'একটু ধৈর্য ধরো বোন, আমি তোমাকে সব খুলে বলবো। দেখো, তুমি তখন আরো অবাক হবে।' এই বলে সে তার হাতের সেই পবিত্র কোরাণটা একটা সাটিনের থলের মধ্যে ভরে রেখে, তারপর সে আমাকে তার পাশে বসাল। এই প্রথম আমি তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকালাম। কি অপূর্ব মাধুর্যে ভরা তার মুখখানি। সুন্দর সুঠাম দেহ, বলিষ্ঠ চেহারা। গভীর স্বচ্ছ দৃষ্টি তার চোখে, হাসলে যেন মুক্তা ঝরে। আমি তখন মুগ্ধ তার রূপেরসুধা পান করতে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি। এক সময় সেই আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠে আমি ওকে বললাম, 'আমি যে আর ধৈর্য ধরতে পারছি না প্রিয়তম। বলো এবার তোমার সেই রহস্য কাহিনী, আমি শুনি—'

'হ্যাঁ সুন্দরী, এবার বলছি, তুমি শোনো।' বলে অতঃপর সে বলতে শুরু করলো তার জীবনের কাহিনী, 'এই শহরের সুলতান ছিলেন আমার বাবা। ঐ যে রাজদরবারে সিংহাসনের উপরে পাথরের মূর্তি হয়ে বসে আছেন, তিনি আমার পিতা। আর ঐ সোনার পালঙ্কে যিনি অর্ধশায়িতা তিনি আমার মা, আমার বাবার প্রথম বেগম। তাঁরা দুজনেই ছিলেন প্রজাবৎসল, আর প্রজারাও তাঁদের খুব শ্রদ্ধা করতো, কারোর কোন অভিযোগ ছিলো না আমার বাবার শাসনের বিরুদ্ধে। আমার বাবা মা ছিলেন ইসলাম বিরোধী। তাঁরা ছিলেন শক্তির উপাসক, অগ্নি-দেবতার বিশ্বাসী।

আমার বাবা মা'র বহুদিন যাবৎ কোন সন্তান-আদি ছিলো না। বাবার শেষ জীবনে আমাকে তিনি পুত্র হিসেবে লাভ করেন। এবং আদরের ধন ছিলাম। ভাগ্যগুণে আমাদের প্রাসাদে এক বৃদ্ধা মহিলা বাস করতো, খোদা আল্লাহর উপরে তার ছিলো অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু বাইরে সে এমন ভাব দেখাত, যেন সে ঘোর ইসলাম বিরোধী। এই ভাবেই সে আমার বাবার মন এবং বিশ্বাস জয় করে থাকবে। তাই আমি যখন বড় হলাম, তার হাতে বাবা আমার ভার তুলে দিয়ে তাকে বললেন, 'ওকে এমন ভাবে শিক্ষা দাও যাতে সে আমাদের ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আমি যেন ইসলাম বিরোধী হয়ে উঠি।

কিন্তু কার্যত সেই বৃদ্ধা আমার বাবার সব ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করলেন। আমাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য সে পবিত্র কোরান থেকে পাঠ করে শোনাতে লাগলেন দিনের পর দিন। তারপর আমি যখন ইসলাম ধর্মে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করলাম, তখন সে আমাকে একদিন বললো, 'ইসলাম ধর্মে তোমার এই আগ্রহ, শিক্ষা বিস্তার, এ সব ব্যাপারে তুমি তোমার বাবার কাছে একান্ত গোপন রাখবে, তাঁর কাছে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়লে তিনি তোমার এবং আমার গর্দান নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না। অতএব সাবধান বাছা, কাক-পক্ষীও কেউ যেন না জানতে পারে যে, তুমি ইসলামের পরম ভক্ত একজন।'

অতএব আমি তার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম। আমি তখন জেনে গেছি, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস না রাখলে মানুষের উপকার হবে না, একমাত্র ইসলাম ধর্ম মানুষকে সৎ জীবন যাপন করতে শেখায়, পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতে প্রেরণা দেয়। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত না হলে মনে শান্তি নেই, পাপীর উদ্ধার নেই।

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী সেই মহিলা একদিন মারা মারা গেলেন। তারপর একদিন পয়গম্বর আল্লাহর বজ্রধ্বনির মতো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো শহরের মানুষ-জন,—'শোনো এই শহরবাসীরা, তোমরা অন্ধের মতো শক্তির দম্ভে মেতে উঠেছো, অগ্নির উপাসনা করতে থাকলে কোন উপকার তোমাদের হবে না, হতে পারে না। এবং ধ্বংস তোমাদের সর্বনাশের

পথে টেনে নিয়ে যাবে। তাই আমি তোমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলছি, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের এই সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন আল্লাহর নাম-গান ছাড়া তোমাদের এই বিপদ থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। তোমরা জাগো, তোমরা তোমাদের সুলতানের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠো, সোচ্চার হয়ে ওঠো, তাকে বোঝাও একমাত্র আমিই তার ভাগ্যবিধাতা। সে আমার কথা শুনলে আমি তার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তার ভালমন্দের, তার সুখ-দুঃখের অংশীদার হবো আমি।'

তখন তাদের বোঝালেন, 'ঐ ভণ্ড পয়গম্বরের কোন সতর্ক বাণীই তোমাদের ক্ষতি করতে পারে না। অহেতুক ভয় পাচ্ছো তোমরা। এখন তোমরা নির্ভয়ে তোমাদের বাড়ি ফিরে যেতে পারো। আমার এবং আমার বিশ্বাসের উপর ভরসা রাখো, দেখবে কেউ তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

সুলতানের কথায় তারা তখন তাদের আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে পেলো, তাঁর প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠলো। সুলতানের দরবারে আসার আগে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারা এবার অগ্নির উপাসনা করবে না, তখন তারা তাদের সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে



পয়গম্বরের এই সতর্কবাণী শুনে আমার আব্বাজানের সব প্রজারা তখন দারুণ ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠল। এবং পরদিন তারা আমার বাবাকে ঘিরে ধরল (যেহেতু তিনি তখন এই শহরের সুলতান, প্রজাদের দণ্ড-মুণ্ডের একমাত্র কর্তা), এবং তারা তাঁর সামনে প্রশ্ন রাখল, 'এ আমরা কার কণ্ঠস্বর শুনলাম? পয়গম্বরের সতর্কবাণী শুনে আমরা শঙ্কিত। বলুন, জাঁহাপনা, এরপর আমরা কাকে বিশ্বাস করবো? আল্লার না কি আপনাকে, আপনার আরাধ্য দেবতা শক্তির উৎসকে অগ্নি দেবতাকে।'

প্রত্যুত্তরে অভয়বাণী দিয়ে আমার আব্বাজান

দিলো এবং আগের মতো ইসলাম বিরোধী থেকে পুরো একটি বছর তাদের সুলতানের আদর্শ মেনে কাজ করে গেলো।

তারপর আল্লাহর প্রথম সতর্কবাণী শোনার এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয়বার আল্লাহর সেই সতর্কবাণী শুনতে পেলো। এবারেও সুলতান তাদের আশ্বস্ত করে বললেন, 'তোমরা যেমন অগ্নির উপসনা করছিলে ঠিক সেই ভাবেই চালিয়ে যাও, কোন ভয় নেই তোমাদের। আমি তো আছি, আল্লাহ তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেন না। তোমরা নিশ্চিন্তে থাকবে আরো।'

কিন্তু সুলতান তখনো বুঝলেন না, কি ভুল তিনি করতে যাচ্ছেন। পয়গম্বর আল্লাহর সতর্কবাণী। নস্যাৎ করে দিয়ে শয়তানকে তিনি আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছেন। তখনো তিনি জানতেন না, ইসলাম ধর্ম বিরোধী হয়ে অগ্নির উপাসনা করা কত পাপ, কত অন্যায় এবং তার পরিণাম যে কি ভয়াবহ হতে পারে তা তাঁর জানা ছিলোনা। আল্লাহর তৃতীয়বার সতর্কবাণী উচ্চারিত হওয়ার পরেও তিনি তাঁর প্রজাদের উপদেশ দিলেন অগ্নির উপাসনা করার জন্য। আর সেটাই তাঁর এবং তাঁর রাজ্যের কাল হয়ে উঠলো একদিন।

একদিন ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই হঠাৎ তাদের সেই সর্বনাশা দিনটি উপস্থিত হলো, সেই দিনটি ছিলো তাদের বিচারের দিন। সেদিন মহম্মদ আল্লাহ তাঁর কোন ফরমান নিয়ে এলেন না, একেবারে শেষ বিচারের শাস্তি নিয়ে এসে হাজির হলেন। আকাশ ভেঙ্গে বজ্রপাত হলো সেই অভি-শপ্ত শহরের উপরে, যার সঙ্গে একমাত্র অগ্নি-বৃষ্টির তুলনা করা যেতে পারে। সেই আগুনের তেজ সহ্য করতে না পেরে সুলতান এবং তাঁর বেগম সমেত সমস্ত প্রজা আর এই শহরের রাজ-প্রাসাদ বাড়ি ঘর সব কালো পাথরে পরিণত হয়ে গেলো নিমেষে। পাষাণ মূর্তির মতো যে যেখানে যে অবস্থায় ছিলো দাঁড়িয়ে রইলো, আজও তারা সেই একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের প্রাণশক্তি স্তব্ধ হয়ে গেছে, পশু-পক্ষী, জন্তু-জানোয়ার কেউ রেহাই পেলো না পয়গম্বরের সেই রুদ্র-রোষ থেকে। একমাত্র আমিই বেঁচে রইলাম, ইসলামে বিশ্বাসী ছিলাম বলে। আর সেইদিন থেকে নিয়মিত কোরান পাঠ করে আসছি আমি। কিন্তু আমি বড় নিঃসঙ্গ, বড় একা।'

শাহজাদার সেই করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে আমি তখন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। তার কথার মধ্যে কি যাদু ছিলো কি জানে, আমি মুগ্ধ হয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলি, 'ঠিক সময়েই আল্লাহ আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি এখন তোমাকে আমাদের বাগদাদ শহরে নিয়ে যেতে চাই। সেখানে গেলে দেখবে সবাই ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, তাদের সঙ্গে তোমার মোলাকাৎ হলে বুঝতে পারবে তারা এত সৎ এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান। তাদের সংস্পর্শে এলে ইসলাম ধর্মের আরো নতুন-নতুন তত্ত্ব তুমি জানতে পারবে, তোমার জ্ঞানের পরিধি আরো বেড়ে যাবে তখন। আমি তোমার বাঁদী হয়ে থাকবো জীবনের বাকী ক'টা দিন। সেখানে আমার বিরাট প্রাসাদ আছে, আমিই সেই প্রাসাদের একমাত্র কর্ত্রী, দাস-দাসী আমার কথায় ওঠে-বসে। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমি আমার জীবনকে উপলব্ধি করিনি, এখন মনে হচ্ছে আল্লাহ তোমার সঙ্গে আমার মিলন ঘটানোর জন্যই বোধহয় এতদিন আমার শাদার ইন্তজার করেছেন। এক রকম ভালোই হলো, সবাই খোদার মর্জি। চলো, আর কাল-বিলম্ব না করে আমার সাথে বাগদাদে চলো প্রিয়তম। আমার বাণিজ্যতরী তোমাদের বন্দরে অপেক্ষা করছে, সওদা করতে বেরিয়েছিলাম অর্থের লোভে, সেই লোভ এখন আর আমার নেই, তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য। তোমার মতো এমন সৎ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী পুরুষ সঙ্গী পেয়ে আমার জীবন ধন্য।—এই পর্যন্ত বলে আমি চুপ করলাম তার মনের কথা জানার জন্য।

ওদিকে শাহরাজাদ দেখলো আর একটা রাত্রি-শেষ হয়ে আসবে, আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। তখন সে তার অসমাপ্ত কাহিনী পরদিন রাতে শোনাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চুপ করলো।

পরদিন রাতে যথারীতি শাহরাজাদ তার অসমাপ্ত কাহিনীর জের টেনে বললো, জানেন জাঁহাপনা, মেয়েটি তখন সেই যুবকের প্রেমে ভেসে চলেছিল, তার সময় মন জুড়ে একটা বিরাট আসন করে নিয়েছে সে তখন, তাকে ছেড়ে একা দেশে ফেরার

সাধ্য ছিলো না তার। নতুন করে সে তার কাছে প্রেম নিবেদন করতে থাকে তার সঙ্গে বাগদাদে যাওয়ার জন্য। যতক্ষণ না যুবকটি 'হ্যাঁ' বললো, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার চেষ্টা চালিয়ে গেলো।

তারপর দুজনে একই পালঙ্কে শুতে গেলো। সেদিন রাতেই বলতে গেলে একরকম তাদের শাদী হয়ে গেলো। ও ওকে প্রাণ ভরে উপভোগ করলো, সোহাগ জানালো চুম্বন দিয়ে দেহ দিয়ে। পরদিন বড়বোনকে যুবকের সঙ্গে শুয়ে থাকতে দেখা যায়।'

এবার শুনুন সেই বড়বোনের জবানবন্দীতে।

পরদিন ভোর হওয়া মাত্র (খলিফা হারুন-অল্ রসিদকে উদ্দেশ্য করে বড়বোন বলতে শুরু করে) ঘুম ভেঙ্গে যায় আমাদের। তখন খাট থেকে নেমে আমরা দুজনে সুলতানের কোষাগারে প্রবেশ করলাম। কোষাগার থেকে দামী দামী হীরা মুক্তা, জহরৎ এবং সোনা রূপা যে যতটা পারলাম সংগ্রহ করে সঙ্গে নিলাম। তারপর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বন্দরের দিকে এগিয়ে চললাম। বন্দরে গিয়ে দেখি আমার দিদি এবং জাহাজের ক্যাপ্টেন আমার জন্য গভীর উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করছে। ক্রীতদাস এবং ক্রীতদাসীরা আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে। আমাকে ফিরে যেতে দেখে তারা খুব খুশি হলো, তাদের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। তারা জানতে চাইলো, আমার কি হয়েছিল, ফিরতে এত দেরী কেন হলো, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তখন আমি এই শহরের সুলতানের সেই করুণ কাহিনীর কথা সব খুলে বললাম তাদের। কি জন্য আজ এই শহরের সুলতান, বেগম এবং তাঁর প্রজারা পাষাণ হয়ে গেছেন, বললাম তাদের। দুঃখে তাদের বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু সঙ্গে আমার এই শহরের শাহজাদার যুবককে দেখতে পেয়ে আমার দুই দিদির (আমার সঙ্গের এই মাদী কুকুর দুটির প্রতি খলিফার দৃষ্টি আকর্ষণ করে)। মুখ দেখে মনে হলো তারা আমার সৌভাগ্যে খুশি নয়, হিংসায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। আমার সেই যুবক প্রেমিককে দেখে তখন থেকেই তারা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে শুরু করে দেয়।

জাহাজ আবার সমুদ্রে ভাসতে শুরু করলে একদিন কথা প্রসঙ্গে তো জিজ্ঞেস করেই বললো, 'আচ্ছা ছোট, তুমি ঐ সুপুরুষ যুবকটিকে দেশে নিয়ে গিয়ে কি করবে?'

মৃদু হেসে আমি তাদের আমার মনের কথাটা বলে ফেললাম, 'ওকে আমি শাদী করবো, ঘর বেঁধে বাকী জীবন সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাতে চাই।'

তারপর যুবকের দিকে ফিরে বলি, 'আমার প্রিয়তম, তুমি আমার বোনের কথা তো শুনলে সব, এবার বলো, তুমি আমাকে শাদী করবে তো?'

সে তখন মৃদু হেসে আমার প্রস্তাবে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলে 'প্রিয়তমা, তোমার হাতে আমার ইজ্জত, এখন থেকে আমি তোমারই কথা, সব ইচ্ছা পূরণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তোমার ইচ্ছা মতো এগিয়ে যাও। তোমার দেশে গিয়ে আমি তোমাকে আমার জীবন সাথী করে নেবো। কি, খুশি তো?'

'হ্যাঁ, আমি খুব খুশি প্রিয়তম, তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য। আমার সব চাওয়া শেষ তোমাকে পেয়ে। আমি কোন কিছুই চাই না, তুমিই আমার একমাত্র [illegible]।'

'জানেন জাঁহাপনা, আমার দিদিরা কিন্তু আমাদের খুশিতে খুশি হতে পারলো না। আমাদের ইচ্ছার কথা শুনে তারা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে শুরু করে দিলো সেই তখন থেকেই। উদ্দেশ্য আমাদের দুজনকে তারা দেশে ফিরতে দেবে না। এক সঙ্গে এই সমুদ্র পথে আমাদের দুজনকে খতম করে তারা আমাদের ধন-দৌলত হস্তগত করে সুখে কাটাবে।'

ওদিকে আমাদের জাহাজ তখন হাওয়ার অনুকূলে

নির্বিঘ্নে ভেসে চলেছে আমাদের দেশের উদ্দেশে। এভাবে চললে খুব তাড়াতাড়ি দেশে ফেরা সম্ভব হতে পারে। দিন কয়েক সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার পর একদিন আমরা বশরাহ বন্দরে এসে পৌঁছলাম। জাহাজ নোঙর করে সেখানে খানাপিনা সারা হলো। রাতটা সেই বন্দরে কাটানোর ব্যবস্থা হলো। রাত গভীর হতেই আমরা যে যার কেবিনে শুতে চলে গেলাম। আমি এবং শাহজাদা একটা কেবিনে এবং অন্য আর এক কেবিনের ব্যবস্থা হলো আমার দুই দিদির জন্য।

একটু পরেই আমি এবং [illegible] স্বামী গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু [illegible] আমার দুই দিদির চোখে ঘুম নেই। তখন তারা কুমতলব [illegible] করতে [illegible] ঠিক করলো সেই রাত্রেই তারা আমাদের দুজনকে খুন করবে। সেই মতো তারা পা টিপে টিপে চুপিসারে আমাদের কেবিনে ঢুকে আমাদের ঘুমন্ত দেহ দুটি তুলে নিয়ে গিয়ে অশান্ত সমুদ্রের জলে [illegible] করলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি সাঁতার জানতাম, সাঁতার কেটে [illegible] কোন রকমে সোজা এক দ্বীপের তীরে। কিন্তু শাহজাদা সাঁতার জানতো না, সে [illegible] হাবুডুবু [illegible] গেলো [illegible] তা [illegible] কি [illegible] জাহাপনা, [illegible] আপনি [illegible] নেই। [illegible] তখন আমার বুক [illegible] ফেটে যাচ্ছিল কাঁদতে কাঁদতে [illegible] চিৎকার করে উঠলাম তখন। কিন্তু [illegible] কোন সাড়া [illegible] পেলাম না, তার বদলে সমুদ্রের গর্জন [illegible] এলো, সমুদ্রের ঢেউগুলো [illegible] স্মরণ [illegible] দিলো, বৃথাই আমার তাকে খুঁজে ফেরা। শাহজাদার ভাগ্যে কি ঘটেছিল জানি না তখনো।

ভিজে পোষাকে সমুদ্রতীরে বসে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম। পরদিন ভোরের আলোয় দেখলাম, আমার জাহাজ তখন আমার চোখের আড়ালে চলে গেছে, তখন পড়ে আছে এক নির্জন দ্বীপে একা, নিঃসঙ্গ। সেই দ্বীপের একটা মেঠো পথ দেখে মনে হলো, পথ যখন আছে, তখন জনবসতির হদিশ পাওয়া যেতে পারে হয়তো, সেই পথ দিয়ে কয়কদম এগিয়েছি, হঠাৎ চোখে পড়লো একটা বড় সাপ একটা ছোট সাপকে তেড়ে আসছে। একটু পরে ছোট সাপটা আমাকে চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। তার হাবভাব দেখে মনে হলো, সে যেন আমার সাহায্য চায়, অর্থাৎ আমি যেন বড় সাপটাকে শায়েস্তা করে। তার সেই মনোভাবের কথা টের



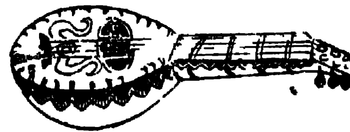
পাওয়া মাত্র একটা বিরাট পাথরের টুকরো হাতে তুলে নিয়ে বড় সাপটার মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই পাথরের আঘাতে বড় সাপটার মাথা থেঁতলে গেলো, এবং তার নিষ্প্রাণ দেহটা মাটির উপরে লুটিয়ে পড়লো। ওদিকে ছোট সাপটা হঠাৎ দুটি ডানা মেলে আকাশে উড়ে যেতে থাকে, এবং একটু পড়েই আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় সে। সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্যের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেখি ছোট কালুকেউটে সাপটা মেয়ের রূপ ধারণ করে আমার পায়ের সামনে বসে আছে, এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এই মাদী কুত্তি দু'টি (জাঁহাপনা, এরা আমার সেই দুই দিদি)। তখনো আমি তার পরিচয় জানি না। ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসে শুধোই, 'আচ্ছা বোন, তুমি কে, কোথ্ থেকে আসছো?'

তার দু'চোখে বিস্ময়। এর মধ্যে তুমি আমাকে ভুলে গেলে? মনে নেই তোমার, তুমি আমাকে সেই বড় পুরুষ সাপটার অত্যাচার থেকে আমাকে বাঁচিয়েছিলে আল্লাহর দোয়ায়। আমি একজন জিনিয়াহ এবং সেই বড় সাপটা ছিলো জিন। সে আমাকে ঘৃণা করত। তার হাত থেকে তুমি আমাকে মুক্ত করে দেওয়া মাত্র আমি আকাশে উড়ে যাই। তারপর তোমার জাহাজে নামি, যেখান থেকে তোমার দিদিরা তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। তোমাকে একটা সুখবর দিই, তোমার সব সামানপত্তর তোমার বাড়িতে রেখে এসেছি। তারপর আমার অনুচরদের হুকুম করি, জাহাজটাকে জলে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য। তার আগে তোমার সেই নিষ্ঠুর দুই দিদিকে কুত্তিতে পরিণত করি। আমি জানি ঐ দুই দিদি তোমার এই দুরবস্থার জন্য, তাদের জন্যই তুমি তোমার প্রেমিককে হারিয়েছ। বেচারা সাঁতার জানত না, তাই সে জলে ডুবে মারা যায়।'

তারপর সেই জিনিয়াহ আমাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললো, 'তোমার দিদিদের আমি হিসেবে প্রতিদিন তিনশোটা বেত মারবো।' ফিরে যাওয়ার আগে সে আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেলো, 'তুমি যদি আমার কথা আক্ষেপ করে কিংবা ভুল করে, কোনদিন তাদের বেত না মারো, আমি তখন আবার ফিরে আসবে এবং তাদের আবার মানুষে পরিণত করার জন্য ছুটে আসবো।'

আমি তাকে জবাব দিলাম। সেই থেকে একটি দিনও আমি তাদের বেত মারতে ভুলিনি, প্রতিদিন মেরে তাদের তাদের পিঠে রক্ত ঝরাই। আর তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলি, 'আমি তোমাদের কাছ থেকে মাফি চেয়ে নিচ্ছি, আমার কোন দোষ নেই আল্লাহ। আমি শুধু আজ্ঞাবাহক মাত্র। তারা যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়।' 'হ্যাঁ জাঁহাপনা, এই হলো আমার জীবনে সেই করুণ কাহিনী!

খলিফা তার জীবনের সেই করুণ এবং বিচিত্র কাহিনী শুনে বিস্মিত হলেন, এবং জাফরকে ইশারা করে বলে দিলেন; মেজবোনকে তাঁর সামনে হাজির করার জন্য।'



'জাঁহাপনা, আপনাকে আমার জীবনের কাহিনী বলতে পারার জন্য আমি ধন্য। আল্লাহ আজ আমায় দয়া করে আপনার দরবারে মিলিয়ে দিয়েছেন, 'অতঃপর মেজোবোন তার জীবনেব একটা রূপরেখা টানতে শুরু করলো, 'মৃত্যুর সময় আব্বাজান আমার জন্য প্রচুর ধন সম্পত্তি রেখে যান। অল্প কয়েকদিন নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে একদিন এক বিরাট ধনী সওদাগরের সাথে আবার বিয়ে হয়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বেহস্তে চলে যায় সে। আমি তখন তার আশি হাজার স্বর্ণ দিনারের অধিকারিণী হয়ে যাই পবিত্র উত্তরাধিকার আইনের বলে। কাঁচা বয়স আমার তখন, হাতে কাঁচা পয়সা এলে যা হয়, আমাদের তাই হলো।

একদিন হলো কি বাড়িতে বসে আছি, হঠাৎ একটি বৃদ্ধা এসে উপস্থিত হলো আমার কাছে, অতি কুৎসিত কদাকার দেখতে। ভাঙ্গ দাঁত, মোটা ভ্রূ, সাদা-কালোয় মেশানো সাপের দেহের মতো মাথার চুল, বিরাট মুখের হাঁ। তাকে দিনের আলোয় দেখলেই ভয় পেতে হয়, না জানি রাতের অন্ধকারে দেখলে কি হবে, হয়তো ভুত দেখাব মতো আঁতকে উঠতে হবে। ডাইনী সদৃশ চেহারা।

আমার সামনে জমিনে চুম্বনের স্পর্শ রেখে সালাম জানিয়ে সে বলে, 'আজ রাতে আমার পালিতা মেয়ের শাদী, সে বড় অসহায়। আমরা গরীব, এবং এই শহরে নবাগতা, কাউকে চিনি না। তাই আপনি যদি আমার তার শাদীতে হাজির হন আমি ধন্য হবো, খোদা আপনার মঙ্গল করবেন। আর আপনি এসেছেন শুনে এই শহরের অন্য মানুষ-জনও উপস্থিত হবে আমার মেয়ের শাদীতে। তাই আপনাকে আমাব বিনীত অনুরোধ আপনার যা দয়া হয় দেবেন এবং আপনি যেন—'

এই দিন দুনিয়ায়,
আমরা বড় অসহায়।
আপনি এলে,
অন্য সবাই মিলে,
করবে শাদীর আসর।

বৃদ্ধার কথার মধ্যে কি যাদু ছিলো কে জানে, দয়া পরবশ হয়ে আমি তার অনুরোধ রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের মনে বললাম, এই সুযোগ, শাদীর আসরে যাওয়ার নামে আমি আমার দামি পোষাকের বাহার এবং আমার হীরা-মানিক খচিত ওপর অলঙ্কারের জৌলুষ প্রদর্শন করা যাবে।

আমার সম্মতি পেয়ে বৃদ্ধা আমার পা দু'টির ঝাঁপিয়ে পড়ে চুম্বন করতে করতে বললো, 'খোদা আল্লাহ, আপনার মনের ইচ্ছা পুরণ করুন, আর আমি যেন ধন্য হই আপনাকে পেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা আরো বললো, 'আমার জন্য এখুনি আপনাকে কোন কষ্ট করতে হবে না, নৈশ-ভোজের সময় আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন, আমি নিজে এসে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।'

পর পর সে আমার হাতে চুমু খেয়ে প্রস্থান করলো তখনকার সুতোয় গেঁথে মালা গাঁথলাম, ব্রোকেডের শাড়িটা সাফ করলাম, লোহার সিন্দুক থেকে দামী অলঙ্কারগুলো বার করলাম, বৃদ্ধা এলে সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়ব তার সঙ্গে। তার আগে হামামে ঢুকে স্নানটা সেড়ে রাখলাম। জানি না আমার কি সৌভাগ্য প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে আমার জন্য।

আমার ভবিষ্যতের চিন্তায় আমি মগ্ন, সেই সময় সেই বৃদ্ধা এসে আমার হাজির হলো, কথাবার্তা তার দ্রুত নয়, 'মালকিন, শহরের গণ্যমান্য মহিলারা সবাই হাজির, আপনি এবার চলুন, তাঁরা আপনার জন্য অধীর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন।'

তৈরি হয়েই আমি ছিলাম। অতঃপর আমি আমার পরিচারিকাদের নিয়ে বৃদ্ধার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়।

বৃদ্ধা বলেছিল সে গরীব ইনসান। কিন্তু একটা বিরাট প্রাসাদের সিংহদ্বারের সামনে এসে তাকে থামতে দেখে আমি একটু অবাক হলাম, এ আমায় কোথায় নিয়ে এলো সে? এ কি আমার সৌভাগ্য না কি দুর্ভাগ্য কে জানে। সিংহদ্বারের প্রবেশ পথের দেওয়ালগাত্রে খোদাই করা শায়েরী চোখে পড়লো আমার সেই সময়:

হাসির রাজ্যে আমার বাস,
চিরন্তন—
নেই কোন উত্থান, নেই কোন পতন
স্খলন,
নেই কোন পাপ আমার মনে।
ভালোবাসি ফুল ফোটার গান,
আমার আনন্দ,
তুমি সুখে থাকো,
তোমার মনের আয়নায় আমার প্রতিবিম্ব
যেন দেখি,
ভরা থাক স্মৃতি সুধা, থাকে নাকো
কোন দ্বন্দ্ব।

প্রাসাদে প্রবেশ করার দরজায় কড়া নাড়তেই কপাট খুলে যায় আমাদের জন্য। বাদশাহী কায়দায় প্রাসাদের ঘরগুলি সাজানো। ঘরের মেঝের উপরে পারস্যের গালিচা বিছানো, সিলিং-এ ঝাড় লণ্ঠন ঝুলানো, চিরাগবাতি ঝলমল করছে। বারান্দা পেরিয়ে আমরা গিয়ে ঢুকলাম এক কক্ষে, সুন্দর করে সাজানো সেই কক্ষ, শিল্পী যেন তার নিপুণ হাতে তার মনের সব রঙ উজাড় করে দিয়ে ঘরটি সাজিয়ে রেখেছিল আমার জন্য, যা ভাষায় সামান্য দু চার কথায় বর্ণনা করা যায় না। জাঁহাপনা, মেজবোন তখন সুলতান হারুন-অল রসিদকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে, 'জানেন জাঁহাপনা, তারপর কি দেখলাম জানেন? এক অপরূপ সুন্দরী যুবতী নৃত্যের তালে তালে পায়ের ছন্দ মিলিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো ঘরটা এমনিতেই দেখতে বেহেস্তের মতো লাগছিল সেই ঘরে সুন্দরী মেয়েটিকে আমার বেহেস্তের পরীর মতোই মনে হলো যেন। সে ঘরে ঢুকাই ঘরের বাহার যেন আরো বেশি খুলে গেলো।

মেয়েটি তার হাত দুটি আমার দিকে প্রসারিত করে আহ্বান জানালো আমাকে, 'এসো বহিন, সুস্বাগতম। বহুত সুক্রিয়া, আমি তোমার জন্যই ইন্তজার করছিলাম অনেকক্ষণ থেকে।' তারপর সে একটা শায়েরী আওড়াল:

এই প্রাসাদ, প্রাসাদের মানুষজন
[illegible] আছে সবাই, তুমি আসবে
যে পথ দিয়ে
ধুলা উড়িয়ে,
অধর চুমিয়া তোমার পায়ের ধুলায়
সঁপিয়াছে তারা আদর যতন,
করো এবার সমর্পণ,
তোমাকে পেয়ে আজ এই প্রাসাদখানা
ধন্য তোমার পদস্পর্শে,
এবার নাকাব খোলো হে বেহেস্তের পরী।

সোনার পালঙ্কের হাতছানির দুর্বার আকর্ষণ আমি অনুভব করছিলাম তখন। মেয়েটি আমাকে সেই পালঙ্কের উপরে বসিয়ে আমার পাশে বসলো। তারপর সে তার দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'জানো বহিন, আমার এক ভাইজান

আছে, সে তোমাকে এক শাদীর আসরে দেখে থাকবে, আমার থেকেও সুপুরুষ সে, যে কোন সুন্দরী মেয়ে তার সঙ্গে মহব্বৎ করতে পেলে ধন্য হয়ে যাবে। আমার সেই ভাইজান তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। সে তোমাকে তার মনের কথা বলার জন্য বৃদ্ধাকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে ছলে বলে কৌশলে তোমাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসেছে। এবার বুঝতেই পারছো, এখানে অনাথ মেয়ে বলে কেউ নেই, এখানে আমরা সবাই আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, এবং আবরুজানও। তবে তার কোন দুঃখ, তোমার দিল সে এখনও জানতে পারেনি। তাকে তুমি খারাপ ভেবো না, তার উদ্দেশ্য খারাপ বলে মনে করো না। আসলে সে তোমার মত পেলেই তোমাকে তার বিবি সম্মানে ভূষিত করতে চায়। এ সবই আল্লাহর দোয়ার উপরে নির্ভর করছে, অবশ্য তোমার যদি মদত থাকে তবেই তা সম্ভব।'

আমি দেখলাম এত বড় একটা প্রাসাদে আমি তাদের হাতে বন্দিনী, এখন আমার ইচ্ছের কোন মূল্য নেই এখানে। স্বভাবতঃ আমি তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম। মেয়েটি তখন উল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে তার যুবক ভাই এসে ঘরে প্রবেশ করলো। সত্যি সুদর্শন যুবকই সে, আমার উপযুক্ত শাহাজাদার মতোই তার রূপ বটে। তার মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকাতে গিয়ে মনে মনে ভাবলাম, তার কোন একটুও বাড়িয়ে কিছু বলেনি। প্রথম দর্শনেই আমি তার মহব্বতে পড়ে গেলাম। মনে মনে বলে উঠলাম, এসো, তুমি আমাকে গ্রহণ করো প্রিয়তম।

যুবকটি বোধহয় আমার মনের কথাটা টের পেয়ে গিয়েছিল, তাই সে আমার পাশে এসে বসলো। নিচু গলায় সে আমাকে প্রেম নিবেদন করলো, কথা বলতে গিয়ে তার মুখে সব সময় সুন্দর হাসিটা যেন লেগেই ছিলো। যেন আসমান থেকে চাঁদ নেমে এসেছে জমিনের উপরে। পূর্ণ চাঁদের হাট বসে গেছে তার অধরে। আমাকে তার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে দেখে মেয়েও আর একবার আনন্দে নেচে উঠে হাততালি দিয়ে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে ঘরে এসে প্রবেশ করলো কাজী এবং তার চারজন সাক্ষী। তারা আমাকে সালাম জানালো। সেখানেই একটা কাগজে আমাদের শাদীর কবুলনামা লেখা হলো।

তারপর যুবকটি আমার দিকে ফিরে বললো, 'হে সুন্দরী, তোমাকে আমার একটি শর্ত জানিয়ে দিই।' এই বলে সে উঠে গিয়ে একটা পবিত্র কোরান এনে বলে, 'এটা স্পর্শ করে দুনিয়া তরফ করো, ভবিষ্যতে আমাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষের আসক্ত হবে না।'

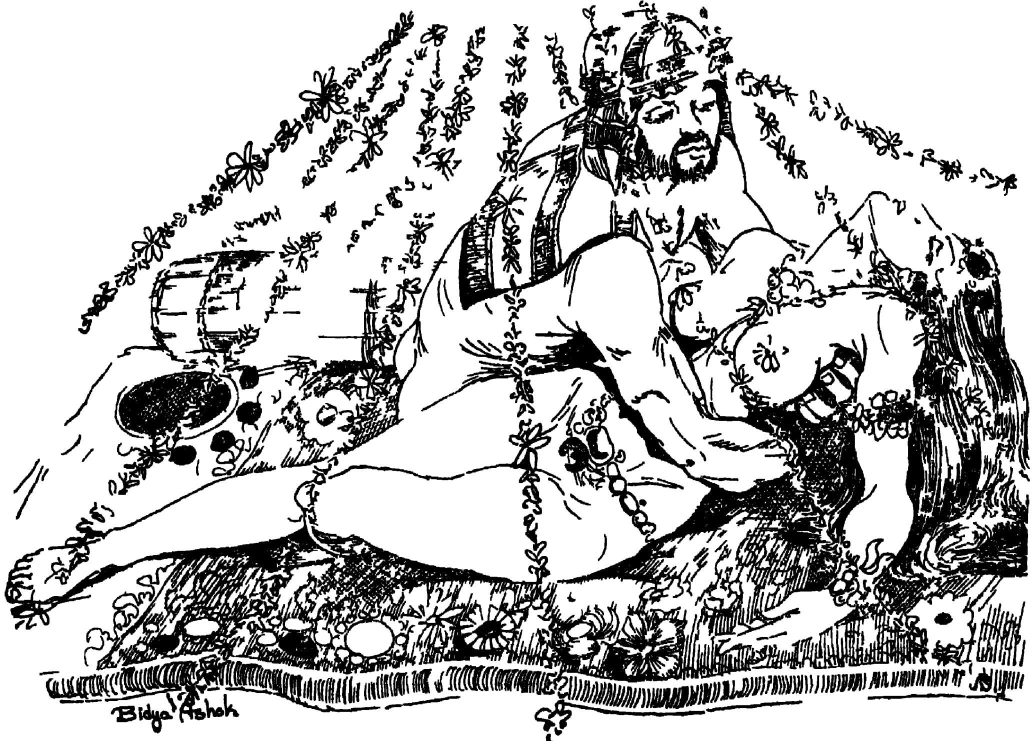
আমি তৈরি হয়েই ছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সেই পবিত্র কোরান স্পর্শ করে তার কথা মতো শপথ নিলাম। আনন্দে লাফিয়ে উঠে সে আমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো প্রেমের আলিঙ্গনে। আমার অধরে, গালে, কপালে বার বার চুমু খেয়েও যেন তার পিপাসা মেটে না। তার সেই উদ্দাম ভালো-বাসা আমায় কানায় কানায় ভরিয়ে দিলো।

তারপর নৈশভোজের আসরে যে যা পারল খেলো। আমার খাওয়ায় মন ছিলো না, আমার তখন অন্য চিন্তা। কখন রাত গভীর হবে, কখন আমি আমার নতুন স্বামীকে একান্ত কাছে পাবো। এক সময় আমার সেই ইচ্ছা পূরণের মুহূর্তটি আমার হাতের মুঠোয় এলো, হাত বাড়ালেই আমি তাকে আমার হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে যেতে পারি। সে আমাকে তার শয়ন কক্ষে নিয়ে গেলো। ফুলে ফুলে সাজানো পালঙ্ক, মখমলের মতো নরম বিছানায় আতর খুসবু ছড়ানো। একটু আগে আমরা সরাব পান করতে ব্যস্ত ছিলাম। সেই সরাবের আসর ছেড়ে আমরা তখন ফুলের বাসরে এসে প্রবেশ করলাম। আতর, খুসবু, এবং ফুলের মিষ্টি গন্ধে আমার নূতন স্বামী মহব্বত জানানোর জন্য

পাগল। পাগলের মতো আমার শরীরটা ফুল-শয্যায় এলিয়ে দিয়ে ঘন ঘন চুমু খেলো, কখনো জড়িয়ে ধরে, কখনো বা আমার শরীরটা তার কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে। আমার নরম দেহটা তখন যেন তার খেলার পুতুল হয়ে যায়। সারা রাত ধরে সে আমার দেহটা নিয়ে তার খুশি মতো খেলা করে। তার উষ্ণ আলিঙ্গনের স্পর্শ সুখ পেয়ে আমি তখন ধন্য, নিজেকে তার কাছে সঁপে দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করলাম না। এর আগেও আমার একবার শাদী হয়েছিল, কিন্তু আমার আগের স্বামী ছিলেন কবর-যাত্রী, উত্থান-শক্তি রহিত এমন এক বৃদ্ধ আমার মতো যুবতীর টগবগে যৌবনে কি এমন ঝড় তুলতে পারে? যে ক'দিন সে বেঁচে ছিলো, আমাকে সে শুধু উত্তেজিতই করতে, কিন্তু আমার সেই উত্তেজনা প্রশমিত করার মতো তার প্রয়োজনীয় দৈহিক ক্ষমতা ছিলো না। তাই সত্যিকারের পুরুষের সুখ পেলাম সেই রাতে আমার নতুন স্বামীর কাছ থেকে। সার্থক হলো আমার নারী জীবন, সম্পূর্ণ হলো আমার কুমারীত্বের বিসর্জন উৎসব। সেই রাতে সে আমায় সুখের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো একটার পর একটা প্রেম-প্রেম খেলায়।

এই ভাবে পুরো একটা মাস প্রতি রাতে সুখ দিয়ে সে আমার মন ভরিয়ে দিলো। আমি ধন্য তাকে আমার নতুন স্বামী পেয়ে। কিন্তু মানুষের সুখ বোধহয় চিরন্তন নয়, খোদারও ইচ্ছা নয়, কেউ এক নাগাড়ে চিরকাল সুখ ভোগ করুক। এক মাস যাওয়ার পর আমার কি খেয়াল হলো, (নাকি ভিমরতি) নতুন স্বামীর অনুমতি নিয়ে বাজারে বেরোলাম কিছু জিনিষ কেনাকাটা করার জন্য, সঙ্গে নিলাম সেই বৃদ্ধাকে এবং একজন ক্রীতদাসীকে।

প্রথমেই গেলাম একটা সিল্কের শাড়ীর দোকানে। দোকানী একজন যুবক। বৃদ্ধা তার সঙ্গে আমার



পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলে, 'ওর বাবা একজন বিরাট কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। এখানে আপনি আপনার মনের মতো পছন্দ করে শাড়ী কিনতে পারেন।' তারপর সে, সেই যুবক দোকানীকে উদ্দেশ্য করে বলে 'বাছা এই মহিলাকে তুমি তোমার দোকানের সব থেকে দামী শাড়ী দেখাও। পরে সে আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিসফিস করে বলে, 'যুবকটির সঙ্গে দু'চারটের মিষ্টি-মধুর কথা বলুন মালকিন।'

আমি তখন রেগে গিয়ে তাকে বলি, 'আমরা শাড়ী কিনতে এসেছি, মিষ্টি কথা বলতে আসিনি।'

যুবকটি আমার পছন্দ মতো শাড়ী এনে দেয় তার ভাণ্ডার থেকে। সেই সব শাড়ীর দাম দিতে গেলে যুবকটি দাম নিতে অস্বীকার করে বলে, 'আজ এই শাড়াগুলো আপনাকে উপহার দেবার সুযোগ আমাকে দিন, পরে অন্যদিন দাম নেবে'খন।' তখন আমি বৃদ্ধাকে বললাম, 'উনি যদি শাড়ার দাম না নেন, তাহলে ওর সব শাড়ী ওকে ফিরিয়ে দাও।'

'হায় আল্লাহ', কান্নার মতো করে যুবকটি চিৎকার করে উঠে বললো, 'এক কানাকড়িও আমি আপনার কাছ থেকে আজ নিতে পারছি না, আমি কোন স্বর্ণ-মুদ্রা কিংবা রূপার বাবের বিনিময়ে আপনার কাছে শাড়ী বিক্রী করতে চাই না, আমি শুধু চাই বিনিময়ে একটিবার আপনাকে চুম্বন করতে। আমার এই দোকানে যত শাড়ী আছে, সে সবের দাম আপনার একটি চুম্বনের সমান।'

'একটি চুম্বনে তোমার তাতে কি লাভ হবে বাছা?' যুবকটির দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে বৃদ্ধা এবার আমার দিকে ফিরে নিচু গলায় বলে, 'অমন একজন সুপুরুষ যুবক তোমার কাছ থেকে একটি মাত্র চুম্বন ছাড়া আর তো কিছু চাইছে না। এতে তোমার আপত্তি কিসের বোন?' একান্ত আপন-জনের মতো 'তুমি' করে সে বললো, 'রাজি হয়ে যাও বোন, ভবিষ্যত তোমার আরো সুখের হবে। ও তোমাকে—'

'ও কথা বলো না তুমি', আমি তাকে বাধা দিয়ে বলি, 'আমি যে কোরান ছুঁয়ে আমার স্বামীর কাছে শপথ করেছি, তিনি ছাড়া অন্য কোন পুরুষে আসক্ত হবো না আমি।'

কিন্তু সে আমার কোন যুক্তি মানতে চাইল না, বললো, 'তাতে কি হয়েছে, কেবল একটি মাত্র চুম্বন তো, কেউ জানতে পারবে না, তোমার একটি চুম্বন পেলে ধন্য হয়ে যাবে যুবকটি, আর তোমার শপথ ভঙ্গের কথাও কেউ জানতে পারবে না। রাজি হয়ে যাও বাছা, হয়তো একটি চুম্বনের বিনিময়ে তোমার ভাগ্য ফিরে যেতে পারে।'

বুড়ি তখন এমনি নাছোড়বান্দা যে আমি না তার কথা ফেলতে পারছি, না আমি সেখান থেকে পালিয়ে আসতে পারছি। দেখলাম বেশি জোর-জবরদস্তি করলে হৈ-চৈ, লোক জানাজানি হয়ে যাবে। ভাবলাম, তার চেয়ে বরং যুবকটির প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাই।' মাত্র একবার তো সে চুমু খাবে, ক্ষতি কি! রাস্তার লোক যাতে না আমাদের চুম্বনের দৃশ্য দেখতে পায়, সেই জন্য রাস্তার দিকে পিছন করে দাঁড়ালাম, নাকাব দিয়ে মুখটা ঢেকে দিলাম। নাকাবের মধ্যে দোকানী তার মাথা গলিয়ে আমার অধরের সঙ্গে সে তার ঠোঁট মিলিয়ে চুমু খেলো, একবার। কিন্তু চুমু খাওয়ার সময় এত জোরে সে কামড়াল যে ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো। যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিলাম, বৃদ্ধা ঠিক সময়ে আমাকে ধরে ফেললো দু'হাত বাড়িয়ে।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম দোকানী তার দোকান বন্ধ করে রেখে পালিয়েছে। বৃদ্ধা তখন আমাকে সহানুভূতি জানিয়ে বললো, 'আল্লাহর দোয়ায় সে তোমার আরো বেশি ক্ষতি যে করেনি, সেটাই মঙ্গল। তারপর সে আমার একটা হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে গিয়ে বলে,

'চলো, এবার ফেরা যাক, মালিক ফেরার আগেই আমাদের ফিরতে হবে। আর একটা কথা, তোমার মুখের ঐ ক্ষত ভুলেও কখনো মালিককে দেখিও না। উনি যা চতুর লোক, খারাপ একটা কিছু ধারণা করে নিলেই হলো! তারচেয়ে দু'চারদিন শরীর খারাপ বলে চালিয়ে দিও। ভালো পাউডার এনে দেবো, ক্ষতস্থানে ছড়িয়ে প্লাসটার লাগিয়ে দেবো, লাগালে দু'দিনেই দাগ মিলিয়ে যাবে। তখন তোমার স্বামী টের পাবে না আজকের ব্যাপারটা।

দিনের বেলাটা শরীর অসুস্থ বলে তো কাটিয়ে দিলাম, কাউকে আমার ঘরে ঢুকতে দিলাম না। কিন্তু রাত্রে স্বামী-সঙ্গ এড়াই কি করে! আমার ঠোঁটের ক্ষতই বা তাঁর চোখের আড়াল করি কি করে?

আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে আমার স্বামী উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'প্রিয়তমা, শুনলাম তুমি নাকি অসুস্থ, তোমার এ হাল হলো কি করে? বেশ তো বহাল তবিয়তে বাড়ি থেকে বেরোলে সকালে সওদা করতে।'

প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, 'ও কিছু নয়, একটু মাথা ধরেছে, তাই শুয়ে আছি।'

তবু আমার স্বামীর উদ্বেগ দূর হলো না চিরাগ-বাত্তি আমার মুখের সামনে মেলে ধরে নকাব তুলে আমার মুখ ভালো করে দেখতে গিয়ে শিউরে উঠলেন, 'সে কি, তোমার ঠোঁট ও ভাবে কেটে গেলো কি করে প্রিয়তমা?'

'আর বলো কেন, সওদা করার জন্য অন্যমনস্ক ভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, সেই সময় একটা উট পিঠে জ্বালানি কাঠ নিয়ে আমার কাছ দিয়ে যেতে গিয়ে একটা কাঠের খোঁচা লেগে যায় আমার ঠোঁটে, তাতেই এই রক্তারক্তি। আমি ঠিক লক্ষ্য করিনি, আচমকা খোঁচা লেগে যায়, এই আর কি!'

'ঠিক আছে, কালই আমি সুলতানের দরবারে গিয়ে নালিশ জানাবো। জ্বালানী কাঠের সওদা-গরদের শায়েস্তা করে ছাড়বো।'

না; না ওদের আর আর দোষ কি বলো', 'আমার মনে শঙ্কা জাগে, একজনের অপরাধে অন্যজন কেন শুধু শুধু শাস্তি পাবে? স্বামী তখন রাগে ফুঁসছে। তার রাগ প্রশমিত করার জন্য কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বললাম, 'আসলে দোষ ঐ গাধাটার। বাজারে যাওয়ার জন্য একটা গাধা ভাড়া করি; সেই গাধাটা ভীষণ দুষ্টু ছিলো। শুরু থেকেই তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছিল পথ চলতে গিয়ে। টাল সামলাতে না পেরে হঠাৎ এক সময় সেই গাধার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যাই, তখন মাটিতে পড়ে থাকা কাঠের টুকরো কিংবা কাঁচের টুকরোয় লেগে ঠোঁটটা কেটে গিয়ে থাকবে হয়তো।'

'তাহলে', আমার স্বামী এবার আরো রেগে গিয়ে বললে, 'কাল সকালেই আমি জাফর-অল- তারসকীর কাছে গিয়ে অভিযোগ করবো আজকের এই ঘটনার কথা জানিয়ে, যাতে তিনি হতচ্ছাড়া গাধার মালিককে কোতল করার আদেশ দেন।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে, প্রিয়তম, আমি ওর গলা জড়িয়ে ধরে আবদারের সুরে বললাম, 'আমার এই সামান্য আঘাতের জন্য দুনিয়াশুদ্ধ লোককে শাস্তি দেবার কোন প্রয়োজন নেই, আল্লাহই উপযুক্ত অপরাধীকে ঠিক শাস্তি দেবেন, দেখো, তাছাড়া এটা তো একটা দুর্ঘটনা মাত্র, তার জন্য কাউকে দায়ী করা যায় না, কি বলো?'

তারপর জাঁহাপনা, সুলতান হারুন-অল- রসিদকে উদ্দেশ্য করে বলে, আমার মনে হয়, আমার স্বামী বোধহয় আসল ঘটনার কথা অনুমান করে থাকবে। তা না হলে সবজান্তার মতো অমন উত্তেজিত হয়ে বললোই বা কেন—

'চুপ কর বিশ্বাসঘাতিনী, তুই তোর শপথের কথা খেলাপ করেছিস। আসল ঘটনা চেপে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কাহিনী শুনিয়ে পবিত্র কোরাণ অপবিত্র করেছিস তুই। এরপর বিশ্বাস করে তোকে

আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না।' এই বলে সে চিৎকার করে একবার হুঁঙ্কার ছাড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে সাতজন হাবসী ক্রীতদাস দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে ছুটে এলো।

আমার স্বামীর হুকুমে তারা আমাকে বিছানা থেকে ঠেলে নামিয়ে ঘরের ঠিক মাঝখানে নিক্ষেপ করলো। তারপর আমার স্বামীরই নির্দেশে একজন হাবসী আমার দুটো কনুই দুদিকে চেপে ধরলো তার শক্ত মুঠোর মধ্যে, তার সারা দেহের ভার আমার মাথার উপরে, দ্বিতীয় হাবসী ক্রীতদাস আমার হাঁটু দুটো চেপে ধরে পা দুটো দুদিক ফাঁক করে বসে রইলো তার মালিকের হুকুমের জন্য। আমার স্বামী তখন তাঁর শানিত তরবারি তৃতীয় হাবসীর হাতে তুলে দিয়ে হুকুম করলো 'সাদ, ঐ তরবারি দিয়ে ওর ধর আর গর্দান কেটে আলাদা করে দে, তারপর ওর দেহের খণ্ডিত টুকরো দুটো টাইগ্রীস নদীতে ভাসিয়ে দিবি, মাছেরা খুঁটে খুঁটে ওর দেহ যাতে খেয়ে ফেলে। বিশ্বাসঘাতিনীর এই হবে যোগ্য পুরস্কার।'

ও আমার মহব্বৎ, আমার পাপ,
ওর মহব্বৎ, এখন দাঁড়ি-পাল্লায়,
অন্য পুরুষে ভাগ বসায়,
জানিনি আগে পুষেছি আমি এ কোন্
কাল সাপ।
আমি যে জেনেছি ও কলঙ্কিনী,
এরপর ওকে জীইয়ে রাখার কোন মানে
হয় না।
মহব্বতের এমন অপমান আমি সইবো না,
আমি যে জেনেছি ও বিশ্বাসঘাতিনী

হাবসী সাদ তার মালিকের কাছ থেকে চরম হুকুম পেয়ে শেষ মুহূর্তে তার হাতের তরবারি উঁচিয়ে আমাকে বললো, 'মালকিন, তোমার আখরি সময় এখন উপস্থিত। তোমার কোন শেষ ইচ্ছা থাকলে বলতে পারো, সম্ভব হলে তা পূরণ করা হবে—'



'তোমার শতায়ু হোক বাছা', আমি তাকে অনুরোধ করলাম আমার মাথার উপর থেকে একটু সময়ের জন্য নেমে যেতে, যাতে করে আমি আমার শেষ জবানবন্দী দিয়ে যাই। হাবসী সাদ আমার অনুরোধ রাখলে পর আমি তখন সংক্ষেপে বললাম, কি কারণে আজ আমার এই অবস্থা একেবারে সিংহাসন থেকে ধূলায় কেন আমাকে নেমে আসতে হলো আজ। কি ভাবেই বা সেই দোকানী আমার এমন সর্বনাশ করলো, সব তাকে খুলে বললাম। আমার স্বামী সব শুনেও আমাকে ক্ষমা করা দূরে থাক উল্টে রাগে ও গুজনায় গর্জে উঠলেন, 'সাদ, ঐ কুত্তিকে বলে দে, ওর অমন ঠুনকো ভালবাসায় আমার আর বিশ্বাস নেই, মরতে ওকে হবেই—

নারী, তোমরা ছলনাময়ী,—
এক পুরুষে তোমাদের দেহের সুখ মেটে না,
আমি তোমার কথায় ভুলব না,
তোমার ঐ পাপ মুখে মহব্বতের কথা
মানায় না।

মৃত্যু তোমার শিয়রে,
মিথ্যা সাফাই না গেয়ে,
এবার তুমি বিদায় হও,
আল্লাহর নাম জপ করে।

'আমার স্বামীকে আমি বিশ্বাস করে কতই না ভালবেসেছিলাম, সেই স্বামী আমার সত্য কাহিনী বিশ্বাস করলেন না। বিশ্বাস করুণ জাঁহাপনা, মেজোবোন তার চোখের জল আর কিছুতেই চেপে রাখতে পারলো না, কান্নাজড়ানো স্বরে বললো, 'তখন আর আমি বেঁচে থাকার কোন মানে খুঁজে পেলাম না। আমি তখন জেনে গেছি, মৃত্যু আমার অনিবার্য তাই আমার শেষ প্রার্থনা জানালাম আমার স্বামীর কাছে।

যখন আমি রইবো না এ দুনিয়ায়,
পড়বে মনে আমাকে তোমার,
রচনা করো একটি স্মৃতি-সৌধ মিনার,
খোদাই করে তার উপরে লিখে রেখো
আমার নাম,
তোমায় জানাই আমার সালাম।
খোদা জানেন কোন দোষ নেইকো আমার,
বিচারের নামে এ প্রহসন, এ অন্যায়।



আমার শায়েরীর উত্তরে আমার স্বামীর মুখে শায়েরী শুনতে পেলাম, কি অশ্রাব্য তার ভাষা, আর কুরুচীর পরিচয় না পেলাম তার মনের কথায়। সে সব কথা আপনি নাই বা শুনলে জাঁহাপনা। এখানে অনেক জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ দেখতে পাচ্ছি, তাঁদের কাছে আমি আমার স্বামীকে হেয় করতে চাই না। আমার উপরে যত সে অন্যায় করে থাকুক না কেন, হাজার হোক সে তো আমার স্বামী ছিলো একদিন। তার সম্মান আমি ধূলোয় মিশিয়ে দিতে পারি না। জাঁহাপনা, আমার দু'চোখের কোল বেয়ে তখন অশ্রুর বাদল নেমেছে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। মৃত্যুকে আমি ভয় পাইনি, আমার তখন কেবল একটি মাত্র ভয় ছিলো, নিরপরাধ নারীদের এভাবে কাজীর বিচারে অসময়ে এই দুনিয়ায় থেকে যেতে হবে, কে তার বিচার করবে? তখন আমি মনে মনে খোদার কাছে জানাতে থাকি, তুমি সর্বজ্ঞ, তোমার আখরি বিচার আমি মাথা পেতে মেনে

নেবো। তুমি তো জানো খোদা, আমার মনে কোন পাপ নেই, আমি কোন অন্যায় করিনি। মৃত্যুর পর হলেও তোমার শেষ বিচারের অপেক্ষায় আমি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছি। আমার গাল বেয়ে তখন অশ্রুর বন্যা বয়ে চলে।

তবু আমার স্বামী এতটুকু বিচলিত হলো না, কিংবা দয়া দেখলো না। বরং গর্জে উঠে আবার সেই হাবসী ক্রীতদাসকে হুকুম করলেন, 'আর কোন কথা নয়. এবার তুমি তোমার কাজ করো সঙ্গে, ওকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলো। ঐ কলঙ্কিনী, বিশ্বাস-ঘাতিনীকে আমাদের আর কোন প্রয়োজন নেই—'

এরপর হাবসী সাদ আমার মাথার কাছে এগিয়ে আসে, তার হাতে উদ্যত তরবারি। আমি তখন আমার মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মনে মনে আল্লাহর নাম নিচ্ছি, অজ্ঞানে যদি আমি কোন অপরাধ ক'রে থাকি, তিনি যেন মাফ করে দেন। হঠাৎ সেই সময় সেই বৃদ্ধা মহিলা কোথ থেকে যেন ছুটে এসে আমার স্বামীর পায়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চুমু খেলো এবং কাঁদতে কাঁদতে অনুরোধ জানালো, 'বাছা আমি তোমাকে ছোটবেলা থেকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি, আমার বুকের দুধ খাইয়ে তোমাকে বড় করে তুলেছি। অন্তত সেই দাবীতে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা জানাই, ওকে এবারের মতো মাফ করে দাও, প্রাণে মেরোনা। এমন কোন অন্যায় ও করেনি। যার জন্য ওকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।' আমার স্বামীকে তখনো চুপ করে থাকতে দেখে যতক্ষণ না সে তার আশ্বাস বাণী শুনতে পাচ্ছে ততক্ষণ পযন্ত ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে থাকে, 'একে যদি তোমার আর বিশ্বাসই না হয়, বেশ তো মন থেকে একে ছুড়ে ফেলে দাও, তোমার প্রাসাদ থেকে ওকে তাড়িয়ে দাও ঝেঁটিয়ে, ওর মুখ আর তোমার দেখতে হবে না। তবে ওকে যেন জানে মেরো না, এ আমার শেষ ভিক্ষা তোমার কাছে বাছা—'

বুড়ির কান্না দেখে আমার স্বামীর মন বোধহয় ভিজল, তবে রাগ কমল না একটুও। তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বললো সে, 'ঠিক আছে, ওকে আমি মাফ করে দিচ্ছি, তবে ওর দেহে এমন একটা চিহ্ন করে দেবো, যাতে করে সারাজীবন সেই দাগ দেখে ও ওর পাপের কথা, ওর বিশ্বাস ভঙ্গের কথা স্মরণ করতে পারে।' এই বলে সে হাসবী ক্রীতদাসের হুকুম করলো আমাকে বিবস্ত্র করে জমিনের উপরে শুইয়ে দিতে।

তারপর তার হুকুম মতো তারা আমার দেহ থেকে শেষ বস্ত্রটা অপসারণ করলে পর আমার স্বামী হাতে একটা চাবুক নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার চোখ দুটো তখন আগুনের গোলার মতো জ্বলছিল, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল সে। তার হুকুমে আমাকে চিত করে শুইয়ে দেওয়া হলো। সেই অবস্থায় সে আমার পিঠের উপরে সপাং সপাং করে বেত মারতে থাকে। বেতের আঘাতে আমার সারা শরীর জর্জরিত হয়ে ওঠে, পিঠের চামড়া ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। এক সময় সেই অমানুষিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তারপর সে তার হাবসী ক্রীত-দাসদের হুকুম করলো আমাকে যেন রাতের অন্ধকারে আমার বাড়িতে ফেলে রেখে আসা হয়, সঙ্গে যাবে সেই বৃদ্ধ মহিলা আমার বাড়ি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য, যেখান থেকে একদিন বিয়ের আগে সে আমাকে তুলে নিয়ে এসেছিল।

আমার পিঠের চাবুকের ঘা শুকতে মাস চারেক সময় লাগলো, ততদিন পর্যন্ত আমি শয্যাশায়ী ছিলাম। তারপর একদিন সুস্থ হয়ে ওঠে স্বামীর প্রাসাদে ফিরে গিয়ে দেখি সেই প্রাসাদ তখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। তারপর আমি আমার এই দিদির কাছে ফিরে গিয়ে আমার জীবনের করুণ কাহিনী বলি। আমার দিদি তখন দয়াপরবশ হয়ে বলে, 'আল্লার দোয়ায় তুমি যে জানে বেঁচে আমার কাছে ফিরে এসেছ, তাই যথেষ্ট। দিদির বাড়িতেই আমি ঐ দুটি কুত্তাকে দেখতে পাই।

তারপর দিদি আমাদের কাছে তাঁর কাহিনী শোনায়। দিদির সেই করুণ কাহিনী শুনে আমরা প্রতীজ্ঞা করলাম, জীবনে আর কখনো আমরা শাদীর নাম নেবো না। কিছুদিন পরে আমাদের ছোট বোনও এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়।

তারপর থেকে আমরা তিন বোন মনের সুখে নিজেদের খুশি মতো বাজার হাট করি, ভালো ভালো জিনিষ বাজার থেকে কিনে এনে খাইদাই, স্ফূর্তি করি। কাল রাত পর্যন্ত সেই ভাবেই আমাদের সুখের দিনগুলি ক টছিল, সে তো জাঁহাপনা, আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন।

এবার আমি গতকালের ঘটনার কথা বলি, সকালে আমার বড়দিদি বাজারে যায় কেনাকাটা করতে। ফিরে আসে ঐ যুবক কুলিটিকে সঙ্গে নিয়ে, যুবকটি মোট বয়ে এনেছিল আমাদের বাড়িতে, অনেকদিন পরে তাকে আমরা পুরুষ সঙ্গী হিসেবে পাই, তাকে নিয়ে সারাটা দিন আমরা তিন বোনে মিলে আনন্দ স্ফূর্তি করি। তারপর আসে ঐ তিন কালান্দার রাত্রির প্রথম প্রহর তখনো উত্তীর্ণ হয়নি একজন সম্মানিত সওদাগর আসে মসুল থেকে এবং তারা প্রত্যেকে তাদের জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী আমাদের শোনায়। আমরা তাদের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করতে থাকি, কিন্তু এক সময় তাদের মধ্যে একজন তার প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ করে কৌতূহল প্রকাশ করে বসে। আমাদের সঙ্গে তাদের চুক্তি ছিলো, তারা সবকিছু দেখে যাবে, কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে পারবে না, তা সত্বেও তাদের কৌতূহল দমন করতে পারেনি। তাই তখন তাদের আমরা বন্দী করে মুক্তির সর্ত হিসেবে তাদের জীবনের কাহিনী শুনিয়ে আমাদের খুশি করার আদেশ করি। বলা-বাহুল্য তারা প্রত্যেকেই তাদের জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়ে আমাদের মন ভরিয়ে দেয় কানায় কানায়। তখন আমরা তাদের মুক্তির আদেশ দিই, অতঃপর তারা যে যার গন্তব্যস্থলে চলে যায়। তারপর আজ সকালে আপনার তলব পেয়ে আপনার দরবারে চলে আসি জাঁহাপনা।

খলিফা হারুন-অল রসিদ এতক্ষণ তার কাহিনী অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শুনছিলেন এবং গল্প লেখক-কে তার কাহিনী আগেই লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। কাহিনী শুনে মনে হল তিনি খুব তৃপ্ত। এবং সেই ভাবটা তিনি তাঁর কথায় প্রকাশ করে বললেন, 'তোমার এমন সুন্দর কাহিনী শুনে আমি যুগপত পুলকিত এবং ব্যথিত।'

ওদিকে শাহরাজাদ দেখল ভোরে আলো ফুটে উঠতে আর দেরী নেই। তখন সে তার কাহিনী থামিয়ে পরদিন আবার শুরু করার অনুমতি চাইল বাদশাহ শাহরিয়ারের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাব কথায় সম্মতি জানালেন।

পরদিন আবার রাত নামতেই শাহরাজাদ বাদশাহ শাহরিয়ারের উদ্দেশ্যে বললো, 'জানেন জাঁহাপনা, খলিফা তারপর করলেন কি, অনুলেখকদের হুকুম করলেন, তারা যেন ছোটবোন এবং তিন কালান্দরের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখে। অতঃপর খলিফার সামনে তাদের এবং সেই দুটি মাদী কুত্তিকেও হাজির করা হলো।

তারপর খলিফা বড় বোন, বাড়ির প্রধান কর্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি সেই আফ্রীদি জিনিহের কোন খবর জানো, যে তোমার দুই বোনকে মাদী কুকুরে পরিণত করেছিল?'

'তা তো বলতে পারবো না জাঁহাপনা', বড় বোন প্রত্যুত্তরে বলে, 'সে আমাকে তার মাথা থেকে একগোছা চুল ছিঁড়ে আমাকে দিয়ে যাওয়ার সময় বলে,—তোমার যখনই আমাকে প্রয়োজন হবে, তখন আমার মাথার দু'গাছি চুল আগুনে পুড়লেই আমি আবার তোমার সামনে এসে হাজির হবো।'

'ঠিক আছে', খলিফা তখন হুকুম করলেন, এখুনি সেই জিনিহাকে এখানে এনে হাজির করো!'

খলিফার আদেশ মতো চুলের গাছিটা আগুনে নিক্ষেপ করলো বড়বোন। সেটা পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া মাত্র সারা দরবার ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠলো। উপস্থিত সবাই একটা প্রচণ্ড গর্জন শুনতে পেলো। মনে হলো যেন একটা লড়াই শুরু হতে যাচ্ছে। সেই কাঁপুনি থামতে না থামতেই খলিফার সামনে হাজির হলো জিনিয়াহ ডানা মেলে। এই জিনিয়াহই ছিলো ছোট কেউটে সাপ। এখন সে মুসলমান যুবতী এবং রূপবতী। জাঁহাপনাকে সালাম জানিয়ে সে বলে, 'আপনি আমাদের আল্লাহ পয়গম্বর, আমার সালাম গ্রহণ করুন জাঁহাপনা!'

তারপর বড়বোনের দিকে ফিরে বলতে থাকে, 'ঐ মেয়েটি এক সময় আমার জান বাঁচায় এক অত্যাচারী নারীদেহ লোভী পুরুষ জিনিয়াহর হাত থেকে। তখন আমি দেখি তার দুই দিদি ষড়যন্ত্র করে ঐ মেয়েটি এবং তার ভাবী স্বামীকে খুন করতে চেয়েছিল। আমি তখন ঐ মেয়েটির উপকারে এমনি প্রীত যে, তার বিনা অনুমতিতেই তার ঐ নিষ্ঠুর দুজন দিদির কাছে ছুটে যাই এবং তাদের আমি কুকুরে পরিণত করি। প্রথমে ভেবেছিলাম ওদের কোতল করে দেবো, কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, তাতে ঐ মেয়েটি দারুণ আঘাত পাবে। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার মত বদলাই। অবশ্য আপান যদি ইচ্ছে করেন, এখুনি আমি ওদের মানুষের রূপ ফিরিয়ে দিতে পারি।'

'হ্যাঁ, তুমি ওদের মানুষের রূপ ফিরিয়ে দাও আগে', খলিফা তাঁর ইচ্ছার কথা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়ে বললেন, 'তারপর তাদের মেজবোনের ব্যাপারটা আম খতিয়ে দেখবো। যদি দেখি তার কাহিনী একান্তই সত্য হয়, তাহলে ওর অভিযোগ আমি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবো এবং তার স্বামীর ভুল ভাঙ্গাতে তাকে খুঁজে বার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।'

'ঠিক আছে জাঁহাপনা', জিনিয়াহ বলে, 'আপনার ইচ্ছা মতো আমি এখুনি ঐ কুত্তি দুটোকে মুক্তি দিচ্ছি। আর ঐ মেয়েটির স্বামী, যে ভুল করে ওর উপরে অমন অকথ্য অত্যাচার করে, ওর সব সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয়, তাকেও আমি চিনি। সে আপনার অতি আপনজন, আপনার কাছেই আছে জাঁহাপনা।'

এই কথা বলে যে এক পেয়ালা জল হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র আওড়াল তার উপরে তারপর সেই মন্ত্রপূত জল কুত্তি দুটোর উপর ছিটিয়ে দিয়ে বললো, 'তোমরা আবার তোমাদের মানুষের চেহারায় ফিরে যাও!'

মেয়ে দুটি তাদের আগেব চেহারা ফিরে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলো এবং শ্রদ্ধার চোখে তাকালো তাদের মুক্তিদাতা জিনিয়াহের দিকে।

জিনিয়াহ তখন খলিফার দিকে ফিবে বললো, 'জাঁহাপনা, শুনলে আপনি অবাক হবেন, ঐ মেয়েটির সেই অত্যাচারী স্বামী কে জানেন? সে আপনারই পুত্র অল-আমিন, অল-মামুনের ভাই। মেয়েটির রূপ দেখে সে তার মহব্বতে পড়ে যায়। চালাকি করে এক বৃদ্ধার সাহায্যে মেয়েটিকে সে তাঁর প্রাসাদে ভুলিয়ে নিয়ে আসে এবং শাদী করেন তাকে মিষ্টিমিষ্টি কথা শুনিয়ে। তবে মেয়েটির উপর অত্যাচার করার জন্য তাকে ঠিক দায়ী করা যায় না, কারণ শাদীর সময় মেয়েটিকে দিয়ে তিনি শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন, অন্য কোন পুরুষের প্রতি আসক্ত হবে না সে। যাইহোক, ঘটনাচক্রে মেয়েটিকে একদিন তাই স্বামীর কাছে মিথ্যে কথা বলতে হয়। এবং সেই কারণেই আপনার পুত্র প্রথমে তাকে কোতল করার সিদ্ধান্ত নেন, তারপর খোদা আল্লাহর ভয়ে কিনা কে জানে, জানে না মেরে তার উপরে ঐ ভাবে অত্যাচার করে, তার চিহ্ন তো আপনি তো নিজের চোখে দেখেছেন।'

জিনিয়েহ-এর মুখ থেকে মেয়েটির অমন দুরাবস্থার কথা শুনে খলিফার মালুম হলো, তার জন্য কে দায়ী। তখন তিনি তার দুঃখে ভীষণ কাতর, ভিজে ভিজে

গলায় বললেন, 'আল্লাহকে সুক্রিয়া জানাই, এই মেয়ে দুটির জীবনের করুণ কাহিনী শোনার সুযোগ আমাকে দিয়েছেন। আর এখন আল্লাহর কৃপায় আমরা একটা মহত কাজ করে যাবো, আমাদের মৃত্যুর পরেও স্মৃতি হয়ে থাকবে চিরদিন।'

তারপর তিনি তাঁর পুত্র অল-আমিনকে তলব করলেন, এবং সে তাঁর সামনে এসে হাজির হলে মেজবোনের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন, তুমি একে চেনো ওর সম্বন্ধে যা জানো বলো। তার পুত্র অকপটে সত্যি কথাই বললো, অস্বীকার করলো না মেয়েটিকে।

তখন তিনি তার পুত্রের বিচারের ভার তুলে দিলেন কাজীদের উপরে। কাজীদের উপদেশ মতো সেই হতভাগ্য মেয়েটির সঙ্গে আল আমিনের দ্বিতীয়বার শাদীর ব্যবস্থা করলেন খলিফা এবং তার পুত্রবধূকে যথোপযুক্ত উপহার সামগ্রী দিয়ে এবং সসম্মানে তার প্রাসাদে ঠাঁই দিলেন। আর প্রথম কালান্দারের সঙ্গে বড়বোনের শাদীর আয়োজন করলেন। বাকী দুই বোনের সঙ্গে শাদী দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় কালান্দারের সঙ্গে। কালান্দাররা এক একজন রাজপুত্র সেই কথা ভেবেই তিনি তাদের জন্য নতুন প্রাসাদ তৈরী করিয়ে দিলেন এবং তাদের উপযুক্ত মাসোহারার ব্যবস্থা ও করলেন সেই সঙ্গে। আর খালিফা নিজে শাদী করলেন তাদের কুমারী ছোটবোনকে, সে তাঁর হারেমে অন্যতম বিবির স্থান পেলো।

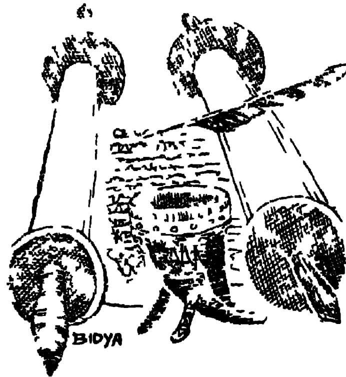
খলিফার সেই মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে ধন্যধন্য করে উঠলো তাঁর আমির, ওমরাহ, উজির এবং প্রজারা।

ওদিকে শাহরাজাদ তার কাহিনী শেষ করলে তার ছোটবোন দুনিয়াজাদ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'আঃ দিদি, কি চমৎকার গল্প না শোনালে তুমি! এরকম কাহিনী এর আগে কখনো শুনিনি। বাকী রাতটুকু এর থেকে আরো চমকপ্রদ, আরো রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়ে তুমি আমাদের মন ভরিয়ে দাও দিদি!'

শাহরাজাদ তখন শাহেনশাহ শাহরিয়ার দিকে ফিরে বললো, 'হ্যাঁ, বলবো বৈকি বোন, তবে তার আগে শাহেনশাহ আমাকে নতুন কাহিনী বলার অনুমতি না দিলে শুরু করি কি করে বলো?'

শাহরিয়ারও তখন উদগ্রীব নতুন কাহিনী শোনার জন্য। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'তুমি তোমার গল্প বলো, শুনতে আমার লাগে ভালো। তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।'

অতঃপর শাহরাজাদ নতুন করে আবার তার কাহিনী বলতে শুরু করলো:



এক কুঁজো লোকের গল্প

'এ কাহিনী', শাহারজাদ তার নতুন এক চমকপ্রদ কাহিনী শুরু করতে গিয়ে বলে, 'জানেন জাঁহাপনা, এক দর্জি, কুঁজো লোক, ইহুদি, খ্রীষ্টান এবং এক নাপিতকে নিয়ে। পুরাকালে চীন দেশের কোন এক শহরে এক দর্জি বাস করতো। ভারি আমুদে লোক ছিলো সে। সে তার বিবিকে নিয়ে বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। রাস্তা-ঘাটে সবাই তাদের সব সময় হাসি ভরা মুখ ছাড়া কোন দিন গোমড়া মুখ দেখতে অভ্যস্ত ছিলো না। একদিন হলো কি, সেই দর্জি তার বিবিকে সঙ্গে নিয়ে সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়েছে, এক সময় পথে তারা দেখলো, এক কুঁজো লোক তাদের দিকে তাকিয়ে আপন মনে হাসছে। লোকটা দেখতে বড় অদ্ভুত, ঠিক সার্কাসের জোকারের মতো। দর্জি দম্পতী তার অমন চেহারা দেখে আকৃষ্ট তার প্রতি এবং তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি অমন হাসছো কেন বলোতো ?'



'কোন কিছু ভেবে তো হাসিনি হুজুর। আমি এরকম অকারণেই হেসে থাকি।'

বড় অদ্ভুত লোক তো। দর্জি ভাবলো, লোকটাকে বাড়িতে নিয়ে মজা লুটলে কেমন হয় ? সে তার মনের কথা জানিয়ে সেই কুঁজো লোকটাকে বলামাত্র সে রাজী হয়ে গেলো তাদের বাড়িতে সেদিন রাতে অতিথি হওয়ার জন্য।

সেদিন রাতে দর্জি দম্পতী তাকে খুব খাতির করে নৈশ ভোজে আপ্যায়ন করলো। কিন্তু এক সময় দর্জির বিবি দেখে যে লোকটা তেমন কিছুই খাচ্ছে না। বড় লাজুক লোক তো। দর্জির বিবি তখন মাছের একটা বড় টুকরো নিজের হাতে সেই কুঁজো লোকটির মুখের ভিতরে গুঁজে দেয়, কাজটা সে মুহূর্তের মধ্যে সমাধা করে ফেলে লোকটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোন অবকাশই পেলো না। দর্জির বিবি তখন তাকে মাছের টুকরো খেয়ে ফেলার জন্য অনুরোধ করে বলে, 'আল্লাহর দোহাই, মাছটা তুমি খেয়ে নাও, তা না হলে তোমাকে খাওয়ানর কোন মজাই আমরা পাবো না।'

অতঃপর মুখ ভর্তি মাছটা সে কোন রকমে গলাধঃকরণ করার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু এক সময় তাড়াতাড়িতে মাছের একটা কাঁটা তার কণ্ঠ-নালীতে আটকে যায় শ্বাস নিতে দারুণ কষ্ট পায় সে। এক সময় বেচারা দম বন্ধ হয়ে মারা গেলো দর্জির বাড়িতে—

ওদিকে ভোরের আলো ফুটে উঠতে দেখেই বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে শাহরাজাদ কাহিনী অসম্পূর্ণ রেখে চুপ করলো।

পরদিন রাত্রে শাহেন শাহের অনুমতি নিয়ে শাহরাজাদ তার কাহিনীর জের টেনে আবার বলতে শুরু করলো—

'হ্যাঁ জাঁহাপনা, সেই কুঁজো লোকটার হঠাৎ মৃত্যু হতে দেখে দর্জি তো মহা সমস্যায় পড়লো, আবার কি ফ্যাসাদ রে বাবা। সুখে থাকতে ভূতে কিলোবার মতো আর কি। এ বিপদ থেকে স্বয়ং পয়গম্বর আল্লাহও বোধহয় তাদের রক্ষা করতে পারবেন না। তাহলে এখন উপায়!

দর্জির বিবি তার এমন অবস্থা দেখে তাকে আশ্বস্ত করে বলে, 'মিথ্যে তুমি অমন চিন্তা করছো কেন বলো তো? কেন, তোমার সেই শায়েরীর কথা মনে নেই?' সে সেই শায়েরীটা আওড়াতে থাকলো :—

না জানি আল্লাহর এ কি খেলা,
এমন কোন দোস্ত নেই যে,
আমার দুঃখের সাথী হতে পারে,
যাহোক কিছু মতলব আঁটতে হবে
এইবেলা।
আগুনের শিখা ঐ দাউ দাউ জ্বলে,
অন্তহীন ভাবনা তখন আমার মনে ধেয়ে
চলে—

দর্জি তখন তার বিবির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'এই মৃত লোকটিকে নিয়ে আমি এখন কি করি বলো তো?'

'ভাবনার কি আছে?' প্রত্যুত্তরে সে বলে, 'কুঁজো লোকটাকে আজই রাতে এখান থেকে পাচার করে দিতে হবে। উঠে তুমি ওকে তোমার কাঁধে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড। একটা সিল্কের চাদর দিয়ে তার দেহটা ঢেকে দিচ্ছি। আমি তোমার পিছন পিছন যাবো এবং কাঁদতে কাঁদতে পথচারীদের আকর্ষণ করে বলবো, এ আমাদের একমাত্র সন্তান, বাছার আমার বসন্ত হয়েছে, তাই হাকিমকে দেখাতে চলেছি।'

তা দর্জির বিবির মতলবটা বেশ কাজে দিলো। তার বিলাপ শুনে পথচারীরা প্রথমে আকৃষ্ট হলেও পরে যখন শুনলো, তারা তাদের বসন্ত রোগে আক্রান্ত সন্তানকে হাকিম দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে, তখন ভয়ে তারা দূরে ছিটকে পড়লো, কুঁজো লোকটার মৃতদেহ চ্যালেঞ্জ করা দূরে থাক। অতএব তারপর নির্বিবাদে তারা এক অপরিচিত হাকিমের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল এক সময়।

দরজার কড়া নাড়তেই এক নিগ্রো ক্রীতদাসী দরজা খুলে দিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ায়।' 'কি ব্যাপার?'

দর্জির বিবি উত্তরে বলে, 'আমাদের কপাল পুড়েছে গো, আমাদের কি হবে, একমাত্র সন্তানের বসন্ত রোগ হয়েছে, বাছা আমার খুব কষ্ট পাচ্ছে, ওর চিকিৎসা দরকার।' নিগ্রো ক্রীতদাসীর হাতে একটা সিকি গুঁজে দিয়ে সে আবার বলে, 'তাড়াতাড়ি হাকিমকে ডেকে নিয়ে এসো।'

নিগ্রো ক্রীতদাসী তার প্রভু হাকিমকে খবর দেওয়ার জন্য দোতলায় উঠে গেলে দর্জির বিবি তার স্বামীকে তাড়া দিয়ে বলে, 'এই সুযোগ, কুঁজো লোকটাকে এখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলো আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। অতঃপর কুঁজো লোকটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়, একেবারে উপরেই সিঁড়ির ধাপে তাকে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসিয়ে রেখে পালিয়ে আসে তার বিবিকে সঙ্গে নিয়ে।

ওদিকে ইহুদী হাকিম তার নিগ্রো ক্রীতদাসী মারফত আগাম সিকি দিনার হাতে পেয়ে তাড়াতাড়ি রুগীকে দেখার জন্য সিঁড়ি বেয়ে নামতে যায় অন্ধকারে। তাড়াতাড়ির মাথায় চিরাগবাতি সঙ্গে নিয়ে আসতে ভুলে যায় সে। অন্ধকারে তার পায়ের ধাক্কায় মৃত কুঁজো লোকটা গড়াতে গড়াতে একেবারে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে লুটিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হাকিমের উচ্চস্বরে কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'আলো দেখাও!'

ক্রীতদাসী চিরাগবাতি হাতে ছুটে আসে। হাকিম নিচু হয়ে কুঁজো লোকটাকে পরীক্ষা করে

দেখে বুঝতে পারে, সে মৃত, তার দেহটা তখন পাথরের মতো শক্ত, অনড়। হাকিম তখন আক্ষেপ করে বলে ওঠে, 'এ আমি কি করলাম? রুগীকে বাঁচানোর কর্তব্য আমার। অথচ সামান্য একটু অবহেলার জন্য দায়ী, আমার পা লেগেই দোতলা থেকে নিচে একতলায় পড়ে যায় এবং তাতেই তার মৃত্যু ঘটে তৎক্ষণাৎ।'

সে তখন কুঁজো লোকটার মৃতদেহ বহন করে নিয়ে আসে ঘরের মধ্যে। ইহুদি হাকিম তার বৌকে ঘটনার কথা খুলে বললে সে তখন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'তা তুমি এখনো বসে আছো? ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে আমরা দুজনেই যে মারা পড়বো। তার চেয়ে চলো দুজনে মিলে ধরাধরি করে ছাদে নিয়ে যাই, সেখান থেকে মৃতদেহটা পাশের বাড়ির বাবুর্চির ছাদে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সারারাত ধরে তার বাড়িব কুকুর, বেড়াল এবং ইঁদুরগুলো মৃতদেহটা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। পাশের বাড়ির মুসলমান লোকটা ছিলো সুলতানের প্রাসাদের প্রধান বাবুর্চি, গভীর রাতে বাড়ি ফিরতো সে।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। ইহুদি দম্পতী দুজনে মিলে পাশের বাড়ির ছাদে কুঁজো লোকটার মৃতদেহ তো ছুঁড়লো, কিন্তু ছাদে না পড়ে দুটি বাড়ির গলির মধ্যে পড়ে যায় দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে। আর ঠিক তার পরেই বাবুর্চি সেই সময় দোস্তদের সাথে কোরাণ পাঠ শুনে বাড়ি ফিরলো। গলিটা ছিলো খুব সরু। কুঁজো লোকটা হাকিমের বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে সোজাসুজি দাঁড়িয়ে যায় দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, একজন জলজ্যান্ত লোক বুঝি কোন কুমতলবে



দাড়িয়ে আছে সেখানে।

সুলতানের বাবুর্চি সেই একই ভুল করলো। 'শ্লা—কাশ তুই মাংস চুরি করে পালিয়েছিলি। আজও আবার এসেছো সেই মতলবে? দাঁড়াও তোমাকে মজা দেখাচ্ছি!' এই বলে সে তার কাছে গিয়ে সজোরে ঘুষি মেরে বসলো তার মুখের উপরে, সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহটা মাটির উপরে পড়ে গেলো। কোনা সাড়া-শব্দ নেই। বাবুর্চি ঘাবড়ে যায়। তবে কি লোকটাকে মেরে ফেললো সে। নিচু হয়ে মৃতদেহ পরীক্ষা করতে গিয়ে সে বুঝলো, তার

অনুমানই ঠিক, লোকটা আর বেঁচে নেই। সে তখন দারুণ ভয় পেয়ে গেলো। আল্লাহর নাম জপ করতে করতে ভাবলো, এখন খোদা ছাড়া তার বাঁচার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু একি করলেন তিনি। একজন নিরীহ কুঁজো লোককে খুন করে বসলো সে তাকে চোর ভেবে? এখন উপায়! যাইহোক, রাতটা শেষ হওয়ার আগেই তার মৃতদেহ বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে, ভাবলো সে।

অতঃপর কাঁধের উপর কুঁজো লোকটার মৃতদেহ চাপিয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো সে। অন্ধকার রাস্তা, কেউ তাকে দেখতে পেলো না। বাজারের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা দোকানের সামনে তাকে জীবন্ত মানুষের মতো দাঁড় করিয়ে দেয় দেওয়ালের গায়ে। চারিদিক একবার সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলো সে।

একটু পরে সেখানে হাজির হলো যীশুভক্ত এক খ্রীষ্টান যুবক। সুলতানের মোসাহেব সে। সে তখন রীতিমতো মাতাল, পা টলছে। গোসল করার জন্য হামামে যাওয়ার দরকার ছিলো তার একবার। প্রথম রাত্রিতে কে যেন তার টাকা-কড়ি সব ছিনতাই করে নেয়, মাতাল ছিলো বলে টের পায়নি সে তখন। মৃত কুঁজো লোকটাকে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যে ভাবলো, এই লোকটাও বোধহয় ছিনতাই-এর মতলবে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি তোমাকে।' নিজের মনে বলে সে তখন টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে তার নাকের উপরে সজোরে ঘুষি মেরে বসলো। মৃতদেহটা মাটির উপরে পড়ে যেতেই সে তখন বাজারের প্রহরীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠলো, 'বাঁচাও বাঁচাও আমাকে!'

তার চিৎকার শুনে বাজারের প্রহরী ছুটে এলো দ্রুত সেখানে। 'কি হলো, এতো চিল্লাচ্ছো কেন?'

ঘটনাস্থলে প্রহরী এসে দেখলো, মৃত কুঁজো লোকটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হাঁপাচ্ছে খ্রীষ্টান যুবকটি।

'লোকটা বোধহয় আমার সামান-পত্তর ছিনিয়ে নেওয়ার মতলবে ছিলো। কিন্তু ঠিক সময়ে আমি ওর মতলব টের পেয়েছি।' খ্রীষ্টান যুবকটি বলতে থাকে, 'বাছ'ধন তোমাকে আমি ছাড়ছি না। বল শ্লা-কি মতলবে ছিলি?'

পাহারাদার তখন খিঁচিয়ে ওঠে, 'এখন ওকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াও। আমি দেখছি লোকটা আসলে কে?'

অতঃপর সে মৃত কুঁজো লোকটার দেহের উপর থেকে উঠে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলো পাহারাদার তখন কুঁজো লোকটার মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখতে ব্যস্ত। এক পলক দেখেই সে বুঝে গেছে, লোকটা মৃত এবং তার মৃত্যুর জন্য দায়ী ঐ খ্রীষ্টান যুবকটি। ইতিমধ্যে তার হাঁবভাব-চেঁচামেচিতে বাজারের অন্য লোকজন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা ভীড় করে দাঁড়ালো ঘটনাস্থলে। প্রহরী তখন তাদের সাক্ষী রেখে খ্রীষ্টান যুবকটিকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেলো কোতোয়াল সাহেবের কাছে সুবিচারের আশায়। একজন খৃষ্টানের একি ঔদ্ধত্য? একজন খাঁটি মুসলমানকে কোতল করা!

প্রহরী আর কাল বিলম্ব না করে তার কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে তাকে কোতোয়াল সাহেবের বাড়িতে নিয়ে এলো।

রাত অনেক তখন। কোতোয়াল সাহেবের চোখে যত রাজ্যের ঘুম এসে জড়ো হয়েছিল তখন। পরদিন বিচার শুরু হবে বলে তিনি আবার শুতে চলে গেলেন। ওদিকে মাতাল যুবক এবং কুঁজো লোকটার মৃতদেহ পুলিশ আটক করার আদেশ দিলো কোতোয়াল সাহেব। পরদিন তার বিচার হবে।

পরদিন সকালে কোতোয়াল সাহেবের দরবারে বিচার শুরু হলো। আসামী একজন খৃষ্টান যুবক, সুলতানের রাজ্যে দালালি তার পেশা। মন দিয়ে

সব শুনলো কোতোয়াল সাহেব। তার বিচারে সেই খৃষ্টান যুবকের ফাঁসীর হুকুম হলো। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসীর আয়োজন প্রায় শেষ। খৃষ্টান যুবকের গলায় জহ্লাদ ফাঁসীর দড়িটা লাগাতে যাবে ঠিক সেই সময় সুলতানের বাবুর্চি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো কোতোয়ালের দরবারে, এই ফাঁসীর হুকুম রদ করতে হবে। একজন নিরপরাধ লোককে অন্যায় ভাবে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলতে দেবে না সে। সে তখন কোতোয়াল সাহেবের কাছে অকপটে স্বীকার করলো, 'হুজুর, ঐ খৃষ্টান যুবকটি খুনী নয়, আসলে আমিই ঐ কুঁজো লোকটিকে খুন করি।'

'তাই নাকি? কিন্তু তুমি যে সত্যি কথা বলছো, তারই বা কি প্রমাণ?' কোতোয়াল প্রশ্ন করে তাকায় সেই বাবুর্চির দিকে।

'প্রমাণ? বেশ দিচ্ছি', বলে সে সবিস্তারে গত-কাল রাতের ঘটনার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা দিলো সে। তারপর কোতোয়ালকে প্রশ্ন করলো, 'আমার দোষে একজন নিরপরাধ মুসলমান জানে খতম হলো, এখন দেখছি, আমার দোষেই আবার একজন খৃষ্টান যুবক ফাঁসীর দড়িতে জান দিতে যাচ্ছে। এটা কি সুবিচার হচ্ছে। সুবিচার করতে হলে, আমার মতো অপ-রাধীকেই ফাঁসী দেওয়া উচিত, অন্য কারোর নয়!'

অতঃপর কোতোয়ালের নির্দেশে খৃষ্টান যুবকের গলায় ফাঁসীর দড়ি সরিয়ে সুলতানের বাবুর্চির গলায় লাগানো হলো। 'বাবুর্চি নিজে তার অপরাধ কবুল করেছে।' কোতোয়াল বলে, 'ফাঁসীর দড়ি যদি টানতে হয় তো ওর গলায় টানো!'

হুকুম মতো ফাঁসীর দড়িটা জহ্লাদ টানতে যাবে, ঠিক সেই সময় সে ইহুদি হাকিম হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো। কোতোয়ালের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনুরোধ করলো, 'বাবুর্চিকে ছেড়ে দিন ওর কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার। আমিই ঐ কুঁজো লোকটাকে খুন করেছি।' বলে সে সেদিন রাতের সব ঘটনা খুলে বললো।

কোতোয়াল সাহেব তার জবানবন্দী শুনে তো অবাক। তবে সে এ-ও বুঝলো যে, সত্যি সুলতানের বাবুর্চির কোন দোষ নেই। সে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলো, আসলে ইহুদি হাকিমই ঐ লোকটাকে খুন করে খুনের সব চিহ্ন লোপাট করে দেয়। অতএব এখন ইহুদি হাকিমকে অনায়াসে ফাঁসী দেওয়া যায়। সেই রকম নির্দেশ গেলো জহ্লাদের কাছে। জহ্লাদ এবার তার করণীয় কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য ফাঁসীর দড়িতে শেষ টান দিতে যাবে, সেই সময় কোতোয়ালের কাছে ছুটে এসে বলে, 'ঐ বাবুর্চিকে রেহাই দিন হুজুর। ও নির্দোষ! সব দোষ আমার। আমাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন। দিন পড়িয়ে আমার গলায় ফাঁসীর দড়ি।

এবার জহ্লাদ কোতোয়ালের হুকুমে ফাঁসীর দড়ি পরিয়ে দেয় ইহুদি হাকিমের গলায়। আয়োজন প্রায় শেষ, কেবল ফাঁসীর দড়িটা টেনে ধরা। এবং সেই দড়িটা যেই টানতে গেলো, এমন সময় আর একবার বাঁধা পেয়ে থমকে দাঁড়ালো সে।

'এই রোকো, রোকো!' সেই দর্জি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলে, 'আমিই সেই কুঁজো লোকটাকে, খুন করেছি, অন্য কেউ নয়!' সে তখন বলতে থাকে, 'গতকাল সন্ধ্যায় বিবিকে সঙ্গে নিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে বেড়াতে বেরিয়েছিল। পথে সেই কুঁজো লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সে তখন মাতাল, হাসছিল অকারণ। খুব মজা লাগলো তার অমন চেহারা দেখে। বিবির অনুরোধে তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে এলাম। খুব আদর যত্ন করে তাকে নৈশ-ভোজে আপ্যায়ন করলাম। লোকটা ছিলো ভীষণ লাজুক, তেমন কিছু মুখে তুলছিল না। আমার বিবির দৃষ্টি এড়ায় না। সাধারণতঃ মেয়েরা পুরুষদের থেকে বেশি অতিথি পরায়ণ, একজন অতিথি আহার করতে বসে অভুক্ত থেকে যাবে, সে হয় না। তাই সে নিজের হাতে এক টুকরো মাছ তার মুখের ভিতরে গুঁজে দেয়, বিবি আমার বুঝতে পারেনি,

তার হা-টা অত ছোট। যাইহোক কুঁজো লোকটা তো রকমে মাছের টকরোটা গিলতে থাকে, কিন্তু হঠাৎ মাছের কাঁটা তার গলায় বেঁধে যায়, এবং তাতেই অমন বিপত্তি। সঙ্গে সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে তার মৃত্যু ঘটে। তখন আমার বিবি মতলব খাঁটিয়ে কুঁজো লোকটাকে কাঁধে চাপিয়ে একটা চাদর তার মৃতদেহের উপর ঢেকে নিয়ে ঐ ইহুদি হাকিমের বাড়িতে নিয়ে যায়, সঙ্গে আমিও ছিলাম। হাকিম তখন দোতলায়। তার নিগ্রো চাকরানীকে একটা সিকি দিনার আগাম ফি বাবদ দিয়ে বলি, হাকিমকে ডেকে আনার জন্য, আমাদের একমাত্র পুত্রের ভীষণ বিপদ বসন্ত রোগে আক্রান্ত সে। তিনি যেন এখনি তার রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করেন। তারপর নৌকরানী তার প্রভুকে ডেকে আনার জন্য দোতলায় উঠে যেতেই আমরাও তাকে অনুসরণ করি। দোতলার সিঁড়ির একেবারের ওপরের ধাপে দেওয়াল ঘেঁষে কুঁজো লোকটাকে বসিয়ে রেখে আমার বিবি তখন বলে, এই সুযোগ, চলো এবার এখান থেকে কেটে পড়ি। তার মতলবটা মন্দ নয়, এই ভেবে আমরা তখন চুপিচুপি সেখান থেকে পালিয়ে আসি মৃত কুঁজো লোকটাকে ইহুদি হাকিমের বাড়িতে ফেলে রেখে এসে। তারপর ইহুদি হাকিম হয়তো জরুরী তলব পেয়ে ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে যায় অন্ধকারে তার পায়ের ধাক্কায় কুঁজো লোকটা সিঁড়ি বেয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে এসে হাজির হয়। তখন হাকিম সাহেব তাকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারে সে মৃত এবং তার মৃত্যুর জন্য নিজেকে সে দায়ী করে। কিন্তু আমি তো জানি, তার মৃত্যুর কারণ আমি, হ্যাঁ অনেক আগেই আমরা তাকে খুন করেছি, বিশ্বাস করুণ, এতটুকু বানিয়ে বলছি না। যা বললাম সব সত্য।

কোতোয়াল তখন ইহুদি হাকিমের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'এ সব কথা কি সত্য?'

হাকিম মাথা নেড়ে সায় দেয়, 'হ্যাঁ, সব সত্য।'

অতঃপর কোতোয়ালের দিকে ফিরে দর্জি তখন বলে, 'ইহুদি হাকিমকে মুক্তি দিয়ে আমার ফাঁসীর হুকুম দিন!'

দর্জির মুখ থেকে কুঁজো লোকটার রোমাঞ্চকর মৃত্যুর কাহিনী শুনে কোতোয়াল তখন স্তম্ভিত। সঙ্গে সঙ্গে সে তার অনুলেখককে সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য হুকুম করলো। তারপর জহ্লাদের দিকে ফিরে আদেশ করলো, ইহুদি হাকিমকে মুক্তি দিয়ে দর্জির ফাঁসী কার্যকরী করার জন্য।

জহ্লাদ তখন ফাঁসীর দড়িটা ইহুদির গলা থেকে খুলে নিয়ে দর্জির গলায় পড়াতে গিয়ে বলে, 'একের পর এক ফাঁসীর দড়ি একজনের গলা থেকে আর একজনের গলায় পড়াতে গিয়ে আমি ভীষণ ক্লান্ত। অথচ এখনো পর্যন্ত কাউকেই ফাঁসীতে লটকানো গেলো না।'

ওদিকে কুঁজো লোকটা গতকাল সন্ধ্যা থেকে সুলতানের প্রসাদ ছেড়ে সেই যে বেরিয়েছিল তারপর থেকে তার আর কোন পাত্তা নেই। সে ছিলো সুলতানের অতি প্রিয়পাত্র। স্বভাবতই তার কোন খোঁজ না পেয়ে সুলতান উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। লোকটা মাতাল অবস্থায় কোথায় কোন্ খানা-খন্দে পড়ে গেলো কিনা কে জানে। তিনি তাঁর অনুচরদের কাছে খোঁজ নিতে গিয়ে একজন দুঃখের সঙ্গে জানালো, 'জাঁহাপনা, এই মাত্র আমরা খবর পেলাম, কুঁজো লোকটা নাকি খুন হয়েছে এবং তার হত্যাকারীকে ফাঁসী দেওয়ার জন্য হুকুম দেয় নগর কোতোয়াল সাহেব। তখন একের পর এক হত্যাকারী এসে স্বীকার করে, সে-ই প্রকৃত হত্যাকারী। অবশেষে এক দর্জি এসে প্রকৃত ঘটনার সঠিক বিবরণ দিয়ে দাবী করে, আসলে সে-ই সেই কুঁজো লোকটার হত্যাকারী।

সুলতান মনোযোগ সহকারে সব ঘটনা শুনলেন।

তাঁর দরবারের আমির ওমরাহ উজির গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল তাঁর পরবর্তী হুকুম শোনার জন্য। সুলতান এবার তাদের দিকে ফিরে হুকুম করলেন, 'এখুনি তোমরা সেই কোতোয়ালের কাছে ছুটে যাও। আর সেই চারজন হত্যাকারী প্রথিক লোকগুলোকে ধরে নিয়ে এসো আমার দরবারে।'

সুলতানের আদেশ পেয়ে প্রধান উজির তার পাইক-পেয়াদা নিয়ে ছুটলো সেই নগর কোতোয়ালের



কাছে। সেখানে গিয়ে সে দেখে জহ্লাদ তখন দর্জির গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে টানার অপেক্ষায় মুহূর্ত গুনছে। সেই দৃশ্যটা দেখা মাত্র উজির চিৎকার করে বলে ওঠে, 'থামো থামো! ওকে ফাঁসীতে ঝুলিও না!'

তারপর সে সুলতানের আদেশ-নামা নগর কোতোয়ালের হাতে তুলে দেয় এবং দর্জি, ইহুদি চারজন লোককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো সুলতানের দরবারে কুঁজো লোকটার মৃতদেহ বহন করে নিয়ে আসে তার পাইক-পেয়াদারা।

সমস্ত ঘটনার কথা মন দিয়ে শুনলেন সুলতান। সব শোনার পর তাঁর মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এ রকম কাহিনী-এর আগে কখনো শোনেননি তিনি। বড় বিচিত্র, বড় অদ্ভুত, বড় রোমাঞ্চকর, সেই সঙ্গে একটা দুঃখবোধ জড়িয়ে আছে যেন সেই সব হাকিম, মুসলমান বাবুর্চি এবং সেই খৃষ্টান যুবক, এই কাহিনীতে। তিনি তাব অনুলেখক'কে আদেশ করলেন সেই কাহিনী যেন স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা হয় এবং সবাইকে মুক্তির আদেশ দিলেন তিনি।

সেই সময় সেই খৃষ্টান যুবকটি এগিয়ে এসে বললো, 'জাঁহাপনা. এ আর এমন কি বিচিত্র ঘটনার কথা শোনালেন। আমি আপনাকে এর থেকেও

বিচিত্র কাহিনী শোনাতে পারি, যদি আপনি অনুমতি দেন—'

'তাই নাকি?' সুলতান মৃদু হেসে বলেন, 'বেশ তো তোমার কি কাহিনী শোনাও, আমি অবশ্যই শুনবো—'

অতঃপর সেই খৃষ্টান যুবকটি তার বিচিত্র কাহিনী শুরু করার জন্য একটু সময় নিলো।

ওদিকে শাহরাজাদ দেখলো ভোরের আকাশের একটা ক্ষীণ সূর্যের আলো দেখা দিয়েছে, ভোর হয়ে এলো। তাই সে তখন তার কাহিনী অসমাপ্ত রেখে শাহজাদা শাহরিয়ার দিকে তাকালো, পরদিন আবার তার কাহিনী শুরু করার অনুমতি পাওয়ার জন্য শাহরিয়ার মৃদু হেসে তার কাহিনী শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

শুনুন তাহলে জাঁহাপনা, আমি আপনাদের দেশে এসেছিলাম ব্যবসা করার জন্য, ভালো লাগলো দেশটা, তাই থেকে গেলাম। আমার জন্মভূমি মিশরের কায়রোয়। আমার বাবার দালালির ব্যবসা ছিলো। একদিন আমি আমার দোকানে বসে আছি, সেই সময় একটা গাধার পিঠে চড়ে এক সুবেশ সুদর্শন যুবক এসে হাজির হলো সেখানে। আমাকে দেখতে পেয়ে সালাম জানাল সে আমায়। উঠে দাঁড়িয়ে আমিও তাকে সেলাম জানালাম।

তারপর সে একটা রুমাল বার করল। সেই রুমালে ক্ষীরার বীজ বাধা ছিলো। সেগুলো দেখিয়ে সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'এখানে এর দাম কি হতে পারে?'

উত্তরে আমি বললাম, 'একশো দিনহার।'

'ঠিক আছে, আগামীকাল তুমি তোমার মুটে-মজুর এবং ওজন করার দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে খান অল-জয়ালীতে দেখা করো আমার সাথে।

যুবকটি চলে যাওয়ার পর আমি আমার মহাজনদের সঙ্গে দেখা করে বললাম, 'মন প্রতি একশো কুড়ি দিনহার পেলে পঞ্চাশ মণ ক্ষীরার বীজ পাইয়ে দিতে পারি। তারা আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যায়। পরদিন কথামতো লোকজন নিয়ে সেই যুবকটির কাছে গেলাম। আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল সে তখন। ওজন করে পঞ্চাশমন ক্ষীরার বীজ পাওয়া গেলো, যার দাম পাঁচ হাজার দিনহার দিতে চাইল। দামটা সে পরে কোন এক সময় আমার দোকান থেকে নিয়ে যাবে বলে। ওদিকে আমার মহাজনও আমাকে শতকরা দশভাগ কমিশন দেয়। অর্থাৎ একদিনে আমি মোট এক হাজার দিরহান নাফা করলাম।

তারপর প্রায় একমাস পরে যুবকটি আমার সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইল, ক্ষীরা বীজের দাম বাবদ সাড়ে চারশো দিনহার কোথায়। তখন আমি তাকে বলি, 'সেটা তোমাকে দেওয়ার জন্য এক মাস আমি তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। এখুনি দিচ্ছি। তবে তার আগে আমার ঘরে গিয়ে কিছু খানা-পিনা করলে হতো না?'

'এখন নয়, একটু পরে আমি ঘুরে আসছি', এই বলে সে গাধার পিঠে চড়ে চলে যায়।

কিন্তু সেদিন সে আর ফিরে এলো না। একমাস পরে আবার একদিন এসে বলে, ক্ষীরা বীজের দামটা নিয়ে অপেক্ষা করতে, একটু পরেই সে ঘুরে আসছে। আগের বারের মত এবারেও সে সেদিন ফিরে আর এলো না। এলো সেই এক মাস পরে। সেবারও সে আমার গদিতে কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে শুধোয়, 'আমার টাকার থলেটা ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, আছে বৈকি। আমি এখুনি এনে দিচ্ছি, একটু অপেক্ষা করো, সিন্দুক থেকে বার করে আনছি—'

'না, না এখন আমি চাইছি না, এখন আমার হাতে খুব জরুরী কাজ আছে', যুবকটি বলে, 'সন্ধ্যাবেলা আসবো, ফিরে এসে তখন টাকাগুলো নিয়ে যাবোখন, কেমন?'

আমার অপেক্ষাই সার হলো, কিন্তু সে আর এলো না সেরারের যাত্রায়। তারপর পুরো একটা বছর পার করে একদিন সে এলো। তাকে সেদিন সত্যি শাহজাদার মতোই দেখাচ্ছিল, পরণে দামী রেশমী কোর্তা-পায়জামা। চোখের দৃষ্টি সজাগ। আমাকে দেখেই খচ্চরের পিঠের উপরে বসে থাকা অবস্থায় সে জিজ্ঞেস করে 'আমার টাকার থলেটা ঠিক আছে তো?'

সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, 'আপনার এই যক্ষের ধন আগলে বসে থাকতে পারবো না। আপনি কি রকম লোক মশাই, আমার মতো সামান্য একজন দালালকে বিশ্বাস করে অতগুলো টাকা বাইরে ফেলে রেখেছেন?'

কিন্তু সেদিনও তার সেই এক কথা, 'ফেরার পথে নিয়ে যাবো।' তবে সেদিন তার ফেরা আর হয় না।

তারপর বছর খানেক বাদে সে আবার এলো। সেদিন সে খুব সাজগোজ করেই এসেছিল। আমি তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে বললাম, 'আজ আর আপনাকে ছাড়ছি না। গরীবের বাড়িতে দু'মুঠো অবশ্যই খেয়ে যেতে হবে।' আমার মনটা প্রায়ই খচখচ করে, যুবকটির টাকা সুদে খাটিয়ে এর মধ্যে বাড়তি বেশ কিছু উপার্জন করেছিলাম। সেটা তাকে যে ভাবেই হোক ফিরিয়ে দিতে না পারলে মনটা স্বস্তি পাচ্ছিল না।

আমার প্রস্তাবে যুবকটি রাজী হয়ে গেলো, তবে একটা শর্তে, বললো সে, 'খাওয়ার সব খরচ আমার। আপনার কাছে গচ্ছিত টাকা থেকে খরচ করতে হবে।'

তার কথায় আমি রাজী হয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

তাকে খাওয়ানোর সময় লক্ষ্য করলাম, ডান-হাতের বদলে বাঁ-হাত দিয়ে খেলো সে। ভাবলাম, বোধহয় ডান-হাতটা তার জখম হয়ে থাকবে। কিন্তু অভ্যাসের মতো ডান-হাতের সাহায্য ছাড়াই সে তার বাঁ-হাতটা কেমন অনায়াসে ধুয়ে নিলো। তখন আমার কেমন যেন কৌতূহল হলো, চেপে রাখতে পারলাম না। এক সময় তাকে জিজ্ঞেসই করে বসলাম, 'আচ্ছা সওদাগর সাহেব, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করছি,—আপনার ডান-হাতটা কি জখম আছে?'

কোন কথা না বলে সে তার ডান-হাতের উপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দিতেই আসল ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠলো। দেখলাম তার ডান-হাতটা নেই, কব্জি থেকে কাটা।

যুবকটি তখন কেমন উদাস স্বরে বললো, 'বাঁ-হাত দিয়ে আপনার বাড়িতে খেলাম, আপনি হয়তো ভাবলেন, এ আবার কেমন অদ্ভুক। এবার নিশ্চয়ই বিশ্বাস করলেন, আপনাকে অসম্মান করার জন্য বাঁ-হাতে খাইনি, আসলে ডান-হাতে খাওয়ার সৌভাগ্য আমার এ জীবনে তার কখনো হবে না।' একটু থেমে সে আবার বলে, 'জানেন, আমার এই হাত কাটা যাওয়ার পিছনে এক অদ্ভুত কাহিনী জড়িয়ে আছে।'

'তাই নাকি? কি সে কাহিনী শুনতে পারি?'

সে তখন তার সেই অদ্ভুত কাহিনী শোনাতে লাগলো আমাকে।

বাগদাদের ছেলে আমি। আমার আব্বাজান ছিলেন সেখানকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, ধনী ব্যবসায়ী। আমাদের বাড়িতে তখন বছরের সব সময়ই তীর্থযাত্রী, এবং বিদেশী সওদাগরদের ভীড় লেগে থাকতো। তাদের মুখ থেকেই মিশরের গল্প আমি শুনি, সেই ছেলেবেলা থেকেই মিশরের হাতছানি বার বার আমাকে টানতে থাকে। তখন থেকেই আমি মনে মনে ভেবে রাখি, সুযোগ পেলেই মিশরে পাড়ি দেবো, বাণিজ্য করবো সেই দেশে গিয়ে। এর মধ্যে আব্বাজান একদিন আমাকে

ছেড়ে বেহেস্তে চলে গেলেন। আমি তখন তার বিষয় সম্পত্তির পুরো অংশীদার। সেই টাকায় বাগদাদ এবং মসুল থেকে নানান জিনিষ কেনা-কাটা করে একদিন কায়রোর উদ্দেশে রওনা হয়ে আপনাদের এই শহরে প্রবেশ করলাম।

কায়রো শহরের এক সরাইখানা অল-মসরুরে গিয়ে একটা ঘর ভাড়া নিলাম সামানপত্রগুলো রাখার জন্য। সেখানকার এক নফরকে কয়েকটা রৌপ্য-মুদ্রা দিলাম খাবার কিনে আনার জন্য, ভীষণ খিদে পেয়েছিল। তারপর এক সময় কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম থেকে উঠে বেন-অল-কাসরেন' নামক এক রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম, রাস্তাটা ছিলো দু'টি প্রাসাদের মধ্যবর্তী একটি গলি। সওদা করার ফিকিরে যাই সেখানে। কিন্তু খালি হাতে সেই সরাইখানায় ফিরে আসতে হলো আবার।

সকালে ঘুম থেকে উঠে কিছু কিছু কাপড়ের নমুনা একটা গাঁটরাতে বাঁধাতে গিয়ে নিজেকে বলি, বাজারে গিয়ে দাম ঠিক করতে হবে আজ। তারপর আমার কয়েকজন ক্রীতদাসের মাথায় কাপড়ের গাঁটরীগুলো চাপিয়ে এগিয়ে চললাম শহরের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র কাইজারিয়াৎ-এ। আমার আগমনবার্তা পাওয়ামাত্র দালালরা আমার কাছে ছুটে এলো। তারা আমার কাপড়ের নমুনাগুলো সংগ্রহ করে বিক্রীর জন্য হাত দিলো, কিন্তু আমার নসীব খারাপ, তাই ভালো দাম দিয়ে কেউ কিনতে এগিয়ে এলো না। বাজারের মন্দা দেখে মুষড়ে পড়লাম। যাইহোক, আমার অমন দুরবস্থা দেখে দালালদের শেখ বা প্রধান দালাল আমার কাছে এগিয়ে এসে পরামর্শ দেয়, শুনুন মালিক, কি করে বেশী নাফা করতে হয় তার মতলব আমি আপনাকে দিতে পারি। এখানে অন্য সওদাগররা যা করে থাকে আপনাকেও তাই করতে হবে। ধারে কাপড়গুলো বেচলে আপনি একটু বেশী দাম পেতে পারেন। নির্দিষ্ট সময়ে আপনি আপনার প্রতিনিধি মারফত আপনার মাল বিক্রীর টাকা তারা শোধ করে দেয় কিস্তিতে। তারপর সপ্তাহের বাকী দিনগুলি এই শহর এবং নীল নদের শোভা দেখে বেশ আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারবেন।'

'তা তোমরা মন্দ বলোনি', এই বলে তাদের আমি সরাইখানায় সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলাম। তারা আমার কাপড়ের গাঁটরীগুলো সরাইখানা থেকে তুলে নিয়ে গেলো, বিনিময়ে মহাজনরা আমাকে হুণ্ডি লিখে দিলো। একমাস পরে কিস্তির টাকা শোধ পাওয়া যাবে প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার। সেই হুণ্ডিগুলো আমি আমার এক প্রতিনিধির হাতে তুলে দিলাম টাকা আদায় করার জন্য।

তারপর একটা মাস আমি কায়রো শহরে মনের আনন্দে ভালোমন্দ খাওয়া-দাই আর রাতে সুন্দরী যুবতীদের দেহ-সুখ উপভোগ করে রাত কাটালাম। একমাস পর থেকে প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আমার কাপড় বেচার টাকা কিস্তিতে শোধ দিতে থাকে আমার মহাজনরা, সেই সব টাকা আমি থলের মধ্যে ভরে সীল করে সরাইখানায় রেখে দিই। রাতে মেয়েমানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করি।

একদিন এক সোমবার এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল গোসল সেরে, খাওয়া-দাওয়া করে এক মহাজনদের অল-দিন অল-তোস্তানির দোকানে গেলাম, সে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। পুরোদমে বাজার চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা গল্প-গুজব করে কাটালাম। আমাকে তার নাকি খুব পছন্দ।

এক সময় বোরখা ঢাকা একটি মেয়ে এসে দোকানে ঢুকলো কিছু কাপড় চোপড় সওদা করতে। পাতলা নাকাবের আড়াল থেকে তার মুখের আদলটা দেখে মনে হয়, মেয়েটি বেশ সুন্দরী। পিঙ্গল চোখ, টিকলো নাখ, দুধে-আলতা রঙ গায়ের। তার শরীর থেকে দামী আতরের খুশবু আমার নাকে এসে লাগছিল। আমাকে দেখে মেয়েটি তার

নাকাব তুলে দেয় আমাকে তার রূপ সুধাপান করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। তাতে আমি তার প্রতি আরো বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম যেন।

সে তখন দোকানী বদর-অল-দিনকে সালাম জানিয়ে বললো, 'সোনার জরির কাজ করা ভালো মসলিন আছে আপনার কাছে?'

দোকানী তখন তার দোকানের মজুত ভাণ্ডার থেকে সব থেকে দামী মসলিন কাপড় বার করে তাকে দাম বললো চারশো দিরহাম।

কাপড়ের টুকরোটা সঙ্গে নিয়ে মেয়েটি বললো, 'এটা আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তবে এতো টাকা আমার সঙ্গে নেই। বাড়ি ফিরে গিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'তা সম্ভব নয় মালকিন', দোকানী প্রত্যুত্তরে বলে, 'এই দেখুন, আমার মহাজন সামনেই বসে আছেন, এই কাপড়টা উনিই সরবরাহ করেছেন। আজ ওঁকে কিস্তির টাকা শোধ করার দিন। আমার এখুনি খুব টাকার দরকার।'

'আজ আপনি এ কি নতুন কথা আমাকে শোনাচ্ছেন?' মেয়েটি রাগত স্বরে চিৎকার করে ওঠে, 'এর আগে আপনার পাওনা আমি মিটিয়ে দিইনি?'

'দিয়েছেন বৈকি!' দোকানী এবার বিনীত সুরে উত্তর দেয়, 'আমি তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু বললাম তো, আজ আমার টাকার খুব দরকার, তাই এখন আর আপনাকে ধারে কাপড় বেচতে পারছি না। আমাকে মাফ করবেন!'

এই কথা শোনার পর মেয়েটি আর স্থির থাকতে পারলো না, দোকানীর কোলের উপরে কাপড়ের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলে, 'আপনারা সব দোকানীরাই সমান, কে ভালো কে মন্দ খরিদ্দার তা এখনো চিনতে পারলেন না।' উত্তেজিত অবস্থায় দোকান থেকে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়।

দৃশ্যটা আমার ভালো লাগল না। মেয়েটির জন্য কেমন যেন মায়া হলো। আমি তখন তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আপনি খামোকা রাগ করে চলে যাবেন না মালকিন, ফিরে এসে দোকানে একটিবারের জন্য বসুন, কথা আছে আপনার সঙ্গে।

আমার কথায় কি যাদু ছিলো কে জানে, মেয়েটি মৃদু হেসে দোকানে ফিরে এসে আমার ঠিক বিপরীত আসনে বসে বললো, 'আপনার কথাতেই ফিরে এলাম, বলুন আপনার কি বলার আছে?'

আমি তখন দোকানীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঐ কাপড়টার কি দাম আছে বলুন?'

'এগারশো দিরহাম।'

'ঠিক আছে বাকী একশো দিরহাম আপনার নাফার টাকাটা আমি একটা রসিদে লিখে দিচ্ছি। এক টুকরো কাগজ দিন আমাকে।'

তারপর সেই কাগজের টুকরোর টাকার রসিদ নিয়ে মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'এটা আপনি নিয়ে যান, আগামী হাট।বাজারের দিনে টাকাটা আপনি আমাকে এখানে শোধ দিয়ে যেতে পারেন। আর না দিলেও কোন ক্ষতি নেই এটা আপনি আমার তরফ থেকে উপহার হিসেবেও গ্রহণ করতে পারেন।'

'আর আল্লাহর দোয়ায় আপনার মতো এমন এক মহানুভব ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।' মেয়েটি এক গাল হেসে বলে, 'আপনার মতো স্বামী পেলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যেতো!'

আল্লাহ বোধহয় তার এবং আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। বেহেস্তের সুখের চাবিকাঠি যেন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছি। আমি তার দিকে তাকালাম স্থির চোখে। স্বচ্ছ পাতলা নাকাবে ঢাকা তার মুখ। অস্পষ্ট হলেও তার পিঙ্গল চোখে দুষ্টু হাসি তখন আমাকে মাতাল করে তুলেছিল, স্থির থাকতে না পেয়ে বললাম, 'প্রিয়তমা, এই কাপড় দুটো এখন তোমার, এমনি আর একটা

তোমার জন্য প্রস্তুত, তাব আগে তুমি যদি একটি-বারেব জন্য নাকাবটা সবিযে তোমার মুখটা যদি একবাব দেখতে দাও—'

আমাব কথাটা বোবশয় তার মনে ধরলো। কোন দ্বিধা নয়, কোন সংকোচ নয়, ধীবে ধীবে সে তাব মুখেব উপর থেকে নাকাবটা সরিয়ে আমাব চোখের উপবে তার পিঙ্গল চোখ দুটি মেলে ধরলো, যেন একটা সুন্দব গোলাপ পাঁপড়ি মেলে দিলো সেই মুহূর্তে। তাব মিষ্টি মুখ, আতবের খুশবু, সব মিলিযে একটা মাযাময পরিবেশ গড়ে তুললো সেই মুহূর্তে। চোখের পলক যেন তে ভুলে গেলাম। মেযেটি তাব মুখের উপরে ফিরে আবার নাকাব টেনে দিতে তবে আমার হুঁস হলো।

'প্রিযতম, আমাব কাছ থেকে খুব বেশি দিন বিচ্ছিন্ন হযে থেকো না, আনার খুব কষ্ট হবে।'

মেযেটি কখন যে চলে গিযেছিল খেযাল নেই, সম্বিৎ ফিরে পেলাম, দোকানীর ডাকে, 'কি ভাবছেন?'

'মেযেটি খুব সুন্দর তাই না?' তাব সমর্থন না পেযেই আমি তখন মেযেটিব খোঁজ খবব নিতে থাকি। উত্তরে সে বলে, 'মেযেটি কোন আমিরেব কন্যা হা, প্রচুব আর্থেব মালকিন সে এখন, কারণ সম্প্রতি তার বাবা মাবা গেছেন।

তারপর সেই দোকানীব কাছ থেকে বিদায নিযে সবাইখানায় ফিবে এলাম। নৈশভোজে বসতে মন চাইল না। আসলে তখন আমার কোন কিছুই ভাল লাগছিল না। মেযেটিব অমন চোখ ঝলসা না রূপ দেখে সে বিনা অন্য সব কিছু তখন আমা কাছে বিস্বাদ বলে মনে হচ্ছিল। পরদিন সেই দোকানীর গদীতে না যাওযা পর্যন্ত মনে শান্তি ছিলো না। আমি তাকে সালাম জানিযে তাব পাশে গিযে বসলাম।

সেই মেযেটি আবাব এলো সেই দোকানে আগের চেযে বেশী দামী পোষাক পড়ে, সঙ্গে এক ক্রীতদাসী নিযে। বহুর-অল-দিনের দিকে লক্ষ্য না করেই সে আমাকে সালাম জানালো। তারপর আমার কাছে মুখ নামিযে এনে সে বললো। আহাঃ কি মিষ্টি কণ্ঠস্বর তাব, যেন আমার কানে মধু ঝরে পড়লো, 'কাউকে আমাব সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, আপনার পাওনা বাবশো দিরহাম আমি মিটিযে দিতে চাই।'

'তা এতো তাড়া কিসের?'

মেযেটি তখন তার বটুযা থেকে টাকাটা বাব করে আমাব হাতে গুঁজে দিতে গিযে বলে, 'আমরা আপনাকে হাবাতে চাই না বলেই টাকার লেনদেন তাড়াতাড়ি চুকিযে ফেললাম।

আমি তখন তাকে আমাব পাশে বসিযে টাকার রসিদ লিখে দিলাম, টাকাব অঙ্ক শূন্য বাখলাম। মেযেটিকে বললাম, 'আপনার যেমন খুশি আমার নামে খবচ দেখিযে দিতে পাবেন, আপত্তি কবব না।'

আমার কথায কি ছিলো কে জানে, মেযেটা কেমন অসন্তুষ্ট হযে হঠাৎ দোকান থেকে বেরিযে গেলো। বড় অদ্ভুত মেযে তো। তার মনের খববটা নিতে যখনি তার সঙ্গে আলাপ জমাতে যাচ্ছি ওখনি সে উধাও হয়ে গেলো। পথে নেমে অনেক খুঁজলাম মেযেটাকে। জনাবণ্যে সে একা নয, হারিযে যেতে মানা নেই। তাকে না পাওযার ব্যর্থতায ও বাক্রান্ত মন নিযে ফিবে যাচ্ছি, হঠাৎ এক নিগ্রো ক্রীতদাসী আমার পথ আগলে দাঁড়িযে বললো, 'মালিক, 'মালিক, দযা কবে আপনি একবার আমার সঙ্গে আসুন, আমাব মালকিন অপেক্ষা করছেন।'

'কিন্তু আমি তো কাউকে এখানে চিনি না, তাই কে যে আমাকে খোঁজ কবতে পাবে, ভেবে পাচ্ছি না।'

'সে কি।' নিগ্রো ক্রীতদাসী অবাক হযে বলে, 'এবই মধ্যে আপনি আমার মালকিনকে ভুলে গেলেন? খানিক আগেই তো একটা কাপড়ের

দোকানে তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হলো না?'

আমি তখন চমকে উঠলাম। কি আশ্চর্য মেয়েটি আমাকে ইয়াদ করেছে? সঙ্গে সঙ্গে আমার মন কানায় কানায় ভরে উঠলো খুশিতে। কাল বিলম্ব না করে অনুসরণ করলাম মেয়েটিকে।

'ওঃ প্রিয়তম', মেয়েটি সান্নিধ্য পাওয়া মাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে উঠলো, 'প্রিয়তম, আমি যে তোমার প্রেমে পাগল, তোমার এক মুহূর্তের অদেখার

তারপর মেয়েটি বললো, 'প্রিয়তম, এক কাজ করলে হয় না, তোমার কিংবা আমার বাড়িতে মিলিত হলে কেমন হয়?'

'এখানে আমি একজন আগন্তুক। সরাইখানায় তোমাকে আপ্যায়ণ করার মতো জায়গা তেমন নেই। তাই ভাবছি, যদি তোমার বাড়িতে আমাকে আহ্বান করো—'

'বেশ তো, তাই হবে।' মেয়েটি বলে, 'কিন্তু



বেদনা আমি যে আর সইতে পারি না। তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকে কিছুই আমার আর ভালো লাগে না। খাওয়া ঘুম সব আমি ভুলে গেছি।'

প্রত্যুত্তরে আমি বলি, 'কিন্তু প্রিয়তমা, তুমি বুঝবে না, তোমার থেকে আমার দুঃখ দ্বিগুণ। জানো, কাল রাতে আমি সুখে কিছু কাটাতে পারিনি। কেবলি মনে হয়েছে, কখন তোমার সাথে আবার আমার দেখা হবে, কখন তোমার মুখের নাকাব তুলে তোমার সুন্দর মুখখানি দেখতে পাবো।'

আজ তো শুক্রবারের রাত, কাল সকালে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না জানান পর্যন্ত কিছু করা যাচ্ছে না। এক কাজ করো, কাল সকালে এখানকার মসজিদে গিয়ে প্রথমে তুমি নামাজ পড়বে। তারপর সেখান থেকে একটা গাধার পিঠে চড়ে হাব্বালিয়াহর মহল্লায় চলে আসবে, সেখানে একটা বিরাট প্রাসাদ দেখতে পাবে, প্রাসাদের নাম 'অল-নাকিব বরাকত', সেখানেই আমি থাকি। দেরী করো না, আমি তোমার অপেক্ষা করবো।'

মন আমার খুশিতে ভরে ওঠে। মেয়েটির কাছ থেকে হাসি মুখে বিদায় নিয়ে ফিরে আসি সরাইখানায়। সেদিন রাতে এক অদ্ভুত খুশির মেজাজে চোখের পাতা দুটো এক করতে পারলাম না। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি অদ্ভুত জাগরণ।

পরদিন সকালে ঘু· থেকে উঠে তাড়াতাড়ি গোসল সেবে নতুন পোষাকে নিজেকে সাজালাম, গায়ে দামী আতর ছড়ালাম। নাস্তা-পানি সেরে বেরিয়ে পড়লাম সরাইখানা থেকে। তারপর রাস্তার মোড় থেকে একটা চ্চর ভাড়া করে হাব্বানিয়াহ-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলা·। কথা হলো, খচ্চরের মালিক আপাতত তখন চলে যাবে। পরে আমার ফেরার সময়ে হাজির হয়ে সে আমাকে সরাইখানায় পৌঁছে দেবে।

মিউনিক কুটীরে মেয়েটির ঘরের দরজায় কড়া নাড়তেই দরজা খুলে যায়। দরজার ওপারে দুটি যুবতী ক্রীতদাসীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। বয়স অল্প হলেও তাদের স্তন দুটি বেশ পুরুষ্ট এবং কুমারী, রূপ ও যৌব· যেন ফেটে পড়ছিল তাদের দেহ থেকে যেন দু'টি চাঁদ আকাশ থেকে নেমে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। পূর্ণিমার চাঁদের মতোই তাদের চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করছিল।

'আসুন, ভেতরে আসতে আজ্ঞা হোক', তারা আমাকে বলে, 'মালকিন অপেক্ষা করছেন আপনাদের জন্য।' কাল সারা রাত ঘুম হয়নি তার, আপনার অপেক্ষায় রাত্রির প্রহর গুণছেন তিনি, আর আজ আপনার শুভ চিন্তায় নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেছেন তিনি।'

মেয়েটিকে অনুসরণ করে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করলাম। বিরাট আঙ্গিনা, তার চারপাশে সাতখা·া ঘর, সাতটা দরজা, মারবেল পাথরের মেঝে, আসভ বপত্রে সাজানো ঘরগুলো, দরজায় দামী পর্দা ঝুলছিল, মেঝের উপরে পারস্যের গালিচা বিছানো। ঘরে ঢুকে একটা কৌচে বসতে যাবো,—এমন সময়

শাহরাজাদ দেখলো, ভোর হয়ে আসছে। বাদশাহ শাহরিয়ারের দিকে তাকিয়ে পরদিন আবার গল্প বলার অনুমতি চাইলো সে। শাহরিয়ার তখন মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

পরদিন রাত্রে শাহরাজাদ আবার তার কাহিনী শুরু করতে গিয়ে বললো, 'তাহলে সেই যুবক দালালের মুখ থেকেই তার কাহিনী শুনুন জাঁহাপনা—'

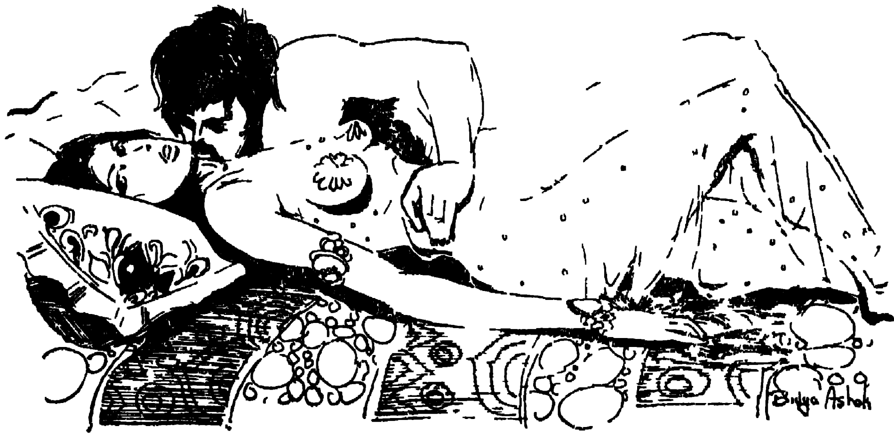
ঘরে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করতে যাচ্ছি, মেয়েটিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম আমার সামনে। তার মাথায় মণিমুক্তো খচিত মুকুট, দামী অলঙ্কারে মোড়ানো সারা অঙ্গ। সবে মাত্র প্রসাধন সেরে এসেছে যেন সে, পরিচ্ছন্ন মুখাবয়ব, সুর্মা টানা চোখ। সব মিলিয়ে এক অনিন্দ্য সুন্দর রূপ-লাবণ্যে অপরূপ দেখাচ্ছিল তাকে। তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে অনেকক্ষণ চোখ ফেরাতে পারলাম না। আমাকে দেখে হাসলো, যেন এক মুঠো মুক্তো ঝরে পড়লো তার অধর দিয়ে। আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে আমাকে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো, আমার মুখটা তার কবোষ্ণ বুকের মধ্যে চেপে ধরে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেললো সে, একটা অতৃপ্ত বাসনার অবসান হলো সেই মুহূর্তে। তারপর ধীরে ধীরে আমার মুখটা সে তার দু'হাতের চেটোয় তুলে ধরে মুখ নামিয়ে আনলো আমার উষ্ণ ঠোঁটের উপরে। আমার ঠোঁট জোড়া চুষতে থাকে সে শব্দ করে (আমিও তার ঠোঁট দু'টো চুষে দিই, নিঃশেষ করে তার অধরের সুধা পান করতে থাকি)।

এক সময় সে আমার ঠোঁটের উপর থেকে তার মুখটা বিচ্ছিন্ন করে গভীর অনুরাগের সুরে বলে, 'প্রিয়তম, তুমি যে আজ আমার ডাকে সাড়া দিয়ে আমার সান্নিধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছ, এ যেন বিশ্বাস হয় না।' অতঃপর সে তার সন্দেহ দূর করার জন্য আমার মাথায় বুকে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে

বলে, 'বিশ্বাস করো প্রিয়তম, আল্লাহর কসম, তোমাকে দেখাব সেই প্রথম দিন থেকেই আমি তোমার মহব্বতে পড়ে গেছি, তখন থেকে আমার চোখে ঘুম নেই, পেটে খিদে নেই। কেন এমন হলো বলো তো?'

'সে প্রশ্ন তো আমারো প্রিয়তমা।' আবেগ মেশানো কণ্ঠে আমি উত্তর দিলাম, 'আমি তোমার মহব্বতের ক্রীতদাস. নিগ্রো ক্রীতদাস। এই প্রথম তুমি আমাকে মহব্বতের প্রথম পাঠ শেখালে, আমি ধন্য, ধন্য আমার জীবন। তোমার এমন মহত মহব্বত আমি জীবনে কোন দিনও ভুলতে পারবো না। তুমি

খাওয়ার পর আবার আমরা গল্পে মেতে উঠলাম। এক সময় মেয়েটির চোখে সরাবের নেশা একটু একটু করে ঘনিয়ে আসে। সে আমায় আহ্বান জানায় তার বিছানায়। সেই আহ্বানের জন্যই বুঝি আমি অপেক্ষা করছিলাম এতক্ষণ ধরে। তার শয্যা-সঙ্গী হতে গিয়ে আমার ভূমিকা অতি নগণ্য। আমাকে বিশেষ কিছুই করতে হলো না, মুখ্য ভূমিকা সে-ই গ্রহণ করলো। উপোসী কাটের মতো সে আমাকে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুললো, তারপর আমার দেহ লেহন করে দিলো। তবে দেহ-মিলনের শেষ পর্বে আমার ভূমিকা অবশ্যই মুখ্য হয়ে



যখন করুণা করে তোমার মহব্বত আমাকে এমন উজাড় করে ঢেলে দিলে, আশাকরি ফিরিয়ে নেবে না কখনো, ভুলে যাবে না আমাকে কোনদিনও।'

'এ তুমি কি বলছো প্রিয়তম, আমার মহব্বত সাচ্চা', মেয়েটি আবার আমার ঠোঁটে তার চুম্বন এঁকে দিয়ে বলে, 'আল্লাহর দোয়ায় সেই ভুল যেন আমাকে করতে না হয় কখনো।'

তারপর সে আমাকে তার অতি আপনজনের মতো যত্ন করে খাওয়ালো। খাওয়া শেষে নিজে হাতে করে তুলে দিলো সরাবের গ্লাস আমার হাতে। তার হাতের স্পর্শে সরাব নয় যেন অমৃত-সুধা পান করলাম আমি। গোলাপ জল দিয়ে হাত-মুখ ধুলাম।

উঠলো। তার মতো আমিও তখন চরম উত্তেজিত। তার নিরাবরণ দেহের আহ্বান আমি অস্বীকার করতে পারলাম না। তার দেহে প্রবিষ্ট হলাম এবং অনেকক্ষণ ধরে তাকে সুখের সাগরে ভাসিয়ে এক সময় তার দেহের গভীরে বিন্দু বিন্দু করে তৃপ্তির শেষ নির্যাসটুকু ঢেলে দিলাম। আমরা দুজন তখন অসম্ভব ভাবে কাঁপতে কাঁপতে এ ওর দেহের মধ্যে বিলীন হয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ কারোর মুখে কোন কথা ছিলো না, কেবল অনুভূতিটা তখন অনেক না বলা কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল, চাওয়া পাওয়ার হিসাব নিকাশ করে দিচ্ছিল, অনুভবে দুটি মন মিশে গিয়ে একাকার হয়ে উঠছিল। স্থান

কাল সব ভুলে আমরা তখন বেহস্তের সুখ পেতে মেতে উঠলাম, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই সুখ আমরা আমাদের মনের মণিকোঠায় গেঁথে রাখার চেষ্টায় সচেষ্ট হয়ে উঠলাম।

এক সময় দূরে আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠতে দেখা যায়। তখন আমি তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠে বসলাম। সে আমাকে হামামে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে গোলাপ জল দিয়ে স্নান করাল, আমার সারা দেহ নিজের হাতে মুছে দিতে গিয়ে বললো, 'প্রিয়তম, তোমার এই বলিষ্ঠ পৌরুষ দেহের সুখ আর আগে কখনো পাইনি, সেই চরম আনন্দদায়ক সুখ তুমিই প্রথম আমাকে দিলে। তোমার এ দেহ একান্ত আমার হয়ে থাকুক, আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনাই কেবল জানাই।'

মখমলের বিছানায় রুমালে বাঁধা পঞ্চাশ দিনার তাকে উপহার স্বরূপ রেখে আসতে গিয়ে তার দিকে ফিরে তাকাতেই চমকে উঠলাম। মেয়েটি তখন কাঁদছিল। কান্না-স্বরে সে শুধোয়, 'প্রিয়তম, তোমার ঐ সুন্দর মুখের দর্শন আবার আমি কবে পাবো যাওয়ার আগে বলে যাও ?'

'সূর্যাস্তের পর আবার আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হবো', তাকে কথা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম অতঃপর।

ভাড়া করা খচ্চরের মালিক প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করছিল। তার সেই খচ্চরের পিঠে চড়ে সরাইখানায় ফিরে এলাম। তার হাতে আধ দিনারের একটা স্বর্ণমুদ্রা তুলে দিতে গিয়ে বললাম, 'সূর্যাস্তের পর আবার এসো!'

সরাইখানায় ফিরে এসে প্রাতঃরাশ সেরে আবার বেরিয়ে পড়ি হাটে-বাজারে, আমার বকেয়া পাওনার কিস্তির টাকা আদায় করে ফিরে আসি সরাইখানায়। তখন আকাশের পশ্চিম প্রান্তে সূর্য অনেকটা হেলে পড়েছে। একটু পরেই রাজ্যের অন্ধকার নেমে আসবে। নিজেকে প্রস্তুত করি। আমার নফরকে বলে রেখেছিলাম মেয়েটির জন্য ভালো মন্দ খাবার কিনে রাখতে। আজ আমি তাকে নিজের হাতে খাওয়াবো। দামী সরাবও সঙ্গে নিয়ে যাবো। নিজের হাতে আজ আমি আমার প্রেয়সীকে খাওয়াবো সে আমার জান, সবকিছু আমার সে, অনুভবে বুঝেছি আমি সেই সত্যটা, তার মহব্বতের জন্য আমি সব কিছু করতে পারি, পথের ভিখারী হলেও তার মহব্বত আমি ফিরিয়ে দিতে পারবো না।

সন্ধ্যা নামতেই রুমালের খুঁটে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা বেঁধে নিয়ে খচ্চরের পিঠে খাবারের পাত্রগুলি সাজিয়ে নিয়ে রওনা হলাম আমার প্রেমিকার বাড়ির উদ্দেশ্যে। নতুন এক দৃশ্য চোখে পড়ল সেদিন। ঝকঝকে চকচকে মেঝের মার্বেল পাথর, দরজা-জানলার পর্দাগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরে বাড়তি চিরাগ বাতি। বুঝলাম, এ আয়োজন সবই আমার জন্য। মন ভরে গেলো খুশিতে কানায় কানায়। আমাকে দেখতে পেয়ে মেয়েটি ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'তুমি এসেছ প্রিয়তম? তুমি বিনে আমার জীবন বিফলে যায়।' তারপর যথারীতি, আদর, চুম্বন দেহের উষ্ণ ঘ্রাণ নেওয়া।

এরই মধ্যে মেয়েটি আয়োজন করে নৈশ-ভোজের। আজ আমি নিজের হাতে আমার আনা ভাল ভাল খাবার খাইয়ে দিলাম তাকে এবং সে আমাকেও খাওয়াল। আমার সরাবের গ্লাসে প্রথম চুমুক দেয় সে, এবং আমি তার গ্লাসে প্রথম চুমুক দিলে পর তবে সে ঠোঁট রাখে সেই গ্লাসে। মাঝরাত পর্যন্ত সরাবের নেশায় মত্ত থাকলাম দুজনে। এক সময় মেয়েটির চোখে চটুল চাহনি ঘনিয়ে আসে, তার বেশ-ভূষা কেমন শিথিল করে দিয়ে বসে সে। উঠে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে। তারপর সে আমাকে তার শয়নকক্ষে নিয়ে যায়। দুজনে জড়াজড়ি করে নরম বিছানায় ঢলে পড়ি। মেয়েটি তার পাখীর মতো নরম বুকে টেনে নেয় আমার মুখটা, সোহাগ আর চুমোয় ভরিয়ে দেয় আমার ঠোঁট।

এক সময় আমাদের দু'টি দেহ মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। চরম প্রাপ্তির শেষ বিন্দুটুকু না পাওয়া পর্যন্ত কেউ কারোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ভাবতে পারলাম না। এক সময় ভোর হয়ে আসে। রুমালের খুঁটে বাঁধা পঞ্চাশটা স্বর্ণমুদ্রা মেয়েটির বিছানায় রেখে ফিরে আসি সরাইখানায় সন্ধ্যাবেলায় আবার আসবো কথা দিয়ে।

এইভাবে রাতের পর রাত অনিদ্রা, অসংযম এবং বেহিসেবী খরচ করে আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। বাজারে যাওয়া বন্ধ কারণ কারোর কাছেই আমার আর টাকা পাওনা নেই, [illegible] কিস্তির টাকা মিটিয়ে বসে আছি [illegible] আমার তখন অনেক টাকার দরকার। এই বিদেশ বিভূঁইয়ে কার কাছে গিয়ে হাত পাতবো, কে অচেনাকে বিশ্বাস করে খালি হাত ভরিয়ে দেবে স্বর্ণমুদ্রায়। মেয়েটির রাতের হাতছানি আমি তখনো ভুলতে পারিনি। মোহ, সব মোহ। ভাবলাম, লোভ, এই নিয়েই তো আমাদের জীবন!

সরাইখানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম এক সময়। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কোন খেয়াল নেই আমার তখন। যন্ত্রচালিতের মতো রাস্তায় নামতে হয় তাই নামলাম যেন উদ্দেশ্যহীন সেই যাত্রা। একা একা হাঁটতে হাঁটতে এক সময় জুহুওয়াল্লাহ গেটের সামনে এসে পৌঁছে কেমন কৌতূহল হলো আমার। এখানে এতো ভীড় কিসের? কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম, রণসজ্জার সাজে এক সিপাই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে আছে, সেরকম দৃশ্য শহরে বা একটা কারোর চোখে পড়ে না। তাই তারা দৃশ্যটা বেশ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখছে এবং



উপভোগ করছে। এক সময় আমি তাদের সামিল হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে সিপাই-এর কাছ ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ালাম। সিপাইকে দেখার জন্য তখন সবাই এমনি তন্ময় হয়ে আছে যে, কেউ কারোর দিকে নজর দেবার মতো অবসর ছিলো না। সিপাইটা তখন ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে, জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গেছে। ভীড়ের চাপে এক একবার সিপাই-এর ঘাড়ের উপরে হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ি, কখনো সে আমাকে সামাল দেয়, আবার

কখনো বা বিরক্ত হয়ে দূরে ঠেলে দেয়।

আমি তখন কপর্দক শূন্য এক ব্যক্তি, কোথাও টাকার গন্ধ পেলেই ছুঁক ছুঁক করে উঠি। হঠাৎ তখন আমার নজরে পড়ল সিপাই-এর জামার বুক-পকেটটা অস্বাভাবিক স্ফীত, পকেট থেকে সিল্কের একটা দড়িও ঝুলতে দেখলাম। তাহলে নিশ্চয়ই তার পকেটে টাকার থলি আছে। এবার আমি সামান্য একটু ভীড়ের ঠেলায় ইচ্ছে করে নিজেকে সামলাতে না পারার ভান করে সিপাই-এর উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতটা গিয়ে পড়লো তার জামার বুক পকেটে। আমার হাতের মুঠোয় তখন সেই টাকার দড়িটা। দড়ি ধরে সহসা একবার টান দিতেই সেটা আমার হাতের মুঠোয় চলে এলো। ঝানু পকেটমারের মতোই সেটা আমি নিঃশব্দে আমার জামার পকেটে চালান করে দিয়ে সেখান থেকে কেটে পড়ার ধান্দা করছি, সেই সময় সিপাই ছুটে এসে আমার জামার কলার চেপে ধরলো আচমকা। স্পষ্ট বুঝলাম, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমি এড়াতে পারিনি। আমার মধ্যে একটা শয়তান ভর করেছিল তখন। সিপাই-এর পকেট ফাঁকা, রাগে উত্তেজনায় সে তার ভারী বুট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতেই মুখ থুবরে মাটিতে পড়ে গেলাম।

ওদিকে আমার দুরাবস্থা দেখে আশ-পাশের পথচারীরা হৈ-হৈ করে ছুটে আসে ঘটনাস্থলে, সিপাইকে ঘিরে ধরে তার কাছে কৈফিয়ত চায়, 'একজন ভদ্র যুবককে ও ভাবে মারলে কেন তুমি?' জনতা তখন আমার দিকে। সিপাইকে তারা কোণঠাসা করে দিয়েছে।

'কিন্তু সিপাই সে, জনতার থেকেও কঠিন। রুক্ষস্বরে জবাব দেয় সে, 'তা চোরকে জুতো পেটা করবো না তো পুজো করবো?'

চোর? আমি যে চুরি করতে পারি, অধিকাংশ জনতা বিশ্বাসই করতে পারলো না। তারা ধরে নিলো, আমি নির্দোষ, অন্যায় সিপাই-এরই। অকারণে সে আমাকে পিটিয়েছে। আবার কিছু লোক আমার বিপক্ষে চলে গেলো। কেউ কেউ আবার সন্দেহ প্রকাশ করলো, 'কে জানে বাবা, কার মনে কি আছে? আজকাল চেহারাই মানুষের আসল পরিচয় নয়, 'ইত্যাদি'—

যাইহোক আমার পক্ষের লোকেরা আমাকে রক্ষা করার জন্য সিপাই-এর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে যায়, কিন্তু আরো বেশি দুর্ভাগ্য আমার জন্য অপেক্ষা করছিল বোধহয়। সেই সময় নগর কোটাল সেই পথে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। উত্তেজিত জনতা দেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। ভীড় ঠেলে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

'ব্যাপার কি? এতো হৈ-চৈ কিসের?'

'আল্লাহ জানেন আমীর সাহেব। এই যুবকটি চোর।' সিপাই তখন আরো উত্তেজিত। নগর কোটালের কাছে নালিশ জানায়, 'ঐ ছোকরা আমার জেবে হাত দিয়ে আমার টাকার ব্যাগটা ছিনতাই করে নিয়েছে। আমি এর বিচার চাই আমীর সাহেব। আপনার কাছেই যুবকটিকে ধরে নিয়ে যাবো ভাবছিলাম। তা আপনি নিজেই যখন এসে হাজির, আশাকরি এবার সঠিক বিচার হবে। আপনি নিজেই ওকে জিজ্ঞাসা করুন, ও আমার জেব থেকে টাকার থলিটা তুলে নিয়েছ কিনা?'

'তুমি যে বলছো, ঐ ছোকরা তোমার জেব মেরেছে', নগর কোটাল জিজ্ঞেস করলেন, 'অন্য কেউ তা কি দেখেছে?'

'না হুজুর।'

নগর কোটাল তখন দারোগা সাহেবের (সে তাঁর সাথেই ছিলো) দিকে ফিরে বললেন, 'ছোকরাকে ভাল করে তল্লাসী চালাও। দেখো ওর কাছ থেকে সিপাই-এর চুরি যাওয়া টাকার থলিটা পাওয়া যায় কিনা!'

'হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আমার কাছ থেকে সেই টাকার

থলিটা সত্যি সত্যি পাওয়া গেলো। সিপাই-এর জবানবন্দী মতো গুণে গুণে কুড়ি দিনার পাওয়া গেলো সেই থলির ভিতর থেকে।

কোটাল সাহেব তখন আমাকে তাঁর কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে ছোকরা, এবার সত্যি করে বলো তো তুমি এই টাকার থলিটা ঐ সিপাই-এর জেব থেকে তুলে নিয়েছো?'



আমি তখন মাথা নিচু করে নিজের মনে বলি, এখন আমি যদি অস্বীকার করি তাহলে আমাকে অনেক ঝামেলায় পড়তে হতে পারে।' তাই আমি মাথা তুলে তাঁর দিকে ফিরে উত্তর দিলাম, 'হ্যা, আমি ওটা সিপাইজীর জেব থেকে চুরি করেছি।'

আমাকে দোষ স্বীকার করতে দেখে নগর কোটাল তো দারুন অবাক হলেন। বলে কি ছোকরা? সত্যি সে তাহলে চোর। তখন তিনি জহ্লাদকে ডেকে বললেন 'ওর হাত দু'খানা কেটে উড়িয়ে দাও, যাতে ফের আর সে চুরি করতে না পারে।

জহ্লাদ তৈরী হয়েই ছিলো। কোটাল সাহেবের হুকুম পাওয়া মাত্র প্রথমে সে আমার বাঁ-হাতটা কেটে বাদ দেওয়ার জন্য উদ্যত হওয়া মাত্র সিপাইটার বোধহয় মায়া হলো আমার উপরে। সে তখন নিজে উপযাজক হয়ে কোটাল সাহেবের কাছে আর্জি জানালো, আমার বাঁ-হাতটা যেন কাটা না হয়।

তার কথা রাখলেন কোটাল সাহেব। তাঁর ইঙ্গিতে জহ্লাদ চলে গেলো সেখান থেকে। একটু পরে কোটাল সাহেব তাঁর সঙ্গী দারোয়ান সাহেবকে নিয়ে প্রস্থান করলেন ঘটনাস্থল থেকে। তখন উপস্থিত জনতা দয়াপরবশ হয়ে আমাকে এক পেয়ালা সরাব পান করতে দিলো।

সিপাইটা তখন আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলে, 'তোমার মুখ-দেখে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি জাত চোর নও, নিশ্চয়ই অভাবে পড়ে চুরি করতে বাধ্য হয়েছিলে।' তারপর সে তার সেই টাকার থলেটা আমার বাঁ-হাতে গুঁজে দিয়ে চলে গেলো সেখান থেকে।

তখন আমি আমার ডান-হাতের ক্ষতস্থানে রুমাল চাপা দিয়ে আমার গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হলাম, শান্ত পায়ে। শরীর থেকে অনেক রক্ত ঝরে গেছে ডান-হাতটা কেটে ফেলার জন্য। আমি তখন খুব দুর্বল, শরীর কেমন ঝিমঝিম করছিল, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। সেই অবস্থায় আমি আমার সেই প্রেয়সীর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সোজা তার কার্পেট বিছানো বিছানায় শ্রান্ত-অবসন্ন দেহটা বিছিয়ে দিলাম।

আমার ফ্যাকাশে মুখ দেখে মেয়েটি উদ্বিগ্ন হয়ে শুধোয়, 'প্রিয়তম আজ তোমার মুখটা অমন শুকনো শুকনো কেন দেখাচ্ছে? কি হয়েছে তোমার? কথাই বা বলছো না কেন?'



'ও কিছু নয়? সামান্য একটু মাথার যন্ত্রণা', উত্তরে আমি তাকে বললাম, 'তাছাড়া অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি, সেই জন্য আমি একটু ক্লান্ত। ও সব ঠিক হয়ে যাবে, তার জন্য তুমি কোন চিন্তা করো না।'

মেয়েদের মন, আমার কোন আশ্বাসেই শান্ত হয় না। উদ্বেগ ঘনিয়ে ওঠে তার চোখে-মুখে। সে আমার মাথাটা তার কোলে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'প্রিয়তম, আমার মন বলছে, নিশ্চয়ই তোমার কিছু হয়েছে বলো না, তুমি আজ নীরব কেন? তোমার [illegible] মুখের ছাপ যে অন্য কথা বলছে প্রিয়তম।'

'ও সব কথা ছেড়ে দাও,' আমি তাকে বাধা দিয়ে বলি, 'তুমি তোমার কাজ করো।'

সে তখন [illegible] কেঁদে ওঠে, '[illegible], এখন আর আমাকে তোমার ভালো লাগে না। তোমার কাছে আমার প্রয়োজন [illegible] গেছে, তাই তুমি আর আগের মত [illegible] কথা শোনাচ্ছ না। [illegible] জন্যও তুমি আমাকে আদর করলে না [illegible] প্রিয় একটা চুম দিতেও [illegible]'

তারপর সে অনেক অভিযোগ করলো। কিন্তু আমি তো জানি, তার মন [illegible] কি করে বোঝাই তাকে আমার [illegible] রকম! [illegible] কারণেই [illegible] থেকে দূরে দূরে সরে থাকছি। [illegible] বলা যায় না বলা যায় না [illegible] যদি আমা[illegible] এই যে পরিবর্তন, সব [illegible] এড়িয়ে [illegible]। আমার ভয় [illegible] সব কথা [illegible] আমার [illegible] কোন [illegible] দিতাম না [illegible] না পর্যন্ত।

তারপর সে টেবিলে খাবার [illegible] আমাকে ডাকতে এলে আমি তাকে বললাম, 'খিদে নেই, পেটটা কেমন ভার ভার মনে হচ্ছে।'

'আজ তোমার কি হয়েছে সত্যি করে বলো তো?' অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে সে আমার উত্তরের অপেক্ষায়

'একটু অপেক্ষা করো, আমি তোমাকে সব খুলে বলবো, আমার দুঃখের কথা তোমাকে না জানাতে পারলে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।'

তারপর সে আমার জন্য সরাবের পেয়ালা এনে বলে, 'এটা পান করো, দেখবে সব জ্বালা দুঃখ ভুলে গেছো তুমি।'

'তুমি বলছো সব দুঃখ আমি ভুলে যাবো।' এই বলে বাঁ হাত বাড়িয়ে তার হাত থেকে সরাবের পাত্রটা নিয়ে এক নিঃশেষে চুমুক দিয়ে শেষ [illegible] সে আবার আমার খালি পাত্রে [illegible] ঢেলে দেয়, আর আমি গলাধঃকরণ করতে থাকি [illegible] তখন ভীষণ কান্না পাচ্ছিল, এরপর [illegible] দুঃখের কথা বলতে হবে, কিভাবে সে [illegible] কথাটা [illegible] আমার [illegible] জল গড়িয়ে পড়লো এক সময় [illegible] চোখের জল [illegible]

[illegible] সে জিজ্ঞেস করলো, '[illegible] কি কারণ বলবে না আমাকে? [illegible] দেখে আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে প্রিয়[illegible]' আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে [illegible] আবার জিজ্ঞেস [illegible], 'আচ্ছা, আজ [illegible] হয়েছে বাঁ সরাবের পাত্র নিলে কেন [illegible]'

'[illegible] কাঁধে একটা ফোঁড়া হয়েছে, তাই [illegible] পারছি না।' রুমাল দিয়ে ঢাকা [illegible] প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তখন সে ফোড়াটা গেলে দেবার কথা বলে। আমি তাকে বলি, 'সবে উঠছে, এখনো পাকেনি। কাঁচা অবস্থায় ফাটালে যন্ত্রণা আরো বেড়ে যাবে।'

'ঠিক আছে আর এক পাত্র সরাব পান করে নাও, ভালো ঘুম হবে, সেই সঙ্গে যন্ত্রণাও কমে যাবে।'

সরাবের নেশায় গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম

যেখানে বসেছিলাম সেখানেই। তার চোখে কিন্তু ঘুম ছিলো না। আমার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে চমকে ওঠে সে। সে লক্ষ্য করে, আমার ডান হাতের কব্জি নেই। হয়তো তার কৌতূহল হয়ে থাকবে। আমার হাতের ব্যাণ্ডেজ সরিয়ে দেখতে গিয়ে আমার দুঃখের কারণটা সে তখনই জেনে থাকবে। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে দেখি ব্যাণ্ডেজটা ঠিক মতো বাঁধা নেই। তখন আমার বুঝতে আর বাকী থাকে না, আমার ডান হাত কাটা যাওয়ার ব্যাপারটা সে জেনে গেছে।

আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'আমি জানি, আমার। আজ তোমার এই অবস্থা। এখানে চুরি না করলে কারোর হাত কাটা যায় না। আমি জানি আমাকে দামী দামী শাড়ী নগদ টাকা উপহার দিতে গিয়ে তুমি ফতুর হয়ে গিয়ে শেষে চুরি করতে গিয়েছিলে। উঃ। এসব কথা ভাবতে গিয়ে সারাটা রাত আমার বুক ফেটে গেছে প্রিয়তম, এর পরেও কি তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি? তুমিই বলো, আল্লাহ কি আমাকে মাফ করবেন? তাছাড়া আমার মহব্বতের কি কোন কিমত নেই?'



গোসল সেরে হামাম থেকে ফিরে এসে দেখি, টেবিলে মোরগ মসাল্লাম আর তন্দুরী সাজানো রয়েছে। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে এক পাত্র সরাব এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে এবার আমি উঠে দাঁড়ালাম ফিরে যাওয়ার জন্য। সে তখন আমার পথ আগলে দাঁড়ালো।

'কোথায় চললে?'

'আমার কাজে। কাজ করে তো খেতে হবে?'

'না, তোমাকে আর কাজ করতে হবে না। এখন থেকে তুমি আমার কাছেই থাকবে।' মেয়েটি

আমি ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরি আবেগে। দুজনেই তখন কাঁদতে থাকি। ও আমার মুখটা ওর মুখের উপরে নামিয়ে আনে। দুজনের অশ্রু মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। ও আমার ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলে, 'এখন থেকে আমরা কেউ কারোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি প্রিয়তম, আর তুমিও আমাকে কথা দাও, আমাকে ফেলে রেখে তুমি চলে যাওয়ার কথা ভাববে না কোনদিনও। আমি তোমার পায়ের উপর মাথা রেখে মরতে চাই। উঃ তাতে আমার কি যে সুখ

হবে তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না।'

তারপর সে নিজেই আমাদের শাদীর আয়োজন করলো। ডেকে পাঠালো কাজী সাহেব এবং শাদীর সাক্ষীদের। কাজী সাহেব এলে সে তাকে বলে, 'এই যুবককে আমি শাদী করতে চাই', সাক্ষীদের দিকে তাকিয়ে সে আরো বলে, 'ওরা আমাদের সাক্ষী। আপনি আ'মাদের শাদীর হলফ-নামা লিখে দিন।'

শাদীর চুক্তিপত্রে সই-সাবুদ হয়ে যাওয়ার পর সে আমাকে একটা লোহার সিন্দুক খুলে তার সঞ্চিত ধন-রত্ন দেখিয়ে বললো, 'এখন থেকে তুমি আমার সব ধন-সম্পত্তির অধিকারী হলে। তোমার দেওয়া রুমালের সব পুট্‌লীগুলো ওখানেই রয়েছে, খুলে দেখো প্রতিটি পুট্‌লীতে পঞ্চাশটা স্বর্ণমুদ্রা বাঁধা আছে, একটাও খরচ করিনি। এই সব আমাকে উপহার দিতে গিয়েই আজ তোমাকে ডান হাতটা খোয়াতে হলো। এর থেকে আর কি দুঃখ হতে পারে। এ সব গ্রহণ করে আমার ঋণের বোঝা তুমি হাল্কা করো, তা না হলে আল্লাহ আমাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। তুমি যেন সব নিতে অস্বীকার করো না। আর আমার একান্ত অনুরোধ আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি যেন আমার হয়ে থাকো, অন্য কোন মেয়ে মানুষে আসক্তি যেন তোমার না হয়।'

কি করুণ আবেদন। আমি তার সেই সাদর আহ্বান ফেরাতে পারলাম না। এক হাতে তাকে বুকে টেনে নিয়ে তার অধর আমার উজাড় করা মহব্বতের রঙে রাঙ্গিয়ে দিলাম চুম্বনে। বার বার চুমু খেয়েও তার অধরের সুধা পান যেন শেষ হয় না, অতৃপ্তির কোন ছাপ পড়ে না আমার মনে। তার সেই গভীর ভালোবাসার পরশ পেয়ে নতুন করে জীবন শুরু করার প্রতিশ্রুতি পেলাম। সব ব্যর্থতার গ্লানি মুছে গেলে তার দান আমি গ্রহণ করলাম সেই মুহূর্তে। আমি তখন প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হয়ে গেলাম।

তারপর আমরা হাসি আর গানে পুরো একটা মাস কাটিয়ে দিলাম। তবু মাঝে মাঝে অনুভব করি, আমার একটা হাত কাটা যাওয়ার জন্য ওর মনে ক্ষোভ থেকে গেছে, সে দুঃখ যেন কিছুতেই ভুলতে পারছে না। আমি ওকে বোঝাই, 'এর জন্য দুঃখ কিসের বিবিজান? একটা হাত গেছে তো কি হয়েছে? তুমি তো আমার আছো, থাকবে চিরদিন। বাঁ-হাতটা গেলেও কোন ক্ষতি ছিলো না, তোমাকে তো আমার একান্ত কাছে পেয়েছি। এর থেকে বড় লাভ আর কি হতে পারে বলো? তুমি আমার দিলের কলিজা। আমার সব চাওয়া-পাওয়ার শেষ তোমাকে পেয়ে। আমি ধন্য, ধন্য আমার জীবন। এরপর মরলে আমার কোন দুঃখ থাকবে না। এটা সত্য যে, তোমার জন্যই আমি আমার জীবন ফিরে পেয়েছি। এর থেকে বড় সত্য আর কিছু হতে পারে না।'

কিন্তু অলক্ষ্যে আল্লাহ বোধহয় হাসছিলেন। আমার নসীব খারাপ, এক সঙ্গে সব সুখ বোধহয় সহ্য হবে না আমার। মনের মতো বিবি, অর্থ সব পেলেও আমার দুঃখের অবসান হলো না। শাদীর বেশ শেষ না হতেই আমার জান বিবিজানের বেঁচে থাকার আয়ু ফুরিয়ে যাওয়ার নোটীশ এলো। কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো ও। রোগশয্যা থেকে আর সে উঠতে পারলো না। আমি আমার জান প্রাণ দিয়ে তার সেবা-যত্ন করলাম। ভালো ভালো হাকিমকে দেখালাম। কিন্তু কেউ তার বেঁচে থাকার প্রতিশ্রুতি দিতে পারলো না। তাদের আশঙ্কা মতো কয়েকদিন পরেই ও বেহস্তে চলে গেলো আমাকে একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে রেখে দিয়ে।

তার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সমস্ত ধন-সম্পত্তি ও জমি-জমার মালিক হলাম আমি একা। কিন্তু একা আমি অতো অর্থ নিয়ে কি করবো।

তাই নগদ টাকা এবং হীরা জহরতগুলো কাছে রেখে জমি-জমা এবং দামী জিনিষপত্র একে একে বিক্রী করতে শুরু করলাম। তার মধ্যে ক্ষীরার বীজ ছিলো কয়েক মণ যা আপনাকে বিক্রী করলাম। আপনার কাছ থেকে ক্ষীরার বীজ বিক্রীর টাকা নিতে না আসার কারণ, আমার মৃত বিবির অন্য জিনিষপত্র বিক্রী-বাটার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলাম এতদিন। আজই একটু ফুরসত পেলাম। তাই তো আপনার আমন্ত্রণ ফেরাতে পারলাম না। তাছাড়া আপনার কাছে গচ্ছিত রাখা টাকাটার একটা বিলি ব্যবস্থা করার জন্যই আপনার বাড়িতে আসা। আপনি তো সব শুনলেন আমার কথা। সত্যি কথা বলতে কি, এত টাকা নিয়ে আমি কি করবো? একা মানুষ। তাই ঠিক করেছি আপনার কাছে গচ্ছিত রাখা টাকাটা আমি আর নেবো না। ওটা আপনিই রেখে দিন, আপনার ব্যবসার কাছে লাগবে।'

যুবকটি নিজের থেকেই আবার বলে, 'এই হলো আমার জীবনের করুণ কাহিনী, আমার হাত খোয়া যাওয়ার ইতিহাস, যে কারণে আজ আমাকে বাঁ-হাতে খেতে দেখলেন আপনি।'

'আপনার এই বদান্যতার জন্য আমি খুব খুশি। আপনার এ উপকার আমি কোনদিনও ভুলতে পারবো না।'

'কেনই বা ভুলবো বলুন?' যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'আরো বেশি করে মনে রাখার জন্য আমার ইচ্ছে আমার সাথে আপনিও আমার ব্যবসায় নেমে পড়ুন। আমরা দুজনে এক সঙ্গে ব্যবসা চালাতে পারি তাহলে। আপনি আমার পাশে থাকলে আমার খুব উপকার হয়। আমাদের ব্যবসায় লাভের টাকা আমরা সমান ভাগে ভাগ করে নেবো। এখন আমি এখানে বাগদাদে আছি। আমার ব্যবসা হলো কায়রো এবং আলেকজান্দ্রা থেকে মালপত্তর এনে এখানকার বাজারে বিক্রী করা। এতে অনেক মুনাফা আছে। আপনি রাজী হয়ে যান, আপনাকে আমি পুরোমাত্রায় মদত দেবো।

এ যেন জল না চাইতেই আকাশে ঘনো কালো মেঘের আবির্ভাবের সামিল। আমি তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাই সঙ্গে সঙ্গে। তারপর থেকে দু'জনে এক সঙ্গে ব্যবসা দেখি। আজ কায়রোয় তো আগামীকাল আলেকজান্দ্রায়। সেখানকার জিনিষ নিয়ে এসে এখানে বিক্রী করে দিই, লাভ তাতে অনেক করলেও মনে আমার শান্তি নেই। এই ভাবে আমাদের কাজ কারবার বেশ ভালো ভাবেই চলছে। এবার এসেছি, এখান থেকে কিছু মালপত্র কিনে নিয়ে যেতে। আমার জন্মভূমি কায়রোয় এ সব জিনিষের চাহিদা আছে খুব। গতকাল রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে সেই কুঁজো লোকটার মরা লাশটা আমাকে অহেতুক ঝামেলায় ফেলে দিলো।

এখানে একটু থেমে বললাম, 'আমার কাহিনী তো শুনলেন জাঁহাপনা, বেশ চমকপ্রদ কাহিনী, তাই না?'

'না, আমি তো মোটেই মানতে রাজী নই। মামুলী কাহিনী আমার মনে একটুও দাগ কাটাতে পারেনি। অতএব তোমাকে ফাঁসির দড়িতে অবশ্যই ঝুলতে হবে।'

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো, ভোর হয়ে আসছে, তাই সে শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে চুপ করলো তখনকার মতো।

বাদশাহ শাহরিয়ারের যেন তর সয় না, রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে শাহরাজাদকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'গতকাল তুমি গল্প শেষ করোনি। বলো তারপর কি হলো? চীনদেশের বাদশাহ তাকে মাফ করলেন?'

'না, জাঁহাপনা, তিনি তাকে সাপ বানিয়ে দিলেন, 'তোমার বাঁচার কোন আশা নেই, ফাঁসীর দড়িতে তোমাকে ঝুলতেই হবে।'

তখন সুলতানের সেই বাবুর্চি এগিয়ে এলো—

চীনা-বাদশাহের সামনে এবং জমিন স্পর্শ করে বললে, 'হুজুর আপনি যদি অনুমতি দেন তো, এর থেকেও আরো বেশী চমকপ্রদ কাহিনী আমি আপনাকে শোনাতে পারি। তবে একটা শর্তে, আমার কাহিনী ভালো লাগলে, আমাদের সবাইকে প্রাণে বেঁচে থাকতে দিতে হবে

বাদশাহ তার প্রস্তাবে সায় দিতেই সে তখন তার কাহিনী বলতে শুরু করলো। এবং সুলতানের বাবুর্চির মুখ থেকেই তার জীবনের কাহিনী শুনুন জাঁহাপনা, বললো শাহরাজাদ।

বাবুর্চির কাহিনী

গতকাল রাতে একটা পার্টি ছিলো আমাদের। বড় বড় হেকিম, জ্ঞানীগুণীদের সমাগম হয় সেখানে। কোরান পাঠ শেষ হওয়ার পর রাতের খানা-পিনার আয়োজন হলো। টেবিলে থরে থরে সাজানো খাবারের সঙ্গে অতি সুস্বাদু রসুনের বিরিয়ানিরও ব্যবস্থা ছিলো। সবার প্রিয় এই বিরিয়ানি, নাম শুনলে জিবে জল আসার কথা। সেই বিরিয়ানি, দিয়েই আমরা সবাই খাওয়া শুরু করলাম একজন বাদে। আমাদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও সে সাফ জানিয়ে দেয়, রসুনের বিরিয়ানি সে খেতে পারবে না।

কেন খাবে না সে, তাকে চেপে ধরাতে শেষে সে বলে, 'এই রসুনের বিরিয়ানি খাওয়ার দরুণ আমাকে একবার দারুণ খেসারত দিতে হয়। তাই সেই ভুল আমি আর করতে চাই না আপনারা বরং খান, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই—'

আমরা তখন তাকে বললাম, 'বেশ তো তুমি না খাও তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু— তোমার না খাওয়ার কারণটা অবশ্যই বলতে হবে, তা না হলে এত ভালো একটা খাবার খেয়েও আমরা তৃপ্তি পাবো না।'

'কিন্তু আপনাদের তৃপ্তি দেওয়ার জন্য যদি একান্তই আমাকে ঐ রসুনের বিরিয়ানি খেতেই হয় তাহলে চল্লিশবার সোডা, চল্লিশবার পটাশ এবং চল্লিশবার সাবান, মোট একশো কুড়িবার আমাকে হাত ধুতে হবে তার আগে।'

'বেশ তো, এ আর এমন কি কথা', গৃহস্বামী তার নফরদের উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বলেন, 'তোরা কে কোথায় আছিস শুনে যা। সোডা, পটাশ এবং সাবান তৈরী রাখার জলদি ব্যবস্থা কর আমাদের মেহমানের জন্য।' সঙ্গে সঙ্গে তার এক নফর সোডা, পটাশ এবং সাবান এনে হাজির হলো।

আমরা অবাক হলাম তার সেই রকম সকম দেখে। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করলাম, লোকটা পাগল নাকি? কিন্তু আমাদের সব হাসি নিমেষে মিলিয়ে গেলো একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখে। লোকটা খাওয়া শুরু করতেই দেখতে পেলাম, তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কাটা। তার কারণ জিজ্ঞেস করতেই সে বললো, 'একটু আগে আপনাদের বললাম না, রসুন খাওয়ার জন্য একবার আমাকে দারুণ খেসারত দিতে হয়, শুধু ডান হাত কেন, 'সে তখন তার বা-হাত এবং দুটো পা আমাদের সামনে মেলে ধরে বলে, সব বুড়ো আঙুলগুলোই আমাকে খেসারত দিতে হয়েছে আমার একটু ভুলের জন্য কিংবা লোভের জন্যও বলতে পারেন। রসুনের যে কোন খাবার খেতে আমি খুবই ভালোবাসি।'

তখন আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার হাত-পায়ের বুড়ো আঙুলগুলো কেন খোয়াতে হলো, জানতে পারি ?'

'হ্যাঁ, বলবো বৈকি। এবার আর বলতে আমার কোন লজ্জা নেই, আপনারা যখন দেখেই ফেলেছেন, তখন বলতে আর কি দ্বিধা বলুন!' অতঃপর সে তার হাত-পায়ের বুড়ো আঙুল হারানোর করুণ কাহিনী বলতে শুরু করলো। সেই কাহিনীর বিষয়বস্তু হলো এই রকম:

তার বাবা খলিফা হারুণ-অল রসিদের সময় বাগদাদের এক নামকরা সওদাগর ছিলেন। গান-বাজনা খুব প্রিয় ছিলো তাঁর। সেই সঙ্গে সুরা-রসিকও ছিলেন, তামাম দুনিয়ার সেরা সেরা সরাব কিনে আনতেন এবং ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে নিয়ে মৌজ করতেন। তখনকার নাম করা বাঈজীরা



আসতো তাঁর কাছে মুজরো করতে। এই ভাবে তাঁর অর্থের ভাণ্ডার একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়। মৃত্যুর পর এক পাহাড়-সমান দেনা তিনি আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বেহস্তে চলে যান একদিন। সেই দেনা আমি শোধ করি কেনা-বেচার কারবার শুরু করে। দামী দামী শাড়ীর দোকান ছিলো আমার।

তা একদিন আমার দোকানে এক সুন্দরী যুবতী এলো শাড়ী কিনতে খচ্চরের পিঠে চড়ে। সঙ্গে দুজন খোজা পাহারাদার। তার চোখ ঝলসানো রূপ দেখে আমি তাকে শাড়ী দেখানোর কথা বেমালুম ভুলে যাই। মেয়েটি আমার মনের খবর টের পেয়ে গেছে তৎক্ষণাৎ। মৃদু হেসে সে তার নাকাব টেনে দেয় মুখের উপরে মেয়েটি দারুণ রসিক। বলে, 'শাড়ী বেচবেন, নাকি কেবল আমার মুখ দেখেই আপনার ব্যবসাপত্তর চলবে ?'

লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ীর গাঁট খুলে তার পছন্দ মতো শাড়ী দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম অতঃপর। আমার দোকানের কোন শাড়ী তার পছন্দ হলো না।

মেয়েটি তখন অকর তার মুখের উপর থেকে নাকাব সরিয়ে বলে, 'শাড়ীর দোকান করেছেন, অথচ মেয়েদের কি পছন্দ তা জানেন না!'

আমতা আমতা করে আমি তখন বলি, 'দেখুন মালকিন, আমার পুঁজিপাটা অল্প, তাই দামী শাড়ী রাখার মতো সাধ্য আমার নেই। তাছাড়া আমার বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা তাই কম আর মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশাও বড় একটা করি না।'

মেয়েটি চোখে বিদ্যুৎ হেনে জিজ্ঞেস করে, 'কেন, শাদী করেন নি ?'

'না, মনের মতো মেয়ে আর পেলাম কোথায় বলুন যে শাদী করবো। তবে—'

'তবে কি ?'

'না এখন থাক পরে বলবো।'

মেয়েটি বোধহয় আমার মনের ঠিকানা পেয়ে গেছে ততক্ষণে। জেনে গেছে, আমার মনের মতো মেয়েকে আমি পেয়ে গেছি, সেই মেয়ে আমার সামনেই বসে আছে এখন। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমরা কেউই আমাদের মনের কথাটা কারোর কাছে খুলে বলতে পারলাম না। মেয়েটির হাবভাব দেখে মনে হলো, সে আমার মহব্বতে পড়ে গেছে। তাই আমি তাকে হারাতে চাইলাম না। পাশের দোকান থেকে দামী দামী শাড়ী এনে তাকে দেখালাম। কয়েক মুহূর্তে আমার অভিজ্ঞতা তখন খুব বেড়ে গেছে। সুন্দরী মেয়েদের কোন্ শাড়ী

বেশী পছন্দ সেই খবরটা আমার তখন জানা হয়ে গেছে। তা সে প্রায় পাঁচ হাজার দিরহাম দামের শাড়ী কিনলো।

কিন্তু কি আশ্চর্য দাম না দিয়েই শাড়ীগুলো বেঁধে সে তার খোজা পাহারদারের হাতে তুলে দিয়ে আপন খেয়ালে আমার দোকান থেকে বেরিয়ে যায়। লজ্জায় কিংবা অনুরাগে কেন কে জানে, আমি তার কাছ থেকে মুখ ফুটে দামটা চেয়ে নিতে পারলাম না। অগত্যা পাশের দোকানের মালিককে বলে এলাম, পরে তার শাড়ীর দাম আমি মিটিয়ে দেবো।

এক সপ্তাহ প্রায় শেষ হতে চললো, কিন্তু মেয়েটি এলো না। আমি তখন খুব চিন্তায় পড়লাম, পাশের দোকানের মালিককে টাকাটা ফেরত দেবো কি করে। যাইহোক, আমার বরাত ভালো যে, একেবারে সপ্তাহের শেষ দিনে সে এসে হাজির আমার হাতে সোনার গহনা তুলে দিয়ে বলে, 'এই নিন আমার আগের শাড়ীগুলোর দাম। এবার আমাকে আরো ভালো ভালো শাড়ী দেখান। যত দাম হোক না কেন, আমি কিনবো।'

সেবার সে প্রায় দশহাজার দিরহাম দামের শাড়ী পছন্দ করে নিয়ে গেলো। সেবারও সে নগদ দাম দিয়ে গেলো না। ভাবলাম, আগের শাড়ীগুলোর দাম যখন সে মিটিয়ে দিয়েছে, তখন আর কোন চিন্তা নেই। এবারের শাড়ীর দামও নিশ্চয়ই সে পরে একদিন মিটিয়ে দিয়ে যাবে।

হ্যাঁ সে এলো বটে, তবে একটু দেরীতে এবং তখন তার রূপ যেন আরো ফেটে পড়ছে। আমার মনে তখন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তার সেই রূপ। আমি তখন শাড়ী বেচবো, নাকি ওর সেই রূপের সাগরে ডুব দিয়ে সুখ উপভোগ করবো। আমার মনে তখন কেমন একটাই চিন্তা, সে আমার জান, আমার কলিজা। তাকে না ফেলে আমার মনে শান্তি নেই। কিন্তু তার মনটা জানিই বা কি করে? সে-ও যে আমাকে চায়, সে কথাটা জানি কি করে এখন? একটা মতলব সাথে সাথে মাথায় এসে গেলো তখন। মেয়েটির ঐ খোজা পাহারাদারটাকে কাজে লাগাতে হবে। তাকে একদিন আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার হাতে এক মুঠো দিরহাম গুঁজে দিয়ে বলি, 'শোনা, তোমার ঐ মালাকিনকে আমি দারুন ভালোবেসে ফেলেছি। এখন তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, তাকে আমার মহব্বতের কথা জানাতে হবে। এবং তার দিলের খবর আমাকে পৌঁছে দিতে হবে। তা বলে তাড়াহুড়ো করো না যেন। তোমার মালকিনের মেজাজ খুশ থাকলে তবেই আমার প্রস্তাবটা তাঁকে জানাবে, তা না হলে সমস্ত ব্যাপারটা কেঁচে যেতে পারে।'

'না, সে ভাবনা নেই হুজুর।'

'তার মানে?'

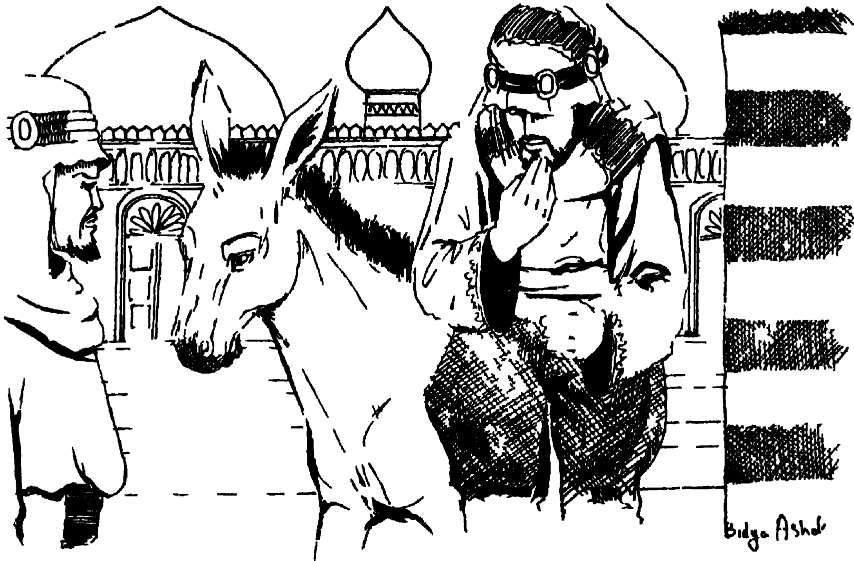
সে তখন একচোট খুব হেসে নিয়ে বলে, 'আমার মালকিন সেই প্রথম দিনেই আপনার মহব্বতে পড়ে গেছে হুজুর। আপনি সত্যি ছেলেমানুষ তাই বুঝতে পারেননি। ওঁর শাড়ীর কি এমন অভাব যে আপনার দোকানে এসে বারবার দামী দামী শাড়ী কিনে নিয়ে যায়? আসলে কি জানেন? আপনাকে দেখার লোভটা সামলাতে পারছেন না বলেই তিনি শাড়ী কেনার অছিলায় আপনার দোকানে আসেন তিনি।' একটু থেমে সে আবার বলে, 'ঠিক আছে হুজুর, আমি আপনাদের মিলনের ব্যবস্থা করে দেবো। যত শীগ্‌গীর সম্ভব, আমার মালকিনের মনের খবর আপনার কাছে পৌঁছে দিয়ে যাবো।'

তারপর বেশ কয়েকদিন কেটে গেলো, সেই খোজাটা কিন্তু আর ঘোড়ার পিঠে চড়ে খোঁজে আসে না। রোজই ভাবি, আজ সে আসবে তার মালকিনের শুভবার্তা আমাকে জানাতে। সেই টানাপোড়েনে চোখে ঘুম নেই, ভালো করে খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে গেছি, ভুলে গেছি আমার

ব্যবসার কথা। দোকানে যাই নামমাত্র, মেয়েটিকে আমার চাই, একান্ত আমার কাছে, আমার বিবি হিসেবে। অপেক্ষা করি সেই শুভ দিনটির জন্য। তখন আমাদের শাদীর কবুল-নামা লিখবে মৌলভী সাহেব।

যাইহোক, আমার সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে সেই খোজাটা এলো। আমাকে সে ইঙ্গিতে শুভ খবরটা সে জানিয়ে বলে, 'আমার মালকিন রাজী। শাদীর দিন ঠিক করতে আপনাকে ডেকেছেন মালকিন।'

'তাই নাকি?' উচ্ছসিত হয়ে বললাম, 'ঠিক



আছে, আজই তোমার মালকিনের সঙ্গে আমি দেখা করছি।' একটু থেমে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা তোমার এই মালকিন মেয়েটি কে বলো তো?'

খলিফা হারুন-অল রসিদের এক বেগম জুবেদার পালিতা কন্যা তাঁর বড় আদরের কন্যা। ধনীর দুলালীর মতোই আচরণ তার। বেগম জুবেদাকে মেয়েটি তার অভিপ্রায়ের কথা জানিয়েছে, সে আমাকে শাদী করতে চায়। বেগম সাহেবা তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তাদের সাদীকে তার কোন আপত্তি নেই। তবে বাগদাদের সেই তরুণ যুবকটিকে তিনি একবার নিজের চোখে দেখতে চান। তাঁর পছন্দ হলেই তবে তাদের শাদীর ব্যবস্থা তিনি করবেন।

কথা হলো, বেগম জুবেদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে সে। সন্ধ্যায় জুবেদার তৈরী মসজিদের সামনে অপেক্ষা করবে সে। তারপর জুবেদা এসে যা করবার করবেন।

তা সেই বাগদাদের তরুণ সওদাগরকে প্রথম দর্শনেই কেমন ভালো লেগে গেলো। এবং তিনি তাকে তাঁর হারেমে নিয়ে গিয়ে তুললেন। ঠিক হলো তাদের শাদী হবে দশদিন পরে। খলিফা হারুণ অল রসিদের সম্মতিও পাওয়া গেলো।

নির্দিষ্ট দিনে মৌলভী এলো, এলো সাক্ষীরা। শাদীর কবুল-নামা লেখা হলো। সেই তরুণ সওদাগরের সঙ্গে মেয়েটির সাদী হয়ে গেলো সাক্ষী-সাবুদ রেখে।

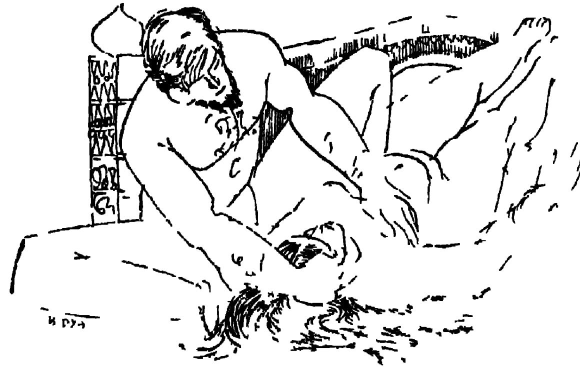
শাদীর পর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সম্মানে জুবেদা বিরাট ভুরি-ভোজের আয়োজন করে রেখেছিলেন।

হরেক রকম নমুনার খাবারের ডিসের সঙ্গে রসুনের বিরিয়ানিও ছিলো। রসুনের বিরিয়ানি আমার খুব প্রিয় আগেই আমি বলেছি, কব্জি ডুবিয়ে খেলাম। খাওয়ার পর রুমাল দিয়ে হাত মুছে নিলাম, কিন্তু পরে হাত ধুতে ভুলে গেলাম।

তারপর এক সময় আঁধার নেমে আসে, প্রাসাদের চিরাগবাতিগুলো জ্বলে ওঠে এক এক করে। আমার বিবির সহচরীরা তাকে প্রাসাদের এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে ঘুরিয়ে এনে সব শেষে আমার ঘরে নিয়ে এলো। সেই ঘরেই আমাদের মধুযামিনী যাপন করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিরাট পালঙ্ক ফুলে ফুলে ঢেকে রাখা হয়েছিল। আতরের খুসবু ম-ম করছিল সারা ঘর ময়, একটা মিষ্টি সুবাসে তাকে প্রথম এতো কাছে পাওয়া। তার ঠোঁটের উপরে আমার ঠোঁটটা নামিয়ে আনতে গেলে আমার হাত এবং মুখ থেকে রসুনের গন্ধ তার নাকে যেতেই হঠাৎ এক ঝটকায় আর্ত চিৎকার করে উঠলো। মুহূর্তে তার সেই চিৎকার শুনে ক্রীতদাসী ছুটে এলো যে যেদিকে ছিলো। আমি তখন ভয়ে কেঁপে উঠলাম, কি জানি কি অপরাধ আমি করলাম, ভেবে পেলাম না।

ক্রীতদাসীরা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে মালকিন, আপনি চিৎকার করলেন কেন?'

প্রত্যুত্তরে সে তখন বলে, 'এই পাগলটাকে অন্যত্র নিয়ে যাও ; আমি ভেবেছিলাম, লোকটার বোধশক্তি আছে।'



আমার মন তখন অপরিসীম আনন্দে ভরে উঠেছিল।

শাদীর রীতি মতো সহচরীরা তাকে বিবস্ত্র করে পালঙ্কের উপরে শুইয়ে দিয়ে ঘর থেকে চলে যায় এক সময়। আমার বিবি ছাড়া ঘরে আমি তখন একা। আমার মন তখন ঐক অদ্ভুত আনন্দে দুলে উঠলো, আমার চোখের সামনে সদ্য বিবাহিতা আমার বিবির নগ্ন দেহের হাতছানি আমাকে ভীষণ ভাবে দুর্বল করে তুললো, আমার ভিতরের পৌরুষ তখন গর্জে উঠলো। আমি তখন বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তার নগ্ন দেহটা আমার বুকের মধ্যে সজোরে টেনে নিলাম। সেই আমাদের প্রথম মিলন রাত্রি, আমি তখন তার কাছে জানতে চাইলাম, কি কারণে সে আমাকে পাগল ঠাওড়ালো!'

'পাগল নয়তো কি? রসুনের বিরিয়ানি খেয়ে যে লোক হাত মুখ ধুতে ভুলে যায়, পাগল ছাড়া তাকে অন্য আর কি ভাবা যেতে পারে? এই অবস্থায় আমাকে তোমার শয্যা-সঙ্গিনী হিসেবে পেতে লজ্জা করে না?'

তারপর সে পাশ থেকে একটা চাবুক তার হাতে তুলে নিয়ে বেধরক মারলো আমার পিঠের উপরে, সপাং-সপাং—যতক্ষণ না সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শেষ দিকে আমার জ্ঞান ছিলো না। এক সময় সে তার

ক্রীতদাসীদের হুকুম করলো, 'যাও একে কোটাল সাহেবের কাছে নিয়ে যাও, রসুনে বিরিয়ানি খাওয়া হাতটা কেটে দিতে বলো তাকে।'

আমার তখন জ্ঞান ফিরে এসেছিল। কথা শোনা মাত্র আমি তখন অনুযোগ করে তাকে বলি, 'তুমি আমার হাত কেটে নেওয়ার আদেশ করছো বিবি-জান? রসুনের বিরিযানি খেযে হাত ধুইনি, এই অপরাধের জন্যে তো?'

আমার হয়ে ক্রীতদাসীরাও তাকে অনুরোধ করে, 'মালকিন, এই লোকটা অতি সরল মানুষ, এটা তার প্রথম অপরাধ, এর জন্য এতো বড শাস্তি ওকে দেবেন না।'

'কোন উপায নেই। এ সবই আল্লাহর ইচ্ছা, শাস্তি ওকে পেতেই হবে।'

তারপর সে ঘর থেকে সেই যে বেরিয়ে গেলো, দশদিন আর দেখা নেই। সেই দশদিন ক্রীতদাসী-দের মারফত আমার খাবার সে পাঠিয়ে দেয়। দশ দিন পরে আমার ঘরে এসে সে বলে, 'রসুনের খাবার খেযে হাত না ধোযার উচিত শিক্ষা আজ তোমাকে দেবো।'

এই বলে সে তার ক্রীতদাসীদের হুকুম করলো আমার হাত-পা বেঁধে ফেলার জন্য। তারপর সে নিজের হাতে একটা ধারালো ক্ষুর দিযে আমার হাত ও পাযের বুড়ো আঙুলগুলো কেটে দেয়, যা আপনারা এই মাত্র দেখলেন। তখন আমি তার কাছে শপথ নিই, রসুনের কোন খাবার খাওযার পর চল্লিশ বার করে সোডা, সাবান এবং পটাশ দিযে হাত ধুযে তার কাছে যাবো। এই কারণে আপনারা আমাকে রসুনের বিরিয়ানি খেতে বললে আমি প্রথমে আপত্তি করেছিলাম।

আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করি, 'তারপর তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি রকম দাঁড়ায।'

'শপথ নেওয়ার পর তার রাগ পড়ে যায় এবং তারপর থেকে আমরা দুজন এক সঙ্গে একই পালঙ্কে শুই এবং তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো সহবাস করি।'

'জাঁহাপনা', বাবুর্চি বললো, 'এতক্ষণ আপনি বাগদাদের সেই তরুণ সওদাগরের কাহিনী তো শুনলেন। এবার আমার কাহিনী শুনুন। গতকাল সেই নিমন্ত্রণ সেরে রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাড়ি ফিরে এসে এই কুঁজো লোকটার মরা লাশ নিয়ে যে ঝামেলায পড়েছিলাম, তা তো আপনি সবই শুনলেন। এখন বলুন, আমার গল্প আপনার কেমন লাগল?'

'না হে বাপু, আমি অতি দুঃখের সঙ্গে বলতে



বাধ্য হচ্ছি, তোমার গল্পটাও আমার মনে একটুও দাগ কাটতে পারেনি। বরং আমার ঐ কুঁজো লোকটা তোমাদের থেকে অনেক বেশী ভালো গল্প বলতে পারতো। তোমরা এখনো তার কাছে শিশু-পুত্র মাত্র তোমাদের জন্য মাথা হচ্ছে, ফাঁসীর দড়িতে তোমাদের সবাইকে ঝুলতেই হবে, দেখে শুনে মনে হচ্ছে, তোমাদের এ যাত্রায বাঁচার কোন পথ নেই। তোমাদের সবাইকে মরতেই হবে—'

তখন ইহুদি হেকিম দেখলো চীনা-বাদশাহ মশাই যা জেদী, তাতে তার হাত থেকে বাঁচার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। ইহুদী হেকিম আবার এও ভাবলো, যদি তার সত্য ভাষণে এতগুলো লোকের জীবন রক্ষা করা যায, তাতে মন্দ কি।

এই সব কথা ভেবে সে তখন চীনা বাদশাহের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললো, 'জাঁহাপনা আমার মনে

হয়, আমার কাহিনী আরো বেশী সরস, আরো বেশি চমৎকার, আপনার ঐ কুঁজো লোকটির কাহিনীর থেকেও রোমাঞ্চকর। অবশ্যই আপনার ভালো লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে ধৈর্য ধরে শেষটুকু না শোনা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করবেন।'

'বেশ তো', চীনা বাদশাহ এবার বলেন, 'তুমি এবার তোমার গল্প বলো আমি শুনি—'

ইহুদী হেকিমের কাহিনী

সেই আশ্চর্য ঘটনাটার কথাটা আমি আমার তরুণ বয়সে শুনেছিলাম। আমি তখন সিরিয়ার দামাস্কাস শহরে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যায়ণ শেষ করে গবেষণার কাজ করছি, সেই সময়ে একদিন সেখানকার নগর-পালের পেয়াদা এসে জানায়, তার সঙ্গে আমাকে একবার যেতে হবে।

বিরাট প্রাসাদ। প্রাসাদের এককক্ষে সোনার পাত মোড়ানো দামী একটা পালঙ্কে শুয়েছিল একটি সুপুরুষ যুবক। আমার রুগী সে। তার অসুখের কথা তাকে জিজ্ঞেস করতে নীরবে চোখের ইশারায় সে জানায় তার খুব অসুখ। আমি তখন তার হাত দেখতে চাই। চাদরের নিচ থেকে সে তার বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে দিলে পর আমি যুগপত বিস্মিত এবং বিরক্ত হলাম। এমন এক সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র সামান্য একটু ভদ্রতাও জানে না? নাড়ি দেখার জন্য হেমিককে ডান হাতের বদলে বাঁ-হাত কেউ দেখায় নাকি? যাইহোক আমি আমার ক্ষোভ দমন করে তার বাঁ-হাতের নাড়ি টিপে দাওয়াই লিখে চলে আসি সেই প্রাসাদ থেকে। তারপর পর পর দশদিন সেই প্রাসাদে যেতে হয় আমাকে। তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে আমার চিকিৎসায়। নগরপাল তখন খুশি হয়ে আমাকে যথোপযুক্ত ইনাম দিলেন তাঁর পুত্রের অসুখ মোটামুটি সারিয়ে তোলার জন্য। এবং আমাকে দামাস্কাস শহরের হাসপাতালের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করলেন, যা আমার কল্পনাতীত ছিলো। সেই তরুণ বয়সে এত বড় সম্মান লাভ করা তকদিরের কথা।

যাইহোক, দশদিনের দিন যুবকটির স্নানের ব্যবস্থা করলাম। নগরপালের বিশেষ অনুরোধে আমাকে তার স্নানের তদারক করতে হলো। গৃহ-ভৃত্যেরা তাকে হামামে নিয়ে গিয়ে তাকে বসনমুক্ত করতেই আমি চমকে উঠলাম, সব বিস্ময় যেন অপেক্ষা করছিল সেখানে। যুবকটির ডান হাতটা কাটা, সদ্য বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল তার দেহ থেকে, এবং সর্বাঙ্গে চাবুকের দগদগে ঘা থিকথিক করছিল। তার অসুখের প্রকৃত কারণটা আমার ততক্ষণে জানা হয়ে গেছে। আমি তখন যুবকটির মুখের পানে তাকাই তার মুখ থেকে প্রকৃত ঘটনার কথা শোনার জন্য।

তার ঠোঁটে ম্লান হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'আপনি খুব অবাক হযে গেছেন হেকিম সাহেব, তাই না? আমার এ অবস্থার জন্য প্রকৃত কারণ আপনাকে সব খুলে বলবো।' যুবকটি করুণ সুরে বলে, আপত্তি না থাকলে আমার ঘরে চলুন, সেখানে নিরিবিলিতে আমার দুঃখের কাহিনী আপনাকে শোনাবো।'

অতঃপর হামাম থেকে ফিরে গিয়ে যুবক তার শয়নকক্ষে আমাকে একা পেয়ে তার জীবনের সব থেকে করুণ কাহিনী বলতে শুরু করলো।

মসুল শহরে এক খানদানি পরিবারে আমার জন্ম। আমার ঠাকুর্দার নয় ছেলে। ঠাকুর্দা মারা যাওয়ার আগেই সব ছেলেদের শাদী দিয়ে যান। আমার আব্বাজান বাড়ির বড় ছেলে এবং আমিই আমাদের বংশের একমাত্র পুত্র, আমার চাচাদের কারোরই ছেলে ছিলো না। তাই সবাই আমাকে খুব পেয়ার করতো।

একদিন আমার বাবা এবং চাচারা পরামর্শ করে ঠিক করলেন, বাণিজ্যে বেরোবেন তাঁরা। আমিও তাঁদের সঙ্গে বিদেশে যাবো, আবদার ধরতে প্রথমে তাঁরা একটু আপত্তি করেন, পরে অবশ্য রাজী হয়ে যান। ঠিক হলো প্রথমে আমরা যাবো মিশরের নীল নদের তীরে কায়রো শহরে। নীল নদের মনোরম শোভার কথা আমার অজানা নয়। কায়রো শহরের প্রাকৃতিক শোভা আমাকে হাতছানি দিচ্ছিল তখন।

একদিন আমরা সবাই রসুল ছেড়ে দামাস্কাসের পথে রওনা হলাম। প্রথমে গেলাম আলেপ্পো শহরে। সেখান থেকে দামাস্কাস শহরে। দামাস্কাস শহরটা আমার কাছে বেহস্ত বলেই মনে হলো যেন। সামনে স্রোতস্বিনী নদী, প্রাকৃতিক শোভা যেন অকৃপণ হাতে আল্লাহ দান করেছেন সেই শহরের চারধারে। আমি মুগ্ধ হলাম। শহর থেকে অনেক দূরে একটা সরাইখানায় গিয়ে উঠলাম, আর আমার আব্বাজান এবং চাচারা শহরের ভিতরে ঢুকে গেলো বাণিজ্য করতে।

চাচারা একদিন বাণিজ্য সেরে ফিরে এলো আমার সরাইখানায। সওদা করতে অন্য শহরে যেতে চান তাঁরা এবার। আমি কিন্তু তখন দামাস্কাস শহরের মহব্বতে পড়ে গেছি, তার প্রাকৃতিক শোভা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে মন চাইছিল না তখন। আমি আমার মনের অভিপ্রায়ের কথা তাঁদের জানাতে তাঁরা আমাকে আমার বাণিজ্যের লাভের প্রাপ্য টাকাটা আমার হাতে তুলে দিয়ে পরবর্তী শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কথা হলো, পরে এক সময় আমি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবো।

তারপর আমি সেখানে নদীর ধারে একটা সুন্দর সুসজ্জিত শাদা মার্বেল পাথরের বাড়ি ভাড়া নিলাম। ফুলের বাগিচায় বাহারী ফুল। সামনে কল কল শব্দে আপন বেগে নদী বয়ে যায়। সেই মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার মন ভরে যায় খুশিতে। মনের আনন্দে একা একা গান গাই এবং দিন গুজরাতে মদ আর মাংস খেয়ে যাই পেট ভরে।

একদিন বাড়ির বাইরে বাগিচায় বসে আছি, হাতে সরাবের গ্লাস, সামনে প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করছি, সেই সময় আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সুন্দর একটি মুখ। সে মুখ এক এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীর, তার সারা অঙ্গে যৌবনের ঢল নেমেছে, সে ঢলে আমার চোখ পিছলে যায়। আমি তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে বসালাম। আশ্চর্য তার কোন সংকোচ, কোন দ্বিধা নেই। বাড়িতে আমি একা এক পুরুষ, এবং সে যুবতী, ভয়-ডর বলে কিছু নেই তার। আমি তাকে বোরখাটা খুলে ফেলতে বললাম। বোরখাটা সে তার দেহ থেকে সরাতেই তার সত্যিকারের রূপ আমার চোখে ঝলসে উঠলো। মুগ্ধ চোখে অনেকক্ষণ তার মুখের উপর থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারলাম না। মেয়েটি এবার কলকলিয়ে হেসে উঠলো, কাছেই স্রোতস্বিনী নদীর কলকল শব্দ। নারী এবং প্রকৃতি যেন মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেলো তখন আমার কাছে। আমি তখন জেনে গেছি, আকাশের চাঁদ আমার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। এ মেয়ে আমার, আমার যৌবনের সাথী হতে যাচ্ছে। আমি তাকে যখন যে ভাবে খুশি

ব্যবহার করতে পারি, তাতে কোন আপত্তি করবে না সে। সে যেন নিজেকে থেকে বিলিয়ে দিতে এসেছে আমার কাছে।

সে তখন খাটের একপাশে অবশ হয়ে অবস্থায় পড়েছিল। স্বচ্ছ পোশাকের ভাঁজ থেকে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুন্দর দুটি গোলাপ ফুটে রয়েছে তার বুকে পাঁপড়ি মেলার অপেক্ষায়। ইচ্ছে হয় তার সু-উচ্চ বুকের চূড়ায় ঠোঁট রেখে পড়ে থাকি। আমার শরীরের মধ্যে যেন টানি অনুভব করি। শেষে থাকতে না পেরে তাকে আমার বুকের মধ্যে টেনে নিই। সে আমার মুখটা তার ঠোঁটের উপর চেপে দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে। একটা মিষ্টি সুবাসের ঘ্রাণ লাগে আমার নাকে। তারপর স্বপ্নাবিষ্টের মতো আমরা কখন যে এ ওর দেহের সঙ্গে মিলে যাই খেয়াল ছিলো না। চরম সুখ-তৃপ্তির আবেগে আমাদের দু'টি নগ্ন দেহ এক সময় থরথর করে কেঁপে উঠে শান্ত হয়ে যায় একটু একটু করে। আমার জীবনে সেই প্রথম নারী দেহের স্বাদ পাওয়া। সে তখন এক অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে মন চাইছিল না।

তবু সেদিনের মতো আমার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আমি তার হাতে দশটি সোনার মোহর উপহার দিতে গেলে মৃদু হেসে মেয়েটি বলে, গতকাল রাতে তুমি আমাকে যে সুখ দিয়েছো তা কখনো পয়সা দিয়ে কেনা যায় না, অমূল্য। মোহর গুলো তুমি রেখে দাও আপাততঃ। এগুলো নিয়ে আমি কি করবো। আমি তোমাকে চাই, ওগো, তুমি যে আমার দিলকা কালজা।' একটু থেমে সে তার আয়ত চোখ দুটি তুলে পনেরোটি দিনার আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, 'এগুলো তোমার কাছে রেখে দাও, তিনদিন পরে আবার আসবো তোমার কাছে। আজকের মতো খাবার আর সরাবের ব্যবস্থা করে রেখো, আমি আসবো।'

সে আমাকে বিদায় চুম্বন দিয়ে সেদিনের মতো বিদায় নিলো আমার কাছ থেকে। মেয়েটি আমার কাছ থেকে চলে গেলো, সে আমার আদর আর মহব্বত নিয়ে গেলো বটে, তবে তার থেকে অনেক বেশী আমাকে দিয়ে গেলো। আমার সারা মন, সারা দিল সে ভরিয়ে রেখে গেলো, বা সে চলে যাওয়ার পরেও আমার সারা মনে একটা চেনা শায়েরীর সুরের মতো গুনগুনিয়ে উঠতে থাকে।

তিনদিনের দিন আবার এলো মেয়েটি। আমার চোখে সেদিন সে যেন আগের দিনের থেকে আরো বেশি সুন্দর রূপ নিয়ে হাজির হলো। আমি মুগ্ধ, আমি তৃপ্ত তার রূপের সুধা পান করে। সারা রাত তার সেই সুধা পান করেও এতটুকু বিস্বাদ কিংবা বিরক্তি লাগলো না। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই আগের দিনের মতো পনেরোটি সোনার মোহর আমার হাতে তুলে দিয়ে তিনদিন পর আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যায় সে। তার সেই মোহিনী রূপ, উচ্ছল যৌবনের পরশ পাওয়ার প্রতীক্ষায় দিন গুণতে থাকি।

তিন দিন পরে সে আবার এলো, এলো আরো বেশী মোহিনী রূপ নিয়ে, উদ্দাম যৌবনে আমার চোখ ঝলসে দিয়ে। সেদিন তার দেহ সম্ভোগের কথা যেন ভুলেই গেলাম, আমার তখন কেবলি মনে হচ্ছিল, তাকে আমার চোখের সামনে রেখে তার সেই রূপের সাগরে ডুব দিয়ে অতল গভীরে তলিয়ে যাই, নিজেকে হারাই তারই মাঝে।

'অমন করে কি দেখছো প্রিয়তম?' কাঁপা কাঁপা অধর আমার ঠোঁটে ঠেকিয়ে সে শুধায়, 'তোমার কি মনে হয় সত্যিই আমি খুব সুন্দরী?'

'হ্যাঁ, প্রিয়তমা, আল্লার দোহায় তামাম দুনিয়ার সব রূপ যেন তোমার মাঝে আমি প্রত্যক্ষ করছি? অন্য কোন নারীর রূপে এ মন আমার ভুলবে না কখনো।' তাই নাকি?' মেয়েটি মুচকি হেসে বলে, 'এরপর আমি যখন তোমার কাছে আসবো,

অনুমতি দিলে আমার থেকেও এক অপরূপ সুন্দরী এবং আমার থেকেও কম বয়সী একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আনতে পারি। সে বড় নিঃসঙ্গ, একা, তার ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে একটি রাত সে কাটায়।'

অনিচ্ছা সত্বেও তার অনুরোধ আমি ফেরাতে পারলাম না। সে আমাকে খুশি করবার জন্য সেই রাতে অন্য আর এক মোহিনী রূপে আমার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিলো, অন্য এক মন নিয়ে আমাকে আদর আর সোহাগে ভরিয়ে দিলো আমার সারা মন, সারা দেহ। সেই সোহাগের রাত আমি জীবনে কোনদিন বোধহয় ভুলতে পারবো না।

পরদিন সকালে যথারীতি আমার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আমার হাতে আরো পনেরোটি মোহর তুলে দিয়ে বলে গেলো, পরেরবার সেই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে আসবে সে।

চারদিনের দিন পর যথারীতি সব আয়োজন সমাপ্ত করে অপেক্ষা করতে থাকি সূর্যাস্তের জন্য। আঁধার নেমে এলে সে এলো, বোরখায় আপাদ-মস্তক ঢাকা একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। তারা আসন গ্রহণ করলে তাদের দিকে তাকিয়ে গুণগুণিয়ে উঠলাম একটি মহব্বতের শায়েরী :—



মহব্বত কাকে বলে জানি না,
আমার মনের দুয়ার খুলে
যখন তুমি এলে,
মগন ছিলাম, তখন তুমি আমার ছিলে
কল্পনা
তোমার নাকাবের আড়ালে ঐ রূপ আমি
দেখেছি কল্পনায়,
আমার মনের আঙিনায় পূর্ণিমার চাঁদ।
এসো সুন্দরী, আসমান থেকে নেমে
এসো,
তোলো এবার নাকাব তোলো,
তোমার রূপ-সাগরে ডুব দিতে চায় যে
আমার মন,
মহব্বত কি কসুম, আমার জান,
দিল দিয়ে ছাখো,
সুখ দেবো, দেখাবো তোমায় আমি নতুন
জীবনের আলো।

এক সময় আমার অনুরোধে নতুন মেয়েটি তার মুখের উপর থেকে নাকাবটা সরিয়ে ফেলতেই আমার কল্পনা একটা বাস্তব রূপ নিলো। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো সুন্দর আলো ঝলমল একটা চাঁদ আমার চোখের সামনে ঝলসে উঠল। আমি তার সেই অপরূপ রূপ দেখে বিস্মিত, বিভোর। ওদিকে আমার প্রেয়সী তখন মুখ টিপে হাসছে। তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই আমার সেই বিভোর ভাবটা নিমেষে উধাও হয়ে যায়। ছিঃ এ আমি কি করছি। নতুন একটা মেয়ের সান্নিধ্যে আসা মাত্র আমি তাকে ভুলে গেলাম। অথচ চারদিন আগেও সে আমার কাছে একমাত্র সুন্দরী মেয়ে হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। এরই মধ্যে আমি আমার দিলুকা কলিজাকে ভুলে গেলাম! একেই বলে বোধহয় পুরুষের মন। মেয়েটি সেদিন ঠিকই বলেছিল, দেখো আমার সঙ্গী মেয়েটির রূপ দেখে আমাকে যেন ভুলে যেও না, তাহলে সে দুঃখ আমি সহ্য করতে পারবো না। না, না, সে ভুল আমি করবো না। মনটাকে শক্ত করে এবার কাজে মন দিলাম।

টেবিলের উপরে রাতের খাবার আগেই সাজিয়ে রেখেছিলাম। প্রথমে সরাব দিয়ে শুরু হলো। তারপর খানাপিনা সেরে আমরা তিনজনে খোসগল্পে মেতে উঠলাম। নতুন মেয়েটির হাতে সরাবের পাত্র



তুলে দেওয়ার আগে আমি প্রথমে একবার চুমুক দিয়ে নিলাম, আমার প্রেয়সীর দৃষ্টি এড়ায় না। আড়চোখে দেখলাম, তার মুখটা কেমন কালো হয়ে গেলো। সেই মুহূর্তে সে যেন তার সব রূপ, সব সৌন্দর্য হারিয়ে ফেললো আমার চোখে।

শুতে যাওয়ার সময় সে আমাকে একটা অদ্ভুত কথা শোনালো, 'আমার বন্ধুটি আমার থেকেও বেশ সুন্দরী তাই না?'

'হায় আল্লাহ—' অস্ফুট কোন রকমে বললাম, এই মুহূর্তে আমার মনের সঠিক ঠিকানা আমার প্রেয়সীকে জানানো যায় না। মেয়েরা বোধহয় পুরুষদের, বিশেষ করে তার প্রেমিকের মনের খবর ঠিক পেয়ে যায়। যে ভাবেই হোক সত্যি কথা বলতে কি নতুন মেয়েটি আমাকে তখন প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তার রূপের কাছে আমার প্রেয়সীর রূপ যেন অতি জোলো বলে মনে হচ্ছিল তখন তারপর সে আমার মনের কথাটাই যেন বলে দিলো।

'আমার বন্ধু আজ তোমার নতুন অতিথি, তাই আমার ইচ্ছে, আজ রাতে ও তোমার শয্যা-সঙ্গিনী হোক।'

এই বলে সে নিজের হাতে আমাদের বিছানা সাজিয়ে দিয়ে নিজে জমিনের উপর আলাদা বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। নতুন মেয়েটিকে আমার পাশে শুইয়ে যৌবনের খেলায় আমরা মেতে উঠলাম দুজনে। নিঃশব্দে নতুন মেয়েটি আমার সব কাজে আশ্চর্য ভাবে সহযোগিতা করলো কোন বাধা পেলাম না তাকে সম্ভোগ করতে গিয়ে। ঘুমিয়ে পড়া না পর্যন্ত আমরা কেউ কারোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলাম না। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি খেয়াল নেই।

সকালে ঘুম ভাঙলো এক আশ্চর্য অনুভূতির মধ্য

দিয়ে। ডান হাতটা কেমন যেন হাল্কা হাল্কা ঠেকছিল, সেই সঙ্গে ভিজে ভিজে বলেও মনে হলো। ভালো করে তাকাতে গিয়ে দেখি আমার হাত ভর্তি রক্ত, রক্ত বালিশে, বিছানায়। এবার আমার হুঁস হলো, নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটেছে, এ খোয়াব নয়! কি খেয়াল হলো, নতুন মেয়েটির দিকে ফিরে তাকাতে গিয়েই চমকে উঠলাম। তার কাঁধে চাপ চাপ রক্ত তখন লেগেছিল, মাথাটা তার ঘর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, প্রাণহীন তার দেহটা পালঙ্ক থেকে ঝুলে ছিল। সেই পৈশাচিক দৃশ্যটা দেখামাত্র পাগলের মতো আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'আল্লাহ্, আমাকে রক্ষা করুন!'

অতঃপর ত্রস্ত পায়ে পালঙ্ক থেকে নেমে আমি তখন আমার প্রেয়সীর খোঁজ করলাম। মেঝের বিছানা শূন্য। তখন আমি ঘরের বাইরে এলাম, সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও তার দেখা পেলাম না। তখন আমার বুঝতে আর বাকী থাকলো এমন নিষ্ঠুর কাজ তারই! হিংসায় উন্মত্ত হয়ে এমন একটা নিষ্ঠুর কাজ সে করে ফেলেছে। নিজের মনে তখন বলি, এখন উপায়? মেয়েটিকে নিয়ে আমি এখন কি করি? কোটাল সাহেব খবর পেলে আমাকে নিশ্চয়ই শূলে চড়াবেন। তাহলে?

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। বাগিচার ঠিক মাঝখানের মাটি খুঁড়ে মেয়েটিকে তার দামী অলঙ্কার এবং পোষাক সমেত কবর দিলাম। সাবধানে তার মৃতদেহটা মাটির গর্তে শুইয়ে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দিলাম। এরপর হামামে ঢুকে গোসল সারলাম ভালো করে। ভালো করে তাকিয়ে একবার দেখে নিলাম, দেহের কোথাও রক্তের দাগ লেগে আছে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে নতুন পোষাক চাপিয়ে নিলাম গায়ে। তারপর বাড়ির মালিকের বাড়িতে গিয়ে তাকে এক বছরের আগাম ভাড়া দিয়ে বললাম, 'আমি এখন চললাম কায়রোয় আমার চাচাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য!'

চাচারা তখন কায়রোয় নীল নদের ধারে তাদের বাণিজ্যের ইতি টানতে ব্যস্ত, হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে তারা তখন দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিল। আমাকে দেখে খুব খুশি হলো তারা। ওদিকে আমার রেস্তও ফুরিয়ে এসেছিল, টাকার দরকার ছিলো। তারা দেশে ফিরে গেল যথা সময়ে। আমি থেকে গেলাম কায়রোয়। পুরো তিনটি বছর সেখানে কাটালাম, মাঝে মাঝে দামাস্কাসের বাড়িওয়ালাকে সেখানকার বাংলোর ভাড়া পাঠিয়ে দিই।

একদিন দামাস্কাসে ফিরে গেলাম, বাড়িওয়ালা আমাকে দেখে মহাখুশি। আমার হাতে বাংলোর চাবি তুলে দিয়ে বলে, 'আপনি এসে গেছেন, এবার আপনার ঘর আপনি সামলান।

বাংলোয় ফিরে গিয়ে দরজা খুলে দেখলাম, আমার সব সামানপত্তর ঠিক ঠিক পড়ে আছে, কিছুই খোওয়া যায়নি। বিছানায় তেমনি কার্পেট বিছানো রয়েছে, কেবল এক পুরু ধুলো জমেছে, এই যা। তিন বছর সাফ-সুফ হয়নি, ধুলোর জমাই কথা। ধুলো সাফ করার জন্য কার্পেটটা তুলতেই দেখি একটা ভারী সোনার নেকলেস পড়ে রয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, সেটা সেই নতুন মেয়েটির। আমার শয্যা-সঙ্গিনী হবার আগে বোধহয় সে তার গলা থেকে খুলে সেটা কার্পেটের নিচে রেখে গিয়ে থাকবে। নেকলেসের উপর থেকে রক্তের দাগ মুছতে গিয়ে কিছুক্ষণ নিজের মনে কাঁদলাম। আমার তখন টাকার খুব দরকার ছিলো। সোনার নেকলেসটা বিক্রী করার কথা ভাবলাম। কিন্তু কে জানতো, অলক্ষে শয়তান তখন হাসছিল।

নেকলেসটা দালালের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাতে যাচাই করে সে জানায় যে, এটা নকল, তামার তৈরী। আসল সোনার হলে দু'হাজার দিনহাম দাম

হতো, কিন্তু নকল বলে এর দাম একহাজার দিরহাম দেওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।'

হ্যাঁ তা হতে পারে, 'আমি তখন মিথ্যে বানিয়ে তাকে বললাম, 'ফ্রাঙ্কফুর্টের এক নকল অলঙ্কারের দোকান থেকে কেনা, আমার এক বান্ধবীকে উপহার দিয়েছিলাম তার মন ভোলানোর জন্য। কিন্তু সেই মেয়েটি একদিন মারা যায়, মারা যাওয়ার আগে নেকলেসটা আমার স্ত্রীকে ফেরত দিয়ে যায় সে। তাই এখন আমরা এটা বিক্রী করতে চাই।' একটু থেমে বললাম, 'ঠিক আছে, এটা বিক্রী করে আপনি আমাকে ঐ এক হাজার দিরহামই এনে দিন—'

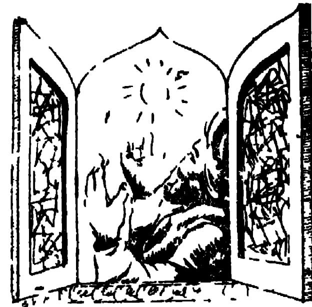
ওদিকে ভোর সমাগত দেখে শাহারাজাদ তার গল্প অসমাপ্ত রেখে চুপ করলো।

পরদিন রাত্রে শাহরাজাদ আবার তার কাহিনী শুরু করতে গিয়ে বলে, 'তারপর কি হলো জানেন জাঁহাপনা? সেই যুবকটি তো দালালকে এক হাজার দিরহামে নেকলেসটা বিক্রী করার জন্য অনুরোধ করলো। আসলে সেই নেকলেসটা খাঁটি সোনার ছিলো। তাই দালালের কেমন সন্দেহ হলো। এতো সস্তায় কেন সে সেটা বিক্রী করতে চাইছে? সে তখন যুবকটিকে তার দোকানে বসতে বলে বাজারে চলে যায়। দালালদের সর্দারকে দেখায় সেই নেকলেসটা। সর্দার তখন সেটা নিয়ে যায় নগর কোটালের কাছে, এবং তাঁর কাছে অভিযোগ করে, 'নেকলেসটা তার বাড়ি থেকে চুরি যায় কয়েকদিন আগে, এবং সেই চোর এখন সওদাগরের বেশে সেটা বিক্রী করতে এসেছে।'

তারপর আমাকে চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হলো কোটাল সাহেবের কাছে। আমি তখন নির্জলা মিথ্যে কথা বলে স্বীকার করলাম, 'হ্যাঁ, আমি নেকলেস চুরি করেছি।' নিজের মনকে প্রবোধ দিই, সত্যি কথাটা বললে যদি কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ে! যদি ঐ নেকলেসের প্রকৃত অধিকারিণীর খুন হওয়ার কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেই ভয়ে আসল ঘটনার কথাটা আমি বেমালুম চেপে গেলাম। চুরি করার অপরাধে বড় জোড় একটা হাত কাটা যেতে পারে সাজা হিসাবে। কিন্তু খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়লে তখন আমার প্রাণদণ্ড কেউ ঠেকাতে পারবে না। এ একরকম মন্দের ভালো। তা শেষ পর্যন্ত আমার অনুমান মতো কোটাল সাহেবের হুকুম মতো জহ্লাদ আমার ডান হাতটা কেটে দেয়।

ততক্ষণে দামাস্কাস শহরে রটে গেছে আমার অপরাধ এবং শাস্তি পাওয়ার কথা। আমার বাড়িওয়ালার কানে কথাটা পৌঁছতেই তিনি আমাকে সাফ জানিয়ে দিলেন, আমাকে সে আর তাঁর বাংলোর ভাড়াটে হিসাবে রাখতে চায় না।

কিন্তু আমি তখন যাই কোথায়? দেশে ফিরে যে যাবো, তাতেও গভীর সংশয় জাগে আমার মনে। বাড়ির লোকেদের কাছে কাটা হাত নিয়ে মুখ দেখাবো কি করে? কি কৈফিয়তই বা দেবো তাদের কাছে হাত কাটা যাওয়ার জন্য!



তিনদিন পরে আমার বাড়িওয়ালা ছুটে এলো আমার কাছে। তার সঙ্গে এলো সেই দালাল সর্দার যে আমাকে মিথ্যে নেকলেস চুরির দায়ে অভিযুক্ত করেছিল। কোটাল সাহেবের পেয়াদা আমার গলায় লোহার শিকল পড়িয়ে দামাস্কাস শহরের উজিরের কাছে নিয়ে গেলো। নেকলেসটা নাকি সেই উজিরের বাড়ি থেকে চুরি যায় তিন বছর

আগে। সেই সঙ্গে তাঁর কন্যাও নাকি নিরুদ্দেশ। সমস্ত ব্যাপারটা তখন আমার কাছে জলের মতো। আমি তখন এও বুঝে গেছি, এবার মৃত্যু আমার অনিবার্য।

আল্লাহর নাম নিয়ে আমি তখন উজির সাহেবের কাছে সব খুলে বললাম তিন বছর আগের ঘটনার কথা। তিনি আমার সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর উপস্থিত কোটাল সাহেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার হাত কাটা হলো কেন? কোটাল সাহেব তখন দালাল সর্দারের অভিযোগের কথা বললেন।

আমি তখন কোটাল সাহেবকে বাধা দিয়ে উজির সাহেবের উদ্দেশে বললাম, 'হুজুর আমার অপরাধ নেবেন না। প্রাণদণ্ডের ভয়ে এবং চাপে পড়ে আমি সেদিন মিথ্যে বানিয়ে বলেছিলাম, হ্যাঁ, নেকলেসটা আমিই চুরি করেছিলাম। আর সেই অপরাধে—'

'ঠিক আছে বাছা, তোমার কোন ভয় নেই, উজির সাহেব আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'এরপর কেউ আর তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।' তারপর তিনি সেই দালাল সর্দারকে হুকুম করলেন, 'মিথ্যে অভিযোগ করে ওর হাত কাটানোর জন্য খেসারত হিসেবে ওর হাতের যথার্থ দাম মিটিয়ে না দিলে আমি তোমাকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাবো এবং তোমার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবো।'

শুধু তাই নয়, কোটাল সাহেবের দিকে ফিরে তিনি হুকুম করলেন, আমাকে বন্ধন মুক্ত করে দেওয়ার জন্য। কোটাল সাহেবের রক্ষীরা আমাকে বন্ধনমুক্ত করে দিলে তিনি দুঃখ করে বললেন,—'জানো বাছা, যে বড় মেয়েটি তোমার কাছে প্রথম যায়, সে আমার বড় মেয়ে, তাকে আমি সব সময় কড়া নজরে রাখতাম। আমার ভাতিজার সঙ্গে ওর শাদী দেই। কিন্তু ওর নসীব খারাপ, বেশীদিন স্বামীর ঘর করতে পারলো না, অসময়ে আমার ভাতিজা মারা যায়। কায়রোয় স্বামীর ঘর করার সময় খারাপ সঙ্গীদের সঙ্গে মেলামেশে করে তার স্বভাব চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। আর সেই জন্যই অনায়াসে সে তোমার সঙ্গে রাত কাটায়। আমার মেজবোনের সঙ্গে তার খুব দোস্তি ছিলো। সে-ই মেয়েই তাকে পটিয়ে-পাটিয়ে তোমার কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু বেচারী জানতো না যে, সেই রাত তার আখরি রাত ছিলো। কি করেই বা বুঝবে বলো, নিজের বোনকে কেউ হিংসার বসে অমন নিষ্ঠুর ভাবে খুন করতে পারে? যাইহোক, অবশেষে আমার ঐ ভ্রষ্টা বড় মেয়ের অনুশোচনা হয় বোধহয়। সে তার মা'র কাছে তার সব দোষ কবুল করেছে। বলেছে, তার ছোটবোন তোমাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে, সেটা সে সহ্য করতে পারলো না বলেই নাকি তাকে সে খুন করে। তাই আমি আবার বলছি, এর পর তোমার আর কোন ভয় নেই।'

উজির সাহেব এখানে একটু থেমে আবার বললেন, 'শোনো বাছা, এ কয় বছর তুমি অনেক দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা, আঘাত অনেক কিছু পেয়েছো। তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝি বলেই আমি তোমার সুখের ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমি চাই, তুমি আমার ছোট মেয়েকে শাদী করো। এই মেয়েটির মা আমার দ্বিতীয় বিবি। তাকে শাদী করলে তুমি সুখী হবে, তোমার টাকা-পয়সার অভাব আমি রাখবো না, তুমি হবে আমার ঘরের ছেলের মতোন। কি রাজী আছো তো?'

'হ্যাঁ, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।' আমি আমার উচ্ছ্বাস চাপতে না পেরে বলি, 'এতো বড় সৌভাগ্য আমি আশা করিনি।'

তারপর তিনি কাজী সাহেব এবং সাক্ষীদের ডেকে আমাদের সাক্ষীর কবুল নামা তৈরী করার ব্যবস্থা করলেন, এবং যথা সময়ে উজিরের ছোট মেয়ের সঙ্গে

আমার শাদী হয়ে যায়। এই হলো আমার জীবনের করুণ কাহিনী—

এই পর্যন্ত বলে যুবকটি থামলো। তারপরেই আমি আপনাদের এই শহরে চলে আসি চিকিৎসা ব্যবসা করে রোজগারের ধান্দায়। আপনার ঐ কুঁজো লোকটাকে গতকাল কে বা কারা যেন মৃত অবস্থায় আমার বাড়িতে ফেলে রেখে দিয়ে সরে পড়ে। তারপরের ঘটনাতো আপনি জানেনই জাঁহাপনা।'

ইহুদী হেকিমের গল্পেতেও মন ভরে না চীনা বাদশাহের। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, হেকিমের গল্পের থেকেও তাঁর সেই মৃত কুঁজো লোকটার মরার ঘটনা আরো আশ্চর্য ব্যাপার। অতএব তাদের সবাইকে কোতল করা হবে। যাইহোক, তোমাদের সব অপরাধের মূলে সেই দর্জির জবানবন্দী এখনো শোনা হয়নি, 'অতঃপর সেই দর্জির দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'ওহে দর্জি মশাই, তোমার নিজের কিছু বলার থাকলে বলতে পারো। তোমার কাহিনী কুঁজো লোকটার মৃত্যুর ঘটনা থেকে কিছু আশ্চর্য ঘটনা থাকলে শোনাও তাহলে। তোমাদের সবার সব অপরাধ আমি মুকুব করে দেবো।'

চীনা বাদশাহের হুকুম মতো দর্জি এবার এগিয়ে আসে চীনা বাদশাহের সামনে এবং সে তার কাহিনী বলতে শুরু করলো অতঃপর।

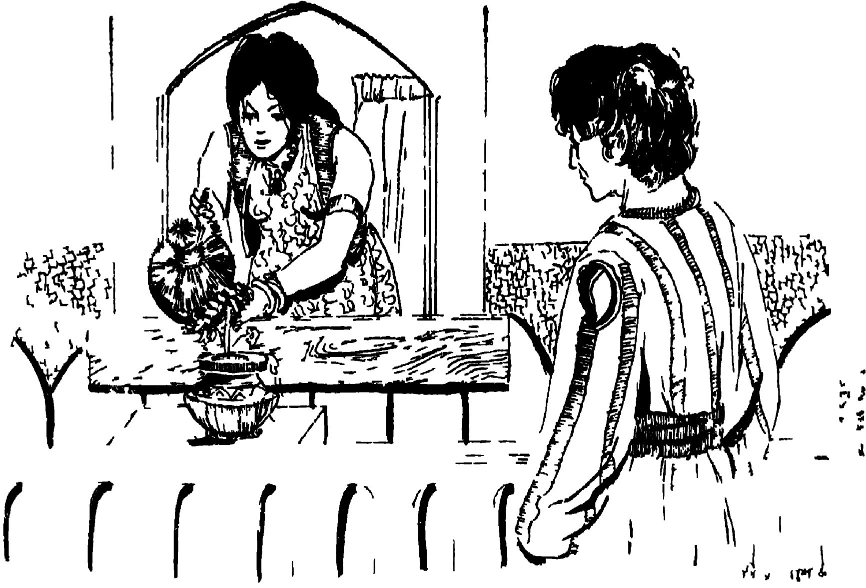
দর্জির কাহিনী

জাঁহাপনা, এ কুঁজো লোকটার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার আগে একটা আশ্চর্য কাহিনী আমি আপনাকে শোনাতে চাই। অবশ্য আপনি যদি একটু ধৈর্য ধরে শোনেন তবেই বলবো।'



চীনা বাদশাহ মাথা নেড়ে তাঁর সম্মতি জানালেন সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর মুখের ভাব দেখে মনে হলো, তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারছেন না। কুঁজোর মৃত্যুর ঘটনাটা তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করতে চান তিনি।

দর্জি তখন তার কাহিনীর জের টেনে আবার বলতে শুরু করলো। হ্যাঁ যা বলছিলাম, গতকাল দিনের শুরুতেই একটা শাদীর আসরে আমাকে যেতে হয়। সেই আসরে সব জাতের মানুষই নিমন্ত্রিত হয়েছিল, ধনী দরিদ্র সবাই, ছুতোর-মিস্ত্রী থেকে শুরু করে আমার মতো দর্জি, তাঁতী, রাজমিস্ত্রী এবং অন্য আরো অনেক পেশার মেহমানরা আসরের শোভাবর্ধন করে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খাবারের আয়োজন শুরু হয়ে যায়। বাড়ির কর্তা এক সময়ে একজন পরদেশী যুবককে সঙ্গে নিয়ে হলঘরে প্রবেশ করে। যুবকটি সুপুরুষ, বেশভূষা দেখে মনে হলো বাগদাদের অধিবাসী সে। খুঁড়িতে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল সে, মনে হলো তার এক পা খোঁড়া। এক সময় অভ্যাগতদের দিকে তাকিয়ে বসতে গিয়ে একজন নাপিতকে দেখা মাত্র সে আবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, এবং খাবারের টেবিল ছেড়ে চলে



যাওয়ার জন্য সে তার খোঁড়া পাটা এগিয়ে দেয়।

তখন উপস্থিত আমরা সবাই তাকে বাধা দিলাম। বাড়ির কর্তা তখন তাকে শান্ত হয়ে বসার জন্য অনুরোধ করে বললেন, 'এখানে আসা মাত্র বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ এভাবে ফিরে যাওয়ার কি এমন কারণ ঘটলো জানতে পারি?'

তখন সে মুখ খুললো, 'এখানে আপনার মেহমান-দের মধ্যে একজন নাপিত এসেছে, যে আমার পক্ষে অশুভ, আমার শত্রু, আমার এই পা খোঁড়া হওয়ার জন্য দায়ী সে। এতো সব ভদ্র মেহমানদের সামনে আমি তার নাম প্রকাশ করতে চাই না, কারণ তাতে আপনারা সবাই অস্বস্তিবোধ করতে পারেন, অযথা আজকের এই খানার আসরের সব আনন্দ মাটি হয়ে যেতে পারে।'

সে কি! তখন আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবি, এখানে এই বিদেশে বাগদাদের একজন যুবক এসে সামান্য একজন নাপিতকে দেখে ঝামেলার কথা ভাবছে? কি ব্যাপার?

কৌতূহল দমন করতে না পেরে শেষে আমরা সেই আগন্তুককে জিজ্ঞেস করে বসলাম, নাপিতের উপরে কেন আপনার এতো রাগ, একটু খুলে বলবেন?'

'বন্ধুগণ, বাগদাদে (আমার জন্মভূমি) এই নাপিতটার দোষেই আমার একটা পা খোঁড়া হয়ে যায়। এবং তারপর থেকে আমি শপথ নিয়েছি, ওর সঙ্গে এক টেবিলে কখনো বসবো না, এমন কি ওর সঙ্গে একই শহরে বাস করবো না। কিন্তু এই বিদেশে এসেও ওর সঙ্গে আবার যে আমার দেখা হয়ে যাবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। যাই-হোক, এরপর একটা দিনও আমি আর এখানে থাকছি না। এ শহর ছেড়ে আমাকে চলে যেতেই হবে!'

'আল্লাহর দোহাই', আমরা তাকে অনুরোধ করলাম, 'দয়া করে আপনার কাহিনী আমাদের বলুন!'

তখন সেই যুবকটি তার ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য রাজী হলো (ঠিক সেই মুহূর্তে সেই নাপিতের মুখের রঙ যায় বদলে, বিবর্ণ ফ্যাকাশে দেখায়)।

তাহলে শুনুন আমার দোস্ত, আমার বাবা ছিলেন বাগদাদের সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী। আল্লার দোয়ায়ে বাবা আমাকে তাঁর একমাত্র পুত্র হিসেবে পান। একদিন আমি সাবালক হতেই আব্বাজান আমাকে ফাঁকি দিয়ে বেহস্তে চলে যান। আমি তখন প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক বনে গেলাম। দাস-দাসী পরিবৃত অবস্থায় খাই-দাই, রাতে ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে সরাবের নেশায় স্ফূর্তি করে রাত কাবার করে দিই। সেই ছেলেবেলা থেকেই কি জানি কেন, মেয়েদের আমি একেবারেই সহ্য করতে পারতাম না, তাদের প্রতি আমার দারুণ ঘৃণা ছিলো।

তা একদিন হলো কি বাগদাদ শহরের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি, হঠাৎ এক দল মেয়েদের মুখোমুখি হতে হলো আমাকে আমি তখন তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ছুটে গিয়ে একটা গলির ভিতরে ঢুকলাম. কানা গলি বেরুবার পথ ছিল না। অগত্যা রাস্তার একটা পাথরের বেঞ্চে গিয়ে বসলাম তখন। বেশিক্ষণ বসিনি, উল্টোদিকের বাড়ির একটা জানলা খুলে যেতে দেখলাম। এবং জানলার ওপারে একটি যুবতী মেয়ের মুখ ভেসে উঠলো, তাকে দেখে মনে হলো যেন খোলা জানালা পথে চৌধুবির চাঁদ দেখা দিলো। দেখতে পরমা সুন্দর, অমন রূপবতী মেয়ে আমি এর আগে কখনো দেখিনি। মেয়েটি তখন ফুলের টবে জল দিচ্ছিল। আমি যে তাকে শ্যেন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছি, টের পাওয়া মাত্র জানলার কপাট বন্ধ করে চোখের আড়াল হয়ে গেলো।

তখন আমার বুকটা হাহাকার করে উঠলো। মেয়েটিকে দেখার জন্য ভেতরে ভেতরে আমার মনটা ভীষণ ছটফট করতে থাকলো। মেয়েদের ঘৃণা করার বদলে সেই প্রথম আমি তাদের প্রেমে পড়ে গেলাম সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত আমি সেখানে বসে থাকলাম, কিন্তু তারপর আর একবারও জানলা খুলে যেতে দেখলাম না। চৌধুবির চাঁদ আর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো না। তবে দিন শেষে শহরের কাজী সাহেবকে তাঁর ভৃত্যদের সঙ্গে নিয়ে সেই বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখলাম। তখন বুঝলাম, আমার দিল্ উদাস করা সেই মেয়েটি কাজী সাহেবের কন্যা। অতঃপর বাড়ি ফিরে এসে বিছানায় পড়ে খুব কাঁদলাম মনের দুঃখে। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হলো, উধাও হলো আমার চোখের ঘুম। বাড়ির কারোর সঙ্গে কথা বলি না। একা একা থাকতে ভালো লাগে এখন।

আমার সেই দুঃখ দেখে আমার ক্রীতদাস ক্রীতদাসীরা দারুণ কাতর হয়ে পড়লো। তারা আমার দুঃখের কারণ জানতে চাইল। আমি তাদের কোন প্রশ্নেরই জবাব দিলাম না।

এক বৃদ্ধা আমার দেখ-ভাল্ করতো। সে আমাকে খুব পেয়ার করতো খবর পেয়ে একদিন ছুটে এলো সে।

'বাছা, তোমার কি হয়েছে, আমাকে সব খুলে বলো, দেখি আমি তোমার জন্য কি করতে পারি!'

বৃদ্ধাকে আমিও খুব পেয়ার করতাম। সবাইকে ফেরালেও তাঁর কথা আমি ফেলতে পারলাম না। আমি তখন আমার মনের সব দুঃখ খুলে বললাম। সব শুনে তার মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেলো।

'কিন্তু বাছা, সে যে বাগদাদ শহরের কাজীর মেয়ে। আর কাজী লোকটিও দারুণ রাগী বদ-মেজাজী, তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে তোমার মনের খবর পৌঁছে দেওয়া খুবই কষ্টকর ব্যাপার। তবে একটা সুবিধে যে, মেয়েটি দোতলায় অন্য মঞ্জিলে থাকে, আর কাজী সাহেব থাকেন নিচে একতলায়। যাইহোক, দেখি তোমার সুখের জন্য আমি কি করতে পারি।' বৃদ্ধা আমাকে আশ্বস্ত করে ফিরে যাওয়ার আগে বললো, 'দুঃখ করো না, হামামে গিয়ে গোসল সেরে ভালো-মন্দ খাওয়া দাওয়া করে অপেক্ষা করো। আর আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'



অতঃপর আশার আলো দেখতে পেয়ে আমার মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে। বাড়ির লোকদের সঙ্গে আগের মতো স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে শুরু করলাম। আমার আনন্দ দেখে তারাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, কারণ তারা ধরে নিয়েছিল, আমি যদি আর কিছুদিন উপবাস থাকি, তাহলে আমার মৃত্যু ঠেকাতে পারবে না, তাদের দুঃখটা এইখানেই।

কয়েকদিন পরে বৃদ্ধা আবার আমার খোঁজ-খবর নিতে এলো। কিন্তু তার মুখটা কেমন গম্ভীর, থমথমে দেখাচ্ছিল। তাহলে কি মেয়েটির কাছে দৌত্য সফল হয়নি! একটা অশুভ আশঙ্কায় আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। হ্যাঁ, আমার আশঙ্কা অমূলক নয়।

'বাছা, তুমি মিথ্যে ঐ মেয়ের জন্য কাতর হচ্ছো। ওর কথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না।' বৃদ্ধা উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে, 'তোমার কথা তাকে বলতেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো, আমাকে সে এই মারে তো সেই মারে। তুমি যে ওকে ভালোবাসো, ওর একটু মহব্বত পাওয়ার জন্য তুমি এদিকে ছটফট করে মরে যাচ্ছো, খানাপিনা ছেড়ে দিয়েছ, এ সব কথা ও যেন কানে তুলতে চায় না। যাই-হোক, আমিও কম নাছোড়বান্দা নয়। একেবারেই আমি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে চাই না। আমি আবার যাবো ওর কাছে। তোমার দিকে ওর মন না ঘোরানো পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হচ্ছি না। বুঝলে বাছা, তুমি যেন আবার মন খারাপ করো না, কেমন?'

বৃদ্ধা যতো আশ্বাসই দিয়ে যাক না কেন, আমি তো কোন আশার আলো দেখতে পেলাম না। মন আমার আবার ভেঙ্গে পড়লো, খাওয়ায় রুচী নেই, নেই চোখে ঘুম। বাড়ির লোকজন যারা আমাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতো, তারা আবার আমার দুঃখে কাতর হয়ে পড়লো। আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেলো না।

তবে কয়েকদিন পরে বৃদ্ধা আবার এলো। এবার তার মুখে হাসি ফুটতে দেখা গেলো।

'বাছা, আজ তোমাকে একটা শুভ সংবাদ দিতে এসেছি' তারপর সে বলতে শুরু করলো, 'আল্লাহ বোধহয় এবার তোমার দিকে মুখ ফিরে তাকিয়েছেন। গতকাল আমি সেই যুবতী মেয়েটির অন্দরমহলে ঢুকে পড়ি নিঃশব্দে, কাজী সাহেব তখন বাড়িতে ছিলেন না। সেই সুযোগে আমি সোজা তার কাছে

চলে যাই চোখ ভর্তি জল নিয়ে। আমার চোখে জল দেখে সেই প্রথম ওকে একটু নরম হতে দেখলাম। যে মেয়ে আগেরদিন আমাকে গালমন্দ করতে করতে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই কিনা আমাকে খাতির করে বসতে দিলো, তারপর অধীর আগ্রহে আত্মীয়তার সুরে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার দাদীমা, কি হয়েছে তোমার? তোমার চোখে জল কেন? তোমার কি দুঃখ বলবে না আমায়?'

আমি তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি। আমার নকল কান্না ও একটুও টের পেলো না। আড়চোখে আমি তার উদ্বিগ্ন মনের ভাব দেখে দরকারি কথাটা তাড়াতাড়ি সেরে নেওয়ার জন্য তৈরী হলাম।

'শোনো নাতনী, তোমাদেরই এক পড়শী যুবকের কাছ থেকে আসছি। সে তার মনের কথা আমাকে সব খুলে বলেছে। সে তোমাকে প্রচণ্ড ভাবে ভালোবাসে। সে তোমার একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কাঙাল। তুমি যদি তাকে একটু করুণা না করো, বাছা আমার তোমাকে না পাওয়ার বেদনায় মরে যাবে।'

তাতে কাজ হলো, মেয়েটির মন নরম হলো। কালই প্রথম ও তোমার খোঁজ-খবর নিলো। নিজের থেকে জিজ্ঞেস করলো, 'দাদীমা, তুমি যে যুবকটির কথা বলছো, কে সে?'

'আমি তখন তোমার পরিচয় দিলাম। মেয়েটিকে প্রথম দেখার মুহূর্তে তুমি কি ভাবে ওর মহব্বতে পড়ে যাও, সব আবার ওকে বলে অনুযোগ করে বললাম, সেদিন তো তুমি তাকে কোন পাত্তা দিতে চাইলে না, আমাকে তোমাদের বাড়ি থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। সেই কথা শুনে বাছা আমার একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। শরীর তার শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। হেকিম বলেছে, বাছা আমার বোধহয় বাঁচবে না। যদিও বাছাকে আমি পেটে ধারনি, তবু সে আমার নিজের পেটের ব্যাটার থেকেও অনেক বেশী আপনার। এখন একমাত্র তুমিই তাকে আবার সুস্থ করে তুলতে পারো। তুমি যদি তাকে একটু করুণা করো তবেই সে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে।'

'তাই নাকি দাদীমা! আমাকে পাওয়ার জন্য এতোই সে আগ্রহী!' মেয়েটি ভিজে গলায় বলে, 'আমার জন্য ও যদি এতোই উতলা হয়ে থাকে, তাহলে ফিরে গিয়ে তাকে বলো, আগামী শুক্রবার জুম্মাবারের দিন আমার আব্বাজান যাবেন মসজিতে নামাজ পড়তে। তখন বাড়িতে কেউ থাকবে না। ওকে বলো, আমি ওর জন্য দরজা খুলে রাখবো, ও যেন সত্যি সত্যি আসে। ওর সঙ্গে দেখা হলে, আমি ওর মনের খবর জেনে নেবো।'

ফিরে আসছি তখন মেয়েটি বলে, 'কিন্তু দাদীমা, বেশাক্ষণ সময় আমি দিতে পারবো না। আব্বাজান মসজিদ থেকে ফেরার আগেই ওকে আমার কাছ থেকে চলে যেতে হবে।'

'হ্যা, বাছা তাই হবে', বৃদ্ধা মুচকি হেসে বলে, 'মহব্বত জানানোর পক্ষে ঐটুকু সময়ই যথেষ্ট, কি বলো?'

তারপর বৃদ্ধা আনন্দে নাচতে নাচতে সোজা আমার কাছে ছুটে আসে। বৃদ্ধার মুখ থেকে সুখবরটা শোনা মাত্র কি আশ্চর্য আমার সব অসুখ দুঃখ-কষ্ট নিমেষে উধাও হয়ে গেলো। খুশি হয়ে বৃদ্ধাকে নতুন পোষাক উপহার দিয়ে বললাম, 'আমার সুখের জন্য তুমি যা করছো, তার কাছে এই উপহার যৎসামান্য!'

আমাকে আবার আগের মতো খুশিতে মেতে উঠতে দেখে বাড়ির লোকজনের মনেও আনন্দের বন্যা হয়ে গেলো। একদিকে আগের মতো খাওয়া-দাওয়া করলেও রাতের ঘুম আর আগের মতো ফিরে এলো না আমার চোখে। আমি বেশ বুঝতে পারি শুক্রবারের আগে আমি আর ভালো করে ঘুমতে পারছি না। আমার মনে কেবল একটাই চিন্তা কখন সেই শুক্রবার আসবে। কখন আমি আমার

প্রেয়সীর সঙ্গে দেখা করতে পারবো! কখন আমি ওকে আমার মহব্বতের কথা শোনাতে পারবো। এবং তখনই বা ওর মুখ থেকে দুটো আদর আর সোহাগের কথা শুনতে পারবো!

আমার সেই বহু প্রতিক্ষিত শুক্রবার এলো। সকাল না হতে হতেই সেই বৃদ্ধা এলো আমার খোঁজ-খবর নিতে। ফিরে যাওয়ার সময় সে বললো, 'আজ তোমার সেই শুভদিনটি সমাগত। এবার হামামে গিয়ে ভালো করে গোসল সেরে তৈরী হও অভিসারে যাওয়ার জন্য, তোমার প্রেয়সী অপেক্ষা করছে।' একটু থেমে সে আবার বলে, 'হ্যাঁ, ভালো কথা চুলগুলো তোমার বড্ড বড় হয়েছে, যাওয়ার আগে ছেঁটে নিও, তাতে তোমার অসুস্থ ভাবটা একেবারে কেটে যাবে। প্রিয়া দর্শনে এই তোমার প্রথম যাওয়া। বুঝতেই পারছো, একটু ফিটফাট হয়েই যাওয়া ভালো, তা না হলে তোমাকে তার মনে ধরবে কি করে বলো?'

'হ্যাঁ, দাদীমা, তুমি ঠিকই বলেছো, আমি এখুনি হামামে ঢুকছি', এই বলে আমার খাস নফরকে ডেকে হুকুম করলাম, বাজার থেকে একটা ভালো নাপিত ডেকে আনার জন্য।

খানিক পরে সে আমার শত্রু ঐ অশুভ বয়স্ক নাপিতটাকে সঙ্গে নিয়ে এলো। ওর মুখ দেখেই আমার কেন জানি না মনে হলো, লোকটা আমার প্রিয়া অভিসারে যাত্রার পক্ষে অশুভ। কিন্তু আমার তখন ভীষণ তাড়া, তাই ওকে ফেরাতে পারলাম না। ও আমাকে সালাম জানালো; অগত্যা আমিও ওকে সালাম আলুকম জানালাম নিছক বাধ্য হয়ে।

ঐ নাপিত প্রথমে আমার অসুস্থতার খোঁজ খবর নিলো, আমি তাকে বললাম, আমার কোন অসুখ এখন আর নেই। যা কিছু আছে, চুল ছাঁটলেই তা দূর হয়ে যাবে। তাই তাকে তাড়া দিলাম, তাড়াতাড়ি চুল ছাঁটার কাজ শুরু করে দেওয়ার জন্য।

সে তখন বলে, 'আপনি ঠিকই বলেছেন মালিক, আপনি জ্ঞানী-গুণী মানুষ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আল্লাহর পয়গম্বর ইবন আব্বাস বলে গেছেন, জুম্মাবার নামাজ পড়ার আগে যে ব্যক্তি ক্ষৌরকার্য সমাধা করে, সারাটা সপ্তাহ তার সুখে কাটে, তার কোন অসুখ-বিসুখ হয় না। আল্লাহর দোয়ায় আপনিও সেই রকম একজন সুখী ব্যক্তি হতে যাচ্ছেন। আপনি—'

আমি তার কথায় বাধা দিয়ে বলি, 'ও সব কথা থাক এখন নাপিত ভায়া, তুমি এবার আমার চুল ছাঁটার কাজে ভালো করে মন দাও তো দেখি! আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না—'

অতঃপর নাপিতটা উঠে দাঁড়ালো। তার হাতের পুটলি খুললো অত্যন্ত শ্লথ গতিতে, যেন এই মুহূর্তে ক্ষৌরকর্ম সারার কাজে তার মন নেই। অত্যন্ত ঢিমে-তালে পুটলি খুলে ছুরি-কাঁচি এবং ক্ষুর বার করে সরিয়ে রাখলো। তারপর একটা বিচিত্র ধরণের একত্রে রূপোয় বাঁধানো সাতটা আয়না পুটলি থেকে বার করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে সামনের বাগিচায় এবং সূর্যের আলোয় সেই বিচিত্র ধরণের আয়নাটা মেলে ধরে কিছুক্ষণ কি যেন নিরীক্ষণ করে সেটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। এক সময় সে আবার আমার ঘরে ফিরে এসে বিজ্ঞ জ্যোতিষীর মতো বলে, 'শুনুন মালিক, আজ হলো হিজরী সন দুশো তেষট্টির দশম শকর শুক্রবার (এই সময়টা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর আশীর্বাদ স্বরূপ) এবং আলেকজেণ্ডারের সময় থেকে সাত হাজার তিনশো তেইশ সনের অষ্টম ঘটিকা এবং ছয় মিনিট গতে জ্যোতিষ গণনায় আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এই সময়টা ক্ষৌরকর্ম শুরু করার পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত। আবার কারোর পক্ষে ক্ষৌরকর্মের পরে কোন শুভ কাজে বেরোলে অলু-ক্ষণের লক্ষণও দেখা যাচ্ছে, যেমন আপনার ক্ষেত্রে আগে-ভাগে আমি একটা অশুভ যাত্রার ইঙ্গিত পাচ্ছি আমার গণনা-শাস্ত্রে।

ব্যাস এর বেশী কিছু আমি আর বলতে চাই না—'

'আঃ তুমি থামবে!' বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'আল্লাহর দোহাই, তুমি এবার তোমার বকবকানি বন্ধ করে ক্ষৌরকর্মে মন দেবে নাপিত প্রবর? আমি তোমাকে আমার চুল ছাঁটার জন্য ডেকে এনেছি, তোমার কাছ থেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপদেশ শুনতে আনিনি। অতএব বক্তৃতা থামিয়ে এবার চটপট তুমি তোমার কাজে মন দাও তো দেখি।'

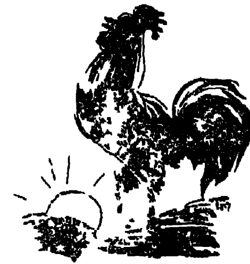
'হায় আল্লাহ', নাপিতটা এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আজকের দিনটা আপনার পক্ষে কতো যে অশুভ তা যদি আপনি একবার মন দিয়ে জানার চেষ্টা করতেন, তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি, আপনি কখনোই এত তাড়াহুড়া করতেন না।'

'আল্লাহ জানেন তুমি কে এবং তোমার পেশা কি? তুমি একজন নাপিত। ক্ষৌরকর্ম সমাধা করাই তোমার একমাত্র পেশা।'

'না মালিক, ঐখানেই আপনি মস্ত বড় ভুল করছেন', নাপিত একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলে, 'আমি শুধু নাপিতই নই, আমি একজন ভালো জ্যোতিষীও বটে। আল্লাহর দোয়ায় আমি কি না জানি বলুন? সাহিত্য চর্চা থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার আমার নখদর্পণে। পাটিগণিত এবং বীজগণিতের কঠিন কঠিন সূত্রের সমাধান আমি যাদুর মতো মুহূর্তে সম্পন্ন করে দিতে পারি। শুধু তাই নয়, কোরাণের বাণী আমার কণ্ঠস্থ। আমার এই অভূতপূর্ব জ্ঞানের জন্য সবাই আমাকে তারিফ করে থাকেন। আপনার বাবা আমাকে খুব ভালো-বাসতেন, খাতির করতেন, সমীহ করতেন আমার এই বড় ভূতি জ্ঞানের জন্য। আপনি হয়তো ভাবছেন, আমি লোকটা কেবল বাজে বকবক করি, কিন্তু আসলে আমি মোটেই তা নয়। আমার মতো স্বল্পভাষী লোক বাগদাদ শহরে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর এই কারণেই এই শহরে আমি মৌন এবং জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে সমাদার লাভ করে থাকি। তাই আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ, আমার জ্ঞানের পরিধি নিয়ে অযথা কৈফিয়ত চাইবেন না, তাছাড়া আমি আপনার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনার ভালোমন্দ দেখা আমার একান্ত কর্তব্য। খোদা আল্লাহকে বহুত সুক্রিয়া যে, ঠিক সময়ে আপনার কাছে আমাকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি চাইলে প্রত্যহ সারা বছর ধরে আমি আপনাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে যেতে পারি, তার জন্য কোন পারিশ্রমিক আমি নেবো না।'

তার বকবকানি শুনতে শুনতে আমি আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না। বিরক্ত হয়ে শেষে বলে ফেললাম, 'আমার সন্দেহ হয় এভাবে আর কিছুক্ষণ তোমার কথার ফুলঝুড়ি ফোটালে তুমি আজ আমার মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারো—'

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো, ভোর হয়ে এলো। তাই সে তার গল্প বলা বন্ধ করলো সে রাতের মতো।



পরদিন বাদশাহ শাহরিয়ার আবার তাঁর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করলে শাহরাজাদ তার কাহিনী শুরু করতে গিয়ে বললো, 'তারপর সেই তরুণকে নাপিত কি জবাব দিলো শুনুন এবার—'

'আপনি ভুল বললেন মালিক! আপনি দেখলেন, আপনার বাবাও স্বীকার করতেন, আমি একজন যথার্থ স্বল্পভাষী। কম কথায় অনেক বেশী

কিছু বলে ফেলি এই যা আমার দোষ। কিন্তু আমার ছয় দাদা আমার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, ভিন্ন প্রকৃতির লোক। বড ভাইজানের নাম অল-বাকবুক, অর্থাৎ ভরা কলসি থেকে জল ঢালবার শব্দ; দ্বিতীয় ভাই অল হাদ্দার, যার অর্থ উটের আওয়াজ; তৃতীয় ভাইজান হলো অল-ফকিক, যার মানে ভোরের ঘুম কেডে নেওয়া মোরগের ডাক, চতুর্থ ভাই অল-কুজ অল-আসওয়ানি, গলা উঁচু সারস, পঞ্চম ভাই অল-গাশাহর, অর্থাৎ উট থেকে পাড যাওয়ার সময় যে শব্দ ওঠে, ষষ্ঠ ভাইজান হলো অল-নাকাশিক, তার মানে ফুলঝুডি ফোটানোর শব্দ। আর সপ্তম হলো, এই অধম। অধমের নাম, অল সামিত, যার অর্থ হলো আত্মসমর্পণ, কথা না বাড়িয়ে নিঃশব্দে নিজেকে সঁপে দেওয়া।'

নাপিতের কথা শুনতে শুনতে আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, এবার বুঝি আমার গল বাডাব ফেটে যাবে। না আর নয় নফরকে ডেকে বললাম, 'ঐ নাপিতকে একটা সিকি দিনার দিয়ে আমার চোখের সম্মুখ থেকে এগুনি বিদায় করে দাও, আমি আর এক মুহূর্ত ওকে সহ্য করতে পারছি না। দরকার নেই আজ চুল ছেটে।'

'এ আপনি কি বললেন মালিক', নাপিত তখন চিৎকার করে উঠে বললো, 'আল্লাহর দোয়ায় আপনার কাছ থেকে পারিশ্রমিক নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। বিনা পারিশ্রমিকে আপনার সেবা করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করবো। আপনার বাবাকেও আমি সেবা করেছিলাম নিঃস্বার্থে এবং বিনা অর্থে। আপনার ভালোর দিকে নজর রাখাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি আবার বলছি মালিক, আজকের দিনটা আপনার পক্ষে শুভ নয়, সেই কথাটা জানাতেই আপনার কাছে আসা। একদিন হলো কি, আজকের মতো আমার জ্যোতিষী গণনায় দেখলাম আপনার বাবার দিনটা ভালো যাবে না। হাতে হাতে আমার ভবিষ্যতবাণী ফলে যেতেই পরদিন তিনি তাঁর নফরকে ডেকে হুকুম করলেন, 'ওকে একশো তিনটি স্বর্ণমুদ্রা এবং দামী শাল উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করো।' তারপর থেকে তিনি আমাকে তাঁর পারিবারিক জ্যোতিষী হিসাবে নির্বাচন করেন। আমার উপদেশ ছাড়া এক পাও নড়তেন না তিনি। বাইরে কোথাও গেলে আমাকে তলব করতেন, বলতেন, 'ওহে



নাপিত জ্যোতিষী, গণনা করে দেখো তো, আজকের দিনটা আমার যাত্রার পক্ষে শুভ কি না।' আমার জ্যোতিষ গণনায় যদি দেখা যেতো, সেই দিনটা তাঁর পক্ষে মোটেই শুভ নয়, আমার আদেশ তিনি শিরধার্য করে নিতেন। আর সে জায়গায় ছোট মালিক আপনি—'

আমি এবার রাগে ফেটে পড়লাম, 'আল্লার দোহাই, তুমি চুপ করবে? আমি যা করতে বলি করবে নাকি—' আমি তখন ফিরে আবার গায়ে পোষাক চাপাতে গেলে সে এবার তার ক্ষুরে শান দিয়ে আমার কাছে এসে ক্ষৌরকর্মে মনোযোগ দিলো। অর্ধেক কামানোর পর সে আবার মুখর হলো, 'মালিক আপনি হয়তো ভাবছেন আমি অনেক বাজে কথা বললাম, কিন্তু মোটেই তা নয়। আমি যাকে যা বলি তার এক বর্ণও কখনো মিথ্যে নয়। এই হাত দিয়ে এর আগে আমি কতো না সুলতান, আমির এবং উজির কবি এবং হেকিমদের ক্ষৌরকর্ম সমাধা করেছি এবং ক্ষৌরকর্মের সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের ভাগ্য গণনা করে তাদের নসীবের কথা ঠিক ঠিক বলে দিয়েছি এবং জ্যোতিষ বিদ্যা গুনে যাদের খারাপ ভাগ্য আমি তাদের ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছি। হাসি মুখে তারা আমাকে উপযুক্ত ইনাম দিয়ে আমাকে খুশি করেছে। অথচ আপনি আমাকে—'

'তুমি তোমার বকবকানি থামাবে। তোমার ঐ বকবকানিতে আমার মাথা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। তোমার যা বলার দরকার নেই, তা তুমি অনর্গল বকে যাচ্ছো। তোমার এইসব বাজে কথা শোনার মতো আমার অবসর নেই। আমার হাতে এখন একটা অতি জরুরী কাজ আছে। তোমার ক্ষৌরকর্ম শেষ হলে তবে আমি সেই কাজে যেতে পারবো। অতএব—'

'অতএব, হ্যাঁ অতএব সেই কারণেই তো আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। আমার অপরাধ নেবেন না মালিক, আজকের দিনটা আপনার কোন কাজের পক্ষেই শুভ নয়। তাই ভীষণ জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, আপনার সেই জরুরী কাজটা কি বলবেন আমাকে দয়া করে?' তারপর সে নিজের থেকেই আবার বলে, 'দাঁড়ান, আর একবার আমার জ্যোতিষ দর্পণে সূর্যের আলো ফেলে দেখি আজ কি কোন্ সময় থেকে আপনার পক্ষে শুভ সূচনা করেছে।' এই বলে সে ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর ফেলে রেখে জ্যোতিষ-দর্পণ হাতে নিয়ে বাগিচার মাঝখানে ছুটে গেলো। অনেকক্ষণ পরে সে আবার ফিরে এসে বললো, 'জুম্মাবারের নামাজ পড়তে পুরো তিনটি ঘণ্টা বাকী রয়েছে। আপনার এতো তাড়া কিসের মালিক?'

'আল্লাহ তোমাকে মাফ করুণ', আমি তখন চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'তোমার বকবকানি শুনতে শুনতে আমার পেটের নাড়ি ভুঁড়ি বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, এবার তুমি চুপ করো।'

তারপর সে আবার ক্ষুরে শান দিয়ে নিয়ে আগের মতো অর্ধেক কামিয়ে হাত-মুখ নেড়ে বকবক করতে শুরু করে দিলো, 'আমি আপনার এই তাড়া দেখে ভীষণ চিন্তিত মালিক। কারণটা আপনি বলতে না চাইলে জোর করবো না। তবে আপনার বাবা এবং ঠাকুর্দা আমার উপদেশ ছাড়া কোন কাজে এগোতেন না কখনো। তাই আপনার এই কারণটা আমাকে বললে বোধহয় ভালো করতেন। যাইহোক, পরে আপনার কোন অনিষ্ট হলে যেন দোষারূপ না করেন।'

তার এই বকবকানির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন পথ দেখতে না পেয়ে নিজের মনে আমি বললাম, 'নামাজ-পড়ার সময় ঘনিয়ে এলো, কাজী সাহেব বাড়ি ফিরে আসার আগেই আমার প্রেয়সীর সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে। এর পরেও আরো বেশী দেরী যদি হয়, জানি না কি ভাবে তার কাছে আমি পৌঁছতে পারবো।'

তাই আমি এবার চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'আমার এক পরিচিতের বাড়ির পার্টিতে যেতে হবে। তোমার বকবকানি থামিয়ে এবার ক্ষৌরকর্মের বাকী কাজটুকু শেষ করে ফেলো হে বাপু।'

সে তখন বলে, 'আজকের দিনটা আমার পক্ষে খুব শুভ। আজ আমার বাড়িতে আমার মেহমান-

দের নিমন্ত্রণ করেছিলাম। কিন্তু তাদের খাবারের আয়োজন করতে একেবারে ভুলে গেছি। এই মুহূর্তে কথাটা মনে পড়ে যেতেই ভাবছি, সন্ধ্যায় তাদের আমি মুখ দেখাবো কি করে। তাদের চোখে আমি যে একেবারে হেয় হয়ে যাবো!'

'তা এর জন্য তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না', আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলি, 'একটু আগে আমি তোমাকে বলছিলাম না, আজ আমার এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে। তাই আমার বাড়িতে অনেক ভালো ভালো খাবার উদ্বৃত্ত হবে, সেই সঙ্গে দামী দামী সরাবের ব্যবস্থাও আছে। সেগুলো তুমি অনায়াসে তোমার মেহমানদের খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যেতে পারো।'

'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুণ। আপনার কি অসীম দয়া মালিক।' নাপিত তখন উল্লসিত হয়ে বলে, 'তা আপনার বাড়িতে কি কি খাবারের আয়োজন করা আছে, তা যদি একবার বলেন খুব ভালো হয় মালিক।'

'পাঁচ ডিস মাংস, দশ ডিস মোরগা মসাল্লাম এবং ভেড়ার মাংসের রোষ্ট।'

'খাবারগুলো আমাকে একবার দেখাবেন মালিক?'

আমি তখন আমার লোকজনদের কাছে ডেকে বললাম, 'খাবারগুলো যেখান থেকে পারো কিনে, ধার করে কিংবা চুরি করে নিয়ে এসো।'

মাংসের ডিসগুলো দেখা মাত্র তার জিবে জল এসে গেলো। তারপর চারিদিক তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'কই সরাবের বোতলগুলো তো দেখছি না?'

'আছে, সব আছে, ঐ যে কাঠের পেটিগুলো দেখছো, ঐ গুলো সরাবের পেটি', আমি তাকে বলি, 'তুমি আমার চুল ছেঁটে ফিরে যাওয়ার সময় বাড়িতে নিয়ে যেও।'

'কিন্তু পেটি খুলে সরাবের বোতলগুলো না দেখা পর্যন্ত আমি যে স্বস্তিতে আপনার চুল কাটতে পারবো না মালিক।'

অগত্যা নফরদের হুকুম করলাম, পেটি খুলে সরাবের বোতলগুলো তাকে দেখানোর জন্য। পেটি খোলা হলো। সরাবের বোতলগুলো দেখামাত্র তার চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠলো।

তারপর কাঁচি আর চিরুণী হাতে করে আমার দিকে এগিয়ে এলো। খানিক চুল কেটে সে ক্ষুর কাঁচি ফেলে রেখে বলে, 'সবই তো দিলেন। আপনি ঠিক আপনার বাবার মতো হয়েছেন, বাবার মতোই আপনি দিলদরিয়া লোক! এরপর আপনি যদি কিছু আতর আর সুগন্ধী নির্যাসের ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে আমি আমার মেহমানদের মনের মতো করে খাতির করতে পারি।'



'ঠিক আছে, তাই হবে বাপু', নফরদের দিকে ফিরে বললাম, 'সুগন্ধী দ্রব্যের পেটিটা নিয়ে এসো।' তারপর নাপিতকে অনুরোধ করলাম, 'সময় বয়ে যাচ্ছে, এবার আমার বাকী ক্ষৌরকর্ম সমাধা করে দাও। জলদি!'

'জানেন মালিক, আজ আমার বাড়িতে অনেক মেহমান আসবে ধনী, দরিদ্র সবাই আসবে। আপনার উপহার দেওয়া মাংস এবং সরাবে আমাদের আজকের আসর খুব জমবে দেখছি। নাচ, গান ফুর্তিতে জমজমাট আসর। তা আপনিও আজ আমার বাড়িতে আসুন না। আপনি এলে আসর আরো ভালো জমবে।'

'কিন্তু নাপিত ভায়া, আজ তো আমার যাওয়া হবে না তোমার বাড়িতে। তোমাকে তো আগেই বলেছি আমার এক বন্ধুর বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হবে! তবে তোমার এই নিমন্ত্রণের জন্য বহুত সুক্রিয়া। পরে অবসর মতো একদিন না হয় তোমার বাড়িতে যাবো।

'আজ গেলে আমার মেহমানদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম, সে রকম নসীব করে কি আমি জন্মাইনি? যাইহোক ভবিষ্যতে আমার বাড়িতে আপনার মতো মহান ব্যক্তির পায়ের ধুলো পড়ার অপেক্ষায় রইলাম জানবেন মালিক—'

'আর কোন কিছু জানাতে হবে না।' আমি এবার রেগে গিয়ে বললাম, 'যাও এবার একটু তাড়াতাড়ি করে আমার ক্ষৌর কর্মের শেষ কাজটা এখন সেরে এখান থেকে কেটে পড়ো তাড়াতাড়ি। তুমি বিদায় হলে তবেই আমি আমার বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে পারি।'

'কিন্তু মালিক', নাপিত তখন বাধা দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'আমি তো আপনাকে একলা ছেড়ে দিতে পারি না। আমি আমার গণনায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আজ আপনার কপালে মহা বিপদের কথা লেখা আছে। আপনি একা সেই বিপদের মোকাবিলা করতে পারবেন না। তার জন্য আমার মতো একজন বিচক্ষণ লোক আপনার সঙ্গে থাকা দরকার, যে চোখ কান খুলে রেখে আপনার আসন্ন বিপদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে পারবে।'

আমি তখন মনে মনে দারুণ বিরক্ত। এই চতুর নাপিতের হাত থেকে কি করে রেহাই পাওয়া যায়, সেই চিন্তায় আমি তখন মগ্ন। তখন আমি তাকে এড়াবার জন্য শেষ চেষ্টা করে দেখার জন্য তৎপর হলাম, 'কিন্তু নাপিত ভায়া, সেখানে তো তোমার যাওয়া হতে পারে না।'

'হ্যাঁ, কেন যে আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে নিতে চাইছেন না। কিন্তু মালিক আজ যে আপনার বড় বিপদের দিন, সেই বিপদ থেকে একমাত্র আমি আপনাকে রক্ষা করতে পারি। আর আপনি আমাকে এড়াতে চাইছেন মালিক, এই বাগদাদ শহরটা বড় বিপজ্জনক। এই শহরের সর্বত্র ফাঁদ পাতা আছে। তার ওপর আজ হচ্ছে জুম্মাবার, আজকের দিনে আল্লাহর কাছে যে যা প্রার্থনা করে থাকে, খোদা তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে থাকেন। কে জানে ঐ মেয়েটি কি মতলবে আছে—'

'বেযাকুফ ব্যাটাচ্ছেলে, চুপ করবে তুমি? নিকুচি করেছে তোমার গণনা!' আমার তখন এতো রাগ হচ্ছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল দিই তাকে দু'ঘা কষিয়ে। আমার প্রেয়সীর নামে এমন হীন অপবাদ দেওয়া! 'যাও, এখুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। আমার ব্যাপারে তুমি কি জানো যে, এসব কথা বলছো?'

'মালিক, আপনি এখন খুব উত্তেজিত। একটু শান্ত হয়ে আমার কথা একটু মন দিয়ে শুনুন তাহলেই বুঝতে পারবেন!' নাপিত তখন আবার তার বক্তৃতা শুরু করলো, 'এখনো আপনি আমার কাছে আসল ব্যাপারটা গোপন করে যাচ্ছেন। কিন্তু আমি আপনার সব খবরই রাখি। আর আপনার আসন্ন বিপদের সংকেত পেয়ে সাধ্য মতো আপনার সাহায্যের জন্য ছুটে আমি এখানে এসেছি।'

নিজের মনেই সে বকে চলে, অবশ্য সেই সঙ্গে সে ক্ষৌরকর্ম শেষ করতে তৎপর হয়ে উঠলো এবার। পাড়ার লোকেরা পাছে তার কথা শুনে ফেলে, সেই আশঙ্কায় আমি চুপ করে রইলাম, প্রতিবাদ করলে যদি সে থামতে না চায়। এক সময়ে ক্ষৌরকর্ম শেষ করলো সে। তখন নামাজ পড়ার সময় হয়ে এসেছে। আমি তখন হাঁফ ছেড়ে তাকে বললাম, 'এবার মাংস এবং সরাব সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমার মেহমানদের আপ্যায়ন করো। আমি তোমার ফেরার অপেক্ষায় থাকব। তারপর আমরা দুজন এক সঙ্গে সেখানে যাবো।'

নাপিত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে

দাঁড়ালাম। মসজিদে নামাজ পড়ার আওয়াজ কানে ভেসে আসছিল। দ্রুত পোষাক বদলে নিলাম। তারপর একাই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। এক রকম ছুটেই আমার প্রেয়সীর বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হলাম। সেই বৃদ্ধা বাড়ির প্রবেশ পথে দাঁড়িয়েছিল। বৃদ্ধা আমাকে সঙ্গে নিয়ে দোতলায় মেয়েটির কক্ষে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো। আমি সেখানে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মালিক কাজী সাহেব নামাজ পড়ে ফিরে এলেন। জানলার ফাঁক দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, উল্টোদিক এক রকে বসে নাপিতটা মেয়েটির ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে (হায় আল্লাহ ঐ দুষ্ট গ্রহটা এখানে পর্যন্ত আমার পিছনে ধাওয়া করেছে)। কি আশ্চর্য, মনে মনে তাকে অভিশাপ দিয়ে ভাবি, আমার এখানে আসার খবরটা কি ভাবে জানলোই বা সে



এদিকে হলো কি কাজী সাহেব তাঁর মেয়ের মনের খবর তখন হয়তো জেনে গেছেন। রাগে উত্তেজনায় মেয়েকে মারধোর করেন, মেয়েটি ছুটে পালায়। একজন নফর মেয়েটির সাহায্যে ছুটে এলে কাজী সাহেব তখন তাকেও মারধোর করেন তাদের চিৎকার শুনে নাপিতভায়া তখন ভাবে, কাজী সাহেব বোধহয় আমাকে পেটাচ্ছেন। তাই সে তখন চিৎকার করে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। কিছু পথচারী তার চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে খোঁজ নিতে গেলে সে বলে, 'কাজী সাহেব আমার মনিবকে বোধহয় খুন করে ফেললেন এতক্ষণে। ওঁর হাত থেকে আমার মনিবকে উদ্ধার করার জন্য দয়া করে আপনারা আমাকে সাহায্য করুণ।'

নাপিতের কাতর অনুনয় শুনে পথচারীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ঠিক এমনটিই চাইছিল নাপিত। পথচারীদের সঙ্গে নিয়ে সে তখন কাজীর দরজায় কড়াঘাত করতে থাকে, সেই সঙ্গে হৈ-হৈ, চিৎকার, 'আমার মনিবকে মেরে ফেললো, কে আছো কোথায়, আমার মনিবকে বাঁচাও—'

বাইরে জনতার চিৎকার এবং দরজায় করাঘাত শুনে তিনি তাঁর একজন নফরকে বললেন, 'দেখতো কি ব্যাপার '

একটু পরে তারা ফিরে এসে খবর দিলো, 'মালিক, আমাদের বাড়ির বাইরে দশ হাজারের মতো মানুষজন উত্তেজিত হয়ে অভিযোগ করছে, এ বাড়িতে তাদের কোন মালিক যেন খুন হচ্ছে।'

কথাটা শুনে কাজী সাহেব তো স্তম্ভিত। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। সামনে অগনিত জনতা, তখনো তারা সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে 'আমাদের মনিব খুন হচ্ছে, আহা একি সবনাশ হলো গো, একি অবিচার কাজীর বাড়িতে—'

'এসব তোমরা কি বলছো?' উত্তেজিত জনতার উদ্দেশে কাজী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে আমাকে খুলে বলো।'

'পাজী কুত্তা, শুয়োর!' আমার দরদী অনুচররা খিস্তি করে অভিযোগ করলো, 'আপনি আমাদের মালিককে হত্যা করেন নি?'

'তা তোমাদের মনিব আমার কি এমন ক্ষতি করেছে যে, আমি তাকে খুন করতে যাবো?'—

ওদিকে সেই সময় ভোর হয়ে আসতে দেখে শাহরাজাদ তার কাহিনী অসমাপ্ত রেখে চুপ করলো।

পরদিন রাত্রে বাদশাহ শাহরিয়ার শাহরাজাদকে তার অসমাপ্ত কাহিনী শুরু করতে বললে, সে তখন বলে, 'হ্যাঁ জাঁহাপনা, বলবো বৈকি! তাহলে শুনুন কাজী সাহেব এবং সেই তরুণ যুবকটির মুখ থেকেই শুনুন—'



'যা যা বলছিলাম কাজী সাহেব তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'তারপরই বলো, তোমার মনিব আমার এমন কি ক্ষতি করেছে যার জন্য তাকে খতম করতে যাবো? আমার বাড়ি তোমাদের সবার জন্য খোলা আছে। আমার কথা যদি না তোমাদের বিশ্বাস হয়, বেশ তো তোমরা নিজের চোখে আমার বাড়িতে ঢুকে দেখে যাও।'

'কেন, আপনি তাঁকে মারধোর করেন নি? অস্বীকার করতে পারেন?' নাপিত তখন কাজীর সামনে এগিয়ে এসে কৈফিয়ৎ চায়, 'আমি নিজের কানে তাঁর চিৎকার শুনেছি। পাজী, ছুঁচো, ন্যাকামো করে আবার বলা হচ্ছে, তোমাদের মনিব কি করেছে যে তাকে খুন করতে যাবো? আপনি কিছুই জানেন না বললেই আমরা বিশ্বাস করে নেবো? আমি আপনার বাড়ির হাঁড়ির খবর সব জানি। আমার কাছে খবর আছে, আপনার আদরের দুলালী মেয়ের আমার মনিবের সঙ্গে মহব্বত আছে, আপনার অনুপস্থিতে অন্য দিনের মতো আজও আমার মনিব আপনার মেয়ের সঙ্গে মহব্বতের খেলা খেলতে আসে। আর বাড়ি ফিরে এসে আপনার নজরে সে পড়ে গেলে আপনি আপনার নফরদের হুকুম করেন, তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলার জন্য। আর তাই করে, আমি নিজের কানে আমার মনিবের মৃত্যু যন্ত্রণার আর্ত চিৎকার শুনেছি। এর পরেও কি আপনি বলবেন, আপনি এ সবের কিছুই জানেন না? যাই হোক, আমার মনিবকে আমাদের হাতে তুলে দিন। আমার মনিবের মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে আমরা খলিফার দরবারে যাবো। আমরা এর বিচার চাইবো তাঁর কাছে। আপনি কাজী সাহেব, আমাদের অপরাধের বিচার করে থাকেন। আজ আমরা আপনার বিচার চাইবো।'

উত্তেজিত জনতার আদালতে কাজী সাহেব বুঝিবা দ্বিধাগ্রস্থ বিস্মিত এবং বিভ্রান্ত। আমতা আমতা করে তিনি বললেন, 'তোমাদের যদি মনে হয়, আমি তোমাদের মনিবকে খুন করেছি, বেশ তো তোমরা আমার বাড়িতে ঢুকে তাকে খুঁজে নাও, তাতে আমি কোন বাধা দিতে যাবো না।'

কাজীর কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া মাত্র নাপিত তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে কাজীর বাড়িতে ঢুকে পড়ল হুড়মুড় করে। তাদের সেই সব কাণ্ডকারখানা দেখে আমি তখন দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। ধূর্ত নাপিতের চোখে ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই, সে ঠিক কাজীর সামনে আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। তারপর কাজীর বিচারে উঃ আমি তখন আর ভাবতে পারছিলাম না লুকোবার জায়গা না পেয়ে অগত্যা একটা কাঠের পেটির মধ্যে ঢুকে পড়ে ভেতর থেকে ঢাকনাটা টেনে দিলাম সামান্য একটু খুলে রেখে শ্বাস নেওয়ার জন্য ধূর্ত নাপিত কাজীর মেয়ের ঘরে ঢুকে তন্নতন্ন করে খুঁজে অবশেষে সেই কাঠের বাক্সের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি বেশ বুঝতে পারি, সে আমার গন্ধ পেয়ে গেছে। টের পেয়ে গেছে কাঠের বাক্সের মধ্যে আমার অস্তিত্ব।'

হ্যাঁ, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। হঠাৎ সে একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলো, কাঠের বাক্সটা তার মাথায় তুলে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করলো। তখন আমি এ কথাও জেনে গেছি, ধূর্ত নাপিত তার

সেই জ্যোতিষ গণনা সত্য প্রমাণ করার জন্য আমাকে কাজীর বাড়ি থেকে বার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে যায়। যাক, এ যাত্রায় আমার প্রাণ রক্ষা পেলো। সঙ্গে সঙ্গে আবার একথাও মনে হলো, ওই নাপিত ব্যাটা যত বুদ্ধিমানই মনে হোক না, এ কথা তো ঠিক যে, ওর অতি-চালাকীর জন্যই আর একটু হলে কাজী সাহেব আজ আমার গলায় দড়ি পরাতে যাচ্ছিলেন। তাই ওকে বিশ্বাস নেই, কে জানে নতুন করে আবার কি বিপদ ঘটিয়ে ফেলে আমার। অতএব অনিশ্চিতের আশায় বসে না থেকে, তার হাত থেকে নিশ্চিত রেহাই পাওয়ার জন্য করলাম কি সেই কাঠের বাক্সের ঢাকনা খুলে তার মাথার উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম জমিনের উপরে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায়, লাফানোর সময় বেকাদায় পড়ে গিয়ে একটা পা ভেঙ্গে যায়। যন্ত্রণা সামলে কোন রকমে চোখ খুলে সামনের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলাম, হাজার হাজার মানুষ আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে। আমি জানতাম, তারা কি চায়। আসার সময় পকেট ভর্তি রৌপ্য এবং স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। করলাম কি, তাদের দৃষ্টি অন্য দিকে সরানোর জন্য পকেট থেকে সেই মুদ্রাগুলো জমিনের উপরে ছুঁড়ে দিলাম আমার দিক থেকে তাদের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার জন্য। তাতে ফল পেলাম হাতে হাতে। তারপর আমার দিকে ফিরে তাকাবার অবসরও পেলো না তারা। তারা তখন আমার ফেলে দেওয়া মুদ্রাগুলো সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো, কে কত বেশী মুদ্রা সংগ্রহ করতে পারে সেই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলো কৌতূহলী জনতা। টাকার লোভ কি কেউ সামলাতে পারে?

কিন্তু আমার তাতে দারুণ সুবিধে হলো। আমি তখন ধূর্ত নাপিতের দৃষ্টি এড়িয়ে তার নাগালের বাইরে চলে যেতে চাইলাম। আমি তখন একটানা দৌড়ে চলেছি। আর নাপিতও তখন আমার পিছু পিছু ধাওয়া করে চলেছে এবং চিৎকার করে বলেছিল, 'আমার মালিক, কোথায় চলেছেন আপনি। আমাকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আপনি থামুন দয়া করে। ও ভাবে খোঁড়া পা নিয়ে ছুটবেন না, তাতে আপনার কষ্টের লাঘব হওয়া দূরে থাক আরো বেশী যন্ত্রণা পাবেন। আমার জন্যই আজ যে আপনি কাজীর হাত থেকে প্রাণে বেঁচে গেলেন, কেন সেই কথাটা বুঝতে চেষ্টা করছেন না মালিক। আমি আপনার পরম উপকারী দোস্ত। আমি যে আপনার আরো সেবা-যত্ন করতে চাই মালিক—'

'আরো সেবা!' মুহূর্তের জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি বিরক্ত হয়ে তার কথার জবাবে বললাম, 'ঢের, ঢের হয়েছে আর নয়। এর পরেও তুমি আমার সঙ্গে থাকলে সত্যি সত্যি আমি জানে খতম হয়ে যাবো। আর নয়, এবার তুমি আমাকে রেহাই দাও নাপিত-ভায়া। আমি এখন একটু একা থাকতে চাই।



ততক্ষণে আমি কাজী সাহেবের সেই কানাগলি ছাড়িয়ে বাগদাদের এ গলি ও গলি পেরিয়ে বাজারে ঢুকে পড়েছিলাম তারপর একটা দোকানের সামনে গিয়ে তার মালিকের সাহায্যে প্রার্থনা করতেই সে তখন আমার শত্রু সেই নাপিতকে মেরে হটিয়ে দেয়। আমি তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, বাঁচার আলো দেখতে পেলাম। সে আমাকে ভরসা দিয়ে বলে, 'এখন আর তোমার কোন ভয় নেই।'

তারপর সে আমাক তার দোকানের পিছনের ঘরে নিয়ে গিয়ে ঠাঁই দিলো এবং আমার শারীরিক আঘাত নিরাময়ের জন্য হেকিমকে ডেকে পাঠালাম। সেই ফাঁকে আমি তখন আমার ভবিষ্যত কর্মপন্থা ঠিক করে করে নিলাম। ভাবলাম এরপর বাড়ি ফিরে গিয়ে কিই বা হবে। এরপর সেখানে ফিরে গেলে নাপিত আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করবে দিবা-রাত্র, তাতে আমার জীবন আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠবে, আমি মরে যাবে তাই তার হাত থেকে জানে বাঁচার জন্য মনস্থ করলাম, এই বাগদাদ শহরে আর থাকবো না, অন্য কোথাও চলে যাবো। তবে তার আগে আমার অর্থ এবং সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করে যেতে হবে। সেই মতো একজন সৎ লোককে নিযুক্ত করে তার উপরে ভার দিলাম আমার বাড়ি বিক্রী করার অর্থ এবং নগদ অর্থ সে যেন গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়। তারপর একদিন সুস্থ হয়ে উঠে এই খোঁড়া পা নিয়ে তামাম দুনিয়া ঘুরতে ঘুরতে আপনাদের এই শহরে এসে উপস্থিত হলাম এখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার জন্য

তারপরের ঘটনা তো আপনি জানেন, বাড়ির সেই মালিককে উদ্দেশ্য করে তরুণ খোঁড়া যুবকটি বলে, 'আপনি যখন আমাকে আপনার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন, তখন ভাবলাম, এ একরকম ভালোই হলো, আপনার মেহমানদের সঙ্গে আমার আলাপ হবে, সেই সঙ্গে এখানকার লোকজনদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাবে। তাই আমি প্রথমে সানন্দে আপনার আহ্বান গ্রহণ করে নিই। কিন্তু এখানে এসে আমার শত্রু, আমার জীবনের ধূমকেতু ঐ নাপিতকে দেখামাত্র নতুন করে আমি যেন আমার জীবনের একটা অশুভ ইঙ্গিত দেখতে পেলাম। মনে মনে শিউরে উঠলাম, এ কি আল্লাহর খেলা। এখানে এই বিদেশে এসেও ঐ পাজী বদমাস লোক-টার হাত থেকে রেহাই পাবো না? ঐ শয়তানটার জন্যই আজ আমি আমাকে আমার জন্মভূমি ছেড়ে এখানে এই বিদেশ-ভূঁইয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে।'

সেই নাপিতের বিরুদ্ধে এতো বড় অভিযোগ করে তরুণ খোঁড়া যুবকটি খানা-পিনার আসর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আমাদের কেমন যেন কৌতূহল হলো। তখন আমরা সেই অভিযুক্ত নাপিতকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহর কসম খেয়ে বলো, তরুণ যুবকটি যা যা বলে গেলো, সব সত্যি?'

'হ্যাঁ আল্লাহর কসম নিয়ে আমি বলছি', উত্তরে সে তখন কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গীতে বলতে শুরু করলো, 'জানি না, আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন না, তবু আমি আমার নিজের কথা অবশ্যই বলবো। তবে আপনারা যেন মনে করবেন না, এ আমার সাফাই গাওয়া, আসলে নিজেকে দোষমুক্ত করার জন্যই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি। জানেন, ঐ যুবকটি অহেতুক আমার উপর মিথ্যে দোষারোপ করে গেলো। আমি আপনাদের কাছে হলফ করে বলছি, ওর কোন অনিষ্ট আমি করতে চাইনি। আমি ওর বিপদ থেকে ওকে রক্ষা করার জন্য কেবল একটু সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। সেদিন আমি ওকে বারবার সাবধান করে দিয়ে বলেছিলাম, একা যাবেন না মালিক, আজ আপনার নসীব ভালো নয়। কিন্তু আমার কথা উনি শুনলেন না, একাএকা কাজী সাহেবের বাড়িতে গেলেন তাঁর মেয়ের সঙ্গে মহব্বত করার জন্য। আমি আজও বিশ্বাস করি, সেদিন আমার কথা শুনলে তাঁর এ রকম হালও হতো না। যাইহোক, আল্লাহর দোয়ার একটা পা-এর উপর দিয়ে বেঁচে গেছেন। তাও আমি সেই সময় লোকজন নিয়ে হাজির না হলে হয়তো জানেই খতম হয়ে যেতেন উনি। আমার বিচক্ষণ বুদ্ধির জন্যই সে যাত্রায় তিনি জানে বেঁচে গেছেন। তার জন্য এতোটুকু কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করলেন না তিনি। বরং উল্টে আমার উপর দোষারোপ করে গেলেন। একেই বলে নসীব। আমার নসীব খারাপ না হলে নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিই?'

এখানে একটু থেমে নাপিত আবার বলতে থাকে, 'তা আপনারাই বলুন, উনি অভিযোগ করে গেলেন, আমি নাকি কেবল বকবক করি, খালি বাজে কথা বলি, আর আমার এই বাজে বকবক করার জন্যই নাকি ওঁর এই দশা হয়েছে। সত্যিই কি তাই? এতক্ষণ আপনাদের সঙ্গে আমি বসেছিলাম, আপনারা কেউ কি শুনেছেন আমার বকবকানি কিংবা বাজে কথা বলে আপনাদের মূল্যবান সময় কি আমি নষ্ট করেছি? না, আমার বিশ্বাস, সেই দোষে আপনারা কেউ আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবেন না। তবে নিজের স্বপক্ষে আমি নিজে সাফাই অবশ্যই গাইবো, কিন্তু আমার ছয় ভাইদের বেলায় এ সব কথা সাজে না। তারা আমার ঠিক উল্টো। উনি যদি তাদের সম্বন্ধে এ সব অভিযোগ করতেন, তাহলে আমার কিছু বলার ছিলো না। কিন্তু আমাকে এমন অপবাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই প্রতিবাদ করবো। আপনাদের কাছে এর একটা বিহিত চাইবো। তবে তার আগে আমি আমার সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বললেই আপনারা সহজেই অনুমান করে নিতে পারবেন আমি বড় জ্ঞানী আমার মত উদার বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং আমার মতো সাবধানী মানুষ খুব কমই আপনাদের চোখে পড়ে থাকবে। কথার জাল বুনে আপনাদের মূল্যবান সময় আমি আর নষ্ট করাতে চাই না। সংক্ষেপে আমি আমার কথা বলছি এবার। তাহলে শুনুন আমার জীবনের এক দুঃসময়ের কাহিনী:

এক সময়ে বাগদাদে অল-মুস্তাজি বিল্লাহর পুত্র অল-মুসতানসির বিল্লাহর রাজত্বকালে আমি বাস করতাম। তিনি তখন সেখানকার খলিফা ছিলেন। গরীব দুঃখীদের খুব ভালবাসতেন তিনি। তাঁর সুলতানিয়তে কারো কোন অভিযোগ বলতে কিছু ছিলো না! সবাই সুখে বাস করতো, জ্ঞানী-গুণী-জনরা যোগ্য সমাদর পেতো তার কাছ থেকে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন তাঁর সুলতানিয়তে অশান্তি নেমে আসে। প্রজারা তাঁর কাছে অভিযোগ করে দশজন দুস্কৃতকারীর দৌরাত্মে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তারা কখন কার বাড়িতে হানা দিয়ে লুঠতরাজ শুরু করে দেয় সেই ভয়ে তারা সব সময় তটস্থ থাকে। খুব মনোযোগ সহকারে তাদের অভিযোগ শুনলেন সুলতান। তারপর তিনি তাঁর নগর রক্ষককে ডেকে হুকুম করলেন, সেই দশজন দুস্কৃতকারীদের যে ভাবেই হোক বন্দী করে তাঁর সামনে হাজির করার জন্য। তিনি তাকে সাফ জানিয়ে দিলেন, তাঁর সুলতানিয়তে এমন অনাচার, অত্যাচার আর এক মুহূর্তও সহ্য করবেন না তিনি।

তারপর একদিন হলো কি, টাইগ্রীসের উপকূলে সান্ধ্যভ্রমণে বেড়াতে বেরিয়েছি, দেখি, একটা নৌকায় দশজন লোক বসে আছে, নৌকাটা তখন ছাড়ার অপেক্ষায়। আমার তখন মতিভ্রম হলো, ভাবলাম ওদের সঙ্গে আমিও নৌকা-বিহারে যাই। নোঙরটা ঠিক তোলার মুহূর্তে ছুটে গিয়ে সেই নৌকায় আমিও তাদের সাথী হয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই আপনারা জেনে গেছেন, আমি কি রকম স্বল্পভাষী মানুষ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথা বলি না। এমন কি তাদের একবার জিজ্ঞেসও করলাম না, তারা কে, কোথায় যাচ্ছে। কিছু না জেনে-শুনেই আমি সেই নৌকায় চেপে বসি। অবশ্য আমার সেই ভালোমানুষী কিংবা সরল প্রকৃতি যাই বলুন কেন, তার জন্য পরমুহূর্তেই আমাকে দারুণ খেসারত দিতে হলো, হয়ত জানেও খতম হয়ে যেতাম সেদিন। কিন্তু স্রেফ কম কথা বলার দরুণ আর একটু হলে আমি কোতল হয়ে যেতাম।'

একটু থেমে সে আবার বলতে থাকে, 'এই দেখুন আমি কি রকম অন্যমনস্ক স্বভাবের সৎমানুষ। পরের কথা ভুল করে আগে বলে ফেললাম। যাইহোক, গোড়ার কথা আগেই বলি তাহলে—

হ্যাঁ, সবে তখন সেই নৌকার নোঙড় তোলা



হয়েছে, নৌকাটা যখন যাত্রা শুরু করবে, ঠিক সেই সময়ে সুলতানের একদল সেপাই নৌকাটি চারিদিক থেকে ঘিরে এলো। তাদের সঙ্গে স্বয়ং নগর-রক্ষকও এসেছিল। তার হুকুমে আমাদের সবাইকে নৌকা থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে সবার হাতে হাত-কড়া পরানো হলো, বেড়ি পরানো হলো পায়ে। তারপর নিয়ে যাওয়া হলো সুলতানের দরবারে, সেখানেই আমাদের বিচার হবে। পথে কেউ টুঁ শব্দটি করলো না। [illegible] আমার ব্যাপারটা তো সম্পূর্ণ আলাদা। প্রয়োজন যে আমি একটা কথা বলি। কিন্তু আচমকা এমন অবস্থায় পড়ে আমি তখন স্তব্ধ, হতবাক। ভয়ে হারিয়ে আমি তখন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছি একটানা। আমার ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়েছি।

সুলতান তো আমাদের দেখা মাত্র তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। সেই দশজন দাগী আসামীদের কোন কথাই শুনতে চাইলেন না, তার একমাত্র অভিযোগ, তারা দেশের শত্রু, নিরীহ মানুষের শান্তি বিঘ্ন করছে। অতএব তার দরবারে প্রবেশ করা মাত্র তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জহ্লাদকে কাছে ডেকে এনে হুকুম করলেন ঐ দশজন দাগী আসামীদের কোতল করার ব্যবস্থা করো এবং এখুনি।

হুকুম পাওয়া মাত্র জহ্লাদ আমাদের সবাইকে সারিবদ্ধ ভাবে হাঁটু মুড়ে বসতে বললো। বাধ্য ছেলের মতো আমরা তার হুকুম পালন করলাম। সে তার শানিত তরবারী তুলে একের পর এক দুষ্কৃত-কারীর মুণ্ডু ঘাড় থেকে নামিয়ে দিতে থাকে। আমি ছিলাম সবার শেষে। দশজনের গর্দান নেওয়া শেষ। এরপর আমার পালা, আমিই তার শেষ আসামী। আমি তখন এক মনে আল্লাহর নাম জপ করে চলেছি। তিনি বোধহয় আমার কাতর প্রার্থনার কথা শুনে থাকবেন। তা না হলে দশজন দুষ্কৃতকারীর গর্দান নেবার পর জহ্লাদ কেন তার হাতের তরবারী গুটিয়ে তার কোমরে গোঁজা খাপে আবার ঢুকিয়ে রাখতে যাবে। নসীব আমার ভালো না হলে কেনই বা আমাকে সারির একেবারে শেষে দাঁড় করাবেই বা কেন।

আমি তখন গভীর বিস্ময়ে সেই বিচিত্র ঘটনার কথা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি, ততোধিক বিস্ময়ে সুলতান তখন জহ্লাদের চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে কৈফিয়ত তলব করলেন, 'কি ব্যাপার ঐ লোকটার গর্দান নিলে না কেন? কেন আমার হুকুম মানলে না, জবাব দাও!'

'হ্যাঁ, জাঁহাপনা, হুকুম তো আমার জিভের ডগায়



লেগে আছে।' জহ্লাদ উত্তরে বলে, 'আমি আপনার কথার কোন খেলাপ করিনি। আপনার হুকুম মতো আমি দশজন দুষ্কৃতকারীর মুণ্ডু তাদের ধর থেকে আলাদা করেছি, মুণ্ডুগুলো ঠিক ঠিক গোনার ব্যবস্থা করলেই দেখতে পাবেন, আমি ঠিক কাজ করেছি কিনা। আপনি দশজনের গর্দান নিতে বলেছিলেন, যার গর্দান নিইনি, সে হলো একাদশতম ব্যক্তি।'

সুলতানের হুকুম মতো গণনা করে দেখা গেলো, হ্যাঁ, দশটা কাল্লাই পড়ে আছে জমিনের উপরে। সুলতান বুঝলেন, জহ্লাদ ঠিকই বলেছে। সত্যি তো, তিনি তাকে দশজনের গর্দান নিতে হুকুম করেছিলেন। তখন সুলতান ভাবছেন অন্য কথা। তাহলে কে এই একাদশ ব্যক্তি? সেই দশজন দুষ্কৃতকারীদের সাথী হলোই বা কি করে সে। তখন তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি তোমার পরিচয়? কি করেই বা ওদের দলের সঙ্গে মিশে গেলে?'

সুলতানের আদেশ পেয়ে আমি সেই প্রথম মুখ খুললাম। মুখ খুলে প্রথমেই তাঁকে বললাম, 'ধর্মাবতার, আমি কম কথার মানুষ, তাই এতক্ষণ নীরবে আপনার হুকুমে আমি তো আমার গর্দান জহ্লাদের তরবারীর সামনে এগিয়ে দিয়েও তো বসেছিলাম। সে তো আমি নিজের চোখেই দেখলেন। আমি জানতাম, আমাকে কোতল করার আদেশ দিয়ে ভুল করলেন, তবু আমি তখন আপনার ভুল শোধরাবার চেষ্টা করিনি, একটা কথাও বলিনি নিজের নির্দোষিতা

প্রমাণ করার জন্য। আমি আগেই আপনাকে বলেছি, আমি কম কথা বলতে ভালোবাসি, নিজের প্রয়োজনেও কথা বলি না। তাই আমাকে লোকে জ্ঞানী, বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে সম্বোধন করে থাকে। আমার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করে থাকে। আমার সততার উপরে অগাধ বিশ্বাস আছে মানুষের। আর আমার বিশ্বাস খোদা আল্লাহর উপরে। উপর থেকে তিনি প্রত্যেকের ন্যায় অন্যায়ের বিচার করছেন, তার কাছে কারোর প্রতি এতটুকুও দুবলতা নেই। যে যেরকম অপরাধ করবে তার ঠিক ঠিক শাস্তির ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই করবেন। আর নিরপরাধ ব্যক্তিকে রক্ষা করার দায়িত্বও তার, যেমন আজ তিনি আমাকে উপর থেকে ঠিক সময়ে রক্ষা করলেন। তা না হলে আপনার হুকুম পেয়েও কেনই বা জহ্লাদ আমাকে রেহাই দিলো। তার ব্যাখ্যা আপনি নিজের কানে শুনলেন জহ্লাদের মুখ থেকে। আমি একজন নাপিত, ক্ষৌরকর্ম করা আমার জাত ব্যবসা।

তারপর আমি সবিস্তারে বললাম টাইগ্রীস উপকূলে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে কি করে সেই দশজন দুষ্কৃতকারীর দলে মিশে গিয়ে সুলতানের সেপাইদের হাতে বন্দী হলাম, সব খুলে বললাম।

বললাম, তারাই আমাকে আপনার দরবারে নিয়ে এসেছে আপনার বিচারের জন্য। আপনি যখন ঐ দশজন দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে আমার গদান নিতে হুকুম করলেন, তখন আমি একটা কথাও বলিনি, বলিনি আমি নির্দোষ, বলিনি না জেনেশুনে আমি তাদের দলে ঢুকে পড়েছিলাম, বলিনি আপনার সেপাইরা ভুল করে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে। আমি তখন ধীর, স্থির ভাবে শেষটুকু দেখার জন্য শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছিলাম জাঁহাপনা, এর থেকেই আপনি বুঝতে পারবেন, আমি কত সাহসী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। আর আল্লাহর প্রতি আমার বিশ্বাস থাকার দরুণই আজ আমি জানে বেঁচে গেলাম।

ওদিকে সুলতানের মুখে তখন হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। আমার কথায় তিনি দারুণ প্রসন্ন হলেন। এবং আমার সাহস, আমার বুদ্ধির তারিফ করলেন দরবার কক্ষে উপস্থিত সকলের সামনে। তারপর গদ গদ হয়ে বললেন, 'সত্যি নাপিত প্রবর, তুমি ঠিকই বলেছ, তোমার মতো স্বল্পভাষী, বিচক্ষণ এবং সাহসী লোক এর আগে আমি কখনো আমার সুলতানিয়তে দেখিনি।

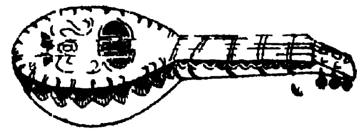
'কিন্তু কি আশ্চর্য দেখুন', নাপিত আবার বললো, 'একটু আগে ঐ তরুণ খোঁড়া যুবকটি কেমন নির্বিবাদে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করে গেলো, আমি নাকি বাজে বকবক করি, অহেতুক পরের কাজে মাথা ঘামাই, আমার জন্যই নাকি তার পা টা ল্যাংড়া হয়ে গেছে। এর পরেও কি আপনারা ওঁর কথা বিশ্বাস করবেন নাকি ওঁর কথা সত্যি ধরে নিয়ে আমাকে অবিশ্বাস করবেন?'

আমরা তখন পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকি। কি উত্তর দেবো নাপিত প্রবরকে। কি আশ্চর্য, লোকটা বাক্যবাগীশ, একটা কথার সূত্র ধরে অনর্গল বকে যায় সে অথচ একটু আগে সে নিজেকে স্বল্পভাষী বলে চিহ্নিত করেছে। এই কি তার নমুনা? একটু আগে সে নিজেকে স্বল্পভাষী বলে বড্ড বড়াই করেছে বড় ধূর্ত এই নাপিতটা। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করলো তার সেই বকবকানি এবং অহেতুক পরের ব্যাপারে নাক গলানোর জন্যই তরুণ যুবকটি তার একটা পা খোঁড়া করে ফেলে। লোকটার শাস্তি হওয়া উচিত। ওর জন্যই তরুণ যুবকটি নৈশভোজের আসর ছেড়ে চলে গেলো। ভারী চতুর বাক্যবাগীশ এই নাপিতটা। দাঁড়াও, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি—'

বাগদাদের খলিফা তখন কি করলো জানেন? মুখে তো তিনি আমার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। কিন্তু—

ঐ তরুণ খোঁড়া যুবকটির মতোই অবিচার করলেন আমার উপরে খলিফা অল-মুসতানসির বিল্লাহ আমার সব কাহিনী শুনে বললেন, 'ওহে স্বল্পভাষী নাপিত-প্রবর, তুমি যে একজন খুব জ্ঞানী, বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে নিজেকে পরিচয় দিলে, সব মানলাম, কিন্তু তোমার মতো একজন এমন সর্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির স্থান তো শুধু এই বাগদাদ শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়, তোমার সেই জ্ঞান তামাম দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর বাগদাদ শহরে তোমার আর স্থান হওয়া উচিত নয়। বাগদাদ ছেড়ে তোমাকে বিদায় নিতে হবে। এখানে তোমার আর একটি দিনও থাকা উচিত নয়।'

আমি তখন বাগদাদ শহর ছেড়ে ঘুরে বেড়াই দেশ থেকে দেশান্তরে। সবশেষে এসে হাজির হই এই চীন দেশে। বাগদাদ শহর ছেড়ে আসার আগে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, খলিফা অল-মুসতানসির মৃত্যু হওয়ার আগে আমার নিজের দেশ বাগদাদ শহরে ফিরে যাবো না। তা একদিন খবর পেলাম, খলিফা অল-মুসতানসির বিল্লাহ নাকি মারা গেছেন। আমার সেদিনের শপথের কথা মনে পড়ে গেলো। দেশে ফিরে গেলাম। দেশের লোকজনদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, আমার ছ'ছটো ভাই নাকি মারা গেছে। সেই দুঃসংবাদটা শোনার পর বাগদাদ শহরটা মনে হলো, আমাকে যেন গিলতে আসছে। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হলো। ভায়েদের পাশে আমি থাকলে হয়তো তাদের এভাবে বেঘোরে জান দিতে হতো না, আমার উপস্থিত বুদ্ধির বলে তাদের নিশ্চয়ই বাঁচিয়ে তুলতে পারতাম। ভাইজানদের হারিয়ে বাগদাদ শহরটা বড় নিঃসঙ্গ বলে মনে হলো আমার কাছে। তাই আবার নিজের জন্মভূমি ছেড়ে বহু দেশ ঘুরে আপনাদের এই চীন দেশে হাজির হলাম একদিন। এখানে এসে আপনাদের এই খানাপিনার আসরে আমন্ত্রণ পেয়ে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার সব আনন্দ মাটি করে দিলো ঐ তরুণ খোঁড়া যুবকটি। আমার জন্য তিনি জানে বেঁচে গেলেন সেদিন, অথচ উল্টে আমাকেই আসামীর কাঠগোড়ায় বসিয়ে চলে গেলেন। আমার নসীবই খারাপ, তা না হলে—যাক সে সব কথা। পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। আমি যে স্বল্প-বাক সে তো আমার আচরণেই প্রমাণ পেলেন আপনারা। তা আপনারাই বলুন, আমি কি জ্ঞানী, নির্ভীক, সাহসী এবং পরোপকারী নই?



নাপিতের গল্প শেষ, তবু থেকে যায় তার রেশ।

অতঃপর চীনের সুলতানের উদ্দেশে দর্জি বলে, জাঁহাপনা, নাপিতের গল্প শুনতে শুনতে আমাদের মনে হয়েছে, এই লোকটা কি বাজেই না বকতে পারে। তার অমন বকবকানিতে বিরক্ত হয়ে আমরা তাকে বন্দী করে একটা ঘরে আটক করে রাখি তারপর খানাপিনা সেরে শাদীর আসর থেকে বেরোতে বেরোতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে আসে।

ওদিকে আমার বিবি তখন বাড়িতে একলা বসে বসে রাগে ফুঁসছিল। স্বভাবতই তার কি সম্ভাষণ হতে পারে তা আপনি সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন জাঁহাপনা। অনুযোগ করে সে বলে, 'সারাটা দিন তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধাদের সঙ্গে স্ফুর্তি করে কাটালে, আর আমি একা বাড়িতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে রইলাম। তুমি কি গো? বাইরে বেরোলে একবারও কি আমার কথা মনে পড়ে না? যাই, সে আমাকে বাধা দিয়ে কোন নিজের কথাই বলতে থাকে, 'না আমি তোমার কথা শুনতে

চাইনা। তুমি যদি এখুনি আমাকে কোথাও বেড়াতে না নিয়ে যাও, আমি তোমার সংসার ছেড়ে চলে যাবো, তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আর রাখবো না তার জন্য পরে আমাকে দোষ দিও না।'

মেয়েদের সেই চিরন্তন অভিযোগ। তাদের মন কি করে দোলাতে হয়, পুরুষদের অজানা নয়। তাই সেই মুহূর্তে তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। সারাটা সন্ধ্যা তাকে সঙ্গ দিলাম, খুশি হলো সে, তার সব রাগ পড়ে গেলো। আমিও কম খুশি হলাম না। বিবিকে পাশে নিয়ে অনেকদিন রাস্তায় হাঁটিনি। ভালোই লাগল অনেকদিন পরে বিবিকে নতুন করে কাছে পেয়ে। খুশির আমেজে মন ভরে উঠলো আমাদের দুজনের। তারপর বাড়ি ফেরার পালা। ফেরার পথে ঐ কুঁজো লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। সরাব পিয়েছিল সে, তবে বেহেড মাতাল হয়নি, জ্ঞান তখনো টনটনে। মুখে শায়েরী টগবগ করে ফুটছিল :—

কে কে বলে আমি নাকি মাতাল,
আমি নাকি পাগল।
হ্যাঁ, সরাব আমার রক্তে,
নই কো তবে অমানুষ।



শায়েরী শুনে মনে হলো লোকটা বেশ মজাদার, তার চেহারার সঙ্গে স্বভাবেরও যথেষ্ট মিল আছে। তাকে আমার বিবির খুব পছন্দ হলো। আমরা, ঠিক করলাম, তাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসবো, তার সঙ্গে রসিকতা করে রাতটা বেশ ভালোই জমবে বলে মনে হয়। লোকটার মনের খবর আরো বেশি করে সংগ্রহ করা যাবে। এক কথায় সে রাজী হয়ে গেলো আমাদের প্রস্তাবে।

খুব খিদে পেয়েছিল। বাড়িতে ফিরেই নৈশ-ভোজের টেবিলে গিয়ে বসলাম। আমার বিবি তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াচ্ছিল। এক সময় সে নিজের হাতে ঐ কুঁজো লোকটার মুখে এক টুকরো মাছ পুড়ে দেয়। কিন্তু তার নসীব খারাপ, মাছের টুকরোটা সে গিলতে পারলো না, হয়তো মদের নেশায় তার ঠিক হুঁস ছিলো না তখন। তাই দম আটকে মারা গেলো সেই মুহূর্তে। তার নিশ্চল দেহটা কুর্শার উপরে এলিয়ে পড়লো। আমরা তখন প্রমাদ গুণলাম। এখন কি হবে? আমার বিবি ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকালো। দু'জনে শলাপরামর্শ করে কুজোর মৃতদেহ আমি কাধে তুলে নিলাম হেকিমের বাড়িতে নিয়ে গেলাম, যেন সে একজন অসুস্থ রুগী, এলাজ করানর জন্য নিয়ে যাচ্ছি। তারপর হেকিমের বাড়ির সিঁড়িতে তাকে ফেলে রেখে এসে পালিয়ে আসি। আমার মতো বিপাকে পড়ে হেকিম তখন বাবুর্চির বাড়ির সামনে তাকে রেখে আসে। বাবুর্চি তার দায়-দায়িত্ব এড়ানর জন্য বাজারের সামনে একটা দোকানের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আসে। এই হলো গতকালকার ঘটনা। আপনি তো সব শুনলেন, আপনার ঐ কুঁজোর থেকে আমার গল্প আরো বেশী চমকপ্রদ, আরো বেশী রোমাঞ্চকর নয় কি জাঁহাপনা?

চীনের সুলতান দর্জির কাহিনী শুনে খুব তৃপ্ত হলেন, তাঁর মুখে খুশির হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। ঘাড় দুলিয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ল্যাংড়া তরুণ যুবক এবং বকবকে নাপিতের গল্প ঐ মৃত কুঁজো লোকটার থেকেও বিস্ময়কর। সত্য কথা, বলতে কি আমি তাদের গল্প শুনতে তাজ্জব বনে গেছি।'

তারপর তিনি তাঁর আমলাদের হুকুম করলেন, দর্জির সঙ্গে গিয়ে সেই ধূর্ত নাপিতটাকে তার বন্দী দশা থেকে মুক্ত করে তাঁর সামনে হাজির করার জন্য। 'সেই স্বল্প-বাকে লোকটার মুখ থেকে আমি তার বক্তব্য শুনতে চাই, যে তোমাদের শাদী বরবাদ করে দিয়েছে, তাকে আমি নিজের চোখে একবার দেখতে চাই। তারপর ঐ কুঁজো লোকটার কবরের ব্যবস্থা তার কবরের উপরে একটা স্মৃতি মিনার তৈরী করিয়ে দেবো—'

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো ভোর হয়ে আসছে। সে তার কাহিনীর ইতি টেনে চুপ করলো।



পরদিন রাত্রে বাদশাহ শাহরিয়ার তাঁর দরবারের কাজকর্ম শেষে শয়নকক্ষে প্রবেশ করেই শাহরাজাদকে হুকুম করলেন, কি গো সুন্দরী, তোমার গল্পের ঝুলি থেকে গতকালের অসমাপ্ত গল্পটা এবার বার করবে?'

'হ্যাঁ, জাঁহাপনা, আমি তো আপনার অপেক্ষাতেই রয়েছি।' শাহরাজাদ মৃদু হেসে বললো, 'তারপর কি হলো শুনুন তাহলে—'

কিছুক্ষণ পরে সেই ধূর্ত নাপিতটাকে চীনা সুলতানের সামনে হাজির করলো তাঁর আমলারা। দর্জিও তাদের সঙ্গে ফিরে আসে। দু'চোখ মেলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নাপিতকে নিরীক্ষণ করলেন। তাকে দেখে তাঁর মনে হলো, লোকটা বৃদ্ধ, নব্বই বছরের ওপরে বয়স হবে তার। বয়স হওয়ার দরুণ মুখের রঙ রোদে পুড়ে তামাটের মতো হয়ে গেছে, মাথার চুল সব শাদা হয়ে গেছে। চোখ দুটো কোটরাগত। লোকটার চেহারাটা কেমন যেন অদ্ভুত ধরণের, না হেসে থাকতে পারলেন না।

হাসি দমন করে তিনি এবার তাকে বললেন, 'ওহে স্বল্প-বাক নাপিত-প্রবর, আমি তোমার কাহিনী সংক্ষেপে শুনতে চাই, শুরু করো—'

'হ্যাঁ জাঁহাপনা, তা আপনাকে শোনাবো বৈকি। তবে তার আগে বড্ড জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, এই খ্রীষ্টান, এই ইহুদি, এই মুসলমান আর ঐ কুঁজো এখানে জমায়েত হয়েছে কেন?'

'কেন, কেন তুমি এই প্রশ্ন করছো?' চীনের সুলতান পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

'কেন এই প্রশ্ন করছি, সেটাও একটা প্রশ্ন হয়ে হয়ে উঠতে পারে', নাপিত জবাবে বলে, 'জাঁহাপনা, আপনাকে আমি আগে-ভাগে জানিতে রাখতে চাই, আমি কোন কাপুরুষ, বাজে বকবক করার লোক কিংবা অলস ব্যক্তি নই। আমি একজন সৎ, জ্ঞানী এবং সাহসী পুরুষ। আমি একজন স্বল্পভাষী মানুষ। আমার জাত পেশা ক্ষৌরকর্ম করার কাজ হলেও পরের উপকার করা আমার একটা মস্ত বড নেশা। আমি যদি আপনার কোন উপকারে আসতে পারি, নিজেকে ধন্য বলে মনে করবো।'

তার সেই উদার মনোভাব দেখে চীনের সুলতান তখন বাবুর্চি, ইহুদী হেকিম ও সেই খ্রীষ্টান এবং দর্জি দালালকে তাদের কাহিনী সংক্ষেপে বলতে আদেশ দিলেন।

নাপিত তাদের কাহিনী খুব মন দিয়ে শোনার পর বিস্মিত হয়ে বললো, 'ও এই ব্যাপার? এতো খুব মজাদার ঘটনা! এক কাজ করুন জাঁহাপনা, আপনি কাউকে হুকুম করুন, ঐ মৃত কুঁজো লোকটার মুখের উপর থেকে চাদরটা সরিয়ে ফেলতে।'

মৃত কুঁজোর মুখের উপর থেকে চাদরটা সরানো হলে পর নাপিত তার মাথাটা নিজের কোলের উপর টেনে নিয়ে একটু সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন নিরীক্ষণ করে। তারপর এক সময় হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠলো, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর মধ্যে একটা না একটা অদ্ভুত ঘটনা জড়িয়ে থাকে। কিন্তু এই কুঁজো লোকটার মৃত্যুর ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

সুলতান একটু অবাক হলেন তার সেই অদ্ভুত কথা শুনে। কৌতূহলী হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার মিত-ভাষী? তোমার একথার অর্থ কি, একটু খুলে বলবে?'

'জাঁহাপনা,' নাপিত তখন বলে, 'আমি ঐ কুঁজো লোকটার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পেয়েছি।' এই বলে নাপিত তার কোমরের বেল্টে গোঁজা লোহার একটা শোন টেনে বার করে কুঁজো লোকটার গলায় ঢুকিয়ে দিলো। কয়েক মুহূর্ত শোনটা তার গলার মধ্যে খুচিয়ে অবশেষে সেটা টেনে টেনে তুলতেই দেখা গেলো রক্ত মাখা একটা বড় মাছের কাঁটা বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সেই কুঁজো লোকটা চোখ মেলে তাকালো, এবং লাফ দিয়ে উঠে বসলো এমন করে যেন তার কিছুই হয়নি মুখে হাত বুলোতে বুলোতে আড়মোড়া ভাঙ্গলো, যেন এই মুহূর্তে ঘুম থেকে উঠলো সে।

'হায় আল্লাহ, আমার কি হয়েছিল! আমি কি গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এতক্ষণ!'

সুলতান সমেত উপস্থিত সবাই সেই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে দারুণ বিস্মিত হলো। এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! মৃত লোক আবার কখনো বেঁচে উঠতে পারে নাকি?

সুলতান তখন নাপিতের সেই অত্যাশ্চর্য কৃতিত্বের তারিফ করে এই ঘটনার কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার জন্য মহাফেজ খানার প্রধানকে আদেশ করলেন। এরপর নাপিতের সম্বন্ধে সবার ধারণা বদলে গেলো। তারা সবাই তাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। এ যেন অলৌকিক ঘটনা। সত্যি কারোর ক্ষমতা না থাকলে কেউ কি কখনো কোন মরা লোককে বাঁচিয়ে তুলতে পারে? এসবই খোদা আল্লাহর কৃপা। নাপিতকে আল্লাহ তাঁর পয়গম্বর করে এখানে পাঠিয়েছেন, সবাই সেই কথাটাই ভাবলো, ভাবলো তার মতো জ্ঞানী-গুণী বোধহয় সুলতানের সালতনিয়তে আর কেউ নেই।

সুলতান তখন মহা খুশি হয়ে ইহুদী হেকিম, মুসলমান বাবুর্চি এবং খ্রীষ্টান দালালকে দামী দামী পোষাক এবং স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিলেন। এবং দর্জিকে দামী পোষাক উপহার দিয়ে তাকে তিনি তাঁর প্রধান দর্জি হিসেবে নিযুক্ত করলেন। তারপর থেকে সেই কুঁজো লোকটা সুলতানের দরবারে আবার তার পাশে এসে বসে শোভা বর্ধন করলেন। আর সেই বিস্ময়কর নাপিতকে দামী ছুরি, কাঁচি এবং ক্ষুর উপহার দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষৌরকার হিসেবে নিযুক্ত করলেন।

শাহরাজাদ তার প্রথম কিস্তির কাহিনী শেষ করে বাদশাহ শাহরিয়ারকে বলে, 'শাহজাদা এ কাহিনীর শেষ এখানেই। তবে এর থেকেও আরো অনেক চমৎকার এবং মজাদার গল্প আমার গল্পের ঝুলিতে রাখা আছে। আপনি যদি অনুমতি দেন তো নতুন করে আবার বলতে শুরু করি—'

শাহরিয়ার তো উচিয়েই ছিলেন শাহরাজাদের গল্প শোনার জন্য। সত্যি মেয়েটা ভালো গল্প শোনাতে পারে। ও বোধহয় যাদু জানে। তা না হলে গল্পের ছলে কেমন মোহিত করে রেখেছে তাকে, ভাবলেন শাহরিয়ার।

ওদিকে দুনিয়াজাদ তার দিদির কানের কাছে মুখ নামিয়ে এসে বলে, 'কি সেই সব গল্প দিদি, বলো না!' অতঃপর শাহরাজাদ নতুন করে আবার গল্প বলতে শুরু করলে।

নাবিক সিন্দবাদ এবং কুলি সিন্দবাদের গল্প

তখন খলিফা হারুন অল-রসিদের রাজত্বকাল, বাগদাদ শহরে সিন্দবাদ হামাল নামে এক গরীব কুলি সারাদিন মাথায় পরের বোঝা বয়ে সামান্য রোজগারে কোন রকমে দিন কাটাতো।

একদিন হলো কি একটা ভারী বোঝা মাথায় নিয়ে চলতে গিয়ে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লো। অবশেষে এক ধনী সওদাগরের বাড়ির সামনে মাথার বোঝাটা নামিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চাইল। সওদাগরের বাগিচা থেকে গোলাপের সুবাস তার নাকে এসে লাগতেই বুক ভরে তার ঘ্রাণ নেয় সে। পরক্ষণেই সওদাগরের বাড়ির অন্দর মহল থেকে একটা মিষ্টি গানের কলি তার কানে ভেসে আসে। আর সে তখন মনে মনে ভাবে, ধনী লোকেরা সত্যি কতই না সুখী, তার কুলি জীবন মিথ্যে। সারাটা জীবন কেবল অভাব আর অনটনেই কেটে গেলো। সে তখন দুঃখের গান গাইতে শুরু করলো:

আমার আঁধার ঘরে
আলোর ঠিকানা গেছে হারিয়ে,
রইনু বসে একা
প্রদীপ জ্বালায়ে।
আমার মনের আঁধার
জানি ঘুচবে না কোনদিন,
একা বাসর সাজায়ে
রইনু বসে একদিন, প্রতিদিন,
সে আসবে, আমায় ভালোবাসবে,
মহব্বত কারে বলে
আমায় শেখাবে,
বলেছিল সে কোন একদিন খেলাচ্ছলে।

গান শেষে মাথায় আবার বোঝা চাপিয়ে যাত্রা শুরু করতে যাবে সে, সেই ধনী সওদাগরের বাড়ির ফটক খুলে একটি কিশোর নফর ছুটে এলো তার কাছে। কচি গলায় সে বলে সিন্দবাদ কুলিকে তার মনিব নাকি ডাকছে।

সিন্দবাদ যুগপৎ বিস্মিত এবং ভয় পেলো। বাড়ি নয় যেন এক প্রাসাদ, সুলতান বাদশাহদের প্রাসাদকে ও যেন হার মানায়। নফর নফরানিরা বাড়ির মালিক বৃদ্ধ সওদাগরের হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো তার চারপাশে। ইয়ার বন্ধু এবং সমাজদার লোকেরা বৃদ্ধের চারপাশে ভীড় করে বসেছিল।

সিন্দবাদ কুলি সেই প্রাসাদ কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র জমিনে চুমু খেয়ে সুলতানের অনুগত প্রজার মতো মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল—

আর শাহরাজাদ দেখলো ভোর হয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে সে তার গল্প থামাল।

পরদিন রাত আবার গভীর হতে যথারীতি বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে সে আবার তার অসমাপ্ত কাহিনীর জের টেনে বলতে শুরু করলো, 'তাহলে শুনুন জাঁহাপনা, তারপর কি ঘটলো—'

সিন্দবাদ তখন গভীর বিস্ময়ে ভাবছিল, এ সে কোথায় এলো? এ যে একেবারে বেহেস্ত। মানুষগুলো যেন একজন জীন কিংবা পরী। তারা সবাই তাকে স্বাগত জানায়। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ লোকটি, প্রাসাদের মালিক তাকে খুব খাতির-যত্ন করে তার পাশে বসিয়ে ভালোমন্দ খানা খাইয়ে শেষে জিজ্ঞেস করলো, 'বেটা তোমার নাম

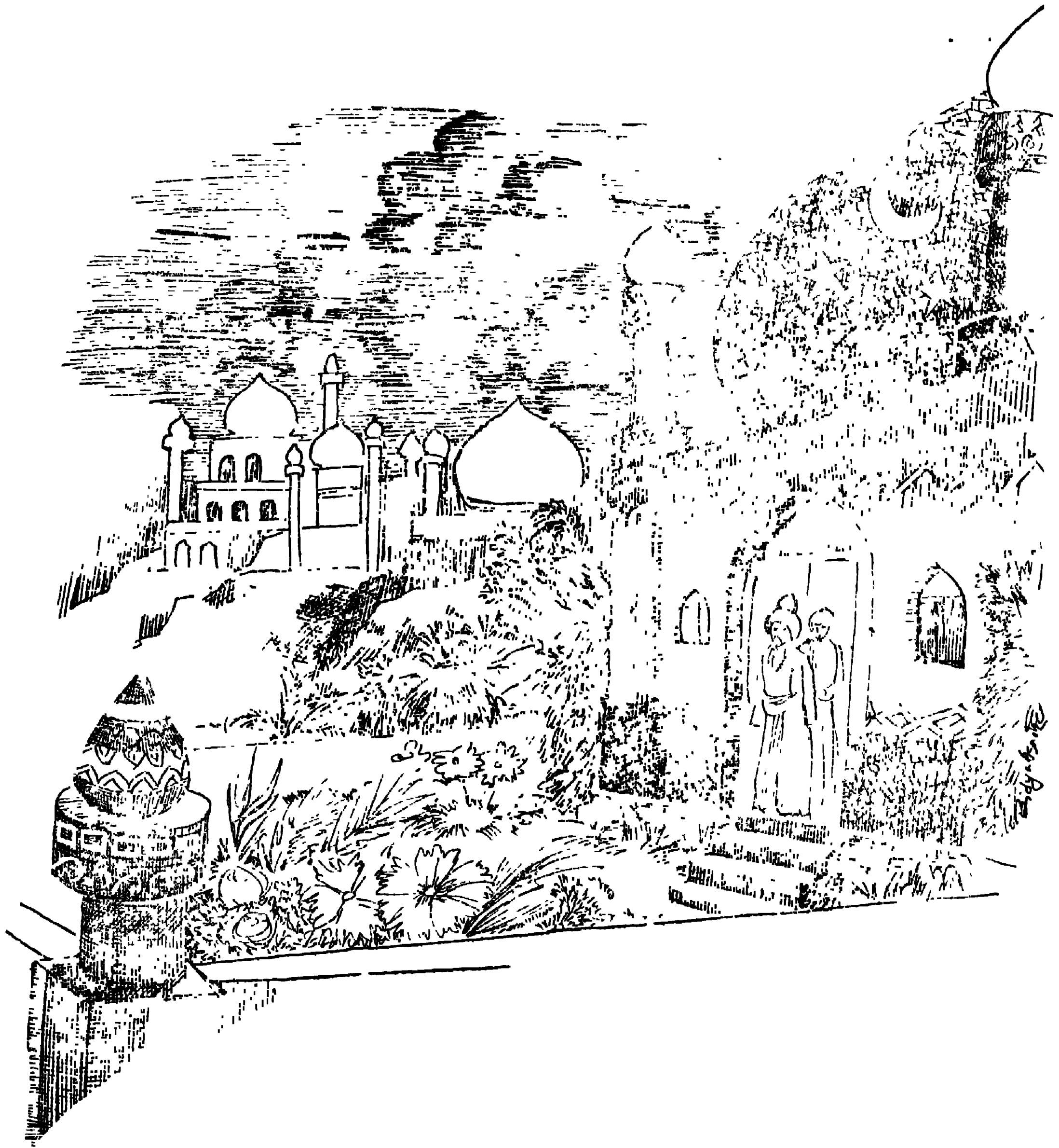
কি তা তো এখনো পর্যন্ত বললে না? আর তোমার পেশাই বা কি বলো আমাকে।'

'বলছি হুজুর, আমার নাম সিন্দবাদ কুলি। মোট বওয়া আমার পেশা, তাতেই কোন রকমে দিন আমার কেটে যায়।'

'তোমার নাম সিন্দবাদ কুলি? কি আশ্চর্য বেটা, আমার নামের সঙ্গে কি অদ্ভুত মিল রয়েছে—আমার নাম সিন্দবাদ নাবিক। আমি তোমার মিষ্টি গান শুনে মুগ্ধ তোমাকে আমার সামনে বসিয়ে গান শোনাব ইচ্ছে হলো, তাই তোমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি আমার ছোট ভায়ের মতো, আমার অনুরোধ রাখবে তো?'

তা সিন্দবাদ কুলি তার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য গানগুলো আমার গাইলো। সিন্দবাদ নাবিক তার সেই দুঃখের গানের কথাগুলো শুনে মুগ্ধ হলো। তার গানের খুব তারিফ করে বললো, 'নামের মতো তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনেরও কি অদ্ভুত মিল রয়েছে যেন। তোমার মতো আমাদের একদিন খুব কষ্টে কেটেছে। বড় বিচিত্র আমার জীবনের কাহিনী শোনাব তোমাকে। জানো বেটা, এই যে আমার এতোবড় প্রাসাদ, এতো নফর নফরানি, ঐশ্বর্য সব দেখছো, আগে এ সব কিছুই আমার ছিলো না। একদিন আমি তোমার মতোই গরীব-দুঃখী ছিলাম। আমার জীবনের সেই সব করুণ কাহিনী তুমি শুনলে বুঝতে পারবে, আমার জীবনের সঙ্গে কতো ভাগ্য বিপর্যয়, মানব আর এর দুঃসাহসিকতাই না জড়িয়ে





আছে। তারই ইনাম স্বরূপ আমার আজকের এই সাফল্য। কিন্তু সেই সাফল্য খুব একটা সহজ লভ্য ছিলো না, অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়ে সেই সাফল্য আমাকে অর্জন করতে হয়েছে, আর তা এসেছে সাত সাতবার অসাধারণ সমুদ্র যাত্রার মাধ্যমে, যেমনি রোমাঞ্চকর, তেমনি বিপদসঙ্কুল সেই সব সমুদ্রযাত্রা। একটা সমুদ্র যাত্রার কাহিনী শুনলেই আমি সত্যি বলছি কিনা তা তোমার মালুম হবে।'

অতঃপর বৃদ্ধ নাবিক তার জীবনের উত্থান পতনের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী বলতে শুরু করলো। সিন্দবাদ কুলিসহ উপস্থিত সবাই নীরবে তার কাহিনী শুনতে থাকে। সিন্দবাদ নাবিক তখন বলতে থাকে—

আমার বাবা ছিলেন তখনকার দিনে একজন অতি দানশীল সম্ভ্রান্ত সওদাগর। গরীব দুঃখীদের দোস্ত ছিলেন। অনেক অর্থ বিলিয়ে দেন তাদের মধ্যে। তা সত্ত্বেও আমার জন্য কম অর্থ এবং সম্পত্তি তিনি রেখে যান নি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি তা ধরে রাখতে পারিনি। আব্বাজানের মৃত্যুর পর তার প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তির একমাত্র মালিক হওয়ার পর দামী দামী পোষাকের বিলাসিতা এবং ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করে একদিন দেখলাম আমি কপর্দকশূন্য হয়ে গেলাম, আমি তখন একজন রাস্তার ফকির বই আর কিছু নয়। দারিদ্রকে আমার বাবা বড় ঘৃণা করতেন এবং আমিও। তাই সেই দারিদ্রের হাত থেকে বাঁচার জন্য তখন আমার অবশিষ্ট বিষয় সম্পত্তি বেচে দিয়ে একদিন সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়লাম বিদেশে বাণিজ্য করে আবার ভাগ্য ফেরানোর জন্য।

এই সময় রাত্রির অবসান হতে দেখে শাহরাজাদ তার গল্প থামিয়ে চুপ করলো।

পরদিন রাত্রে বাদশাহ শাহরিয়ার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে তাকে তাঁর দু'বাহুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে অসমাপ্ত কাহিনী শোনার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ করতেই সে তখন বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিকের কাহিনা বলতে শুরু করলো আবার—

আমাদের জাহাজ বাগদাদের বন্দর ছেড়ে একদিন বসরাহর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তারপর সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এক বন্দর থেকে আর এক বন্দরে মালপত্তর কেনা-বেচা করে একদিন একটা অজানা দ্বীপে গিয়ে আমাদের জাহাজ নোঙর করলো। ঘন সবুজ অরণ্যে ঘেরা দ্বীপ, যেদিকে তাকাই শুধু শস্য শ্যামল প্রান্তর, নাম না জানা গাছের সারি, নির্জন, মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে বেহস্তের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

দ্বীপে নেমে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রান্নার কাজে লেগে গেলো, আবার কেউ কেউ দ্বীপটা ঘুরে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লো, এবং আমি যেন হারিয়ে যেতেই দলছুট হয়ে দ্বীপটা প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে দিলাম।

জ্বালানী কাঠের উনানে সবেমাত্র রান্নার কাজ তখন শুরু হয়েছিল, হঠাৎ সেই সময় জাহাজের দিকে ছুটে গিয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো, 'তোমরা যে যেখানে থাকো, কাল বিলম্ব না করে এক্ষুণি জাহাজে ফিরে এসো।

'তোমরা যে যেখানে আছ জাহাজে ফিরে এসো আমরা যেটা দ্বীপ ভেবে চড়ুই-ভাতি করবো বলে ভেবেছিলাম, আসলে সেটা কোন দ্বীপ নয় বন্ধুগণ, সে হলো বিরাট একটা সামুদ্রিক মাছের পিঠ। হাজার হাজার বছর ধরে গভীর সমুদ্রের ঠিক মাঝখানে ঘুমুচ্ছে। দিনের পর দিন সমুদ্রের বালি আর পলিমাটি জমে মাছের পিঠে সবুজ গাছপালা গজিয়ে ওঠে এবং শস্য শ্যামলা হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমার আশঙ্কা, সেই মাছের পিঠের উপরে আগুন জ্বালিয়েছো বলে আগুনের উত্তাপ তার পিঠে লাগলেই সে সমুদ্রের অতল গভীরে ডুব দেবে। সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সবাই তখন এই বিরাট সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাবে। তাই আমি তোমাদের আবার বলছি, সময় থাকতে থাকতে তোমরা সবাই জাহাজে উঠে এসো, ঐ মাছটার ঘুম ভাঙ্গার আগেই আমরা এই দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাই।'

ক্যাপ্টেনের সেই ভয়ঙ্কর আশঙ্কার কথা ঘোষিত হওয়ার পর যাত্রীদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ত্রাসের সঞ্চার হলো। যে যার প্রাণ বাঁচানোর জন্য কে

আগে জাহাজে ফিরে যাবে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো, সেই সঙ্গে একটা চাপা উত্তেজনা, ব্যস্ততা লক্ষ্য করবার মতোন। কিছু যাত্রী জাহাজে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে সফল হলো, আর বাকী সবাই উত্তেজিত অবস্থায় চিৎকার করে উঠলো, 'হায় আল্লাহ, এ আমাদের কি সর্বনাশ হলো। আমাদের কি এভাবে সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে?'

একটু পরেই মাছটা উনুনের তাপ সহ্য করতে না পেরে একবার আড়মোড়া ভেঙ্গে সমুদ্রের গভীর জলে ডুব দিলো। আর আমরা, যারা তখনো জাহাজে উঠতে পারিনি, তারা উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ-এর ধাক্কায় ছিটকে পড়লো সমুদ্রের বুকে। একটা বিরাট ঢেউ এসে আমরা সবাই এ ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। কেউ কারো কাছে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর অবসর পর্যন্ত পেলাম না। আমি তখন একা, নিঃসঙ্গ হয়ে সমুদ্রে নোনা জল পান করে আর আল্লাহর নাম নিতে থাকি। তখন একমাত্র তিনিই আমার প্রাণকর্তার ভূমিকা নিতে পারেন। আল্লাহর দোয়ায় একখণ্ড ফাঁপা কাঠের গুঁড়ি সেই সময় হাতের কাছে পেয়ে গেলাম। দু'হাতে সেটা আঁকড়ে ধরে দেহটা ভাসিয়ে দিলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ আমার জীবন অনিশ্চিত করে দিচ্ছিল। আস্তে আস্তে আমাদের জাহাজটা আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো এক সময়ে। আমি তখন অকূল সাগরে আসন্ন মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকি। এক সময় রাত্রির কালো অন্ধকারে ছেয়ে যায় নীল সমুদ্র, যেদিকে তাকাই চারিদিক কেবল কালো শ্লেটের মতো থিকথিকে অন্ধকার। আল্লাহ বোধহয় আমার আকুল প্রার্থনা শুনতে পেয়েছিলেন। পরদিন ভোর হওয়া পর্যন্ত আমাকে বাচিয়ে রাখলেন। আমার চোখের সামনে সমুদ্রের নীল রঙ ভেসে উঠলো। তখনো আমি সেই একখণ্ড কাঠের উপরে বসে ভেসে চলেছি। মাথার উপরে আলো ঝলমলে সূর্য। জ্ঞান ছিলো না। জ্ঞান ফিরে পেতে দেখি আমি তখন একটা দ্বীপের কূলে পৌঁছেছি। সামনে বালিয়াড়ি। পা দু'টো কে যেন মাটির সঙ্গে পেরেক দিয়ে এঁটে দিয়েছিল। কোন রকমে টলতে টলতে ক্লান্ত পা দুটো টেনে নিয়ে চললাম দ্বীপের মাঝখানে। খুব খিদে পেয়েছিল তখন। খাবার বলতে দ্বীপের গাছের ফল আর ঝর্ণার জল। একটা গাছের নিচে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিলাম।

একদিন দ্বীপটা ঘুরে দেখছি, হঠাৎ দূরে একটা অদ্ভুত জিনিষ চোখে পড়লো, জন্তু জানোয়ার নাকি সামুদ্রিক কোন জীব ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না দূর থেকে। দারুণ কৌতূহল জাগলো, কিন্তু কাছে গিয়ে সেটা দেখতে সাহস হচ্ছিল না। যাহোক, এক সময় মনটাকে শক্ত করে সেটা লক্ষ্য করে কাছে এগিয়ে গিয়ে সামনা সামনি হতেই আমার ভুল ভাঙ্গলো, একটা মাদী ঘোড়া সমুদ্রের তীরে একটা গাছের গুঁড়িতে বাঁধা থাকতে দেখলাম। ছোটবেলা থেকে ঘোড়ায় চড়া আমার খুব শখ। সেই শখটা মেটাতে ঘোড়ার পিঠে চড়তে যাবো, সেই সময় কোথা থেকে কে জানে একটা লোক ছুটে এসে আমার পথ আগলে দাঁড়ালো। তারপর বড় বড় চোখ করে ফুঁসে উঠলো, 'তোমার পরিচয়? এখানে কেন এসেছো, তাড়াতাড়ি বলো।'

আমি তখন ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে আমতা আমতা করে পথভ্রষ্ট হয়ে এখানে আসার সেই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা বললাম তাকে।

লোকটা তখন একটু নরম হলো বুঝি। তারপর আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললো। পাহাড়ী চড়াই-উতরাই পেরিয়ে একটা গুহার সামনে এসে মুহূর্তের জন্য থামলো সে, বোধহয় দম নিতে। গুহার ভিতরে প্রবেশ করতেই বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে পড়লাম। এ আমি কি দেখছি? গুহার আভ্যন্তরীন মনোরম দৃশ্য দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। বিরাট একটা

হলঘর, সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো। এমন এক নির্জন দ্বীপের ভেতর এতো সুন্দর একটা প্রাসাদ যে থাকতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে বোধহয় বিশ্বাস হতো না।'

লোকটা তখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আমাকে খুব খাতির-যত্ন করে খাওয়াল, খিদেও পেয়েছিল খুব তখন। তারপর সে আমার পরিচয় জানতে চাইল, জানতে চাইল কিভাবেই বা আমি সেখানে হাজির হলাম। আমি তখন একেবারে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সংক্ষেপে আমার এখানে আসার উদ্দেশ্যের কথা বলে গেলাম সংক্ষেপে, কিছুই বাদদিলাম না।

আমার দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সে অনেকক্ষণ। আমি তখন সেই লোকটার পরিচয় জানতে চাইলাম। উত্তরে সে তার পরিচয় প্রকাশ করে বলে, 'আমি এখানকার সুলতান মিরজানের প্রজা মাত্র, তাঁর হুকুমে আমি উঠে বসি।'

এই সময় শাহারাজাদ দেখলো ভোর হয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার কাহিনী অসমাপ্ত রেখে চুপ করে গেলো।

পরদিন রাতে যথারীতি বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে শাহরাজাদ তার অসমাপ্ত কাহিনীর জের টেনে বলতে থাকে—

দ্বীপের সেই লোকটা তখন সিন্দবাদকে বলে, 'আমাদের সুলতান মিরজানের আদেশ মতো প্রতি মাসে প্রথম চাঁদ দেখার দিনে এই সমুদ্র তীরে আমরা প্রত্যেকে একটা করে মাদী ঘোড়া গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখে যাই। যথা সময়ে সিন্ধুঘোটক জল থেকে উঠে এসে তার সঙ্গে ভাব জমায়, সোহাগ জানায় এবং মাদী ঘোড়ার উপর চেপে স্ফূর্তি করে। তারপর এক সময় সেই খেলা শেষ করে সিন্ধুঘোটক আমাদের মাদী ঘোড়াটাকে জলের ভেতরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মাদী ঘোড়াটার পা বাঁধা থাকার দরুণ সে তখন চিঁহি চিঁহি করে ডাকতে থাকে। আমাদের তখন বুঝতে বাকী থাকে না, মাদী ঘোড়াটার রমণ-সুখ শেষ, ক্লান্তিতে অবসন্ন। আমরা তখন সিন্ধুঘোটককে তাড়িয়ে দিয়ে আমাদের মাদী ঘোড়াকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। যথা সময়ে মাদী ঘোড়াটা বাচ্চা প্রসব করে। এই বাচ্চাগুলোই বড় হয়ে তাগড়াই ঘোড়া হয়ে ওঠে। এই সব ঘোড়া বিদেশের বাজারে চড়া দামে বিক্রী করে আমাদের সুলতান প্রচুর অর্থ উপার্জন করে থাকেন। এবং তাতেই তাঁর এতো ধনদৌলত।'

এরপর সে আমাকে তার দোস্তদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। আমাকে পেয়ে তারা খুব খুশি। লোকটা আমাকে বলে, আল্লাহর দোয়ায় তুমি আমাদের দ্বীপে এসে পড়েছ, তা না হলে অন্য কোথায় যে ভেসে যেতে তার ঠিক নেই। সেখান থেকে তোমার দেশে ফেরার কোন সম্ভাবনাই থাকতো না তখন।

এক সময় সমুদ্রের জল থেকে একটা সিন্ধু-ঘোটককে উঠে আসতে দেখলাম তাদের মাদী ঘোড়ার দিকে লোকটার কথা মতো সিন্ধু-ঘোটকটা মাদী ঘোড়াটাকে জলে টেনে নিতে চেষ্টা করলে সে তার পা ছুঁড়ে তাকে আঘাত করতে থাকে এবং চিঁহি চিঁহি চিৎকার জুড়ে দেয়। তখন সবাই গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে সেই সিন্ধুঘোটকটাকে তাড়া করে সমুদ্রে ঠেলে দেয়।

তারপর তারা আমাকে সেই মাদী ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে তাদের সুলতানের কাছে নিয়ে যায় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য।

সুলতান মিরজান আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার কাহিনী শুনতে চাইলেন। আমার মুখ থেকে সমুদ্রযাত্রায় আমার ভাগ্য বিড়ম্বনার কাহিনী শুনে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে আমার দীর্ঘায়ু কামনা করলেন।

'বেটা, তুমি যখন আমার সুলতানিয়তে একবার এসে পড়েছ তখন তোমার আর কোন ভয় নেই।



তোমার নসীবে এমন দুঃখ লেখা ছিলো। তাই তুমি কষ্ট পেলে। এখন আল্লাহর উপরে ভরসা রাখ, তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন, দেখো।'

আমার উপরে দয়াপরবশ হয়ে সুলতান আমাকে তাঁর দ্বীপের বন্দর দেখাশোনা করার ভার দিলেন। কাজ তেমন কঠিন কিছু নয়। বন্দরে কোন জাহাজ ভিড়লে তার তদারকি করার কাজ। কচিৎ দু'একটা জাহাজ আসে। অতএব কাজের চাপ থাকে না বললেই হয়। তবে এই কাজের ফাঁকে আমি আমার দেশে ফেরার স্বপ্ন দেখি। কোন জাহাজ বন্দরে ভিড়লেই সেই জাহাজের কাপ্তানকে জিজ্ঞেস করি, কোত্থেকে জাহাজটা আসছে, কোথায় যাবে, বাগদাদ শহরটা সে চেনে কিনা, ইত্যাদি। কিন্তু কোন জাহাজের কাপ্তানই বাগদাদের নাম শোনেনি বলে জানায়। আমি তখন একটু দমে গিয়ে পরবর্তী জাহাজ বন্দরের নোঙর করার অপেক্ষায় থাকি। এবং সুলতানের দরবারে ফিরে আসি হতাশ মন নিয়ে। অবশ্য সুলতানের সঙ্গে যতো মিশছি ততই যেন আমাদের বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসা প্রগাঢ় হচ্ছে। আমার উপর সুলতানের বিশ্বাস যেন ক্রমে বেড়ে চলেছে, এক সময় মনে হয়, আমাকে ছাড়া, আমার পরামর্শ ছাড়া তিনি যেন এক পা-ও নড়তে পারবেন না, আমার উপর এমনি নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন তিনি।

সেদিন বন্দর থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এসে দেখলাম কয়েকজন ভারতীয়দের সঙ্গে সুলতান বসে আছেন। আমি তাদের সালাম জানালাম, তারা আমাকে সালাম আলুকম জানালো এবং অতি বিনয়ের সঙ্গে তারা আমার দেশের কথা জানতে চাইলো—

সেই সময় শাহরাজাদ দেখলো, ভোর হয়ে আসছে, তাই সেই রাতের মতো তার কাহিনী অসমাপ্ত রেখে চুপ করলো।

পরদিন রাতে বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুরোধে শাহরাজাদ আবার তার কাহিনীর জের টেনে বলতে শুরু করলো :—'জানেন জাঁহাপনা, ভারতীয়রা যখন

নাবিক সিন্দবাদের পরিচয় জানতে চাইল, সে তখন পাল্টা তাদের পরিচয় জানতে চাইল। এবার সেই নাবিক সিন্দবাদের জবানীতেই শুনুন—

হ্যাঁ, আমার প্রশ্নের উত্তরে তারা জানালো, তারা বিভিন্ন জাতের লোক। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষত্রিয়, যারা তাদের সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ। এবং তারপর ব্রাহ্মণরা হলো অতি সম্মানিত সম্প্রদায় নির্বিবাদী কারোর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ নেই, ধর্মের ব্যাপারে অন্য ধর্মের হিন্দুদের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে বিধান দিয়ে থাক এবং তাদের শাদী ও অন্যান্য শুভ অশুভ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করে থাকে এই ব্রাহ্মণ সমাজ। এ ছাড়া হিন্দুরা নাকি আবো বাহাত্তর বর্ণে বিভক্ত। আমি তো শুনে অবাক। একই সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে এতো ভাগাভাগি? আশ্চর্য!

যাইহোক, একদিন বন্দরে দাঁড়িয়ে আছি নতুন জাহাজ আসার অপেক্ষায়, এক সময় একটা জাহাজ আমাদের বন্দরে এসে নোঙর করতেই আমি এগিয়ে গেলাম জেটির দিকে। এক এক করে যাত্রীরা নেমে আসছে সুলতানের সুলতানিয়তে। জাহাজে কি কি মালপত্র আছে সে সবের একটা হিসাব নেওয়ার জন্য আমি তখন জাহাজে উঠে গেলাম। জাহাজের কাপ্তেন এক এক করে সব জিনিষপত্তর আমাকে দেখালো। সব মাল তদের দেখা হয়ে যাওয়ার পর কাপ্তেনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, খালাস এই বিক্রী-বাটি জন্য আর কোন সামানপত্তর নেই?'

হ্যাঁ, আছে বৈকি!' কাপ্তেন উত্তরে বলে, 'তবে সেই সব সামানপত্তরের মালিকরা এখন জাহাজে নেই, বিক্রী করা যাবে না, তাই দেখাচ্ছি না'

'কেন, তারা আপনার সঙ্গে জাহাজে আসেনি?'

'হ্যাঁ, তারা অন্য যাত্রীদের সঙ্গে বাগদাদ থেকে যাত্রা শুরু করে বটে, তাতে মাঝ সমুদ্রে তাদের ভাগ্য বিপর্যয় হয়, তারা আমাদের দল থেকে হারিয়ে যায়। খোদা আল্লাহ জানেন, এখনো তারা জানে বেঁচে আছে কিনা!'

তখন আমি দারুণ বিস্মিত। একি খোদার খেলা? তাঁর পয়গম্বর হিসেবে তিনি কি এই জাহাজের কাপ্তেনকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে? তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য কাপ্তেনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা তাদের মধ্যে একজনের নাম কি সিন্দবাদ?'

'হ্যাঁ, সিন্দবাদ নামে একজন যাত্রী আমার জাহাজে ছিলো বৈকি। কিন্তু আপনি, আপনি কি করে তার নাম জানলেন?'

অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে কাপ্তেন। এবং আমিও এবার খুব কাছ থেকে তাকে নিরীক্ষণ করতে থাকি। না, আর কোন সন্দেহ নেই। আমি ঠিক চিনেছি। এই লোকটিই আমার সেই জাহাজের কাপ্তেন ছিলো, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই আমি তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, আমি, হ্যাঁ, আমিই সেই নাবিক সিন্দবাদ, একদা আপনার জাহাজের যাত্রী ছিলাম। সেই সব দুর্ভাগা সওদাগরদের মধ্যে আমিও একজন। আমি তখন সব খুলে বলি, সে আমাকে সমুদ্রে ফেলে রেখে জাহাজ নিয়ে চলে যাওয়ার পর কি ভাবে বিপদ-সঙ্কুল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মাত্র একখণ্ড কাঠের



টুকরোর উপর বসে এই দ্বীপে এসে পৌঁছই, সবিস্তারে বর্ণনা দিলাম আমার জাহাজের কাপ্তেনকে।

এই সময় রাত্রির অবসান হতে দেখে শাহারাজাদ তার কাহিনী অসমাপ্ত রেখে চুপ করলো।

পরদিন রাত্রে বাদশাহ শাহরিয়ার থাকতে না পেরে নিজের থেকেই আবার বলেন, 'তারপর কি হলো? জাহাজের কাপ্তেন চিনতে পারলো সিন্দবাদকে?'

'সে কথা সেই সিন্দবাদ নাবিকের মুখ থেকেই শুনুন জাঁহাপনা—'

'জানো সিন্দবাদ', সিন্দবাদ নাবিক তখন তার নতুন দোস্ত সিন্দবাদ কুলিকে বলছিল তার সেই সমুদ্র যাত্রার কাহিনী। 'কাপ্তেন তো প্রথমে আমার কথা বিশ্বাসই করতে চায় না। তার ধারণা ছিলো সমুদ্রের অতল জলে তলিয়ে গেছি আমি। কিন্তু আমার সেদিনের সেই জাহাজের সহযাত্রীরা আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলো। আমাকে সনাক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। অনেক দিন পরে তারা আবার আমাকে তাদের মধ্যে ফিরে পেয়ে আনন্দে ফেটে পড়লো। কাপ্তেনকে শুনিয়ে তারা বললো, 'আল্লাহর কৃপায় এ তোমার পুনর্জন্ম সিন্দবাদ।'

তারপর তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে আমার সামানপত্তর জাহাজ থেকে নামিয়ে আনলো। তাতে আমার লেখা দেখতে পেলাম। সেই সব সামান পত্তর থেকে সব থেকে ভালো এবং দামী জিনিষ বেছে নিয়ে সুলতান মিরজানকে উপহার দেবার জন্য সঙ্গে নিয়ে চললাম তাঁর দরবারে। তাকে আমি সব খুলে বললাম। আমার জাহাজ আবার ফিরে এসেছে, আমি আমার সব সামানপত্তর ফিরে পেয়েছি শুনে খুব খুশি হলেন তিনি। কিন্তু পরমুহূর্তে আমার সঙ্গে তাঁর আসন্ন বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করে মুষড়ে পড়লেন তিনি। তিনি তখন জেনে গেছেন, আমার জাহাজ ফিরে আসা মানেই আমার দেশে ফিরে যাওয়া। তাঁর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। শেষ পর্যন্ত শিশুর মতো কেঁদে ফেলে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোমার মতো সৎ দোস্ত, পরামর্শদাতা এ জিন্দেগীতে আর বোধহয় পাবো না। এই বলে তিনি আমাকে তাঁর সুলতানিয়তে সবচেয়ে দামী দামী সামগ্রী উপহার দিলেন। এমন কি বিদায় বেলায় তিনি তাঁর সবচেয়ে দামী পোষাকটা খুলে আমাকে পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা কেন দিলাম জান? দেশে ফিরে গিয়ে যখনি তুমি আমার এই পোষাক পরবে তখুনি আমাকে তোমার অবশ্যই মনে পড়বে। তাই বলছি এটা তুমি যত্ন করে রেখে দিও।'

আমার প্রতি তার সে অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা ভাবতে গিয়ে মনে মনে ভাবলাম, এ রকম দোস্ত পাওয়া তকদিরের কথা। আল্লাহর দোয়ায় ঠিক সময়ে তাঁর দেখা পেয়েছিলাম বলেই সেদিন আমি আবার দেশে ফেরার সুযোগ পেলাম। তা না হলে সমুদ্রের অতল জলে তলিয়ে যেতাম কবেই।

তারপর সুলতানের মেহেরবানিতে আমি আমার সামানপত্তর বেশ ভালো দামে বেচে দিলাম। দেশে ফিরে তাঁর দেওয়া বেশির ভাগ উপহার সামগ্রী চড়া দামে বিক্রী করলাম। আমি তখন রীতিমত একজন ধনী ব্যক্তি। বিদেশে বাণিজ্য করে পরিণত ভাগ্য ফিরিয়ে বাগদাদে ফিরে গেলে পর যারা আমার দুঃসময়ের সময় দূরে সরে গিয়েছিল সেদিন আবার আমার চারপাশে তাদের ঘুরঘুর করতে দেখা গেলো। আহা মরি মরি, ভালোবাসার কি নমুনা। মনে মনে ভাবলাম, একমাত্র অসময়ে প্রকৃত আত্মীয়-স্বজন এবং দোস্তদের চেনা যায়। যাইহোক, কাউকে আঘাত দেওয়া আমার স্বভাব নয়। তাই ভাগ্য ফিরে পেয়ে প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হয়েও আমি তাদের কাউকে ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। খুশি মনে তাদের সঙ্গে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করলাম। আমার প্রাসাদে আবার নতুন নতুন ক্রীতদাস এবং ক্রীতদাসীরা কাজে বহাল হলো। সবাই আমার জয়গান গাইতে শুরু করলো। সে

বারের মতো আমার সমুদ্র যাত্রা রীতিমতো সফল বলা যেতে পারে। একেবারে অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা যাকে বলে।



সিন্দবাদ নাবিক তার সমুদ্র অভিযানের কাহিনী শেষ করে সিন্দবাদ কুলি এবং তার অপর মেহমানদের পেট ভরে ভালো মন্দ খাওয়ালো। তারপর বিদায় দেওয়ার সময় সিন্দবাদ কুলিকে একশোটি স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিয়ে বললো, 'আজ তুমি আমাকে তোমার মধুর সঙ্গ দিয়ে আমাকে দারুণ খুশি করেছো, তার জন্য এই সামান্য একটু উপহার তোমাকে দিলাম।'

সিন্দবাদ কুলি গরীব মানুষ। দিনমজুরী করে পেট চালায়, সেই মানুষ যখন এক সঙ্গে একশোটি স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়ে তো খুশি মনে মনে ভাবে সে এ যেন আনন্দের চরম শিখরে পৌঁছলো। তাই সে সিন্দবাদ নাবিককে বহুত শুক্রিয়া জানিয়ে সেই উপহার নিতে গিয়ে।

'এই হলো আমার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী।'

সিন্দবাদ কুলি তার জীবনের সেই ভয়ঙ্কর অভিযানের কাহিনী শুনছিল অবাক বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলো না সে এমনি বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল সে।

সেদিনের সেই তরুণ সিন্দবাদ নাবিক তার মতোই যুবক ছিলো তখন। আর আজ সে বৃদ্ধ। এখন তার একমাত্র ভরসা আল্লাহর উপরে। তার ধারণা খোদার দোয়ায় বেঁচে আছে সে এখনো। সে দিনের সেই সব সমুদ্রযাত্রায় ঝড়ঝঞ্ঝা এবং বিপদ সঙ্কুল পথের কথা মনে করলে আরও ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দেয় যেন। আল্লাহর উপরে বিশ্বাস না থাকলে কি আজও সে বেঁচে থাকতে পারতো?

বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক নিজের থেকেই আবার বললো, 'দোস্ত, আমার কাহিনী তো শুনলে, বুঝতেই পারছো, কি নিদারুণ দুঃখ কষ্ট সহ্য করে তবে আজ আমি এই বিরাট প্রাসাদ, প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হয়েছি। ঘর সংসার, বিবি এবং নাতি-নাতনীদের নিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছি। আমার এই উত্তরণের মূলে খোদার দোয়া না থাকলে কখনোই আজ আমি সেই অন্ধকার জগত থেকে উঠে এসে আলোয় রোশনাই দেখতে পেতাম না। অতএব এর থেকেই তুমি বুঝতে পারছো, তুলনায় তোমার থেকে আমার পরিশ্রম অনেক, অনেক বেশী। অথচ তোমার ঐ সামান্য পরিশ্রমে তুমি কতো না কাতর হয়ে পড়েছো, তোমার ঐ দুঃখের শায়েরী শুনে আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে। বলো, আমি ঠিক বলেছি কিনা?'

'মালিক, আমি স্বীকার করছি, সত্যি আপনার উপরে করুণাময় আল্লাহর অসীম দোয়া, সেই সঙ্গে', সিন্দবাদ কুলি মাথা নিচু করে বলে, 'আল্লাহর প্রতি আপনার অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি আছে বলেই আজ আপনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছেন।' তারপর সে ক্ষমা চেয়ে বলে, 'আমি ভুল করেছি, দুঃখে এতো কাতর হওয়া উচিত হয়নি আমার।'

এরপর থেকে তাদের দোস্তিতে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়লো না, বরং উত্তোরত্তর বেড়েই চললো। অবসর পেলেই সিন্দবাদ কুলি চলে আসতো সিন্দবাদ

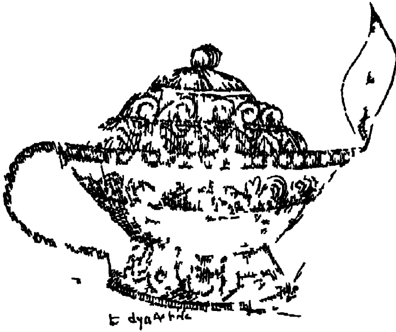
নাবিকের প্রাসাদে। খানাপিনার পর গান-বাজনা এবং স্ফুর্তি করে তারা তাদের বাকী জীবন কাটিয়ে দেয় সুখে-স্বাচ্ছন্দে।

ওদিকে ভোরের আলো ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে সিন্দবাদ নাবিক এবং সিন্দবাদ কুলির কাহিনীর উপরে যবনিকা টেনে বাদশাহ শাহরিয়ারের দিকে তাকালো। শাহরিয়ার অধীর আগ্রহে তার পানে তাকিয়ে বললেন, 'আগামীকাল রাত্রে নতুন কি গল্প শোনাবে শাহরাজাদা?

'এর থেকেও চমকপ্রদ কাহিনী আলাদিন ও আশ্চর্য চিরাগ বাতির কাহিনী. সেই সব কাহিনীতে যাদু আছে, শুনতে শুনতে দারুণ আশ্চর্য হয়ে যাবেন জাঁহাপনা—'

আলাদিনের আশ্চর্য চিরাগ বাতি

এক সময় চীন দেশের এক শহরে এক দর্জি বাস করতো। একটি মাত্র পুত্র সন্তান ছিলো সেই দর্জির নাম তার আলাদিন। ছেলেবেলা থেকেই লেখা-পড়ায় একেবারেই মন ছিলো না তার। দশ বছর বয়সে দর্জি দেখলো, লেখা-পড়ায় যখন তার মন নেই এবার তাহলে তাদের জাত ব্যবসা দর্জির কাজে তার



মন বসানো যাক। খুব ইচ্ছে ছিলো একমাত্র পুত্রকে অন্য কোন ভালো কাজে তাকে শিক্ষানবীসি করাবে। কিন্তু তা যখন আর হলো না, অগত্যা নিজের দোকানে নিয়ে গিয়ে দর্জির কাজ শেখার ব্যবস্থা করলো সে।

কিন্তু তা হবে কি? যে ছেলে রাস্তায় রাস্তায় দোস্তদের সঙ্গে খেলায় মত্ত থাকে দশ বছর বয়সে বাবার দোকানে দর্জির কাজে আবদ্ধ হয়ে থাকতে তার মন কেন চাইবে? তাই সুযোগ পেলে বাবা হয়তো কোন খদ্দেরের বাড়ি তৈরী পোষাক পৌঁছে দিতে গেছে, অমনি আলাদিন দোকান থেকে পালিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তো, দোস্তদের সঙ্গে খেলায় এবং হৈ-হল্লোড়ে মেতে উঠতো।

গরীব দর্জির বড় আশা ছিলো ছেলের উপরে, লেখা-পড়া শিখে মানুষ হবে, তার মতো কষ্টকর সামান্য দর্জির ব্যবসা আর তাকে করতে হবে না। জীবনটা ছেলের রোজগারে কাটিয়ে দেবেন, সে আশা তো পূরণ হলো না এমন কি তাদের জাত ব্যবসা দর্জির কাজেও তার মন বসানো গেলো না। তার মনের দুঃখে একদিন তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লো। সেই যে শয্যা নিলো, আর রোগ মুক্ত হতে পারলো না। একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে বেহেস্তে চলে গেলো সে।

তার বিধবা বিবি দেখলো, স্বামী নেই, একমাত্র পুত্র অপদার্থ তাই সে জলের দামে দর্জির দোকানটা

বেচে দিলো। সেলাই-ফোঁড়াই-এর কাজে তার হাতটা বেশ পাকাপোক্ত ছিলো। বাড়িতে খদ্দের-দের সেলাই-এর কাজ করে কোন রকমে মা-বেটার পেটটা চালাতে থাকে সে। রুজি-রোজগারের ব্যাপারে আলাদিনের কোন ভ্রুক্ষেপই নেই তখন। মা তার কি ভাবে রোজগার করে তাদের পেট চালানোর ব্যবস্থা করছে, সে সব কথা ভাববার অবসর কোথায় তখন? সে তখন তার ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে খেলায় মত্ত থাকে!

একদিন, বয়স তখন তার প্রায় পনেরো, কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে তার দেহে প্রথম যৌবনের ছোঁয়া লাগতে শুরু করে। এমনিতেই ছেলেটা দেখতে বেশ ভালোই ছিলো, দেহে যৌবন আসতেই দেখতে আরো খুবসুরৎ হলো সে। সেই বয়সে সবাই তার দিকে না তাকিয়ে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। ডান-পিটে ছেলেটা তখন সবার প্রিয় হয়ে উঠলো।

একদিন হলো কি সে তার দোস্তদের সঙ্গে নিয়ে খেলছে, এক দরবেশ ফকির সেই পথ দিয়ে যেতে গিয়ে আলাদিনকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। সত্যি ছেলেটা অপূর্ব সুন্দর দেখতে তো? এই রকম একটা সুন্দর ছেলে পেলে—

লোকটা তার ভাবনা আপাততঃ মুলতুবি রেখে তার পরবর্তী কাজের জন্য এগিয়ে গেলো। লোকটা আসলে ফকির নয়, মরোক্কোর মুর সে, এক কুখ্যাত যাদুকর। জ্যোতির্বিদ্যাতেও জ্ঞান তার অগাধ। মানুষের ললাটের লিখন পড়ে অনায়াসে সে তার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত বলে দিতে পারতো। আলাদিনের ললাটের লিখন পড়ে সে বুঝতে পারে। এই ছেলেটির জন্যই প্রতীক্ষা করছিল সে এতদিন, এর জন্যই সুদূর মরোক্কো থেকে এই চীন দেশে ছুটে এসেছে।

কিন্তু কে এই ছেলেটি? কি তার পরিচয়? বুদ্ধি করে আলাদিনের অজান্তে তার এক দোস্তকে কাছে ডেকে এনে চুপি চুপি আলাদিনের পরিচয় জেনে নিলো। তারপর আলাদিনের কাছে গিয়ে তার নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি তো এখান-কার দর্জির ছেলে? তোমার আব্বাজান কেমন আছে আলাদিন?'

'তিনি তো নেই। অনেক দিন হলো তাঁর দেহান্তর ঘটেছে।'

'সেকি? কিন্তু আমি যে—' মুরের বাকী কথা মুখেই থেকে যায়। তার বদলে তার দু'চোখের কোল বেয়ে পানি ঝরে পড়ে।

লোকটা করে কি? অপরিচিত তার নাম, তার আব্বাজানের পেশার কথা জানে দেখে এমনিতেই দারুণ অবাক হয়েছিল আলাদিন, তারপর মুরকে আপনজনের মতো তার আব্বাজানের মৌৎ-এর খবর শুনে কাঁদতে দেখে তখন সে তার অদম্য কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারলো না। তার মায়াভ চোখে তখন অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসা।

আচ্ছা ফকির সাহেব, 'তুমি আমাদের এতো খবর জানলে কি করে? আর এ ভাবে কাঁদছই বা কেন বলো তো?'

'কাঁদবো না? আমি যে অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছিলাম,' মুর বলে, 'সারাটা জীবন বিদেশে কাটিয়ে ভাবলাম তোমার আব্বাজানের সঙ্গে একবার দেখা করে যাই, কবে মরে যাই তার কোন ঠিক নেই। কিন্তু এখানে এসে তোমার মুখ থেকে শুনলাম, বেঁচে নেই সে। তোমার আব্বাজানের মোৎ-এর খবরটা শুনে আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে। যাবে না? সে যে আমার বড় ভাইজান ছিলো, জানো আলাদিন, তুমি আমার ভাতিজা, আমাদের বংশের একমাত্র সন্তান। তোমার দোস্তদের মধ্যে দূর থেকে তোমাকে দেখে আমি ঠিক চিনতে পেরে-ছিলাম, তোমার মুখটা ঠিক আমার বড় ভাইজানের মতো দেখতে হয়েছে। সেই মুখ, সেই চোখ—'

সেই সময় কি শাহরাজাদ দেখলো পুবের আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। তাই সে তার

কাহিনী অসমাপ্ত রেখে চুপ করলো সেদিনের মতো।

পরদিন আবার রাত নামতেই শাহরাজাদের ছোট বোন দুনিয়াজাদ তাকে মনে করিয়ে দেয়, 'কই দিদি, তোমার গল্প আবার শুরু করো? উঃ কি মিষ্টি তোমার গল্প, আর তোমার কি জাদু আছে কে জানে, গল্প শুনতে শুনতে ঘুম যেন কোথায় উধাও হয়ে যায়।'



'এমন খোসামুদি ভাষায় কথা না বললেও আমি তোমাদের গল্প ঠিক শোনাতাম বোন', শাহরাজাদ অতঃপর বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে তার অসমাপ্ত গল্পের জের টেনে বলতে শুরু করলো, 'জানেন জাঁহাপনা, মরোক্কোর সেই মূর লোকটি তখন দর্জির নাবালক পুত্র আলাদিনকে বলতে থাকে—

'জানো ভাতিজা, তোমার দুঃখে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। আমি কতো না হতভাগ্য। স্বদেশে আমার বড় ভাইজানের মৃত্যু ঘটলো, তুমি তার নাবালক পুত্র, কোন রুচি-রোজগার নেই, সেই দুঃখে আমার বুকের ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে। তোমার আব্বাজানের মৃত্যুর পর তোমার মা, এবং তুমি যে কতো অসহায়, বিদেশে থাকার দরুণ কোন খবরই আমি রাখতে পারলাম না। তাই নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। আমি জানি এতে কেউ আমাকে সমর্থন করবে না। কিন্তু আল্লাহ্ জানত, আমি নিরপরাধ। আমার কোন দোষ নেই।'

আলাদিনকে বুকে জড়িয়ে ধরলো তার যাদুকর চাচা। তারপর সে তার বটুয়া থেকে দশটি স্বর্ণমুদ্রা বার করে আলাদিনের হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'শোনো ভাতিজা, এই সোনার মুদ্রাগুলো তোমার মাকে দিয়ে বলো, তোমার বাবার ছোট ভাই, মানে তোমার চাচা বিদেশ থেকে দেশে আবার ফিরে এসেছে আল্লাহর দোয়ায়, কাল আমি তাঁকে সালাম জানাতে যাবো এবং আমার বড় ভাইজানের বাসস্থান আর তার কবরটা দেখে আসবো সেই সঙ্গে।'

যাদুকর মূর তার দৃষ্টির আড়াল হতেই আলাদিন আনন্দে নাচতে নাচতে ছুটে এলো তার মা'র কাছে। সাধারণতঃ অন্যদিন এতো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে না সে। আলাদিনের মা অবাক চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'তুমি খুব অবাক হয়ে গেছো, না?' আলাদিন তার মা'র গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'আজ তোমাকে একটা শুভ সংবাদ দেবো। জানো মা, একটু আগে আমার চাচার সঙ্গে দেখা হলো, অনেকদিন, পরে তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। কাল আসবেন তোমাকে সালাম জানাতে।'

'কিন্তু বাছা', আলাদিনের মা কেমন দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলে, 'তোমার কোন চাচা আছে বলে তো আমার জানা নেই।'

'তা কি করে হয় মা, নিজের থেকে তিনি আমার নাম বললেন, আমার আব্বাজানের দর্জির দোকানের কথা তুললেন তার মৌৎ হওয়ার খবর শুনে হাউ হাউ করে কাঁদলেন। তারপর এই দ্যাখো না, তিনি আমার চাচা না হলে কেউ কি শুধু শুধু পরের ছেলেকে দশটা স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেয়?'

'কে জানে, আমি কতদূর জানি, তোমার আব্বাজানের এক ভাই ছিলো বটে, কিন্তু সে তো

করেই মারা গেছে', আলাদিনের মা বলে, 'তার আর কোন ভাই ছিলো বলে তো আমার জানা নেই—'

'এই সময় শাহরাজাদ দেখলো, ভোর হয়ে আসছে, তাই সে তার আলাদিনের গল্প মুলতুবি রেখে চুপ করলো।



পরদিন রাত গভীর হওয়া মাত্র দুনিয়াজাদ ছিনে জোঁকের মতো বায়না ধরলো, 'দিদি, তোমার সেই আলাদিনের আশ্চর্য চিরাগবাতির গল্প এখুনি শুরু করো লক্ষীটি। আমার যে আর তর সইছে না—'

'হ্যাঁ বোন, এখুনি শুরু করছি।' তারপর সে বাদশাহ শহরিয়ারের দিকে ফিরে বলে, 'জানেন জাঁহাপনা, তারপর সেই ডানপিটে ছেলে আলাদিন তখন যেন অন্য এক এক ছেলে হয়ে গেছে। যে ছেলেবেলা না হলে বিছানা থেকে উঠতো না, সে কিনা পরদিন ভোর সকালে বিছানা থেকে উঠে তাড়াতাড়ি গোসল সেরে নাস্তা-পানি করে বেরিয়ে পড়লো তাদের সেই খেলার মাঠটার উদ্দেশে। তার চাচা মুর লোকটা গতকাল বলে গিয়েছিল আজ সকালে তার জন্য সেখানে অপেক্ষা করবে সে।

তবে একটু দেরী করেই তার চাচা সেই নির্দিষ্ট জায়গায় এলো। এসেই আলাদিনের হাতে দু'টি দিনার দিয়ে কৈফিয়তের সুরে বলে, 'একটু দেরী হয়ে গেলো বেটা, তার জন্য তুমি যেন আবার মন খারাপ করো না। বরং এই দুটি দিনার তোমার মার হাতে দাও গিয়ে। আর তাকে বলো, আজ আমি তোমাদের বাড়িতে খানাপিনা করবো। মাকে গিয়ে বলো তার আয়োজন করতে। নামাজ পড়েই আমি তোমাদের বাড়িতে যাবো।'

আলাদিনের মা তো দু'দুটি স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়ে খুব খুশি হলো। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু অবাকও হলো। আলাদিনকে সে চেনে, নিজের পেটের ছেলের স্বভাব তার অজানা নয়। যাইহোক, এসব সত্ত্বেও আলাদিনের হাত থেকে দুটি স্বর্ণমুদ্রা হাতে নিয়ে বাজার করতে বেরিয়ে পড়লো আলাদিনের মা সওদা করার জন্য, স্বামীর ছোট ভাই মুখ ফুটে আজ তার বাড়িতে খেতে চেয়েছে, এতো তার সৌভাগ্যের কথা। তাছাড়া, 'এখন আর কোন সন্দেহ নেই, সত্যি সত্যি আলাদিনের চাচাই বটে। সে তার ভাতিজার ভালোর জন্য যে সব উপকার করছে তা ভোলার শুধু নয়, আলাদিনের এখন একটা দৃঢবিশ্বাস জন্মেছে, মুর লোকটার উপর থেকে তার সন্দেহের পর্দাটা একটু একটু করে সরিয়ে ফেলার জন্য সচেষ্ট হলো সে।

ওদিকে দুপুর গড়িয়ে যায়, আলাদিনের নতুন চাচা তাদের বাড়িতে তখনো আসছে না দেখে তার মা বলে, 'রাস্তায় বেরিয়ে একটু দেখ তো বাছা, তোর চাচা বোধহয় বাড়ি চিনতে পারছে না।

আলাদিন তখন বাইরে বেরোবার জন্য উদ্যোগ করতে যাবে, সেই সময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হতেই ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে সে দেখলো তার চাচা দাঁড়িয়ে আছে দরজার ওপারে, সঙ্গে একটা কুলি, তার মাথায় একটা ঝুরি—সরাবের বোতল এবং নানান ফলে ভর্তি।

আলাদিনের মা তৎক্ষণে গুটি গুটি পায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল আলাদিনের পাশে, আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা। বৃদ্ধ দরবেশ তাকে দেখে মাথা নিচু করে শ্রদ্ধা জানায়, 'খোদা হাফেজ। মুর লোকটার দু'চোখের কোন ছাপিয়ে জল উপচে পড়লো। কান্না জড়ানো স্বরে সে তখন আলাদিনের

মাকে জিজ্ঞেস করলো, 'বড় ভাইজান কোন্ ঘরে বসতো আমাকে একবার দেখিয়ে দাও।'

আলাদিনের মা তার কান্না দেখে নিশ্চিত হল, মূর লোকটা সত্যি তার স্বামীর ছোট ভাই না হয়ে যেতে পারে না। অতঃপর সে তার স্বামীর বসবাস ঘরে নিয়ে গেলো মূরকে। শ্রদ্ধা এবং ভক্তিতে মূরের মাথা নত হয়ে আসে, জমিনের উপরে চুমু খেয়ে সে তখন বলে, 'আমার কি দুর্ভাগ্য! বড় ভাইজানের মতো অমন সৎ মানুষকে শেষ সময়ে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলাম না; অপদার্থ আমি, তার কোন কাজে আমি লাগলাম না।' বলে সে এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো শিশুর মতো।

সেই সময়ে ভোর হয়ে আসতে দেখে শাহরাজাদ চুপ করলো।



পরদিন গভীর রাতে বাদশাহ শাহরিয়ার তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করলে পর দুনিয়াজাদ বললো, 'দিদি এবার তোমার সেই সুন্দর গল্পটা শুরু করো, শুনতে বড় ভালো লাগে তোমার গল্প।'

'হ্যাঁ, বোন, শুরু করবো বৈকি, তবে তার আগে শাহজাদার অনুমতি না পেলে শুরু করি কি করে বলো?'

বাদশাহ শাহরিয়ার তো তখন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন শাহরাজাদের গল্প শোনার জন্য। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

'হ্যাঁ, জাঁহাপনা, এবার শুনুন তাহলে, আলাদিনের মা'র আর কোন সন্দেহ রইলো না তারপর। সে তখন স্থির নিশ্চিত আলাদিনের নতুন চাচা তার স্বামীর ছোট ভাই।'

ওদিকে মূরও তখন তার যাদুবিদ্যায় বড় ভাইএর বিবিকে বশ করার জন্য খুব ভালো ভালো কথা শোনাতে থাকে, 'আচ্ছা বড় ভাই-এর বিবি, ভাইজান তো অনেকদিন হলো মারা গেছেন, শুনেছি তখন কোন রকমে সংসার চালাতেন। আর তাঁর দর্জির দোকানটাও শুনেছি তুমি নাকি বিক্রি করে দিয়েছো। তাহলে এখন তোমাদের পেট চলে কি করে?'

আলাদিনের মা এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। স্বামীর ছোট ভাইকে অমন এক দরদী লোকের ভূমিকা নিতে দেখে প্রীত হলো সে। তার মনে কোন সংশয় নেই, মূর তার স্বামীর ছোট ভাই না হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু আলাদিনের মা ভাবে, কি করে বলবে, তার ছেলেটা একটা অপদার্থ, এত বয়স হলো, অথচ রুজি-রোজগারের কোন তাগিদ নেই তার। কেবল ইয়ার-দোস্ত এবং খেলা ছাড়া আর কিছু ভাবতে জানে না সে। এসব কথা কি করেই বা বলবে সে তার স্বামীর ছোট ভাই-এর কাছে।

আলাদিনের মাকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মূর লোকটা শান্ত সংযত গলায় আত্মীয়তার স্বরে বলে, 'বড় ভাইজানের বিবি, তোমাদের এমন দুরাবস্থায় সময়ে আমি কোন উপকারে আসতে পারিনি, একেই তো তার জন্য নিজেকে আমার খুবই অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। তারপর তুমি যদি আমাকে তোমাদের অভাব অভিযোগের কথা না বলো, তাহলে আমি ভাববো, তোমায় আমাকে

তোমাদের আপনজন বলে মনে করো না। তাতে আমার দুঃখ আরো বেড়ে যাবে। না বড় ভাই-এর বিবি, দেরী হয়ে গেছে তাতে কোন ক্ষতি নেই, এখন অন্তত তোমাদের সেবা করতে দাও আমাকে। বলো, সত্যি করে বলো তো, সংসারে আলাদিনের কি কোন মন নেই?'

এতো করে যখন বলছে, আলাদিনের মা আর চুপ করে থাকতে পারে না। তখন সে সব খুলে বললো তার ছেলের গুণের কথা। সব শুনে মূর লোকটা বলে, 'তা জন্য কোন চিন্তা নেই বড় ভাই-এর বিবি, আমি যখন তোমাদের কাছে এসে গেছি, আলাদিনকে মানুষ করাব সব ভার আমার উপরে ছেড়ে দাও। সব মনের মতো কাজের ব্যবস্থা আমি করে দেবো।' একটু থেমে মূর আরো বললো, 'ভাবছি, বাজারে একটা বড় কাপড়ের দোকান বানিয়ে দেবো ওকে। খুব একটা পরিশ্রম করতে হবে না। কর্মচারী রেখে যথেষ্ট নাফা করতে পারবে।'

মূরের মুখ থেকে অমন ভালো ভালো কথা শুনে আলাদিনের মা'র মন তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে বলে, 'আপনার ভাতিজা, যে ভাবে তাকে আপনি প্রতিষ্ঠা করতে চান তাতেই আমার সায় আছে।'

'ঠিক আছে', আলাদিনের দিকে ফিরে মূর এবার বলে, 'কাল সকালে তুমি তৈরী হয়ে থেকো। তোমাকে নিয়ে আগে বাজারে বেরোবে। আর পাঁচজন দোকানীদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো, যাতে করে তারা তোমাকে চিনতে পারে, তোমার সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারে। তবে হ্যাঁ, তার আগে সওদাগর হতে হলে সবার আগে চাই ভালো সাজ-পোষাক। তা সে কাল বাজার থেকে কিনে নিলেই চলবে, কি বলো ভাতিজা?'

আলাদিনের মনে আনন্দ আর ধরে না তখন। নতুন পোষাক পড়ে কাপড়ের দোকান খুলে বসবে সে, উঃ কি আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দেয় সে।

'অনেক বেলা হল, আজ তাহলে চলি। কাল এমন সময়ে আবার আসবো। চলি বড় ভাই-এর বিবি, চলি আলাদিন।'

মূর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে আলাদিনের মা ভাবে, স্বামীর ছোট ভাই তো নয় যেন সাক্ষাৎ আল্লাহর পয়গম্বর। বড় ভাইজানের বিবি আর ছেলের জন্য কতই না চিন্তা। পরমাত্মীয় না হলে কেউ কি পরের জন্য এভাবে উপকার করতে এগিয়ে আসে নাকি? না, এমন ভালোমানুষকে আর সন্দেহ করা উচিত নয়। এখন থেকে আলাদিনের ভালোমন্দ তার স্বামীর ছোট ভাই-এর উপরেই ছেড়ে দেবে সে, ভাবলো আলাদিনের মা।

এই প্রথম মূরের কথা-বার্তায় এবং ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তার খাওয়ার ব্যবস্থা করলো। টেবিলে ভালো-মন্দ খাবার সাজিয়ে তাকে খাওয়ার জন্য আহ্বান করলো আলাদিনের মা। সব শেষে সরাব পরিবেশন করতে ভুললো না সে। মূর তখন বুঝে গেছে, আলাদিন এবং তার মা'র মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে সে। এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে, সে তাদের একজন পরমাত্মীয়, হিতাকাঙ্ক্ষী। ঠিক এই রকমটিই চাইছিল সে। সরাবের নেশা যখন তুঙ্গে, মূর উঠে দাঁড়ালো তার সরাইখানায় ফিরে যাওয়ার জন্য। এবং পরদিন সকালে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেলো সে।

পরদিন সকালে মূর লোকটা কথা মতো আবার এলো। আলাদিনের মা নিজে গিয়ে সদর দরজা খুলে দিলেন। মূর কিন্তু সেদিন আর বাড়ির ভেতরে ঢুকলো না, বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলো। এগিয়ে গিয়ে তার চাচার হাতে চুমু খেয়ে সালাম

জানায়। আর মূর তার হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বাজারে চলে আসে।

একটা বড় পোষাকের দোকানে ঢুকে দোকানের মালিককে মূব বলে, 'সব থেকে দামী পোষাক দিন আমার এই ভাতিজার জন্য।' হাতের ইশারায় আলাদিনকে দেখায় সে।

আলাদিনের পছন্দ মতো শাহজাদার পোষাকই কিনলো সে। কোন দরদাম নয়, দোকানী যে দাম চাইল তাই সে মিটিয়ে দিলো। দামী পোষাক হাতে পেয়ে আলাদিনের আনন্দ আর ধরে না। চাচার হাত ধরে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে সে।

তারপর চাচা তাকে শহরের সব থেকে ভালো একটা হামামে নিয়ে গেলো। সেখানে তারা ভালো করে গোসল সারলো। নতুন পোষাকে সজ্জিত হয়ে আরসির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আলাদিন। তার চেহারাটা একেই খুব সুন্দর ছিলো তার ওপর দামী পোষাকে তাকে সত্যি সত্যি শাহজাদার মতো দেখতে মনে হচ্ছিল। তার খুশি আর ধরে না তখন। চাচার কাছে ফিরে গিয়ে সে তার হাতে চুমু খেয়ে তাকে বহুত সুক্রিয়া জানালো নতুন পোষাক কিনে দেওয়ার জন্য।



এই সময় ওদিকে ভোরের আলো ফুটে উঠতে দেখে শাহরাজাদ চুপ করলো। বাদশাহ শাহরিয়ারের কাছ থেকে পরদিন আবার গল্প বলার অনুমতি নিলে।

পরদিন আবার রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াজাদ বলে ওঠে,—'তারপর আলাদিনের কি হলো দিদি? ওর সেই মরোক্কো ফেরত চাচা ওর দোকান খোলার ব্যবস্থা করেছিলো তো?'

'হ্যাঁ বোন, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। শাহরাজাদ এবার বাদশাহ শাহরিয়ারের দিকে ফিরে বলে, 'তার আগে আমাদের মালিক শাহজাদার অনুমতি নেওয়া তো প্রয়োজন।'

শাহরিয়ার মিটিমিটি হেসে বলে, 'অনুমতি তো তোমাকে অনেক আগেই দেওয়া আছে শাহরাজাদ। বারবার অনুমতি চেয়ে তুমি মিথ্যে সময় নষ্ট করছো। তোমার বোনের মতো গল্পের পরবর্তী অধ্যায় শোনার জন্য আমিও খুব উদগ্রীব। নাও এবার তোমার কাহিনী শুরু করো—'

হাঁ, বৃদ্ধ মূর তারপর আলাদিনকে সঙ্গে নিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়ালো, নানান উদ্যান, মসজিদ ঘুরে সন্ধ্যার দিকে একটা রেস্তোঁরায় ঢুকে নৈশভোজ সারলো। অমন মুখরোচক দামী সুস্বাদু খাবার এর আগে কোনদিন খায়নি আলাদিন। তার বাবা ছিলো একজন গরীব দর্জি। সেই সব দামী খাবার চোখে দেখা দূরে থাক নামও শোনেনি সে কখনো। সেই সঙ্গে আকণ্ঠ সরাব পান করলো তারা।

রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে বৃদ্ধ মূর রেস্তোরাঁর পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে আলাদিনকে বলে, 'বেটা, একদিন তুমিও তোমার ব্যবসা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এই রকম একটা প্রাসাদের মালিক হতে পারবে। তবে ভালো সওদাগর হতে হলে তোমাকে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী সওদাগরদের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের আদব-কায়দা, ব্যবসার কারসাজি তাদের সঙ্গে মিশে জেনে নিতে হবে। আমার সরাইখানায় চলো, আজই তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো।'

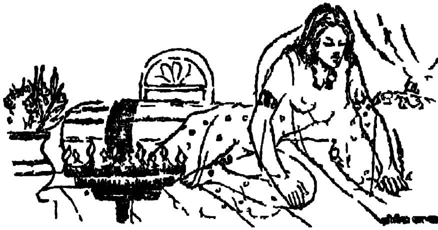
মূরের সরাইখানা থেকে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেলো আলাদিনের। মূর তাকে পৌঁছে দিতে আসে। ওদিকে আলাদিনকে বাদশাহী পোষাকে

সজ্জিত দেখে যুগপত বিস্মিত এবং পুলকিত হলো আলাদিনের মা।

'ভাইজান, কি বলে যে তোমাকে সুক্রিয়া জানাবো ঠিক বুঝতে পারছি না,' যুবকে ঘরে আহ্বান করে নিয়ে এসে আলাদিনের মা বলে, 'খোদা আপনাকে ঠিক সময়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি কি উপকার করলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আলাদিনকে আমি আপনার হাতে তুলে দিলাম। হয়তো আপনার সামনে বাঁদরটা মানুষ হলেও হতে পারে।'

'কেন, তোমার তাতে সন্দেহ আছে নাকি' মূর তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, 'ওর মতো বুদ্ধিমান ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। এখন কাজের কথায় আসা যাক। কাল জুম্মাবার, হাট-বাজার বন্ধ, পরশুর আগে আলাদিনের দোকান খোলা যাচ্ছে না। তবে আগামীকাল সকালে আলাদিনকে এক বাগান-বাড়ির পার্টিতে নিয়ে যাবো ভাবছি। সেখানে অনেক তাবড় তাবড় সওদাগরেরা আসবে তাদের সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দেবো। জানো তো, ব্যবসায় উন্নতি করতে হলে অন্য সব সওদাগরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হয়—'

ওদিকে তখন ভোর হয়ে আসতে দেখে শাহরাজাদ চুপ করলো।



পরদিন রাত গভীর হতেই ছুনিয়াজাদ আবার অনুরোধ করলো, 'দিদি তোমার সেই মিষ্টি গল্পটা আবার শুরু করো—'

পরদিন সকালে বৃদ্ধ মূর চাচার আসতে দেরী হতে দেখে প্রথমে আলাদিন একটু মুষড়ে পড়লো, বোধহয় সে আর এলো না। একটু পরেই আলাদিনের সব আশঙ্কা, সব ভাবনা মন থেকে মুছে দিয়ে মূর লোকটা দরজায় করাঘাত করলো। আলাদিন ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

'একটু দেরী হয়ে গেলো বেটা, তুমি হয়তো ভাবছিলে, তোমার চাচা বোধহয় তোমাকে ধাপ্পা দিয়ে গেলো। না, তা নয় বেটা, একটা শুভ কাজে যাবো বলে আজ জুম্মাবার মসজিদে ভালো করে নামাজ পড়ে এলাম তোমার শুভ কামনা করে। আর দেরী নয়, শুভস্য শীঘ্রম ! চলো, এবার বেরিয়ে পড়া যাক।'

বাগান বাড়ির পার্টির নাম করে তো মূর তাকে বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে এলো, কিন্তু শহর ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র ছাড়িয়ে এক সময় আলাদিন তার চাচার সঙ্গে একটা জঙ্গলে গিয়ে প্রবেশ করলো, জঙ্গলের চারপাশে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পাহাড়ী পথে হাঁটতে গিয়ে এক সময় ভীষণ ক্লান্তি-বোধ করলো আলাদিন। পা আর চলে না। মূর তাকে কেবল বলতে থাকে, 'আর বেশী দূর নয় বেটা, আর একটু হাঁটলেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবো।'

মরোক্কর বৃদ্ধ মূর তখন মনে মনে ভাবছে, সুদূর মরোক্কো থেকে এই চীনদেশে এসে আমি তোমারি খোঁজ করছিলাম আলাদিন। তোমার দেখা পাওয়া মাত্র আমি ধরে নিয়েছি, এবার নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার মুখের দিকে তাকিয়েছেন। একবার সেই পাহাড়ী উপত্যকার নিচে আলাদিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে একবার নিয়ে যেতে পারলে হয়, তখন কে আর তাকে দেখে।

এক সময় সেই নির্দিষ্ট পাহাড়ী উপত্যকার সামনে এসে তারা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসে পড়লো।



একটু পরেই আলাদিনের চোখে ঘুম নামলো। ঘুম যখন ভাঙলো, তখন দিনের শেষ আলোটা বুঝি নিভে গেছে। পশ্চিমের অস্তগামী সূর্যের আভা ছড়াচ্ছিল তখন।

আলাদিন ঘুম থেকে জেগে উঠতেই বৃদ্ধ মূর তাকে বলে, 'অনেক ঘুমিয়েছো, এবার একটু কাজ করো দেখি আমার জন্য', বৃদ্ধ মূর বলে, 'সামনে ঐ যে ঝোপঝাড় দেখতে পাচ্ছো, খুব বেশী দূরে নয়। এখন ওখান থেকে কিছু শুকনো ডাল-পালা সংগ্রহ করে নিয়ে এসোতো।'

ভোর হয়ে আসছিল সেই সময়। শাহারজাদ গল্প বলা থামিয়ে বাদশাহ শাহরিয়ারের পানে তাকালে। মৃদু হেসে বাদশাহ অনুমতি দিলো পরদিন শাহরাজাদের মুখ দেখে নতুন করে আবার গল্প শোনার জন্য।

পরদিন রাত গভীর হওয়া মাত্র শাহরাজাদ তার গল্পের জের টানতে গিয়ে বললো, 'জানেন জাঁহাপনা, নতুন জীবনের স্বাদ পাওয়ার জন্য উৎসাহী আলাদিন কিছুক্ষণের মধ্যে থেকে শুকনো ডাল-পালা সংগ্রহ করে নিয়ে এলো বৃদ্ধ মূরের কাছে।

মূর তখন ভাবছিল, এই জায়গাটা খুঁজে পাওয়ার জন্য দীর্ঘ চল্লিশটা বছর অপেক্ষা করার পর এই চীন দেশে এসে ভিড়েছে।

বৃদ্ধ মূর তার অমন তড়িঘড়ি কাজ দেখে খুশি হয়ে বলে, 'এবার বেটা, এখানে একটু শান্ত হয়ে বস। ততক্ষণে আমি আমার কাজগুলি সেরে নিই।'

এই বলে সে সেই শুকনো ডালা-পালায় অগ্নি সংযোগ করে পকেট থেকে একটা কৌটো বার করে ঢাকনা খুললো। কৌটো থেকে গুঁড়ো মতো কি যেন ফেললো সেই আগুনের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ঊর্দ্ধাকাশে উঠতে থাকে।

সে সময় বৃদ্ধ মূর নিজের মনে বিড়বিড় করে কি যেন বলে, আলাদিন তা বুঝতে পারে না। সে শুধু দেখে, জায়গাটা ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়ে অন্ধকারে ডুবে গেছে। একটু পরেই তার কেমন মনে হয়, তার পায়ের নিচের মাটিটা অসম্ভব কাঁপছে। ভূমিকম্প নাকি? কথাটা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট শব্দে জায়গাটায় ফাটল ধরে একটা বিরাট গর্তে পরিণত হয়ে গেছে।

আরে লোকটা যাদু জানে নাকি? আলাদিন এই প্রথম দারুণ ভয় পেলো। এই সব যাদুকররা মানুষের অনিষ্ট করে থাকে। এরা মানুষের উপকারী, দোস্ত সেজে নিজেদের কাজ হাসিল হয়ে যাওয়ার পরই তাকে খতম করে ফেলে। তাহলে মূর চাচাও কি সেই ধরনের লোক? তবে কি সে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের পরিবারের পরম আত্মীয়, তার আব্বাজানের ছোট ভাই বলে অভিনয় করছে! না, লোকটাকে তেমন সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। এই প্রথম আলাদিন তার সেই চাচার অবাধ্য হতে চাইল, পালাবার মতলব করলো।

মূর শুধু জাদুকর নয় জ্যোতিষীও বটে। আলাদিনের মনের ভাবটা টের পেয়ে গিয়ে সে তার হাতটা খপ করে ধরে ফেলে বলে, 'আয় বেটা, তোকে এবার আমার খেল্ দেখাবো। অতো ছটফট করছিস কেন? এদিকে আয়!'

আলাদিন তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে পালাবার জন্য ভয় পাওয়ার মতো করে বলে, 'আমি এমন কি দোষ করেছি চাচা যে, তুমি আমাকে এমন এক অদ্ভুত জায়গায় নিয়ে এলে? না, আমি ঠিক ভালো বুঝছি না চাচা, দয়া করে তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। এদিকে রাতও হয়ে এলো। আম্মা ভাবছে—'

'আরে বোকা ছেলে, এর মধ্যে তোর চাচাকে ভুলে গেলি?' মূর তার মনের ভাবটা আন্দাজ করে এবার তাকে ভালো ভালো কথা বলে ভোলাতে চাইল, 'বেটা, তুই না আমার বড় ভাইজানের ছেলে, আমি কি তোর কোন ক্ষতি করতে পারি? আয়, এদিকে আয়!'

বৃদ্ধ মূর তাকে এক রকম জোর করে সেই গর্তের সামনে টেনে নিয়ে বললো, 'এই যে গর্তের নিচে একটা শ্বেতপাথরের চাঁই দেখতে পাচ্ছো, ওতে একটা তামার কড়া আছে। এবার এই গর্তের নিচে নেমে তামার কড়াটা দু'হাত দিয়ে ধরে পাথরের চাঁইটা সরিয়ে ফেলেই দেখতে পাবে সুড়ঙ্গ পথের একটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে তোমাকে নিচে নেমে যেতে হবে—'

সেই সময় শাহরাজাদ পূবের আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠছে দেখে চুপ করে গেলো।

পরদিন রাতে দুনিয়াজাদ আবার তাড়া দিলো, 'দিদিভাই এবার তোমার গল্প শুরু করো। তারপর আলাদিনের কি হলো?'

'হ্যাঁ বলছি বোন', বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে শাহরাজাদ বললো, 'আলাদিনের মুখ থেকেই শোনো তাহলে—'

ওদিকে আলাদিন তো তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। এ কোথায় আমাকে নিয়ে এলো মূর চাচা? এ যে রূপকথার দেশ যক্ষপুরীতে নিয়ে এলো তাকে। তাকে দিয়ে তার চাচা সেই যক্ষের ধন উদ্ধার করাতে চাইছে।

'না চাচা আমি পারবো না। আমাকে তুমি মাফ করো—'

'দূর বোকা, এতো ভয় পেলে চলে? ঐ গর্তের মধ্যেই যে তোর সব ভবিষ্যত লুকিয়ে আছে। ওর মধ্যে তোর সৌভাগ্যের ধন লুকিয়ে আছে, সেটা তুলে আনতে পারলে তোর ভাগ্য ফিরে যাবে, রাতারাতি তুই বিরাট ধনী লোক হয়ে উঠবি। তোর হুকুমে তামাম দুনিয়া উঠবে বসবে। না, আর দেরী নয়, এবার জলদি এই গর্তের মধ্যে নেমে পড়—'

'তাহলে আমার সঙ্গে তোমাকেও নামতে হবে চাচা। অত বড় পাথরের চাঁইটা আমি তো একা তুলতে পারবো না।'

বৃদ্ধ মূর প্রত্যুত্তরে বলে, 'আরে বোকা ছেলে, আমি যদি পারতাম তাহলে তোকে কেন এখানে নিয়ে আসবো, ও সবই আল্লাহর মর্জি। আমি হাত দিলে এখানে আমার সব পরিশ্রমই পণ্ড হয়ে যাবে। ঐ পাথরের চাঁই কোনদিনও সরানো যাবে না। তাই তোমাকে একা সেই কাজটা সারতে হবে। নিচে নেমে পড়ো, তোমার আম্মা আর আব্বাজানের নাম নিয়ে তামার ঐ কড়াটা ধরে টান দাও, দেখবে অনায়াসে পাথরের চাঁইটা সরে যাবে।'

অগত্যা চাচার হুকুম মতো গর্তের কাছে গিয়ে আলাদিন তার বাবা মার নাম নিয়ে তামার কড়াটা ধরে টান দিতেই সত্যি কেমন একটা হাল্কা জিনিষের মতো সেই ভারী পাথরের চাঁইটা সরে গেলো, আর তখনি তার মনে হলো, তাকে ধাক্কা দিয়ে সেই পাতালপুরীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো—

এবং শাহরাজাদ দেখলো, ভোর হয়ে আসছে। তাই সে চুপ করে গেলো সেই মুহূর্তে।

পরদিন সেই রাত আবার ফিরে আসে। ঘুম ঘুম চোখে তুনিয়াজাদ বলে, 'দিদি, তোমার সেই ঘুম তাড়ানো গল্পটা আবার শুরু করো, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।' ওদিকে বাদশাহ শাহরিয়ারও তাকে তাড়া দিলে সে তখন বলতে শুরু করলো, 'তারপর জাঁহাপনা, সেই বৃদ্ধ জাতুকর আলাদিনকে জমিনের উপর থেকে পাখী পড়ানোর মতো নির্দেশ দিতে থাকে কিভাবে পাতালপুরিতে নামতে হবে, এবং কি ভাবে তার সৌভাগ্যের ধন সেই চিরাগবাতিটা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হবে এবং ফেরার পথে দেখবে হীরা, মনি মুক্তো জহরত গাছে ঝুলছে. যতো পারো গাছ থেকে তুলে নিয়ে এসো—'একটু নেমে বৃদ্ধ মূর আবার বলে, 'পাতালপুরী তো নয় যেন বেহস্তে গিয়ে হাজির হবে তুমি। ছাদের কুলুঙ্গিতে দেখতে পাবে তা সেই চিরাগবাতিটা। ছাদের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে চিরাগবাতিটা নিয়ে পকেটে রেখে দেবে। তোমার দামী-কুর্তা নষ্ট হওয়ার ভয় নেই, কারণ চিরাগের তেল, সাধারণ তেল নয়, সে তেলে দাগ লাগে না।'

এই পর্যন্ত বলে বৃদ্ধ মূর নিজের আঙুল থেকে মন্ত্রপূত একটা আংটি খুলে আলাদিনের হাতের আঙুলে পড়িয়ে দিয়ে বললো, 'এটা সঙ্গে থাকলে কোন অপদেবতা কিংবা শয়তান তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। এখন ভালোয় ভালোয় যত তাড়াতাড়ি পারো কাজ হাঁসিল করে ফিরে এসো বেটা। একবার ঐ চিরাগবাতিটা আমাদের হাতের মুঠোয় এলে দেখবে তখন তুমি তামাম তুনিয়ার সব চেয়ে ধনী লোক হয়ে যাবে। বিরাট প্রাসাদ, দাস-দাসী —'



তামাম তুনিয়ার সব থেকে ধনী লোক হবো আমি?' কথাটা শুনে আলাদিন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তাহলে তো আর দেরী করা ঠিক হবে না। তাড়াতাড়ি পাথরের চাঁইটা সরিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে পাতালপুরীতে নেমে গেলো সে। তারপর চারখানা ঘর পেরোতে হলো তাকে। চাচার নির্দেশ মতো সোনার মোহর ভরা জালাগুলো খুব

সাবধানে ছোঁয়া বাঁচিয়ে বাগানে এসে হাজির হলো সে। বাগান ঘেঁষে সেই সিঁড়িটা তার চোখে পড়লো। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে কুলুঙ্গি থেকে জ্বলন্ত চিরাগবাতিটা তার নজর এড়ালো না।

সেই সময় ভোর হয়ে আসতে দেখে শাহরাজাদ চুপ করলো।

তামার সেই জ্বলন্ত চিরাগবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে সেটা সে তার পকেটে চালান করে দিতে গিয়ে তার বুক কেঁপে উঠলো এক অজানা ভয়ে। তবে পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো সে। চাচা তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, খুব সাবধানে নড়াচড়া করবে সেখানে, এমন ভাব দেখাবে না, যাতে মনে হয় তুমি ভয় পেয়েছো। আর ভয় পেলেই তোমার সর্বনাশ।

যাইহোক অতি সন্তর্পণে ফের আবার বাগানে চলে এলো সে। তারপর সেই গাছগুলোয় কাঁচের ফল ভেবে আসল হীরা, জহর, মণি মুক্তা যতো পারলো সে তার কামিজ কুর্তার পকেটে ভরে নিলো। এবার ফিরার পালা।

সেই গর্তের মুখে এসে উপর দিকে তাকাতে গিয়ে আলাদিন দেখলো, বৃদ্ধ মূর জ্বলন্ত চোখ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে দেখেই সে খিঁচিয়ে উঠলো; 'কই সেই চিরাগবাতিটা এনেছিস?'

'হ্যাঁ, এনেছি বৈকি। আগে আমাকে গর্তের ভিতর থেকে উপরে উঠে যেতে দিন, তারপর সেটা বার করে দিচ্ছি', আলাদিন কি যেন ভেবে বলে, 'তাছাড়া সেটা আমার বুক পকেটের একেবারে নিচে পড়ে গেছে, তার ওপর সেই কাঁচের ফলগুলো চালান করেছি যে, বার করতে দেরী হবে না চাচা—'

'কে তোর চাচা? এ জিন্দেগীতে আমি তোর চাচা হতে যাবো কেন?' মূর তখন খিঁচিয়ে ওঠে, 'ওসব চালাকী ছাড়। এক্ষুনি, এই মুহূর্তে চিরাগবাতিটা আমার হাতে তুলে না দিলে আমি তোকে মজা দেখাচ্ছি। আমার সৌভাগ্যের ঐ ধনটা পাওয়ার জন্য এই চীন দেশে ছুটে এসেছি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে। কি ভেবেছিস, খালি হাতে আমি মরোক্কোয় ফিরে যাবো। না, তার আগে—

আলাদিন তখন পাথরের মূর্তির মতো সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তার চাচার হঠাৎ এই পরিবর্তনের কথা ভাবছিল। তার মাথায় খেয়াল চাপলো, সে ভাবলো, চাচা এখন ভীষণ রেগে আছে, এই সময় উপরে ওঠাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই সে নিচে পাতালপুরীতে নেমে যেতে থাকে আবার।

ওদিকে মরোক্কবাসী যাদুকর বৃদ্ধ মূর তখন রাগে উত্তেজনায় জমিনের উপরে দাঁড়িয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে মাথার চুল ছিঁড়ছিল। কিন্তু এ ছাড়া তার কিছু করার ছিলো না কারণ সেই পাতালপুরীতে প্রবেশ করার অধিকার ছিলো না তার। সে তখন বুঝে গেছে সেই আশ্চর্য চিরাগবাতিটা সহজে হাত ছাড়া করার পাত্র নয় আলাদিন। আলাদিনের তখন কেবল একটাই বক্তব্য, 'পকেট ভর্তি হীরা-জহরতের ভারে আমি নুইয়ে পড়ছি, আগে আমাকে হাত ধরে উপরে তোলো, তারপর তোমার হাতে আমি চিরাগবাতিটা তুলে দেবো—!'

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহরাজাদ গল্প বলা তখনকার মতো থামালো।

পরদিন গভীর রাতে বাদশাহ শাহরিয়ার তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করতেই দুনিয়াজাদ অনুরোধ করলো, 'দিদি, তোমার সেই সুন্দর গল্প আবার শুরু করো—'

শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে শাহরাজাদ আলাদিনের সেই আশ্চর্য চিরাগবাতির কাহিনী বলতে শুরু করলো আবার। 'জানেন জাঁহাপনা, সেই বৃদ্ধ জাদুকর মূর লোকটা দেখল শত অনুরোধ এবং ভয় দেখানো সত্বেও আলাদিন কিছুতেই সেই চিরাগ-

বাতিটা তার হাতে তুলে দিলো না, অথচ সেটা তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তখন সে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলো, আলাদিনকেও তার সুফল সে কিছুতেই ভোগ করতে দেবে না। তখন সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো। পাতালপুরীর প্রবেশ পথ থেকে অদূরে সরে গিয়ে পকেট থেকে মন্ত্রপূত ধুপ-ধুনো জাতীয় গুঁড়ো পকেট থেকে বার করে কাঠের আগুনে নিক্ষেপ করলো। এবং সেই মুহূর্তে তার পায়ের তলাকার মাটি আবার কেঁপে উঠলো ভূমি-কম্পের মতো, সঙ্গে সঙ্গে পাতালপুরীর মুখটা আগের মতো আবার পাথর চাপা পড়ে গেলো। মরোক্কোর শয়তান তখন আলাদিনকে পাতালপুরীতে বন্দী হতে দেখে উল্লাসে ফেটে পড়লো।

যাদুকর মুর যে একজন জ্যোতিষী ছিলো তাতে কোন সন্দেহ নেই সে তার জ্যোতিষ গণনায় জানতে পারে, সেই পাতালপুরীতে গচ্ছিত রাখা আশ্চর্য চিরাগের বাতিটা তার ভাগ্য ফেরাতে পারে, এমনি গুণ সেটার। কিন্তু সে তার গণনায় এও জানতে পারে যে, আলাদিন ছাড়া অন্য কেউ সেই চিরাগবাতিটা পাতালপুরী থেকে উদ্ধার করতে পারবেনা। একমাত্র আলদিনই সেই আশ্চর্য চিরাগবাতির মালিক হতে পারবে। কিন্তু আলাদিন তাতে সেই সৌভাগ্যে বাধ সাধতে তাকে পাতাল-পুরীতে সমাধিস্ত করে ভাবলো এদেশে থাকার আর কোন মানে হয না, এরপর সে তার দেশ মরোক্কোতে ফিরে যাবে।

ওদিকে আলাদিন দেখলো, পাতালেপুরী থেকে উপরে উঠে আসার প্রবেশ পথ পাথর চাপা পড়ে ঢেকে গেছে। পাতালপুরী তখন যাদুকর মূরের যাদুতে কাঁপছিল। দারুণ ভয় পেলো সে। কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ দেখতে না পেয়ে আলাদিন বুঝলো, সেখানেই তার অন্ধকূপ হত্যা হবে। এ সব সেই শয়তান যাদুকরের কারসাজি। তাকে দিয়ে চিরাগবাতি উদ্ধার করার কাজটা হাঁসিল করে নিতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত সে তাকে এখানে খেতে না পেয়ে তিল তিল করে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে।

আসন্ন মৃত্যু যন্ত্রণার কথা মনে করে ভয়ে ভাবনায় চঞ্চল হয়ে উঠে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে শুরু করে দিলো আলাদিন এক সময়। সে তখন জেনে গেছে তার এই আসন্ন মৃত্যু পর্বে তার কোন আত্মিয় কিংবা দোস্ত তার জীবনের শেষ মুহূর্তে মুখে দু'ফোঁটা পানি দিতে আসবে না এখানে। একা নিঃসঙ্গ হয়ে মৃত্যুর সেই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হবে। হায় আল্লাহ, এ তুমি কি করলে? এই কি তোমার মনে ছিলো—

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহরাজাদ গল্পের ইতি টানলো।

পরদিন রাতে দুনিয়াজাদ এবং শাহজাদা শাহরিয়ারের বিশেষ অনুরোধে সে আবার গল্প বলতে শুরু করলো। 'জাঁহাপনা, এবার শুনুন তাহলে সেই পাতালপুরীতে আলাদিনের অবস্থা তখন কি দাঁড়ালো। আলাদিন তখন পাতালপুরীতে নেমে গিয়ে হা-হুতাশ করছে আর আল্লাহর কাছে নালিশ জানাচ্ছে, কি এমন পাপ আমি করেছি যে, এই পাতালপুরীতে আমাকে আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে? হে আল্লাহ, শুনেছি, দীন-দুনিয়ার মালিক তুমি আমার—হঠাৎ মূরের দেওয়া আংটির কথা মনে পড়ে গেলো। আংটিটা তার আঙুলে পড়িয়ে দেওয়ার সময় সে বলেছিল, 'এই আংটিটা তোমার বিপদের ত্রাণ কর্তা। এক আশ্চর্য। আল্লাহর নাম নিয়ে সে তখন চিৎকার করে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকে, খোদা, একমাত্র তুমিই আমার ভরসা, তুমি না আমাকে দেখলে আর কেউ না আমাকে এ যাত্রায় আমার এই চরম বিপদ থেকে কে উদ্ধার করবে? উঃ কি অন্ধকার। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, শ্বাস নিতে

ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। চিরাগবাতি আমার চাই না, চাচা তুমি এটা নিয়ে যাও। বিনিময়ে আমাকে এখানকার এই অন্ধকার পাতালপুরী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও। উত্তেজনায় বুক চাপড়াতে গিয়ে তার সেই হাতের আংটি এক সময় বুকে ঘষা লেগে যায়। সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেলো।

আলাদিনের সামনে বিরাট আকৃতির একটা কালো আফ্রিদি দৈত্য আসমান থেকে সেই পাতাল-পুরীতে নেমে এলো। তাকে দেখে আলাদিন তো আঁতকে উঠলো।



'বল প্রভু কি আমাকে করতে হবে। আমি আপনার হাতের ঐ আংটিটার নফর। এ আংটিটা যার হাতে থাকে আমি তার যে কোন আদেশ পালন করতে বাধ্য। আজ্ঞা করুণ, কি ভাবে আমি আপনার উপকারে লাগতে পারি।'

বৃদ্ধ মূরের কথা মনে পড়ে গেলো, আলাদিনের 'এই আংটি তোমার যে কোন বিপদে তোমার উদ্ধারকারী হয়ে দেখা দেবে। এটা কখনো যেন হাতছাড়া করো না—'তাই আফ্রিদি দৈত্যের সেই অভয়-বাণী শুনে তার ভয় অনেকটা কেটে যায়। সে তখন সেই আফ্রিদি দৈত্যের ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তাকে হুকুম করলো, 'আমাকে এই অন্ধকার পাতালপুরী থেকে উদ্ধার করে জমিনের উপরে রেখে আসার ব্যবস্থা করো।'

তখনো তার কথার রেশ মিলিয়ে যায়নি, আলাদিন দেখলো, জমিনের উপরে দাঁড়িয়ে আছে সে। মাথার উপরে উন্মুক্ত আকাশ। আলো ঝলমলে রোদ্দুর। পাতালপুরীর নিশ্চিদ্র অন্ধকার থেকে উপরের আলোয় রোশনাইতে তার চোখ তখন ধাঁধিয়ে উঠেছিল। চোখ রগড়ে ভালো করে তাকাতে গিয়ে আলাদিন দেখলো, তার ত্রাণ-কর্তা সেই আফ্রিদি দৈত্য তার চোখের আড়াল হয়ে গেছে।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো, ভোর হয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে সে তার গল্প বলা স্থগিত রাখলো।

পরদিন রাত্রে শয়নকক্ষে প্রবেশ করেই বাদশাহ শাহরিয়ার আবদার করল, 'তারপর তোমার সেই গল্প শুরু করো শাহরাজাদ।'

'হ্যাঁ জাঁহাপনা, তারপর আলাদিন বাড়ি ফিরে এসে তার মাকে সব খুলে বললো। কস্মিন কালেও সেই বৃদ্ধ মূর লোকটা তার চাচা ছিলো না। লোকটা আসলে মিটমিটে শয়তান যাদুকর। জাতে মূর লোকটা, কি করে আমার চাচা হবে তুমিই বলো মা?'

'হ্যাঁ, তাই তো।'

আলাদিন তখন তার কামিজ কুর্তার পকেট থেকে কাঁচের খেলবার মতো দেখতে হীরা জহরত, মণি মুক্তাগুলো বার করে। সব শেষে সেই তামার চিরাগ-বাতিটা বার করে মাকে দেখাতেই সে বলে, 'আশ্চর্য এই সামান্য একটা তামার চিরাগবাতির জন্য বুদ্ধ মূর তোকে পাতালপুরীতে বন্দী করে রেখে খুন করতে চাইল?'

'হ্যাঁ মা, সেটা এখনো আমার কাছে তেমনি রহস্য রয়ে গেলো।' আলাদিন জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা মা, তোমার কি মনে হয়?'

'ওরা সব যাদুকর, কে জানে তার মনে কি বদ মতলব ছিলো। শুনেছি এই সব যাদুকররা ছোট ছেলেদের ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজেদের কাজ হাঁসিল করে থাকে। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, সামান্য ঐ চিরাগবাতিটা যার দাম আধ দিরহামও নয় সেটা তার উপকারে লাগতে পারে! কে জানে, ওটা হয়তো তার তুকতাকের কাজে লাগতে পারতো। যাক বাবা আল্লাহ যখন তোকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন, এখন থেকে একটু সাবধানে থাকিস, চোখ কান খুলে রাখিস সব সময়, বুঝলি বাছা—'

সেই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করলো।

পরদিন রাত্রে দুনিয়াজাদের পীড়াপীড়িতে শাহরাজাদ আবার তার গল্প শুরু করলো। তবে তার আগে বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুমতি নিলো বৈকি।

'শুনুন তাহলে জাঁহাপনা—' শাহরাজাদ বলতে থাকে—

পরদিন সকাল হতেই আলাদিন তার মার কাছে খেতে চাইল। তার ভীষণ খিদে পেয়েছিল তখন। গরীব মা, বাড়িতে খাবার বাড়ন্ত। অথচ একমাত্র পুত্র তার থেকে চেয়েছে, আর সে মুখ ফিরিয়ে থাকবে? এযে মহা পাপ! আল্লাহ তাকে কোন দিন মাফ করবেন না। তাই আলাদিনের মা তাড়াতাড়ি বলে, 'তুই একটু অপেক্ষা কর বাছা, আমি এখুনি মহাজনের কাছ থেকে কিছু আগাম টাকা নিয়ে বাজার থেকে খাবার কিনে আনছি।'

'আচ্ছা মা, ঐ তামার চিরাগটা বেচলে তো আধ দিরহাম পাওয়া যেতে পারে, সেই পয়সায় অনায়াসে তুমি আজকের মতো কিছু খাবার কিনে আনতে পারো।'

'মন্দ বলিসনি', আলাদিনের মা বলে, 'দে কই সেই চিরাগ বাতিটা।'

মা'র হাতে সেই চিরাগ বাতিটা তুলে দিতে গিয়ে আলাদিন বলে, 'বহুদিন ব্যবহার করা হয়নি, ময়লা ধরে গেছে এতে, বেচতে যাওয়ার আগে একটু ঘষে মেজে নিয়ে যাও, তাহলে হয়তো একটু বেশী দাম পেলেও পেতে পারো।'

আলাদিনের মা তার হাত থেকে চিরাগ বাতিটা নিয়ে সেটা পোড়া কয়লার ছাই দিয়ে মাজতে বসলো। একটু ঘষা মাত্র একটা অবাক কাণ্ড ঘটে গেলো। আলাদিনের মা চিৎকার করে উঠলো, 'আলাদিন শীগগীর আয়। শেষে প্রাণটা বোধহয় আমার দৈত্যের হাতে চলে গেলো। আলাদিন তাড়াতাড়ি রসুইঘরে ছুটে গিয়ে দেখে তার মা'র সামনে কালকের সেই বিরাট আফ্রিদি দৈত্যটা দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আলাদিন জলদি তার মা'র হাত থেকে চিরাগ বাতিটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে দৈত্যের দিকে ফিরে তাকায়, 'কে তুমি?'

সেই কুৎসিত আফ্রিদি দৈত্যটা মাথা নুইয়ে তাকে অভিবাদন জানিয়ে বলে, 'আমি এই তামাম দুনিয়ার একছত্র অধিপতি। কিন্তু আমার পয়গম্বর আপনার হাতের চিরাগবাতিটা, আমি ওটার নফর। ওটা যখন আপনার হাতে, এখন আমি আপনার হুকুমের

বান্দা, আজ্ঞা হোক মালিক, কি করতে হবে আমাকে ?'

ব্যাপারটা অনুমান করে আলাদিন তাকে হুকুম করলো, 'কিছু ভালো-মন্দ খাবার-দাবার নিয়ে এসো।'

কথাটা তার মুখ থেকে খসা মাত্র দৈত্যটা চকিতে উধাও হয়ে গেলো এবং পরমুহূর্তে আবার ফিরে এলো। তার হাতে বিরাট একটা রূপোর থালা, সেই থালার উপরে বারোটা সোনার প্লেটে মাংস বিরিয়ানি এবং নানান সুস্বাদু খাবারে ভর্তি। তাছাড়া রুপোর পেয়ালায় দামী সরাবও ছিলো। উঃ এতো খাবার একদিনে কেন তিনদিনেও ফুরনো যাবেনা, আলাদিন ভাবলো। খাবারগুলো ভালো করে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে আলাদিন দেখলো, দৈত্যটা কখন যেন হাওয়া হয়ে গেছে।



আলাদিনের মা তো সেই দৈত্যটাকে দেখে একটিবার মাত্র চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এবার আলাদিন ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরিয়ে এনে বলে, 'দেখ আম্মা, যে দৈত্যটাকে দেখে ভুলে আচমকা ভয় পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলে, সেই-ই কিনা এতো ভালো ভালো খাবার দিয়ে গেছে আমাদের জন্য।'

আলাদিনের মা খাবারগুলো গুছিয়ে রাখেন। এতো খাবার মায়ে বেটায় খেলেও তিন দিনেও ফুরবে না। তাই একটু যত্ন করে তুলে রাখতে হবে খাবারগুলো, ভাবলো আলাদিনের মা।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো পূবের আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে চুপ করে গেলো।

তারপর বেশ কয়েকদিন সেই রুপোর থালা এবং কয়েকটা সোনার বাটি জলের দামে এক ইহুদী স্যাকরায় দোকানে বিক্রী করে আলাদিন পেট চালালো। থালা পিছু একদিনার পেয়ে সে মহাখুশি।

একদিন সেই ইহুদীর দোকানে আর একটা সোনার থালা বেচতে যাওয়ার পথে এক মুসলমান স্যাকরার দোকানে গিয়ে ঢুকলো আলাদিন। সেই বৃদ্ধ মুসলমান স্যাকরা ধর্মভীরু লোক। লোক ঠকানো কারবারে বিশ্বাস নেই তার। ওজন করে ন্যায্য দাম দিলো আলাদিনকে সে--দুশো দিনার। অবাক হলো আলাদিন। ছিঃ ছিঃ ইহুদী স্যাকরা তো তাকে মাত্র এক দিনার দিয়েছে এক একটা সোনার থালার জন্য। এ সব লোকের ফাঁসী হওয়া উচিত। বৃদ্ধ মুসলমান স্যাকরার কাছে কথাটা বলতে সে-ও তার কথায় সায় দিলো। তবে এসব ব্যাপারে লিখিত-পড়িত কিছু না থাকার দরুণ লোকটাকে জেলে দেওয়া যায় না।

'যাই হোক বাছা', বৃদ্ধ মুসলমান স্যাকরা অতঃপর আলাদিনকে কাছে ডেকে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার বাড়িতে এই সব সোনার থালা ছাড়া অন্য আর কোন দামী জিনিষপত্তর আছে ?

'দামী জিনিষ এখনতে কিছু নেই', আলাদিন বলে, 'তবে ঘর সাজানোর জন্য কতকগুলো কাঁচ বা পাথরের ফল আছে, সে সব কি আপনার দোকানে বিক্রী হবে ?' আলাদিন তখনো জানতো না পাতালপুরীর গাছের সেই কাঁচের ফলগুলো আসলে কোনটা হীরা জহরত, আবার কোনটা মণি মুক্তো।

বৃদ্ধ স্যাকরা বলে, 'ঠিক আছে কাল ঐ একটা কাচের ফল নিয়ে এসো, দেখি কি দাম তোমায় দিতে পারি ?'



পরদিন কাঁচের একটা ফল নিয়ে সেই বৃদ্ধ স্যাকরার দোকানে গেলো আলাদিন। সত্যি বৃদ্ধ সমঝদার জহুরী বটে এবং অবশ্যই সৎ। কাঁচের ফলটা পরীক্ষা করতে গিয়ে চমকে ওঠে। গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করে সে, 'এরকম ফল তোমার কাছে আর কত আছে?'

'গুণে তো দেখিনি', সরল আলাদিন সত্যি কথাই বলে, 'তা একশোটা কিংবা তার থেকেও বেশি হতে পারে। কিন্তু কেন বলুন তো?'

'শোনো বাছা আমাকে তুমি যা বলেছো, কিন্তু অন্য আর কোন লোকের কাছে বলো না যেন।'

'কেন, এ কথা আপনি বলছেন কেন বলুন তো?'

'কেন বলছি জানো?' বৃদ্ধ চোখ বড় বড় করে বলে, 'এই একটা ফলের যা দাম, তা আমাদের সুলতানের সাতটা সুলতনিয়তের ধন সম্পত্তি বিক্রী করলেও এর পুরো দাম উঠবে না। অতএব এই কাঁচের ফলগুলো খুব যত্ন করে রেখে দিও, পরে কখনো কাজে লাগতে পারে।'

অতএব বাড়ি ফিরে এসে সেই কাঁচের ফলগুলো একটা পুটলির মধ্যে পুরে লুকিয়ে রাখলো আলাদিন।

তারপর থেকে সেই বৃদ্ধ মুসলমান জহুরীর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেলো আলাদিনের। প্রতিদিন তার দোকানে এসে গল্প-গুজব করে, সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। একদিন ঐ রকম আড্ডা

দিচ্ছে সে বৃদ্ধ স্যাকরার দোকানে, সেই সময় সুলতানের পেয়াদারা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে গেলো আজ সুলতানের কন্যা শাহজাদী বদর অল বুদুর হামামে গোসল করতে যাবেন। সেই সময় যেন একটা কাক-পক্ষীও না থাকে। এখুনি যে যার দোকান বন্ধ করে কেটে পড়ো, তা না হলে ধরা পড়লে সুলতানের হুকুম, তার যেন গর্দান নেওয়া হয়।

মুহূর্তে বাজারের সব দোকান পাঠ বন্ধ করে মালিক এবং কর্মচারীরা যে যার বাড়ি ফিরে যায়। যায় না শুধু আলাদিন। তার অনেকদিনের লোভ ছিলো সুলতানের কন্যাকে নিজের চোখে পরখ করা। শুনেছে সে অল বুদুর নাকি অপরূপ সুন্দরী দেখতে। সুলতানের অনুচরদের হাতে কোতল হওয়ার কথা জেনেও সুলতানের হারেমে লুকিয়ে থেকে তাঁর কন্যার রূপ সৌন্দর্য দেখার মতো দুঃসাহস ছিলো না আলাদিনের। সে করলো কি সবার দৃষ্টি এড়িয়ে এক সময় সুলতানের হামামে ঢোকার দরজার আড়ালে লুকিয়ে রইলো।

নির্দিষ্ট সময়ে সুলতানের কন্যা এলেন। হামামে ঢোকার আগে মুখের উপর থেকে নাকাবটা সরাতেই তাঁর রূপের ছটা আলাদিনের চোখ ধাঁধিয়ে দিলো। সে কি! এক অঙ্গে এতো রূপ। এ রূপ যে বেহেস্তের পরীদের রূপকেও হার মানায়। আলাদিনের মাথা ঘুরে যায়। অল বুদুর হামামে প্রবেশ করতেই সে তখন সবার অলক্ষে সেখান থেকে পালিয়ে আসে। বাড়ি ফিরে নাওয়া খাওয়া বন্ধ করলো তিনদিন। অভুক্ত থাকার দরুণ এই তিন দিনে আলাদিনের শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়লো।

উদ্বিগ্ন হয়ে একদিন তার মা তাকে বলে, 'বাছা তোর তবিয়ত ভালো নয়, হেকিমকে ডেকে পাঠাবো?'

'না আমার যা রোগ কোন হেকিমেই তা ভালো করতে পারবে না।'

'এসব তুই কি বলছিস বাছা', ঘাবড়ে গিয়ে তার মা এবার আসল কথাটা জানতে চাইলো, 'সত্যি করে বলতো বাছা, তোর কি হয়েছে?'

'কি আবার হবে মা', আলাদিন এবার তার মনের কথাটা বলে ফেলে, 'সুলতানের কন্যা শাহজাদী অল বুদুর আমার বুকের অনেকখানি জুড়ে বসে আছে। ওকে না পেলে এ জীবন জীইয়ে রাখার কোন মানে হয় না।'

'সেকি? এ তুই কি বলছিস আলাদিন?' তার মা শিউরে ওঠে, 'শাহজাদী অল বুদুরের অসামান্য রূপের কথা আমি শুনেছি তাকে শাদী করার মতো সামর্থ তো তোর নেই বাছা। এসব তোর আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখা। শুনেছি ওকে জীবন সাথী করার জন্য তামাম দুনিয়ার ধনী শাহজাদারা ধর্ণা দিতে আসছে প্রতিদিন সুলতানের কাছে। তাদের বাদ দিয়ে সুলতান কখনই তোর মতো বাউণ্ডুলে ছেলেকে তিনি তাঁর দামাদ হিসেবে বেছে নেবেন না। আমি তোর মা আলাদিন, তোর ভালো-মন্দ বোঝার ভার আমার উপরে ছেড়ে দিয়ে ঐ সুন্দরী শাহজাদীর কথা ভুলে যা। সুলতানের কন্যাকে শাদী করতে হলে যে সব দামী জিনিষপত্তর তাকে ভেট দিতে হবে, সে সব কেনার সামর্থ তোর আছে?'

'হ্যাঁ মা আছে বৈকি।' আলাদিন বলে, 'আমার যা সামর্থ আছে, এ দুনিয়ার কোন শাহজাদাদের নেই। এমনি যে জিনিষ যা কোটি কোটি দিনার দিয়েও কেউ কিনতে পারে না। আমি জানি সেই জিনিষ সুলতান বা তাঁর কন্যার হাতে পড়লে যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে।'

'কি সে জিনিষ বাছা?' আলাদিনের মায়ের চোখে গভীর বিস্ময়।

ওদিকে আলাদিন তখন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, 'সেদিন তোমাকে সেই কাঁচের ফলগুলো দেখিয়েছিলাম না, বাজারের এক বৃদ্ধ মুসলমান স্যাকরার

কাছে যাচাই করে জেনেছি, ঐ রকম একটা ফলের যা দাম আমাদের সুলতানের সাত সাতটা সুলতনিয়তের ধন-সম্পত্তি বিক্রী করলেও তার পুরো দাম উঠবে না। তাই আমি বলি কি জানো মা, ঐ কাঁচের ফলগুলো একটা পিরিচে সাজিয়ে শাল চাপা দিয়ে সুলতানের দরবারে যাও। আমার ইচ্ছার কথা তাঁকে বলে সেগুলো ভেট দিয়ে এসো তাঁকে। দেখবে সুলতান ঠিক আমার প্রস্তাবে সায় দেবেন, না দিয়ে থাকতে পারবেন না তিনি।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু আমার যে ভীষণ ভয় করছে বাছা, এর আগে কোনদিন তো আর সুলতানের দরবারে যাইনি।' আলাদিনের মা বলে, 'তাছাড়া আমরা গরীব, তোর প্রস্তাব শুনে তিনি যদি রেগে যান! তাই আমার ভীষণ ভয় করছে আলাদিন—'

'কিন্তু মা, সাহস তো তোমাকে সঞ্চয় করতেই হবে। আমি তোমার একমাত্র সন্তান। তুমি সাহস না দেখালে আমি প্রাণে বাঁচবো কি করে বলো?'

'তাহলে—'

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো ভোর হয়ে এলো, তাই সে এবার চুপ করে গেলো।



পরদিন রাত্রে বাদশাহ শাহরিয়ার তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করতেই দুনিয়াজাদ বলে উঠলো, 'আচ্ছা দিদি, আলাদিনের মার তারপর কি করলো? সুলতানের দরবারে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, বোন গিয়াছিল বৈকি। ছেলের জান বাঁচাতে সব মায়েরা যা করে থাকে, আলাদিনের মাও ঠিক তাই করলো। সেই মহামূল্যবান কাঁচের ফলগুলো একটা পিরিচে সাজিয়ে নিয়ে হাজির হলো গিয়ে সুলতানের দরবারে সে। কিন্তু পরপর কয়েকদিন সুলতানের দরবারে হাজির হয়েও তাঁকে তার ছেলের মনের কথাটা কিছুতেই বলতে পারলো না। হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে আলাদিন।

ওদিকে তখন পূবের আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠতে দেখে শাহরাজাদ গল্প বলা বন্ধ করলো।

আবার রাত আসে, শয়নকক্ষে ফিরে আসেন বাদশাহ শাহরিয়ার। দুনিয়াজাদ তাড়া দেয় তার দিদি শাহরাজাদকে গল্প শুরু করার জন্য। শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে শাহরাজাদ বলে, 'জাঁহাপনা, তারপর কি হলে জানেন? গতকাল রাত্রে বলেছি, আলাদিনের মা সেই সব কাঁচের ফলের পিরিচ শালের আড়ালে রোজ তো নিয়ে যেতো সুলতানের দরবারে, আর ফিরে আসতো মুখ কালো করে। ছেলের ইচ্ছার কথা সুলতানের কাছে পেশ করা আর হয় না। তা সুলতান হলেন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি, কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। একদিন তিনি লক্ষ্য করেছেন, আলাদিনের মা তাঁর দরবারে ঢুকে এক কোণায় দাঁড়িয়ে থাকে করুণ চোখে, কিন্তু প্রতিদিনই কিছু না বলেই মাথা নিচু করে ফিরে যায়। কিন্তু কেন? তবে কি তার সাহসের অভাব! কিছু বলতে এসেও ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে আলাদিনের মা!

উজিরকে কাছে ডেকে একদিন তিনি বললেন, 'কি ব্যাপার বলো তো উজিরসাহেব, ঐ যে ভদ্রমহিলা আমার দরবারের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে, রোজই এখানে আসে, কিন্তু কোন আর্জি কিংবা নালিশ না জানিয়েই ফিরে যায়। ওকে আমার সামনে নিয়ে এসো তো। আমি ওর মুখ থেকে শুনতে চাই, ও কি চায়?'

উজির তখন পেয়াদা পাঠিয়ে আলাদিনের মাকে সুলতানের সামনে হাজির করলো। আলাদিনের মা তখন ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। কে জানে সুলতান তার সন্তানের ইচ্ছার কথাটা কিভাবে নেবেন। যদি মা ব্যাটাকে এক সাথে কোতল করে দেয়। ভয়টা তার এখানেই।

যাইহোক, সুলতান ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়ে আলাদিনের মাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, কে বাছা তুমি? তোমার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি খুব চিন্তিত। তা কি ব্যাপার বলো তো? আমার কাছে কেনই বা এসেছিলে?

জাঁহাপনা, আমি আপনার একান্ত অনুগত দাসী। আমার স্বামী ছিলেন এই শহরের এক গরীব দর্জি, বহুত দিন হলো তার এন্তেকাল হয়েছে। আমাদের একমাত্র পুত্র আলাদিনকে নিয়ে কোন রকমে দিন গুজরান করি। সেই ছেলে আমার—'

'কেন কি হয়েছে তার?'

'বলতে ভরসা পাচ্ছিনা জাঁহাপনা, ভীষণ ভয় হচ্ছে। যদি অভয় দেন তো বলি।'

'আমার দরবারে কোন ভয় নেই, নির্ভয়ে তুমি তোমার ছেলের কথা বলতে পারো।' সুলতান তাকে আশ্বাস দিয়ে তাড়া দেন, 'আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে, সময় নষ্ট করো না। তাড়াতাড়ি যা বলার বলে ফেলো।'

আলাদিনের মা চারিদিক তাকিয়ে দেখে নিলো, ফাঁকা দরবার। একমাত্র উজির ছাড়া সুলতানের সামনে অন্য কেউ ছিলো না তখন। এই সুযোগ। যে তখন আর কোন ভূমিকা না করে বলেই ফেললো তার ছেলের মনের বাসনার কথা।

'জানেন জাঁহাপনা, আমার গরীব ছেলের ঘোড়া রোগ হয়েছে। সেদিন আপনার কন্যা শাহাজাদী বুদুরকে সে নাকি শহরের নামী হামামের সামনে প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে দেখে ফেলে। সেই থেকে তার রূপে মজে গিয়ে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে সে। ছেলের আমার একান্ত ইচ্ছা, সে আপনার কন্যাকে শাদী করে। আমার পুত্র আপনার দাসানুদাস। আপনি যদি তাকে ফিরিয়ে দেন সে তাহলে আত্মঘাতী হযে মরে যাবে। সে আমার একমাত্র চোখের মণি জাঁহাপনা।' আলাদিনের মা চোখের জল আর সম্বরণ করতে পারে না, 'আপনার সুলতানিয়তে তার বেঁচে থাকা না থাকা এখন আপনার মর্জির উপরে নির্ভর করছে। হুজুর, আমরা গরীব, আলাদ্দিন আমার একমাত্র পুত্র। তাই আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ—

'হ্যাঁ, সবই তো শুনলাম আলাদিনের মা', সুলতান খুব মন দিয়ে তার কথা শুনে বলে, 'তোমার আর আমার মধ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক থেকে আসমান জমিনের ফারাক। তোমরা গরীব, আমার একমাত্র কন্যা আজীবন ঐশ্বর্য বিলাসের মধ্যে পালিতা। তোমার গরীব ছেলে কি তাকে সুখে রাখতে পারবে? আমাদের বাদশাহ পরিবারে মানুষকে আমরা ধন-দৌলতের মাপ কাঠিতে বিচার করে থাকি, অন্য কোন গুণাবলী গ্রাহ্য নয়। কিন্তু সে রকম দৌলত তোমার ছেলের নেই। আমার কন্যাকে শাদী করতে হলে যে নজরানা আমাকে দরকার তা তোমার ছেলের নেই। অতএব বাড়ি ফিরে গিয়ে তাকে পরামর্শ দাও, সে যেন তার ঐ দুরাশা মন থেকে মুছে ফেলে।

'নজরানার কথা যখন তুললেন জাঁহাপনা', আলাদিনের মা শালের আড়াল থেকে সেই কাঁচের ফলের পিরিচটা বার করে সুলতানের পায়ের কাছে নিবেদন করে বলে, 'আমার ছেলে শাহেনশাহকে তার এই যত সামান্য নজরানা পাঠিয়েছে জাঁহাপনা। এটা আপনি গ্রহণ করে তাকে ধন্য করুণ।'

হীরা জহরতের জ্যোতিতে সুলতানের সারা দরবার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো সেই মুহূর্তে। সুলতান চমকে উঠলেন। তাঁর চোখ বিস্ফারিত। বিস্মিত উজিরও। সুলতানের পিরিচ

থেকে একটা কাঁচের আনার তাঁর হাতে তুলে দেয় সে। সুলতান পাকা জহুরী, কাঁচের আনার পরীক্ষা করে বুঝতে পাবেন, এই একটা ফলের দাম তা তাঁর সারা কোষাগার উজাড় করে দিলেও পুরো দাম দেওয়া যাবে না। কিন্তু গরীব দর্জিব বিবি এতো-গুলো মহামূল্যবান ফল পেলো কোথেকে।

তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আলাদিনের মা বলে, তার ছেলে আলাদিন নাকি সম্প্রতি বিদেশে বাণিজ্য করতে যায়। নাফার টাকায় সে এই কাঁচের ফল-গুলো কিনে নিয়ে আসে সেখান থেকে।

সুলতান তখন তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'তাহলে এরপব তো তোমার ছেলেকে আব ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। ঠিক আছে, তোমার ছেলের সঙ্গেই আমি আমার কন্যা বুদুরের শাদী দেবো।'

'কিন্তু জাঁহাপনা', উজির এবার বাগড়া দেয়, 'আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন, আপনার কন্যার উপযুক্ত পাত্র না পেলে তাঁর সঙ্গে আমার ছেলের শাদী দেবেন। আমি যে বড় আশা করে বসে আছি জাঁহাপনা—'

'ঠিক আছে, আমি আমার কথার খেলাপ করবো না।' সুলতান বলেন, 'তোমার ছেলের সঙ্গেই আমার মেয়েব শাদী দেবো। তবে একটা শর্তে। এই বৃদ্ধার ছেলে আমাকে যে নজরানা পাঠিয়েছে, তার থেকেও দামী নজরানা দিতে হবে তোমার ছেলেকে। আমি তোমাকে তিনমাস সময় দিলাম। এই সময়ের মধ্যে তোমার ছেলে যদি আমার শর্ত পালন করতে না পারে, তখন ঐ বৃদ্ধাব ছেলেকেই আমি আমাব দামাদ হিসেবে গ্রহণ করবো।' তারপর তিনি আলাদিনের মা'র দিকে ফিরে বললেন, 'তোমার ছেলের সঙ্গেই আমাব মেয়ের শাদী এক রকম পাকা হয়ে থাকলো। খুশি মনে বাড়ি ফিরে গিয়ে খবরটা তোমার ছেলেকে দিতে পারো এখন।'

হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে আসে আলাদিনের মা। মা'র মুখ থেকে শুভ খবরটা শোনার পর আনন্দে লাফিয়ে ওঠে আলাদিন। সুন্দরী শাহাজাদী বুদুর তাব বিবি হবে, এ যে তার স্বপ্নেরও অতীত, ভাবে আলাদিন। মাকে বলে, 'আমার খুব খিদে পেয়েছে, খেতে দাও আম্মা।'

তারপর থেকে আলাদিন তিনমাস পরের সেই শুভ দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে।

কিন্তু পুরো তিনমাস তাকে অপেক্ষা করতে হলো। খল নায়ক উজিরের গর্দভ পুত্রের সাধ্য ছিলো না আলাদিনের চেয়ে দামী নজরানা সুল-তানকে উপহার দেওয়ার। তাই সে তখন অন্য মতলব আটলো মনে মনে। একদিন সুলতানের দরবারে গিয়ে মুখ কালো করে তাঁকে মিথ্যে খবর দিলো, বিদেশে বাণিজ্য করতে গিয়ে আলাদিনের মৃত্যু হয়ে গেছে।

অশুভ সংবাদটা শোনার পর সুলতান খুব মুষড়ে পড়লেন, আলাদিনের আকস্মিক মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'যাইহোক আর তো অপেক্ষা করা যায় না, এবার তোমার পুত্রের সঙ্গে আমার কন্যার শাদীর ব্যবস্থা করো তুমি।'

ঠিক এই রকমটিই চাইছিল কুচক্রী উজির। ওদিকে তার কূট চালে বিভ্রান্ত হয়ে শাহাজাদী অল বুদুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও উজিরের গর্দভ পুত্রকে শাদী করার মত দিতে বাধ্য হলো। অথচ খবরটা শোনার আগে পর্যন্ত সে তার সব মন প্রাণ সঁপে দিয়ে বসে-ছিল আলাদিনের উদ্দেশে। তা উজির পুত্রের সঙ্গে সুলতানের কন্যার শাদীর খবরটা সুলতানের সারা সুলতানিয়েতে রটে গেলো। আলাদিন এবং তার মায়ের কানেও খবরটা পৌঁছে গেলো। বাজারে শাদীর সওদা করতে গিয়ে সেই মর্মান্তিক সংবাদটা শুনে ছুটে এলো আলাদিনের মা তার ছেলের কাছে। উজিরের চালাকীর কথা শুনে আলাদিন মুষড়ে পড়লো। মায়ে বেটায় সুলতানের এই বেইমানীর জন্য তাঁকে সাঁপ-সাপান্ত করতে ছাড়লো না। সেই সঙ্গে উজিরের মুণ্ডুপাত করতে থাকলো।

তারপর আলাদিন নিজের ঘরে ঢুকে পাতালপুরী থেকে সংগ্রহ করা সেই আশ্চর্য চিরাগবাতিটায় ঘষা দেওয়া মাত্র সেই আফ্রিদি দৈত্যটা এসে হাজির হলো তার সামনে। কুর্নিশ করে দৈত্যটা বলে, 'তামাম দুনিয়ার মালিক আমি, আমি ঐ আশ্চর্য চিরাগবাতিটার দাস। আর ঐ চিরাগবাতিটার মালিক আপনি, আপনার হুকুম তামিল করতে এই বান্দা এক পায়ে খাড়া। বলুন মালিক কি করতে হবে আমাকে?'

আলাদিন তখন সুলতানের বেইমানীর কথা বললো। তাঁর একমাত্র কন্যা অল বুদুরের সঙ্গে তার শাদীর কথা পাকা করেও তিনি এখন উজিরের অপদার্থ গর্দভ পুত্রের সঙ্গে শাদী দিতে চাইছেন। এই শাদী রুখতে হবে যে ভাবেই হোক। আলাদিন তাকে মতলব দিলো, শাদীর রাতে বাসর ঘর থেকে পালঙ্ক শুদ্ধ উজিরের পুত্র এবং সুলতানের কন্যাকে তুলে এনে তার সামনে হাজির করতে হবে।

'তথাস্তু' দৈত্যটা বলে, 'আমার কাছে এ আর এমন কি কঠিন কাজ মালিক। আমার অসাধ্য কিছু নেই! যথা সময়ে আমি আপনার হুকুম তামিল করবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' বলেই সে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

এই সময় ভোর হয়ে আসতে দেখে শাহজাদী গল্প থামিয়ে চুপ করলো।

পরদিন রাত্রে বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুরোধে আবার গল্প বলতে শুরু করলো শাহজাদী।

তারপর একদিন মহাসমারোহে উজির পুত্রের সঙ্গে সুলতানের কন্যা শাহজাদী অল বুদুরের শাদী হয়ে গেলো। কাজী সাহেব শাদীর হলফনামা লিখে দিলো। শাদীর প্রথম রাত্রে প্রথা অনুযায়ী তারা সহবাসে লিপ্ত হতে যাবে ঠিক সেই সময়ে আফ্রিদি দৈত্যকে খোলা জানালা পথ দিয়ে বাসর ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ভয়ে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত তখন। প্রথম মিলন রাত্রে অমন অঘটন ঘটতে দেখে চমকে উঠলো শাহজাদী বুদুর। অপদার্থ উজির পুত্রের সব পৌরুষ ধুলায় লুণ্ঠিত তখন। অবশ্য তার করার কিছুই ছিলো না তখন।

ওদিকে আলাদিন তখন নিজের শয়নকক্ষে পায়চারি করছিল উত্তেজনায়, কখন সেই দৈত্যটা তাদের বাসর ঘর থেকে তুলে নিয়ে আসবে। হঠাৎ তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পালঙ্ক সমেত উজির পুত্র এবং শাহজাদী বুদুরকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে এসে তার শয়নকক্ষে নামাতে দেখে।

'মালিক, এই বান্দাকে হুকুম করুন, এবার কি করতে হবে?' আফ্রিদি দৈত্যটা দাঁড়িয়ে থাকে আলাদিনের হুকুমের অপেক্ষায়।

'হাঁ, এবার তুমি ঐ অপদার্থ কাপুরুষ উজির তনয়কে হামামে নিয়ে গিয়ে পায়খানার ময়লা আধারে নিক্ষেপ করে এসো, দেখো যেন ভোর হওয়ার আগে সেখান থেকে নড়তে না পারে। তারপর কাল সকালে আবার এসো, যথাস্থানে ওদের রেখে আসার জন্য।'

'জো হুকুম হুজুর', দৈত্যটা তার কাজ সেরে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

আলাদিনের কণ্ঠস্বর শুনে শাহাজাদী তখন পালঙ্কের উপর উঠে বসে। অবিন্যস্ত বেসবাস। আলাদিন তাকে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখে তার কুমারীত্ব অক্ষুন্ন তখনো। মৃদু হেসে সে তখন তাকে আশ্বস্ত করতে বলে, 'দেখো শাহজাদী তোমার আব্বাজান আমার মাকে কথা দিয়েছিল, আমার সঙ্গে শাদী দেবে। তুমি বাগদত্তা। আমি চাই না অন্য কোন পুরুষ তোমাকে উপভোগ করুক। তাই তোমার শাদীর প্রথম রাত্রে এমন একটা অপ্রিয় কাজ আমাকে করতে হলো। অবশ্য তার জন্য তোমার কোন ভয় নেই। আইন মতো ফিরে আবার তোমার সঙ্গে আমার শাদী না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমার উপরে কোন অন্যায় জুলুম করবো

না।' এই বলে সে তার বাড়তি রাতের পোষাক দেহ থেকে খুলে সেটা দিয়ে তার এবং শাহজাদী বুদুরের মধ্যে একটা প্রাচ'র রচনা করে শুয়ে পড়লো তার পাশে। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ে আলাদিন।

শাহজাদীর চোখে ঘুম নেই ভয়ে আতঙ্কে। তার বাদশাহী বিলাস-বহুল জীবনে এমন ভয়ঙ্কর রাত্রি বুঝি কখনো আসেনি এর আগে।

পরদিন ভোরের আলো ভালো করে ফোটার আগেই আলাদিনের নির্দেশে শাহজাদী বুদুর এবং উজির পুত্রকে তাদের বাসর ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে আগে সেই আফ্রিদি দৈত্যটা।

সুলতান এবং বেগম সাহেবা ছুটে এলেন তাঁদের কন্যার বাসর ঘরে তাদের প্রথম মধুযামিনী কি ভাবে কাটলো তা খোঁজ নেওয়ার জন্য। কিন্তু ঘরে ঢুকে মেয়েকে অঝোর ধারায় কাঁদতে দেখে বিস্মিত হলেন তাঁরা। তবে কি উজির পুত্র তাদের কন্যাকে সুখ তৃপ্তিতে ভরিয়ে দিতে পারিনি। তার ফুলশয্যা কি তবে কণ্টক শয্যায় পরিণত হয়েছে?

প্রথমে তো শাহজাদী বুদুর মুখ খুলতে চাইলো না। তারপর বাবা মায়ের চাপে মুখ খুললো। কাঁদতে কাঁদতে সবিস্তারে বললো সেই আফ্রিদ দৈত্যের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার কথা। কিন্তু সুলতান কিংবা তার বেগম সাহেবা কেউই তার কথায় সায় দিলেন না। তাঁদের ধারণা, শাহজাদী হয়তো রাত্রে কোন দুঃস্বপ্ন দেখে থাকবে, তাই ও ওরকম ভুল বকছে। শাদীর রাত্রে ওরকম সবারই হয়ে থাকে, তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। দুদিন রাত জেগে স্বামীর সঙ্গে রাত কাটালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সুলতান তাঁর অতীতের স্মৃতি রোমন্থণ করে ভাবেন, শাদীর প্রথম প্রথম বুদুরের মা'ও এই রকম দুঃস্বপ্নের কথা বলে হতাশায় ভেঙ্গে পড়তো। তবে দুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যায়। শাহজাদী বুদুরও একদিন স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হলো কই? পর পর তিন রাত্রি আলাদিনের নির্দেশে সেই চিরাগের দৈত্যটা একই রকমের ভয়ঙ্কর ঘটনার অবতারণা করলো শাহাজাদী বুদুরের এবং উজির পুত্রের জীবনে। ওদিকে সুলতানের সুলতানিয়তে শাহজাদীর অল্প বুদুরের অসুখী বিবাহিত জীবনের সংবাদটা ছড়িয়ে পড়তেই সুলতান সচকিত হয়ে উঠলেন। না, আর নয়, ঐ অপদার্থ উজির পুত্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। নেহাত সে উজির পুত্র, অন্য কেউ হলে সেই মুহূর্তে তাকে কোতল করার আদেশ দিতেন তিনি।

যাইহোক উজির পুত্রকে তাঁর দরবারে তলব করে প্রকৃত ঘটনা জানাতে চাইলেন সুলতান। ওদিকে উজির পুত্রও তখন পর পর তিনরাত্রির সেই বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখে দেখে ভয়ে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুলতানের আদেশ পাওয়ার আগেই সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল শাহাজাদী বুদুরকে তালাক দিয়ে রাজপ্রসাদ ছেড়ে চলে যাবে। সুলতানের দামাদ থাকার চেয়ে কেবল উজিরপুত্র হয়ে বেঁচে থাকা অনেক নিরাপদ, অনেক শ্রেয়। তাই সুলতানের মনের কথা জানা মাত্র সে তাঁর হুকুম মাথা পেতে নিলো।

উজির পুত্র শাহজাদী বুদুরকে তালাক দেওয়ার খবরটা শোনামাত্র আলাদিনের মা সুলতানের দরবারে হাজির হয়ে কুর্নিশ করে বললো, 'আমার পুত্রের বিদেশে বানিজ্য করতে গিয়ে জাহাজডুবি হয়ে মারা যাওয়ার সংবাদটা ঠিক নয়। জ্যান্ত ফিরে এসেছে সে। এবার আপনি আপনার ওয়াদা পূর্ণ করুন। আমার পুত্রের সঙ্গে আপনার কন্যার শাদীর ব্যবস্থা করুন। তিন মাস পরে আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন, সেই সময়টাও আজই ঠিক অতিক্রান্ত অতএব—'

সুলতান তখন তাঁর প্রধান উজিরের দিকে তাকালেন, 'তুমি তো জানো উজির এই বৃদ্ধ দর্জির

বিবিকে আমি কথা দিয়েছিলাম তার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের শাদী দেবো। এখন কি করবো বলো?'

উজির তখন তার পুত্রের সঙ্গে শাহজাদী বুদুরের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায় এমনিতেই ক্রুদ্ধ ছিলো, এখন সেই বুদুরের সঙ্গে আলাদিনের নতুন করে শাদীর ব্যবস্থা করতে এসেছে বৃদ্ধা। স্বভাবতই ঈর্ষায় জ্বলে উঠলো সে। মনে মনে মতলব আঁটতে থাকে, কি করে এই শাদী ভেস্তে দেওয়া যায়। তাই সুলতান তার কাছে পরামর্শ চাইতেই সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দিলো 'এ আর এমন কি সমস্যা জাঁহাপনা? আপনার কন্যা তো আর যে সে ঘরের মেয়ে নয়। সুলতানের কন্যা বলে কথা। আপনার ঐশ্বর্য, বংশ মর্যাদার খাতিরে যে ছেলে আপনার কন্যাকে বিয়ে করবে আপনি হুকুম করুণ, তাকে নজারনা হিসেবে চল্লিশটা সোনার থালায় হীরাজহরত, মণি, মুক্তা সাজিয়ে চল্লিশজন সুন্দরী নফরানী এবং চল্লিশজন নিগ্রো নফর মারফত আপনার দরবারে উপঢৌকন পাঠাতে হবে '

'তোফা তোফা, 'উজিরের কুটনৈতিক চালের তারিফ করে সুলতান বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি আমার উপযুক্ত উজির বটে।'

উজিরের পরামর্শ মতো সুলতানের প্রস্তাব শুনে আলাদিনের মা তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, 'কিন্তু জাঁহাপনা, আমার ছেলে যে গরীব, তার পক্ষে এতো দামী দামী উপহার দেওয়া কি করে সম্ভব বলুন!'

'এই সামান্য উপহারটুকু যদি তোমার ছেলে দিতে না পারে, বাদশাহী বিলাস-ব্যসনে লালিতা আমার মেয়েকে সারাজীবনের ভার নেবে কি করে সে?'

আলাদিনের মা ভাবলো, এ সবই উজিরের চাল, তার পরামর্শেই সুলতান তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা এভাবে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। তিনি বেশ ভালো করেই জানেন, অমন মহামূল্যবান উপহার সামগ্রী তার ছেলে জিন্দেগী ভর চেষ্টা করলেও সংগ্রহ করতে পারবে না, আর তাঁর কন্যা শাহজাদী অল বুদুরকে শাদী করার বাসনাও পূর্ণ হবে না?

মাকে মুখ কালো করে ফিরতে দেখে আলাদিন উদ্বিগ্ন হয়ে নিবেদন করলো, 'কি ব্যাপার আম্মা, সুলতান বুঝি রাজী হলেন না!'

'হ্যাঁ, এক রকম সেই কথাই বলা যেতে পারে', তারপর আলাদিনের মা তাকে সুলতানের নতুন প্রস্তাবের কথা বলতেই আলাদিন হেসে খুন, 'এ আর এমন কি দুরূহ কাজ আম্মা। ঠিক আছে, আমি এখুনি সুলতানের সেই সব উপহারের ব্যবস্থা করছি। তুমি কিছুই ভেবো না।' এই বলে সে তার কক্ষে প্রবেশ করে চিরাগ বাতিটায় ঘষা দিতেই সেই আফ্রিদি দৈত্যটা তার সামনে এসে হাজির হয়ে কুর্নিশ করে বললো, 'জো হুকুম, তামাম দুনিয়ার অধিপতি এই বান্দা আপনার সামনে হাজির। হুকুম করুণ, কি আমাকে করতে হবে!'

আলাদিন তখন সুলতানের উপহার দেবার কথা তাকে বুঝিয়ে বলতেই বিকট শব্দ করে হাসিতে ফেটে পড়লো দৈত্যটা, 'এ আর এমন কি কঠিন কাজ মালিক। এখুনি এনে দিচ্ছি সেই সব উপহার সামগ্রী—'বলেই সে উধাও হয়ে যায়। পলক পড়তে না পড়তেই সেই দৈত্যটা আবার হাজির হয় আলাদিনের সামনে,—'হুজুর, আপনার বাড়ির সামনে চল্লিশজন সুবেশা সুন্দরী বাঁদী, এবং চল্লিশজন সুঠামদেহী নিগ্রো নফর উপহার সামগ্রী নিয়ে অপেক্ষা করছে।'

আলাদিনের মা তো সেই অভাবনীয় অদ্ভুত কাণ্ড দেখে যুগপৎ বিস্মিত এবং উল্লসিত হলো। হায় আল্লাহ, আমার গরীব ছেলের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। সত্যি তিনি দীন-দরিদ্রের উপকারী।

তখুনি আলাদিনের মা ছুটলেন সুলতানের প্রাসাদে। ততোধিক বিস্মিত হলেন সুলতান আলাদিনকে তাঁর দাবী পূরণ করতে দেখে। চোখে

না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সুলতান ভাবেন, তাঁর ভাবী দামাদ না জানি কতো ধন-দৌলতের মালিক। এমন পাত্র হাতছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজী হয়ে গেলেন তাঁর কন্যাকে আলাদিনের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। আলাদিনের মাকে আন্তরিক অভিবাদন জানিয়ে তিনি বলেন, 'আজই তোমার ছেলের সঙ্গে আমার কন্যার শাদী হবে। বাড়ি ফিরে গিয়ে প্রস্তুত হও।'

কূটচক্রী উজির আপত্তি তুলে বলে, 'কিন্তু জাঁহাপনা, আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে। ছোকরা আপনার কন্যার উপযুক্ত হবে কিনা। ও এক ধূর্ত যাদুকর ছাড়া আর কিছু নয়। যাদু না হলে সামান্য এক দীন দর্জির ছেলে এতো সব দামী-দামী হীরে জহরত আপনাকে উপহার দিতে পারে? ওর এই মায়াজালে আপনার কন্যাকে মিথ্যে জড়াবেন না হুজুর।'

যাইহোক, সুলতান এবার উজিরের কোন ওজর-আপত্তিই শুনলেন না। যথা সময়ে নিজের কন্যা শাহজাদী বুদুরের সঙ্গে আলাদিনের শাদী দিলেন মুসলিম শাস্ত্র মতে, কাজী সাহেবকে দিয়ে শাদীর হলফনামা লিখিয়ে।

আলাদিনের ইচ্ছে নয় শাদীর পর এক মুহূর্তও তার বিবি শাহজাদী অল বুদুরকে সুলতানের প্রাসাদে রাখে। সুলতানকে জানিয়ে দেয় সে তার মনের কথাটা এবং সে কথাও জানিয়ে দেয়, তার প্রাসাদ সংলগ্ন খালি জমিনের উপরে একটা নতুন রাজ প্রাসাদ বানাতে চায়। খুশি হয়ে তাকে প্রাসাদ বানানোর অনুমতি দেন সুলতান।

কিন্তু সেই প্রাসাদ বানানোর অতো টাকা কোথায় আলাদিনের! তার মা জিজ্ঞেস করলো। হাসলো আলাদিন, 'আল্লাহর উপরে ভরসা রাখো আম্মা, তিনি আমার ইচ্ছা পূরণ করবেন। আলাদিন জানে তার মুশকিল আসানের একমাত্র দূত সেই আফ্রিদি দৈত্যটা। নিজের ঘরে ঢুকে চিরাগ বাতিতে আলতো ভাবে ঘষা দিতেই দৈত্যটা এসে হাজির।

'তামাম দুনিয়ার অধিপতি আপনার এই বান্দা হাজির। আমি ঐ চিরাগবাতির দাসানুদাস। আর ঐ চিরাগবাতি এখন আপনার হাতে। অতএব আমি আপনার দাস। ফরমাস করুণ মালিক, আমাকে কি করতে হবে?'

'শোনো বান্দা, তুমি তো আমার অনেক উপকার করলে এই চিরাগবাতির দৌলতে। আমাকে প্রচুর ধন দৌলতের অধিকারী করে দিলে, সুলতানের একমাত্র কন্যা শাহজাদী বুদুরকে আমার বিবি হতে সাহায্য করলে। এবার আর একটা উপকার করতে করতে হবে তোমাকে। সুলতানের প্রাসাদের পাশে যে খাস জমিনটা আছে, তার উপরে এমন একটা বিরাট প্রাসাদ বানিয়ে দাও যা দেখে তামাম দুনিয়ার লোক তাজ্জব বনে যায়। তা কতো সময় লাগবে বলো?'

'জো হুজুর, এই বান্দার অসাধ্য কিছু নেই। আপনার চোখের পলক পড়তে যেটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই প্রাসাদ তৈরী হয়ে যাবে আপনার মনের মতো—' কথাটা বলামাত্র উধাও হয়ে যায় সেই দৈত্যটা।

কি আশ্চর্য, আলাদিন এবার সত্যি সত্যি বিস্মিত না হয়ে পারলো না। আফ্রিদি দৈত্যের এতো ক্ষমতা। সুলতানের প্রাসাদে যাওয়ার পথে আলাদিন দেখে তার মনের মতো প্রাসাদের সামনে সেই দৈত্যটা মিটিমিটি হাসছে। তাকে দেখে সে কুর্নিশ জানিয়ে বলে, 'প্রাসাদ আপনার পছন্দ হয়েছে তো মালিক?'

'খু-উ-ব পছন্দ হয়েছে, 'আলাদিন উচ্ছসিত হয়ে বলে, 'বহুত সুক্রিয়া। এখন তোমার ছুটি—'

এই পর্যন্ত বলে শাহরাজাদ চুপ করলো, কারণ তখন পূবের আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠেছিল।

পরদিন দিনের আলো নিভে গিয়ে রাত গভীর হলে বাদশাহ শাহরিয়ার তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করতেই দুনিয়াজাদ তার দিদিকে অনুরোধ জানায়, 'তারপর আলাদিন কি করলো দিদি? বড় মিষ্টি তোমার গল্প, তেমনি সুন্দর ভাবে গল্প বলতে পারো তুমি, শুনতে শুনতে ঘুম যেন কোথায় চলে যায়।'

ওদিকে বাদশাহ শাহরিয়ারও হাসছিলেন। মাথা নেড়ে সায় দিলেন দুনিয়াজাদের কথায়। শাহরাজাদ তারপর কাহিনী আবার শুরু করলো।

'জানেন জাঁহাপনা, গরীব দর্জির ছেলে আলাদিন হঠাৎ বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক হলেও দীন গরীব মানুষদের প্রতি তার দরদ এতটুকু কমলো না। বরং উত্তরোত্তর যেন বেড়েই চললো। প্রতিদিন সে তার নফর-নফরানী মারফত দুহাতে গরীব মানুষদের মধ্যে হাজার হাজার দিনার বিতরণ করতে থাকে। তার সেই দান পেয়ে সুলতানের সারা সুলতানিয়তের লোকেরা তাকে ধন্য ধন্য করতে থাকে। তারা তাকে খোদা আল্লাহর পয়গম্বর বলে সম্মান দিতে থাকলো তারপর থেকে। কথাটা সুলতানের কানে পৌছতেই তিনি সাধুবাদ জানালেন আলাদিনকে। কেবল তার উজির ব্যাপারটা ভালো চোখে নিতে পারলো না। হিংসায় জ্বলে পুড়ে সুলতানের কানে ফুসমন্ত্র দিয়ে সে বলে, 'জাঁহাপনা, আলাদিনের এই সব দান কি আর তার নিজের রোজগারে? এ সবই তার যাদুর খেলা। দেখবেন একদিন তার এই যাদুর খেলা ফুরোলেই তার আসল রূপ ধরা পড়ে যাবে আপনার কাছে।

ওদিকে সেই মরোক্কোবাসী মুর যাদুকর আশ্চর্য চিরাগবাতিটা তার হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে দারুণ মুষড়ে পড়েছিল। তবে তার একমাত্র সান্ত্বনা যে, আলাদিনকে সে সেই পাহাড়ের পাতালপুরীতে বন্দী করে আসতে পেরেছে। এতোদিনে ছোকড়া নিশ্চয়ই মরে গেছে। একদিন সে গণনা করতে বসলো, আলাদিন কবে মরলো খবরটা জানার জন্য। কিন্তু তার গণনায় সে জানতে পারলো, আলাদিন বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। শুধু বেঁচে থাকাই নয়, সে এখন সেই চিরাগবাতির দৌলতে প্রচুর ধনদৌলতের মালিক এবং সুলতানের একমাত্র কন্যা শাহজাদী অল বুদুরকে শাদী করে দিব্যি সুখে-স্বাচ্ছন্দে বাস করছে। সঙ্গে সঙ্গে মুরের চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। সেই মুহূর্তে সে চীন দেশের উদ্দেশে যাত্রা করলো সুদূর মরোক্কো থেকে।

চীন দেশে এসে প্রথমেই সে ঠিক করলো, সবার আগে সেই চিরাগবাতিটা হস্তগত করতে হবে আলাদিনের হেফাজত থেকে। তাই সে চীন দেশের এক মণিহারী দোকান থেকে কয়েকটা তামার নতুন চিরাগবাতি কিনে ফেরীওয়ালের বেশে আলাদিনের প্রাসাদের সামনে দিয়ে হেঁকে যায়, 'পুরনো চিরাগবাতির বদল করে নতুন চিরাগবাতির বদল করে নতুন চিরাগবাতি নেবে—'

সেই সময় আলাদিন প্রাসাদে ছিলো না। সে তখন শিকারে বেরিয়েছিল, ফিরতে দু'চারদিন দেরী হবে। এই সুযোগ, বৃদ্ধ মুর যাদুকর ভাবে।

ওদিকে শাহজাদী অল বুদুরের খাস নফরানী তার কাছে ফেরীওয়ালার খবরটা পৌছে দিয়ে বলে, 'মালকিন, বাড়িতে কোন পুরনো চিরাগবাতি নেই?'

আলাদিন ভুল করে সেই আশ্চর্য চিরাগবাতিটা সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। শাহজাদী বুদুর তার শয়নকক্ষে দেখেছিল সেটা কালি-ঝুলি মাখানো পুরনো চিরাগবাতি। তাই সে শয়নকক্ষে ছুটে গিয়ে সেটা নিয়ে এসে সেই নফরাণীর হাতে তুলে দিয়ে বলে,, 'এটার বদলে নতুন একটা চিরাগবাতি নিয়ে এসো ঐ ফেরীওয়ালার কাছ থেকে।'

বৃদ্ধ মুর তার বহু প্রতিক্ষিত আশ্চর্য চিরাগ-



বাতিটা হাতে পেয়ে বসে গেলো। তাড়াতাড়ি সে তার সরাইখানায় ফিরে এসে সেই চিরাগবাতির উপরে মৃদু ঘষা দিতেই বিরাটাকার আফ্রিদি দৈত্যটা তার সামনে হাজির হয়ে কুর্নিশ জানায়, 'তামাম দুনিয়ার অধিপতি এই বান্দা আপনার সামনে হাজির মালিক। আমি ঐ চিরাগবাতির দাসানুদাস। আর ঐ চিরাগবাতিটা এখন আপনার হাতে আছে বলেই আমি আপনার আজ্ঞাবাহক। হুকুম করুন, কি করতে হবে আমাকে?'

'তুমি তো জানো, আগে এই চিরাগবাতির মালিক ছিলো আলাদিন আর তখন তুমি ছিলে তার বান্দা। সেই আলাদিনের হুকুমে তার জন্য তুমি একটা বিরাট প্রাসাদ বানিয়ে দাও এখানকার সুলতানের প্রাসাদের পাশে। এখন সেই চিরাগ

বাতিটা আমার হাতে। অতএব আমার হুকুমে এখন তুমি সেই গোটা প্রাসাদটা তুলে নিয়ে গিয়ে মরোক্কর কোন জঙ্গলে রেখে এসো। তারপর আমাকে তোমার পিঠে চড়িয়ে সেই প্রাসাদে রেখে আসবে। কি পারবে তো ?'

'কি যে বলেন মালিক', আফ্রিদি দৈত্যটা দাঁত বার করে হেসে বলে, 'এই সামান্য কাজটা আপনার জন্য করতে পারবো না ?' বলেই সে নিমেষে উধাও হয়ে যায়।

ওদিকে সুলতান তাঁর প্রাসাদের অলিন্দ্য থেকে দেখতে পেলেন, তাঁর প্রাসাদের পাশে আলাদিনের প্রাসাদের কোন চিহ্ন নেই। আগের মতোই কেবল ধূ-ধূ জমিন। চমকে উঠলেন তিনি। তাহলে ? তাঁর একমাত্র কন্যা শাহজাদী অল বুদুর গেলো কোথায় ? খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেলো তাঁর সারা সুলতনিয়তে। কোথাও পাওয়া গেলো না শাহজাদীকে। কুচক্রী সেই উজির এতোদিনে সুযোগ পেলো আলাদিনের বিরুদ্ধে শোধ নেওয়ার জন্য। সুলতানকে সে বলল, 'জাঁহাপনা, আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম, ছোকরা যাদুকর ছাড়া আর কিছু নয়।'

সত্যি সত্যি সুলতান এবার তার কথায় বিশ্বাস না করে পারলেন না। একমাত্র কন্যাকে নিখোঁজ হতে দেখে রাগে ফুঁসে উঠলেন তিনি। হুকুম করলেন আলাদিনকে শিকার থেকে কোমরের দড়ি বেঁধে ঘরে আনতে। তারপর পেয়াদারা তাকে ধরে আনলে জহ্লাদকে হুকুম করলেন তাকে কোতল করার জন্য।

ওদিকে আলাদিনের কোতল করার আদেশের খবরটা ছড়িয়ে পড়ামাত্র তাঁর গরীব প্রজারা ছুটে এলো। আলাদিন তাদের পয়গম্বর। রুখে দাঁড়ালো তারা। সুলতানের অন্যায় বিচারে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে তারা। সুলতান বিপদ বুঝে তার মুক্তির আদেশ দিলেন, সেই সঙ্গে আলাদিনকে হুকুম করলেন তাঁর কন্যা শাহজাদীকে খুঁজে বার করে দেওয়ার জন্য। সেই প্রথম শুনলেন আলাদিন তার বিবির উধাও হওয়ার খবর। তার সেই বিরাট প্রাসাদ সমেত শাহাজাদী বুদুরের উধাও হওয়ার ঘটনা দেখে আলাদিন ধরে নেয় এ সেই শয়তান মুর যাদুকরের কাজ। সেই শয়তানটা তার চিরাগবাতিটা হস্তগত করে তার এমন সর্বনাশ করে থাকবে।

সেই মুহূর্তে আলাদিন মরোক্কর উদ্দেশে যাত্রা করলো, যে ভাবেই হোক বুদুরকে খুঁজে বার করতেই হবে পথে এক স্রোতস্বিনী সমুদ্রের জল দেখে শিউরে ওঠে সে। হতাশ হয়ে জমিনের উপরে গড়াগড়ি দিতে গিয়ে তার হাতের আংটিতে ঘষা লাগতেই সেই অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটে গেলো। বিরাটকায় আফ্রিদি দৈত্যটা এসে হাজির হলো তার সামনে। আংটিটার কথা তার মনেই ছিলো না।

ওদিকে আংটির দৈত্যটা তখন তার সামনে কুর্নিশ করে বলে, 'হুজুর আপনার এই বান্দা হাজির। আমি ঐ আংটির গোলাম, যে কোন অসাধ্য কাজ করতে আমি সিদ্ধহস্ত। ঐ আংটিটার মালিক আপনি এখন; অতএব আপনি আমার প্রভু। আপনার বান্দা প্রস্তুত। বলুন কি করতে হবে মালিক ?'

'শোনো দৈত্য-প্রবর, আমি এখন সেই মরক্কোর বৃদ্ধ মুর যাদুকরের শিকার হয়েছি। সেই শয়তানটা আমার আশ্চর্য চিরাগবাতিটা চালাকী করে হাতিয়ে নিয়েছে, এবং চিরাগ দৈত্যের সাহায্যে আমার বিরাট প্রাসাদ সমেত আমার বিবিকে নিয়ে ভেগেছে। এখন সেই প্রাসাদটা আমাকে তুমি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করো।'

'না মালিক, আপনার এ হুকুম আমি মানতে পারছি না। আমার অপরাধ মার্জনা করবেন', আংটির দৈত্যটা বলে, 'চিরাগের দৈত্য আমার

ওস্তাদ। ওর কাজের বিরুদ্ধাচরণ আমি করতে পারবো না। তার চেয়ে আমি বরং মরক্কোর জঙ্গলে আপনার সেই প্রাসাদে পৌঁছে দিচ্ছি, সেখানে গিয়ে হুজুর আপনি যা হুকুম করবেন আমি মানতে রাজী আছি। কিন্তু—

'ঠিক আছে, আপাততঃ তাই করো তুমি—

পলক ফেলতে মরক্কোর জঙ্গলে পৌঁছে যায় আলাদিন আংটির দৈত্যের পিঠে চড়ে। সেই দৈত্যেরই সাহায্যে আলাদিনকে শাহজাদী দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো। 'তুমি এসে গেছো প্রিয়তম? আমি জানতাম, তুমি ঠিক আসবে একদিন না একদিন। আল্লার কাছে দিনরাত মোনাজাত করেছি তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। উনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। আর দেরী করো না প্রিয়তম, আবেগ জড়ানো গলায় বুদুর বলে, 'বৃদ্ধ মুর লোকটা এখন প্রাসাদে নেই, চলো এই বেলা এখান থেকে আমায় পালিয়ে যাই। সে এসে পড়লে তোমার আর রক্ষা নেই।'

'কিন্তু বিবিজান, আমার যে চিরাগবাতিটা চাই। ওটা আমার ভীষণ দরকার।'

'তা তো জানি, কিন্তু সেটা যে ধূর্ত মুর সব সময় তার নিজের কাছে রাখে। জীবিত অবস্থায় তার হেফাজত থেকে হাত সাফাই করলে রেহাই নেই।'

'বেশ তো, 'আলাদিন বলে, আজ রাতেই ঐ বৃদ্ধ মুরের সঙ্গে মহব্বতের অভিনয় করবে তুমি। চোখে সুরমা লাগিয়ে একটু ঢলাঢলি করবে। সোহাগ জানাতে গিয়ে তাঁর ঠোঁটে মারাত্মক জহর লাগিয়ে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।'

'কিন্তু সে রকম জহর আমি কোথ থেকে পাবো?'

'তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করার আমিই করছি।' এই বলে আংটিটা ঘষা মাত্র দৈত্যটা এসে হাজির হয়, কুর্নিশ জানিয়ে বলে, 'বান্দা আপনার সামনে হাজির, বলুন কি করতে হবে মালিক?'

এখুনি আমার মারাত্মক ধরণের জহর চাই।'

'জো হুকুম!' পলক ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জহরের পুরিয়া এনে আলাদিনের হাতে তুলে দেয়।

রাত নামে। শাহজাদীর শয়নকক্ষের একটা আলমারির আড়ালে লুকিয়ে থাকে আলাদিন। তার আগেই সেই জহরের পুরিয়াটা শাহজাদী বুদুর হাতে তুলে দিয়েছিল সে, উপযুক্ত সময়ে বৃদ্ধ মুরের খাবার কিংবা পানীয় কোন কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে সেই জহর। যথা সময়ে বৃদ্ধ মুর যখন শাহজাদীকে আদরে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল, তার দৃষ্টি এড়িয়ে বুদুর তার সরাবের সঙ্গে জহর মিশিয়ে দেয়। একবার মাত্র চুমুক দেওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধ মুর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। আনন্দে আত্মহারা হয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে আলাদিন। তারপর আর কাল বিলম্ব না করে মৃত মুরের ট্যাক থেকে চিরাগবাতিটা হস্তগত করে আলাদিন তাতে আলতোভাবে ঘষা মাত্র এবার চিরাগের আফ্রিদি দৈত্যটা এসে হাজির হলো।

আলাদিম তাকে হুকুম করলো, 'আমার এই প্রাসাদটা আবার চীনদেশের সুলতানের প্রাসাদের দেশের মাঠটার উপরে রেখে এসো।

এক সঙ্গে দামাদ এবং কন্যাকে ফিরে পেয়ে সুলতান আবার খুশিতে মেতে উঠলেন। আলাদিনকে ভুল বোঝার জন্য মাফ চাইলেন আলাদিনের কাছে। এরপর আব বুদুরের ইন্তেকাল পর্যন্ত কোন অঘটন ঘটেনি। সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁর দামাদ আলাদিন রাজ সিংহাসনে বসে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রজাদের সঙ্গে সুখে শান্তিতে বাস করে যায়।

ওদিকে তখন ভোর হয়ে আসছিল, চুপ করার আগে শাহরাজাদ জানিয়ে দেয় বাদশাহী শাহরিয়াকে আগামীকাল থেকে আগের থেকে আরো, আরো বেশী রোমাঞ্চকর কাহিনী সে শোনাবো তাঁকে।

পরদিন রাত্রে কথা মতো চল্লিশ আলিবাবা ও চোরের কাহিনী বলতে শুরু করলো শাহজাদী।

জানেন জাঁহাপনা, সে আজ অনেক যুগ আগের কথা, পারস্যের কোন এক শহরে কাসিম এবং আলিবাবা নামে দুই ভাই বাস করতো। তাদের বাবা ছিলো খুব গরীব। বাবার মৃত্যুর পর তাদের আর্থিক অবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়লো।

যাইহোক বড় ভাই কাসিম এক অবস্থাপন্ন বৃদ্ধের কন্যাকে শাদী করাতে তার অবস্থা কিছু ফিরে যায়। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তার সব সম্পত্তির মালিক হয় সে এবং বাজারে তার শ্বশুরের একটা সওদাগরী দোকানেরও মালিক বনে যাওয়াতে তার আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল হলো।

ওদিকে ছোটভাই আলিবাবা সাধাসিধে মানুষ, মনে কোন প্যাচ নেই। জঙ্গলের কাঠ কেটে বাজারে বিক্রী করে কোন রকমে পেট চালায়। নাফার টাকায় এক এক করে তিনটে গাধা কেনে বাজারে কাঠ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই ভাবে একদিন সে এক গরীব কাঠুরের কন্যাকে শাদী করে নতুন করে সংসার পাতে, নতুন উদ্যমে কাঠ কাটতে যায় বনে-জঙ্গলে, সঙ্গী তার সেই তিনটি গাধা।

একদিন হলো কি কাঠের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে গভীর অরণ্যে ঢুকে পড়ে এক অদ্ভুত দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে গেলো। দূর থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনে সচকিত হলো। এই গভীর গহনে ঘোড়ায় চড়ে কে বা কারা আসছে? অবস্থা দেখে তো মনে হয় কোন ডাকাতের দল, তাদের আস্তানা সাধারণতঃ এমনি গভীর অরণ্যে হয়ে থাকে। কথাটা মনে হতেই দারুণ ভয় পেলো আলিবাবা। প্রাণ বাঁচাতে তাড়াতাড়ি একটা ঝাঁকড়া গাছের উপরে উঠে বসে নিজেকে সেই গাছের ডাল-পাতার আড়ালে লুকিয়ে ফেললো। ডাকাত দল তাকে দেখতে না পেলেও সে কিন্তু গাছের উপর থেকে তাদের সব গতিবিধি স্পষ্ট লক্ষ্য করলো।

হ্যাঁ, ডাকাতের দলই বটে। আলিবাবা দেখলো, অদূরে এক এক করে চল্লিশটা ঘোড়ার পিঠ থেকে দ্রুত নেমে পড়লো চল্লিশজন চোর বা ডাকাত। দৈত্যের মতো চেহারা সবার, মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ, জ্বলন্ত চোখ। ওদের মধ্যে সব থেকে কদাকার বীভৎস চেহারার লোকটা বাকী উনচল্লিশজন লোককে হাতের ইশারায় হুকুম করে সামনে পাহাড়ের একটা উপত্যকায় যেতে বললো।

তারপর সেই চল্লিশজন চোর যে যার ঘোড়ার পিঠ থেকে থলে ভর্তি লুঠের সামানপত্তরগুলো পিঠের উপরে তুলে নিয়ে এগিয়ে যায় সেই পাহাড়ী উপত্যকায়। জায়গাটা কাছেই, আলিবাবার দেখতে কোন অসুবিধে হলো না। সবার আগে চলছিল তাদের সর্দার। সেই জায়গাটায় গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ডাকাত সর্দার। তারপর পাহাড়ের দিকে মুখ করে এক বিচিত্র ধ্বনি দেয় ডাকাত সর্দার, 'চিচিং ফাঁক—' আর সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের তলদেশ থেকে থালার মতো পাথরটা দু'ভাগ হয়ে সরে গেলো খানিকটা, একটা বিরাট গহ্বর পাতালপুরীর প্রবেশ পথ সৃষ্টি হলো।

সর্দারের নির্দেশে তার চেলারা সামানপত্তর নিয়ে সেই গহ্বরে নেমে গেলো। সবার শেষে নামলো তাদের সর্দার। আলিবাবার কানে আবার একটা আওয়াজ ভেসে এলো, 'চিচিং বন্ধ্।'

একটু পরেই ডাকাতদল যে যার ঘোড়া ছুটিয়ে আলিবাবার গাছের তলা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলো আলিবাবা। উঃ তার অস্তিত্ব টের পেলে ওরা তাঁকে আর জ্যান্ত রেখে যেতো না নিশ্চয়ই। তাই এবার সে নির্ভয়ে গাছ থেকে নেমে এলো। এবং ভাবলো, সেই বিস্ময়কর কথাটা সে-ও একবার উচ্চারণ করলে কেমন হয়? সে দেখতে চায় তার নির্দেশে পাতালপুরীর দরজা খুলে যায় কিংবা বন্ধ হয় কিনা! তাই সে সেই জায়গাটার সামনে গিয়ে হাঁক দিলো, 'চিচিং ফাঁক!'

আর সঙ্গে সঙ্গে পাতালপুরীর দরজা যায় খুলে। সত্যি কি অদ্ভুত যাদু আছে এই শব্দ দুটির মধ্যে তা না হলে পাথরের থালাটা দু'ফাঁক হয়ে যায়! আলিবাবার ভয় তখনো কাটেনি, সেই সঙ্গে দ্বিধা, সংকোচ এবং বাধা। সেই বাধার প্রাচীর কাটিয়ে উঠে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো সে আল্লাহর নাম স্মরণ করে।

সারি সারি পাথরের ঘর, ঘর ভর্তি দামী কাপড়ের গাঁটরি, হীরা জহরতের থলে, সোনার দিনার। ধন-দৌলতে ঠাসা পাতালপুরী। এ সবই খুন-জখম-রাহাজানী করে সংগ্রহ করা। কিন্তু এতো ধনরত্ন একা নিয়ে সে কি করবে? তার চেয়ে শুধু সোনার দিনার কিছু নিতে পারলে তার দারিদ্র-দশা ঘুঁচে যেতে পারে। এই সব কথা চিন্তা করে ভর্তি করে সোনার দিনার নিয়ে উপরে উঠে আসে সিঁড়ির প্রথম ধাপে।

পাতালপুরীর বাইরে আসার জন্য সে চিৎকার করে ওঠে, 'চিচিং-ফাঁক!' সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যায়। বাইরে বেরিয়ে এসে সে আবার হাঁক দেয়, 'চিচিং বন্ধ!'

তারপর গাধার পিঠে সোনার দিনারের বস্তা চাপিয়ে দুলকি চালে চলতে শুরু করলো আলিবাবা তার বাড়ির উদ্দেশে।

সোনার দিনার ভর্তি থলেটা দেখে আলিবাবার বিবি ভয়ে আঁতকে উঠলো, তাহলে তার গরীব স্বামী কি শেষ পর্যন্ত ডাকাতির পথে নামলো ভাগ্য ফেরানোর জন্য। কিন্তু এ যে মহাপাপ! আল্লাহ তাকে মাফ করবেন না। লজ্জায়, ঘৃণায় ধিক্কার দিতে থাকে আলিবাবার বিবি তাকে। 'তুমি কি গো? তুমিও কি ঐ ডাকাতদের মতো নিচে নেমে গেলে! লোভ সামলাতে পারলে না?'

'কি যাতা বকছো', আলিবাবা তাকে ধমক দিয়ে বলে, 'কোন কথা না বলে চুপটি করে এখন এই সোনার দিনারের বস্তাটা ঘরে তোলার ব্যবস্থা করো। তারপর ধীরে-সুস্থে সব কথা তোমাকে বলবো।'

ঘরের মধ্যে সোনার দিনারগুলো ছড়িয়ে আলিবাবা তার রোমাঞ্চকর কাহিনী সবিস্তারে খুলে বললো। সব শোনার পর আলিবাবার বিবির মনের আকাশ থেকে দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে যায়। খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে সে। ওঃ এতো মোহর! আমাদের তিন পুরুষেও এতো ধন-দৌলত ফুরিয়ে শেষ করতে পারবে না।

ছেলে মানুষের মতো আলিবাবার বিবি সেই সোনার মোহরগুলো গুণতে বসলে আলিবাবা হেসে উঠলো, 'ও ভাবে গুণলে সারাদিন, সারা রাতেও গুণে শেষ করতে পারবে না।'

কিন্তু আলিবাবার বিবি নাছোড়বান্দা, মেয়েদের মন, এতোগুলো মোহর বলে কথা, হিসেব না রেখে ছাড়বে না সে। তাই সে বললো, 'গুণতে না পারি, ওজন করে তো রাখতে দোষ কি?' একটু থেমে সে তার স্বামীকে বলে, 'তুমি বরং গর্তটা খুঁড়তে থাকো, আমি ততক্ষণে পাশের বাড়ি থেকে দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে আসি।'

পাশেই আলিবাবার বড় ভাই কাসিমের বাড়ি। ছোট জা হঠাৎ দাঁড়িপাল্লা চাওয়াতে অবাক হলো কাসিমের বিবি। গরীব আলিবাবার বিবির দাঁড়ি-পাল্লার কি দরকার থাকতে পারে?

এখুনি আসছি বলে বেশ খানিকটা সময় পার করে কাসিমের বিবির দেখা পেলো আলিবাবার

বিবি। ইতিমধ্যে কাসিমের বিবি দাঁড়িপাল্লায় আটার ঢেলা লাগিয়ে রেখেছিল, আর সেই জন্যই অতো দেরী। তার সেই কৌশল আলিবাবার বিবিও একেবারেই টের পেলো না।

দাঁড়িপাল্লা ফিরিয়ে দিয়ে আলিবাবার বিবি চলে যাওয়ার পর কাসিমের বিবি তার ফাঁদ পাতার জালে কি পড়েছে দেখার জন্য দাঁড়িপাল্লাটা পরীক্ষা করতে একটা স্বর্ণমুদ্রা দেখে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিলো। পরক্ষণেই তার দু'চোখে হিংসার আগুন জ্বলে উঠতে দেখা গেলো।

'সোনার মোহর? সংখ্যায় এতো বেশী যে গুণে উঠতে পারেনি বলে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে রাখতে হলো আলিবাবার বিবিকে। ওমা, একি সর্বনাশ হলো আমাদের? আলিবাবা এতো ধন-দৌলতের মালিক হলো!

ওদিকে কাসিম দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে এসে অবাক হলো তার বিবিকে মেজাজ নিয়ে কথা কথা বলতে দেখে।

'আজ তোমার কি হলো বিবিজান, এতো উত্তেজিত কেন?' কাসিম তাকে সোহাগ জানিয়ে বলে, 'দেখো, তোমার জন্য কি উপহার এনেছি!'

'রাখো অতো সোহাগ কাজ নেই। আসল কাজ করার মুরোদ নেই, ঠুনকো একটা জিনিষ উপহার দিয়ে সোহাগ জানাতে এসেছে আমার মরদ।' মুখ ঝামটা দিয়ে উঠে কাসিমের বিবি তখন সেই স্বর্ণ-মুদ্রাটা কাসিমের চোখের সামনে মেলে ধরে বলে, 'পারবে, পারবে এ রকম থলে ভর্তি সোনার মোহর আমাকে উপহার দিতে?' কাসিমের বিবি তার স্বামীকে ধিক্কার দিতে দিতে আরো বলে, 'ভালো করে তাকিয়ে দেখো, তোমার গরীব ভাইটি তার বিবিকে এ রকম মোহর এতো বেশী উপহার দিয়েছে যে, গুণে শেষ করতে পারেনি, তাই আমার কাছ থেকে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে গিয়ে ওজন করে রেখেছে।'

রাগে, হিংসায় সারারাত চোখের পাতা দুটো এক করতে পারলো না কাসিম। ভোর হতে না হতেই সে ছুটলো তার ছোট ভাই আলিবাবার কাছে। আলিবাবা তখন সবে মাত্র গোসল সেরে এসে দাওয়ায় বসেছিল নাস্তা করার জন্য।

'খুব তো বড়লোকী চাল দেখিয়ে নাস্তা করা হচ্ছে', কাসিম তার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র চিৎকার করে উঠলো, 'তা বস্তা বোঝাই সোনার মোহরগুলো কোথ্থেকে আমদানি করলে শুনি?'

'সোনার মোহর?' আলিবাবার মনে শঙ্কা জাগে। খবরটা তার দাদা জানলো কি করে?

'ন্যাকা! যেন কিছুই জানে না!' কাসিম খিঁচিয়ে ওঠে, 'আমার বিবির কাছ থেকে তোমার বিবি দাঁড়িপাল্লা চেয়ে নিয়ে এসে এ রকম হাজার হাজার মোহর ওজন করোনি?' বলে সে সেই সোনার মোহরটা মেলে ধরে আলিবাবার সামনে, 'এর পরেও কি তুমি আমার কাছে ব্যাপারটা গোপন করবে?'

এতক্ষণে আলিবাবা বুঝতে পারে স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্তির খবরটা তার কানে পৌঁছলো কি করে।

আলিবাবা বুঝলো, এরপর তার দাদার কাছে ব্যাপারটা গোপন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তা করলে দাদা নিশ্চয়ই কোতোয়াল সাহেবের কানে কথাটা তুলে দিয়ে চুরির অপরাধে তার গর্দান নেওয়ার ব্যবস্থা করবে। তাই সে অতঃপর সেই ডাকাতদল, পাতালপুরীতে প্রবেশ পথ খোলার জন্য সেই যাদুময় শব্দ দুটির কথা সব খুলে বললো।

আলিবাবার নির্দেশ মতো পরদিন সকালে দশটা খচ্চর সঙ্গে নিয়ে কাসিম রওনা হলো গভীর অরণ্যে। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে চারদিক একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'চিচিং ফাঁক—!' সঙ্গে সঙ্গে পাতালপুরীর দরজা খুলে যায়।

'ইয়ে আল্লাহ আলিবাবা তাহলে মিথ্যে বলেনি', নিজের মনে কথাটা বলে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে দেখে পাথরের ঘরগুলোয় থরে থরে সাজানো রয়েছে হীরা জহরতের গহনা, স্বর্ণমুদ্রা এবং আরো

অনেক ধনরত্ন। তাড়াতাড়ি সে তার দশটা খচ্চরের বহনোপযোগী দশটা বস্তায় সোনার মোহর ভরে ফের সিঁড়ি বেয়ে উপরে আসে, বাইরে বেরোবার দরজা খোলার জন্য সেই যাদুমন্ত্রটা উচ্চারণ করে 'চিচিং বার্লি!'

দরজা কিন্তু খোলে না। কি আশ্চর্য। বিভ্রান্ত হয়ে সে তখন সব রকমের শস্যের নাম ব্যবহার করে হেঁকে উঠলো। কিন্তু কোন সময়েই দরজা আর খুললো না। এতক্ষণ দশটি থলে ভর্তি সোনার মোহর পেয়ে যতো খুশি হয়েছিল তার থেকেও বেশী চিন্তিত হয়ে পড়লো সে।

ভোরের আলো ফুটে ওটার সঙ্গে সঙ্গে শাহরাজাদ চুপ করলো।

পরদিন রাতে শাহরাজাদ তার গল্পের জের টেনে আবার বলতে শুরু করলো, 'কাসিম তখন বেশ বুঝে গেছে, বাইরে বেরোবার সেই গুপ্ত শব্দটা তার আর মনে নেই। তার মানে, সেই অন্ধকার গহ্বরে তাকে পচে পচে মরতে হবে। কাসিমের অবস্থা তখন পাগলের মতো। পাগলের প্রলাপ বকে সে, 'আল্লাহর কসম, আমার সোনার মোহর চাই না, আমি আর কখখনো লোভের পথে পা বাড়াবো না, আমাকে মুক্তি দাও খোদা। আমি—'

'হ্যাঁ, তোকে একেবারে মুক্তি দিচ্ছি', ওদিকে ডাকাতের সর্দার তার দলবল নিয়ে পাতালপুরীতে নেমে এসে কাসিমকে দেখে গর্জে ওঠে, 'এই দুশমনটা আমাদের আড্ডাখানার সন্ধান পেলো কি করে! লোকটা নিশ্চয়ই এর আগে আমাদের অনুসরণ করে আমাদের গোপন মন্ত্রটা জেনে নিয়ে এখানে ঢুকে পড়েছে। দাও ওকে খতম করে।' সর্দারের নির্দেশে কাসিমের দেহটা দু'খণ্ডে ভাগ করে দেয় তার এক সাকরেদ তলোয়ারের আঘাতে। আর্তনাদ করারও সুযোগ পেলো না লোভী কাসিম।

ওদিকে রাত গভীর হয়ে যাওয়ার পরেও কাসিমকে ফিরতে না দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে আসে তার বিবি আলিবাবার কাছে, 'ভাইজান, কৈ তোমার দাদা তো এখানো ফিরে এলো না।'

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই, 'আলিবাবা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, 'রাত হয়ে গেছে, অন্ধকারে জানোয়ারদের হাতে বেঘোরে প্রাণ হারানোর থেকে জঙ্গলের কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়ে থাকবে। দেখবে কাল সকালেই ভাইজান ফিরে আসবে। তুমি এখন বাড়ি ফিরে যাও ভাবী।'

কিন্তু পরদিন সকালেও যখন ফিরে এলো না, তখন আলিবাবা তার ভাই-এর বিবির মতো খুব চিন্তায় পড়লো। এরপর আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। অতঃপর আলি ছুটলো সেই গভীর অরণ্যে। সেই পাতালপুরীর প্রবেশ পথে আলিবাবা দেখলো কাসিমের দশটা গাধার মৃতদেহ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে সেই মর্মান্তিক দৃশ্যটা দেখে তার অনুমান করতে অসুবিধে হলো না, তার বড়ভাই কাসিম আর বেঁচে নেই। যাদুমন্ত্র পড়ে পাতালপুরীতে প্রবেশ করা মাত্র সে দেখলো তার আশঙ্কাই সত্যি হলো শেষ পর্যন্ত।

কাসিমের খণ্ডিত মৃতদেহ আলিবাবা তার গাধার পিঠে বহন করে নিয়ে এলে তার বিবি ডুকরে কেঁদে উঠলো।

কাসিমের খুন হওয়ার খবরটা প্রতিবেশীরা জানতে পারলে সর্বনাশ। এই বিপদে তাকে পরামর্শ দেওয়ার মতো মানুষ বলতে একমাত্র মর্জিনা, আলি-বাবার কেনা বাঁদী। বাঁদী হলেও অত্যন্ত চতুরা এবং সুন্দরী যুবতী। তার চোখের চাহনিতে যে কোন বুদ্ধিমান পুরুষও বোকা বনে যেতে পারে। বাড়িতে ঢোকার আগে আলিবাবা তার নাম করে হাক দিয়ে এসেছিল।

তা সেই মর্জিনাই ছুটে এসে কাসিমের বিবির মুখে হাত চাপা দিয়ে মৃদু ভৎর্সনার সুরে বলে ওঠে, 'এ তুমি কি করছো চাচী, পাড়ার লোকের কাছে কি কৈফিয়ত দেবে শুনি?'

'ঠিক বলেছিস মর্জিনা', আলিবাবা তাকে সমর্থন করে বলে, 'এখন ভাইজানের মৃতদেহ কবর দেওয়ার আগে তার খণ্ডিত দেহ কি করে জোড়া লাগানো যায় বল তো ? আমার মাথায় কিছুই আসছে না। যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা কর মা।'

'তার জন্য তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না আব্বাজান, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' এই বলে মর্জিনা প্রথমে হেকিমের কাছে গেলো, কাসিম চাচার মৃত্যু শয্যায় শায়িত খবরটা দিয়ে প্রথম দিন দাওয়াই নিয়ে আসে। পরদিন সেই হেকিমের কাছে গিয়ে বলে 'চাচার শেষ অবস্থা, এখন যায় তখন যায়। হেকিম সাহেব, একটু কড়া দাওয়াই দিন।'

'এই নে', দাওয়াই-এর পুড়িয়া হাতে দিয়ে হেকিম সাহেব তাকে বলে, 'এই দাওয়াই-এ তোর চাচার বেমারি না সারলে বুঝে নিস আর কোন দাওয়াই-এ কাজ হবে না। তার কবরের ব্যবস্থা রাখিস তখন।

পরদিনেই কাসিমের বাড়িতে কান্নার রোল উঠলো। সবাই জানলো কাসিম মারা গেছে। নির্দিষ্ট দিনে কাসিমকে কবরস্থ করার ব্যবস্থা করলো আলিবাবা

তবে তার আগে বুদ্ধিমতী মর্জিনা ছুটলো দূরের এক বৃদ্ধ দর্জির কাছে। দর্জির নাম মুস্তাফা। তার হাতে একটা স্বর্ণমুদ্রা গুঁজে দিয়ে বলে, 'তা মুস্তাফা, শুনেছি তোমার হাতের সেলাই-এর কাজ নিখুঁত। একটা কাজ করে দিতে পারলে আমি তোমাকে আরো কয়েকটা সোনার মোহর দেবো। কি রাজী আছো তো ?'

মেয়েটার প্রস্তাব মন্দ নয় তো ! সামান্য একটা সেলাই এর কাজের জন্য আগাম একটা সোনার মোহর। কাজ ভালো করতে পারলে আরো মোহর। আশ্চর্য ব্যাপার তো। সঙ্গে সঙ্গে মর্জিনার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলো দর্জি মুস্তাফা।

অতঃপর মর্জিনা তার চোখে কালো রুমাল বেঁধে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। আশ্চর্য কাসিমের খণ্ডিত দেহ নিপুণ হাতে সেলাই করে দিলো সেই বৃদ্ধ মুস্তাফা দর্জি। যাইহোক নির্বিঘ্নে নির্দিষ্ট দিনে কাসিমের মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়।

আর চল্লিশ দিন শোকদিবস পালন করার পর মুসলিম শাস্ত্র মতে আনুষ্ঠানিক ভাবে কাসিমের বিধবা বিবিকে শাদী করলো আলিবাবা।

ওদিকে বেশ কিছুদিন পরে লুটের মাল নিয়ে ডাকাত সর্দার তার দলবল সঙ্গে নিয়ে সেই অভিশপ্ত পাতালপুরীতে প্রবেশ করে দেখলো, বস্তাবন্দী কাসিমের মৃতদেহটা সেখান থেকে উধাও। সঙ্গে সঙ্গে রাগে ফেটে পড়লো ডাকাত সর্দার, 'দেখছি, আমাদের দুশমনেরা এখনো খতম হয়নি। ঐ লোভী কুত্তাটা ছাড়া তার পিছনে আরো অনেক কুত্তা আছে। তাদের খতম করতে না পারলে আমাদের স্বস্তি নেই।'

সর্দারের হুকুম পেয়ে একজন চোর দরবেশের ছদ্মবেশে জঙ্গলের পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে তল্লাশ চালাতে গিয়ে এক সময় সেই মুস্তাফা দর্জির হাতের সূক্ষ্ম কাজ দেখে বিস্মিত হলো, 'তা মুস্তাফা সাহেব দেখছি তোমার হাতের কাজ খুব ভালো।'

'তা এ আর এমন কি কঠিন কাজ বাছা', মুস্তাফা গর্ব করে বলে, 'এর থেকেও এক কঠিন কাজ আমি করেছি সেদিন। মরা মানুষের দ্বিখণ্ডিত দেহ জোড়া লাগিয়ে এসেছি সেদিন।'

'তাই নাকি ?' দরবেশ বেশী সেই চোরটার চোখ দুটো চক্‌চক্ করে ওঠে। তাহলে এই বোধহয় তাদের সেই দুশমনের তল্লাশ পাওয়া গেলো। তাই সে তাড়াতাড়ি তার আলখাল্লার জেব থেকে একটা সোনার মোহর তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, 'কোন্ বাড়ির কাটা দেহ তুমি জোড়া লাগিয়ে এসেছো, সেটা দেখিয়ে দিলে তোমাকে আমি আরো অনেক সোনার মোহর দেবো। চলো আমার সাথে।'



এ কথায় মুস্তাফা দর্জি দারুণ উৎসাহ পেলো। সঙ্গে সঙ্গে সে রাজী হয়ে গেলো দরবেশ চোরের সঙ্গে আলিবাবার বাড়ি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। দরবেশ চোর তার চোখে রুমাল বেঁধে দেয় রাস্তায় নেমে। অন্ধজনের মতো পথ চিনে ঠিক সে আলিবাবার বাড়িটা দেখিয়ে দেয়। দরবেশ চোর বাড়িটা পরে চেনবার জন্য আলিবাবার বাড়ির দেওয়ালে শাদা চক-খড়ি দিয়ে দাগ কেটে রেখে যায়।

মর্জিনা তখন বাজার করে ফিরে আসছিল। তার মনিবের বাড়ির দেওয়ালে শাদা চক-খড়ির সাংকেতিক চিহ্ন দেখে বুঝে নেয়, নিশ্চয়ই এর পিছনে কারোর বদ মতলব আছে। তাই সে শয়তানকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রতিটি বাড়ির দেওয়ালে শাদা চক-খড়ির দাগ এঁকে দেয়।

গুপ্তচর দরবেশ চোরের খবর মতো সর্দার তার দলে চরদের পাঠালো আলিবার বাড়িটার সঠিক অবস্থান দেখে আসার জন্য। কিন্তু মর্জিনার সেই কারসাজির দরুণ আলিবাবার বাড়িটা ঠিক ঠাওর করতে পারলো না। ক্রোধে জ্বলে উঠলো ডাকাত দলের সর্দার সেই গুপ্তচর দরবেশ চোরের উপরে। সর্দারের হুকুমে তার ধড় থেকে মুণ্ডুটা নামিয়ে দেওয়া হলো তলোয়ারের এক কোপে।

পরদিন আর এক গুপ্তচরকে পাঠালো সর্দার সেই মুস্তাফা দর্জির কাছে। আগের দরবেশ চোরের মতো সে এবার আলিবাবার বাড়ির দেওয়ালে লাল চক-খড়ির দাগ এঁকে এলো। ওদিকে মর্জিনাও ওঁৎ পেতে ছিলো। আগের বারের মতো এবারেও সে তাদের মহল্লার প্রতিটি বাড়ির দেওয়ালে লাল চক-খড়ির দাগ টেনে দেয়। সর্দারের লোক এসে এবারেও বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে যায়। সর্দারের হুকুমে দ্বিতীয় দরবেশ চোরের গর্দান নেওয়া হয় সেই মুহূর্তে।

এবার ডাকাত সর্দার নিজে সেই মুস্তাফা দর্জির সঙ্গে যোগাযোগ করে আলিবাবার বাড়িটা দেখে আসে এবং এবার সে তার বাড়ির দেওয়ালে সোনার মোহরের প্রতিবিম্ব এঁকে এলো। ফিরে আসার সময় আলিবাবার বাড়ির চারপাশ ভালো করে দেখে এলো যাতে পরে বিভ্রান্ত হতে না হয়। সেই সঙ্গে মুস্তাফা দর্জিকে সোনার মোহর উপহার দিয়ে আসতে ভুললো না।

সর্দার তার ডেরায় ফিরে এসে তার সাকরেদদের হুকুম করে আটত্রিশটা তেলের পিঁপে জোগার করে আনো। সে তার মতলবের কথা তাদের খুলে বললো সেই সঙ্গে। সর্দারের পরিকল্পনা মতো উনিশটা ঘোড়ার পিঠে দুটি করে তেলের পিঁপে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। একটা পিঁপে তেল ভর্তি থাকবে, বাকী সাঁইত্রিশটা খালি পিঁপেয় তার সাঁই-ত্রিশজন সাকরেদ গুঁটি সুঁটি মেরে বসে থাকবে। তারপর তাদের ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে ডাকাত সর্দার যাবে আলিবাবার বাড়িতে সন্ধ্যের সময় আশ্রয় নেওয়ার জন্য। তার পরিচয় হবে তেলের ব্যবসায়ী। তাতে আলিবাবার কোন সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। তারপর রাত গভীর হলে সর্দার এক একটা খালি পিপেয় ঢিল ছুঁড়ে ইঙ্গিত করবে বেরিয়ে আসার জন্য। এবং তখন তারা সম্মিলিত ভাবে আলি-বাবার বংশ ধ্বংস করে তাদের দুশমনদের নিঃশেষ করে ছাড়বে।

কিন্তু চতুর মর্জিনার কি রকম যেন সন্দেহ হয়। ডাকাত সর্দারকে আলিবাবা খুব খাতির করে তার ডেরায় ঠাঁই দিলেন। মর্জিনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে থাকে আগন্তুকের উপরে। সেই সময় চিরাগের তেল ফুরিয়ে যেতে আলিবাবার কাছে গিয়ে সে জানায়, 'আব্বাজান, সন্ধ্যের সময় হঠাৎ আপনার অতিথি এসে পড়ায় তেল ফুরিয়ে যাওয়ার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। এখন কি করি বলুন তো?'

আলিবাবা মৃদু হেসে বলে, 'অতোগুলো তেলের পিঁপে বাড়ির মধ্যে রাখা আছে, সেখানে তেলের অভাব কিসের মা, ফুরিয়ে গেলে যে কোন একটা তেলের পিঁপে থেকে একটু তেল নিলে আমাদের মেহমান সওদাগর কিছু মনে করবেন না নিশ্চয়ই।'

কথাটা মন্দ নয়। তেল ফুরিয়ে যেতেই মর্জিনা ছুটলো তেলের পিপের দিকে। তেলের পিঁপে-গুলো রাখা হয়েছিল সর্দারের ঘরের ঠিক পাশে ঘোড়ার আস্তাবলে। একটা পিপের মুখ খুলে তেল নিতে গিয়ে মর্জিনা চমকে ওঠে, একি! তেলের বদলে পিপের মধ্যে একটা ষণ্ডামার্কা লোক সেখানে গুঁটিসুঁটি মেরে বসে আছে। একটি পিঁপে ছাড়া বাকী ত্রিশটা পিঁপে পরীক্ষা করতে গিয়ে একই জিনিষ প্রত্যক্ষ করে তাজ্জব বনে যায় মর্জিনা। তবে পরক্ষণেই এক পিপেয় তেল দেখে খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে সে। সেই তেল ভর্তি পিঁপেটা রসুই ঘরে নিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বড় একটা কড়াইয়ে ঢেলে আগুনে ফোটাবার ব্যবস্থা করে। তারপর সেই ফুটন্ত গরম তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠার মতো ভাজা ভাজা হয়ে একবার মাত্র আর্তনাদ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। ডাকাত সর্দার জানতেও পারলো না, তার সাকরেদদের মধ্যে কেউ বেঁচে থাকলো না, কারণ সে তখন নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিল।

ঘুম ভাঙতেই ধড়মড় করে উঠে বসলো সর্দার। নিশুতি রাত তখন। এই সুযোগ। সে তার ঘর থেকে এক একটা পিপে লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু সাড়া না পেয়ে মুখ খারাপ করলো সে, 'শ্লা নাকে সরষের তেল লাগিয়ে ঘুমচ্ছে। দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি।' এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে সেই পিপেগুলোর মুখ খুলে পরীক্ষা করতে গিয়ে তার নাকে পোড়া চামড়ার একটা বিশ্রী গন্ধ কানে ভেসে আসে। তখুনি সে বুঝে যায়, তার সব ফন্দী-ফিকির আলিবাবার কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। তারই আনা গরম তেলে তার সাকরেদদের নিধন যজ্ঞে মেতে উঠেছে এরা। সে তখন বেশ ভালোই জেনে গেছে, এবার তার পালা, তাকেও রেহাই দেবে না তারা। সর্বনাশা কথাটা মনে হতেই নিশুতি রাত্রে আলিবাবার বাড়ি ছেড়ে নিমেষে উধাও হয়ে যায় ডাকাত সর্দার।

আলিবাবার বড় ছেলে কাসিম দোকান চালায়। একদিন আলিবাবাকে সে বলে, 'আব্বাজান, বাজারের এক সওদাগর হুসেনসাহেব আমাদের বাড়িতে একদিন খানাপিনা করার জন্য

প্রায়ই আবদার করে। তাকে কি বলি বলতো ?'

আলিবাবা তখুনি রাজী হয়ে যায় হুসেন-সাহেবকে রাত্রে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য।

সন্ধ্যার একটু আগে হুসেন সাহেব তাদের বাড়িতে এলো আলিবাবার অতিথি হয়ে। সুপুরুষ চেহারা, মুখে চাপদাড়ি। তাকে দেখে মর্জিনার কেমন যেন সন্দেহ হলো, তবে মুখে কিছু বললো না।

রাত্রে খানাপিনার পর মর্জিনাকে দেখা গেলো নর্তকীর বেশে নাচের আসর জমাতে. তার নাচের সাথী হলো আবদাল্লা। আলিবাবা এবং তার ছেলে মর্জিনার ঐ বেশ, ঐ রূপ দেখে অবাক হয়। মর্জিনা এবং আবদাল্লা নাচের আসর বেশ জমিয়ে তোলে। মর্জিনার হাতে ধারালো ছুরি।

ওদিকে সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে শিউরে উঠে আলিবাবা ভাবে, মেয়েটা বোধহয় বকশিসের জন্য ও রকম অভিনয় করছে। তাই সে তাড়াতাড়ি কুর্তার জেব থেকে একটা সোনার মোহর তুলে দেয় মর্জিনার হাতে। তার দেখাদেখি কাসিমের ছেলেও একটা সোনার মোহর তুলে দেয় মর্জিনার হাতে। সওদাগর খাজা হাসানও বা চুপচাপ বসে থাকবে ? মর্জিনা তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে সেও তার কুর্তার জেব' থেকে সেই সোনার মোহর বার করতে যাবে, মর্জিনা তৈরী হয়েই ছিলো, হুসেনের একটু অন্য-মনস্কতার সুযোগ নিয়ে অতর্কিতে তার বুকে ছুরিটা বসিয়ে দিলো। তার রক্তাক্ত নিশ্চল দেহটা জমিনের উপরে লুটিয়ে পড়লো।

সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আলিবাবা চিৎকার করে উঠলো, ছিঃ ছিঃ এ-তুই কি করলি মা ?'

'আব্বাজান, শুনলে আপনি অবাক হবেন, আপনি যাকে সৎ অতিথি বলে ভাবছেন সে আপনার দুশমন, ডাকাতদলের সর্দার।'

উপসংহার

বাদশাহ শাহরিয়ারের সঙ্গে শাদীর পর এই সময়ে শাহরাজাদ তিনটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। শেষ কাহিনী বলার পর উঠে দাঁড়ায় সে। তারপর জমিনের উপর চুম্বন করে শাহরিয়ারের উদ্দেশে বললো, 'জাঁহাপনা, সহস্র এক রজনী অতিক্রম করার সময় আমি আপনাকে একটানা চমক লাগানো কাহিনী বলে তৃপ্তি দিয়েছি, এ কথা আপনি আজ নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। তার বিনিময়ে আমি এখন আপনার কাছ থেকে কিছু ইনাম পেতে পারি না ?'

'বেশ তো শাহরাজাদ তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর। বলো কি তোমার ইচ্ছা ?'

তখন শাহরাজাদ বাদশাহ শাহরিয়ারের শয়ন-কক্ষের বাইরে অপেক্ষারত ধাত্রীদের উদ্দেশে চিৎকার করে বললো, 'আমার পুত্রদের নিয়ে এসো !'

পরমুহূর্তেই তারা তিনটি ফুটফুটে ফুলের মতো সুন্দর শিশুপুত্রদের কোলে নিয়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করলো। তাদের কোল থেকে শাহরাজাদ তার পুত্রদের নিয়ে বাদশাহ শাহরিয়ারের সামনে বসিয়ে আবার জমিনের উপরে চুমু খেয়ে বললো, 'জাঁহাপনা, এরা আপনার সন্তান। সহস্র এক রজনী ধরে আপনাকে আমি একের পর এক চমকদার কাহিনীর মালা গেঁথে আপনার তৃপ্তি দিয়েছি। তার বিনিময়ে আমি এখন আপনার কাছ থেকে আমার প্রাণ ভিক্ষা চাইছি, আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেবেন না, তাহলে ফুলের মতো এই তিন শিশু অনাথ হয়ে যাবে, ওরা মাতৃহারা হয়ে যাবে তখন।

শাহরাজাদার মুখ থেকে সব শুনে বাদশাহ শাহরিয়ার প্রেমপূর্ণ চোখে তাকালেন শাহরাজাদার

দিকে,—'আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বলছি, শাহরা-জাদ, আমাকে তোমার ঐ তিনটি পুত্র সন্তান উপহার দেওয়ার অনেক আগেই তুমি আমার সারা মন জুড়ে বসে গেছো. আমার হৃদয়ে তোমার স্থান অনেকখানি। এই অবস্থায় তোমাকে হারিয়ে এক মুহূর্ত বেঁচে থাকা আমার কাছে মৃত্যুরই সামিল।' তারপর তিনি তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার ঠোঁটে চুমু খেলেন।

পরদিন রাত্রির অবসান হতে বাদশাহ শাহরিয়ার তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করে চারিদিকে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছিলেন। আমির ওমরাহরা সবাই মুখ চাওয়া-চায়ি করে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠায়। শাহেরাজাদার পিতা বাদশাহের প্রধান উজির তখন তার কন্যার ইন্তেকালের খবর শোনার অপেক্ষায় মুহূর্ত গুণতে থাকে। তার সব ভাবনার অবসান করে বাদশাহ শাহরিয়ার তাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করলেন এবং মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিয়ে বললেন, 'আল্লাহর দোয়ায় আপনার গুণবতী কন্যাকে আমি আমার সত্যিকারের বেগম হিসেবে পেয়ে আজ আমি ধন্য ধন্য আমার জীবন।'

সেদিনের রাজ-কার্য সমাধা করার আগে বাদশাহ সানন্দে ঘোষণা করলেন, শাহরাজাদকে তিনি যথা-যোগ্য মর্যাদা সহ শাদী করে তাঁর হারেমের প্রধান বেগম করে তাঁর মনের মণিকোঠায় স্থান দিতে চান।

শুধু কি তাই? বাদশাহ শাহরিয়ার সমরখন্দ থেকে তাঁর ছোট ভাই শাহ জামানকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সেই ইচ্ছার কথা জানালেন। শাহ জামান শাহারজাদ এবং দুনিয়াজাদের কাহিনী শোনার পর তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভরে উঠলো। সে তখন তার বড় ভাইজান বাদশাহ শাহরিয়ারের কাছে দুনিয়াজাদকে শাদী করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন।

তারপর একদিন বাদশাহী জাঁকজমকে দুই ভাই উজির কন্যাদের শাদী করে উজিরের সব চিন্তা ভাবনার অবসান ঘটালেন তিনি তখন বেতনভোগী উজিরই নন, সে তখন তাঁর পরম আত্মীয় এবং সম্মনিত ব্যক্তি, শাহরিয়ার তার দামাদ।

বাদশাহ শাহরিয়ার তাঁর খাস বেগম শাহরা-জাদের সেই সহস্র এক রজনীর কাহিনীগুলো স্বর্ণা-ক্ষরে লিখে রাখার জন্য অনুলেখকদের আদেশ দিলেন।

